DIGITIZED

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বৃহত্তর কুমিল্লার বিশিষ্ট আলেমগণের ভূমিকা (১৯০১-২০০০ খ্রি.)

পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য
উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
২০১৭

GIFT

তত্ত্বাবধায়ক
ড. আ.জ.ম. কুতুবুল ইসলাম নো'মানী
সহকারী অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

499721

Dhaka University Library
499721

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

গবেষক
মুহাম্মদ আমীমুল এহসান
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রেজিঃ নং - ১০২/২০০৯-২০১০
১১৫/২০১৪-২০১৫ (পুনঃ)

সেপ্টেম্বর - ২০১৭

Dr. A J M Qutubul Islam Numani
Assistant Professor
Dept. of Arabic, University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh.

الدكتور أ ج م قطب الإسلام نعماني
الأستاذ المساعد
قسم العربية، جامعة داكا
داكا-١٠٠٠، بنغلاديش

Ref. No. ....

Date 28/7/2017

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক জনাব মুহাম্মদ আমীমুল এহসান কর্তৃক **"আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বৃহত্তর কুমিল্লার বিশিষ্ট আলেমগণের ভূমিকা"** (১৯০১-২০০০ খ্রি.) শিরোনামে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভটি মৌলিক ও তথ্যবহুল। এটি সম্পূর্ণরূপে তার নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে এ শিরোনামে ইতোপূর্বে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে এ ধরনের কোন গবেষণাকর্ম রচিত হয়নি। চূড়ান্ত পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সন্তোষজনক। আমি এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের চূড়ান্ত কপিটি আদ্যোপান্ত ভালোভাবে পড়েছি ও দেখেছি এবং পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

DIGITIZED

499721

তত্ত্বাবধায়ক

28/7/17

ড. আ.জ.ম. কুতুবুল ইসলাম নো'মানী
সহকারী অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dr. A.J.M. Qutubul Islam Numani
Assistant Professor
Department of Arabic
University of Dhaka.

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Tel: 9661920-73 Ext: 6117 Fax: 880-2-9615277 Mob: 01819116900 Email: ajamal@yahoo.com

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, **"আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বৃহত্তর কুমিল্লার বিশিষ্ট আলেমগণের ভূমিকা"** (১৯০১-২০০০ খ্রি.) শিরোনামে উপস্থাপিত থিসিসটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণার ফল। আমার জানামতে এ শিরোনামে ইতোপূর্বে কোথাও কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত থিসিসটি আমি সম্পূর্ণরূপে বা এর কোনো অংশবিশেষ কোথাও প্রকাশনার জন্য অথবা অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপন করিনি।

নিবেদক

A. Ahsan
24.09.2017

মুহাম্মদ আমিমুল এহসান
পিএইচ.ডি. গবেষক
আরবী বিভাগ
রেজিঃ নং - ১০২/২০০৯-২০১০
১১৫/২০১৪-২০১৫ (পুন:)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

499701

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের, যার অফুরন্ত মেহেরবানীতে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে **"আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বৃহত্তর কুমিল্লার বিশিষ্ট আলেমগণের ভূমিকা"** (১৯০১-২০০০ খ্রি.) শীর্ষক গবেষণাকর্মটি পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভের জন্য উপস্থাপন করার সুযোগ পেয়েছি। অসংখ্য দুরূদ ও সালাম আখেরী নবী সাইয়েদুল মুরসালিন মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের প্রতি।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভকে সাফল্য মণ্ডিত করার ক্ষেত্রে যাঁরা আমাকে আংশিক ও সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এক্ষেত্রে বিশেষ করে আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ও গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক, শিক্ষাবিদ, লেখক ও গবেষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. আ.জ.ম. কুতুবুল ইসলাম নো'মানী স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞ। তাঁর দিক-নির্দেশনা, উদ্দীপনা, অনুপ্রেরণা, সার্বিক সহযোগিতা ও আন্তরিকতা আমাকে সকল ক্ষেত্রে উৎসাহিত করেছে। তিনি বিভিন্ন দায়িত্ব পালন ও বহু কর্মব্যস্ততার মাঝেও আমার জন্য মূল্যবান সময় ব্যয় করে গবেষণাকর্মের প্রতিটি বিষয় খুঁটিয়ে দেখা, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সমন্বয় সাধন করা, প্রতিনিয়ত খোঁজ খবর নিয়ে গবেষণাকর্মের সৌন্দর্য বর্ধনে মূল্যবান উপদেশ ও নির্দেশনা দিয়ে ব্যাপক সহযোগিতা করেছেন। তাঁর সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের কারণে আমার গবেষণাকর্মটি সহজে ও সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। এজন্য আমি তাঁর নিকট আজীবন ঋণী ও চিরকৃতজ্ঞ। এরই সাথে স্যারের পত্নীর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তিনি বিভিন্ন সময়ে স্যারের বাসায় অবস্থানকালে আমাকে আতিথেয়তার মাধ্যমে ঋণের জালে আবদ্ধ করেছেন।

আমি এই অভিসন্দর্ভে সে সকল লেখকদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যাদের রচনা থেকে উপকৃত হয়েছি। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক ড. এ.বি.এম. ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী স্যারের প্রতি, যিনি আমাকে গবেষণাকর্ম সম্পন্নকরণে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউছুফ স্যারের প্রতি। তিনি আমাকে পরামর্শ দিয়ে উৎসাহ-অনুপ্রেরণা জুগিয়ে উপকৃত করেছেন। আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সহযোগী অধ্যাপক ড. যুবাইর মো. এহসানুল হক, সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহম্মদ শহীদুল ইসলাম ও সহযোগী অধ্যাপক ড. আবদুল্লাহ আল-মারুফ স্যারের প্রতি, তাঁরা বিভিন্ন সময় খোঁজ খবর ও পরামর্শ দিয়ে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আলেম উলামা, পীর-মাশায়েখ, মুহাদ্দিস, ইসলামী গবেষক, লেখক, অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের যারা তথ্য সরবরাহ, পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদানসহ গবেষণাকর্মের জন্য সাক্ষাৎকার প্রদান করে সহযোগিতা করেছেন।

আমি চিরকৃতজ্ঞ ও চিরঋণী আমার শ্রদ্ধাভাজন পিতা জনাব কাজী আবু লাইচ মাওলানা সফিকুল আলম-এর প্রতি তিনি আমাকে এই গবেষণাকর্মে যোগদানের জন্য সবচেয়ে বেশি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন এবং আমার শ্রদ্ধেয় আম্মা জনাব মাকসুদা বেগমের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তিনি আমাকে ইসলামের খেদমতে সদা-সর্বদা নিয়োজিত থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন ও দোয়া করছেন। আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মুনিরুজ্জামানের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ যার অনুপ্রেরণায় ও বুদ্ধি পরামর্শে এ গবেষণাকর্মটি আজ পূর্ণতা লাভ করেছে। আমি

Dhaka University Institutional Repository

গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই আমার শ্রদ্ধেয় চাচা মাওলানা কেফায়েত উল্লাহ হেলালী ও মাওলানা হোসাইন আহমাদ সাহেবের প্রতি তাঁরা আমাকে সর্বদা পড়ালেখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপদেশ প্রদান করেন।

আরও কৃতজ্ঞতা জানাই আমার ভগ্নিপতিদের প্রতি, তাঁরা আমাকে সবচেয়ে বেশি মনোবল ও উৎসাহ দিয়েছেন ও অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁরা হলেন- মাওলানা ইসমাঈল হোসাইন, অধ্যক্ষ, নরহরিপুর ফাযেল মাদ্‌রাসা, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা, মাওলানা ফয়েজ উল্লাহ সাবেক শিক্ষক ফরীদাবাদ মাদ্‌রাসা, ঢাকা, মুফতী ফরীদ আহমাদ, মুহাদ্দিস উজানী মাদ্‌রাসা ও মুফতী জাবের আহমাদ, মুহাদ্দিস জামিয়া কারিমিয়া, রামপুরা, ঢাকা। আমি তাঁদের কাছে আজীবন ঋণী।

এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বেগম সুফীয়া কামাল জাতীয় গ্রন্থাগার, কুমিল্লা জেলা গণগ্রন্থাগার, কুমিল্লা ইসলামীক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা ইসলামীক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগারসহ বিভিন্ন মাদ্‌রাসা গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তাঁরা আমাকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। কম্পিউটার কম্পোজ ও প্রুফ রিডিংয়ের ক্ষেত্রে শ্রম ও মেধা ব্যয় করেছেন জনাব মো. হেলালুজ্জামান ও জনাব আবদুল হান্নান, আমি তাঁদের প্রতি আন্তরিকতভাবে কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে আমি তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা সর্বোপরি আমাকে এই অভিসন্দর্ভ রচনায় বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিয়েছেন এবং সহযোগিতা করেছেন।

মুহাম্মদ আমীনুল এহসান
পিএইচ.ডি. গবেষক
আরবী বিভাগ
রেজিঃ নং - ১০২/২০০৯-২০১০
১১৫/২০১৪-২০১৫ (পুন:)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপণ পরিচিতি

আ. = আলাইহিস সালাম
ই. = ইতিহাস/ইসলামীক
ইং. = ইংরেজি
ই.ফা.বা. = ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
কু. = কুমিল্লা
খ্রি. = খ্রিস্টাব্দ
খ. = খণ্ড
জে. = জেলার
ড. = ডক্টর
দ্র./বি.দ্র = বিশেষ দ্রষ্টব্য
পৃ. = পৃষ্ঠা
প্রি. = প্রিন্টিং
মৃ. = মৃত্যু
ম. = মডার্ন
হি. = হিজরি
রহ. = রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
রা. = রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু/আনহা/আনহুমা/ আনহুম
বা. = বাংলা/ বাংলাদেশ
সা. = সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
সং. = সংস্করণ
লি. = লিমিটেড
p. = Page
ED/Ed. = Edition/Edited
Pub. = Publisher.
Dr. = Doctor of Philosophy

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রবের যিনি মানবকুলকে সৃষ্টি করে তাদের হেদায়েতের জন্য অগণিত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। অসংখ্য দুরূদ ও সালাম আখেরী নবী মানবতার মুক্তির দিশারি ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর। অফুরন্ত রহমত বর্ষিত হোক তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কেরামের ওপর, যাঁদের হিদায়াতের আলোয় আলোকিত হয়ে পৃথিবীতে ইলমে দ্বীন বিস্তার লাভ করেছে। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আর এর মাধ্যমেই সূচিত হয় বান্দার সাথে মহান রাব্বুল আলামিনের সেতুবন্ধন। মানুষকে এ মহাসত্য কথাটি স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁরা মানুষের নিকট আল্লাহর পরিচয় ও তাঁদের কর্তব্যের বিষয় তুলে ধরেছেন। নবীগণের সে ধারাবাহিকতায় দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে ঐশী প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে আলেমগণ যুগে যুগে শিক্ষার আলোকবর্তিকা হাতে ধারণ করে দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। কেননা শিক্ষা মানব-জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। আবহমানকাল থেকে মানব সভ্যতার সূচনা ও অগ্রগতির সাথে যেমন শিক্ষার সম্প্রাসারণ ঘটেছে তেমনিভাবে তার প্রকৃত ধারাও প্রবর্তিত হয়েছে। ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও মূল্যবোধে উজ্জীবিত হওয়া হলো ইসলামী শিক্ষার মূল লক্ষ্য। অর্থাৎ যে শিক্ষার মাধ্যমে নিজেকে ও আল্লাহকে সঠিকভাবে জানতে ও চিনতে পারা যায়, জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের দিকনির্দেশনা ও সমাধান পাওয়া যায় সেটা ইসলামী শিক্ষায় বিদ্যমান। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ শিক্ষা কুরআন-সুন্নাহ তথা তাওহিদ ও রিসালাত ভিত্তিক। যা সমগ্র মানব-জাতির জন্য কল্যাণকর। যা মানুষকে হেদায়েতের পথে পরিচালিত করে মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে জাগিয়ে তোলে। আর সে শিক্ষা অনুযায়ী বাস্তব-জীবন পরিচালনা করার মাধ্যমেই পরিপূর্ণ সার্থকতা রয়েছে। ইসলামী শিক্ষার মূল উৎস আল-কুরআন ও আল-হাদীস। আল-কুরআন নাযিলের প্রথম আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা শিক্ষার কথা বলেছেন। যেমনঃ- اقراء باسم ربك الذى خلق পড় তোমার রবের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।[১] এমনিভাবে হাদীসেও ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও বৈশিষ্ট্য বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। নবী-রাসূলগণকে আল্লাহ তা'আলা মানব-জাতির শিক্ষক রূপে প্রেরণ করেছেন। আর মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন সর্বশেষ নবী ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। তাঁর মাধ্যমেই ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে। তিনি ছিলেন গোটা মানব-জাতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ও আদর্শ শিক্ষক। রাসূল (সা.) ঘোষণা করেন بعثت معلمًا - আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। অর্থাৎ আমাকে প্রচারক হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।[২]

রাসূল (সা.) তাঁর সাহাবাগণকে আল-কুরআন শিক্ষাদানের পাশাপাশি হাদীসও শিক্ষাদান করেছেন এবং সকল অনাগত উম্মতের নিকট পৌঁছাতে তিনি নির্দেশও দিয়েছেন। রাসূল (সা.)-এর সাহাবীগণ তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে ইসলামের দাওয়াত বিশ্বময় পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। বহু সাহাবী যারা বিভিন্ন এলাকায় ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে গিয়ে আর ফিরে আসেননি। ইসলামের প্রচার-প্রসারে সেখানেই থেকে গেছেন। আর কেউ কেউ দ্বীনের দাওয়াতী কাজে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। এভাবেই তাঁরা সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে সমাজ

---

[১] আল-কুরআন; সূরা আলাক: ১।

[২] সুনান ইবন মাযাহ, (দুবাই : আল-মাকতাবাতুশ শামেলা), পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

গঠনের জন্য আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মুসলমানদেরকে দ্বীনী শিক্ষাদান করা এবং এ শিক্ষার মাধ্যমেই গোটা-জাতিকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে আলেমগণ ইসলামী শিক্ষা তথা কুরআন-হাদীসের নৈতিক শিক্ষাগুলো সাধারণের মাঝে প্রদান করে থাকেন। যাতে করে একটি আদর্শিক সমাজ গড়ে ওঠে। যার মাধ্যমে ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হাসিল হয় এবং পরস্পরের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি হয়।

আরব বাণিজ্যিক কাফেলার আগমনের মাধ্যমেই পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসার লাভ করে। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম সিন্ধু বিজয়ের পর বহু-সংখ্যক আরব আগমন করেন। যার ফলে উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে সমৃদ্ধি লাভ করে। এখানে পবিত্র কুরআন-হাদীসের চর্চা হতে থাকে। পরবর্তীতে তা পুরো ভারতবর্ষে মুসলমানদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। সে লক্ষ্যে বহু দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে যা মক্তব, ফার্সী মাদ্রাসা ও আরবী মাদ্রাসা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আর আরবী মাদ্রাসাগুলোতেই উচ্চশিক্ষা অর্জন করতো। আরবী ও ইসলামী শিক্ষার উন্নতিকল্পে এদেশে আলেম-উলামার ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক। তাঁরা পাক-ভারত-বাংলায় ইসলামের দাওয়াত অমুসলিমদের মাঝে প্রচার করেন। তাঁদের দাওয়াতের মাধ্যমে দেশ, জাতি ও সমাজ অনেক উপকৃত হয়েছে। ফলে জাতি আজও তাঁদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। তাঁরা ইসলামের সঠিক উদ্দেশ্য ও আদর্শ বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠা করেন অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকা। যার মাধ্যমে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তার লাভ করতে থাকে। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ব্রিটিশ বেনিয়া ও অত্যাচারী জমিদারদের নিষ্পেষণে নিপীড়িত বাংলার মানুষকে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সঠিক অবস্থানে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্কারমূলক আন্দোলন গড়ে ওঠে। তার মধ্যে দেওবন্দী সিলসিলা, ফুরফুরা সিলসিলা ও জৌনপুরী সিলসিলার সংস্কার আন্দোলন অন্যতম।

বৃহত্তম কুমিল্লাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়ে মানুষকে কুসংস্কার ও অনৈসলামীক চাল-চলন থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে তাঁরা অনন্য অবদান রাখেন। বৃহত্তর কুমিল্লাসহ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অশিক্ষিত ও কুসংস্কারে জর্জরিত জনগোষ্ঠীকে আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারে ব্যাপক উন্নতি সাধন করেন। তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেন অনেক মাদ্রাসা, মসজিদ, মক্তবসহ বিভিন্ন দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাঁদের দ্বীনী দাওয়াতের উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সমাজ সংস্কার, আরবী ও ইসলামী শিক্ষার যে উন্নতি সাধিত হয় তা বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে। তাঁরা অনেকেই আরবী ও ইসলামী শিক্ষা পাঠদানের পাশাপাশি সহায়ক গ্রন্থসমূহ শিক্ষাদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। তাঁদের অনেকেই আবার কেবল অধ্যয়ন ও পাঠদানে সীমাবদ্ধ ছিলেন না বরং আরবী ও ইসলামী শিক্ষাকে প্রচার-প্রসারের জন্য বিভিন্ন কিতাব বা কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ অনুবাদ গ্রন্থও রচনা করেছেন। এসব বিদগ্ধ আলেম উলামাদের আরবী ও ইসলামী শিক্ষার অবদান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ও সঠিক তথ্য-বহুল কোনো গবেষণাকর্ম না থাকায় তাঁদের ইতিহাস কালের গর্ভে বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

তাই এ অঞ্চলের বহু আলেম-উলামা যাঁরা আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদের জীবন ও উদ্ভাবনী কর্মের অবদান নিয়ে গবেষণা করে তা সংরক্ষণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং **"আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বৃহত্তর কুমিল্লার আলেমগণের ভূমিকা"** (১৯০১-২০০০খ্রি.) পর্যন্ত শিরোনামে গবেষণাকর্মটি সমাপ্ত করার প্রত্যয় গ্রহণ করি। কিন্তু বৃহত্তম কুমিল্লা

Dhaka University Institutional Repository

অঞ্চলে অসংখ্য আলেম-উলামা রয়েছেন তাঁদের সকলের জীবন ও উদ্ভাবনী কর্ম উল্লেখ করা খুবই দুরূহ। তাই যাদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁদের অবদানসমূহ উল্লেখ করেছি।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিশেষ কোনো জনপদ, শাসক কিংবা সচেতন সমাজ, শিক্ষা বিস্তারে অনেক বেশি অবদান রাখে। আর আলেমগণই আল্লাহর কালাম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তাঁর ইবাদাত করে থাকেন এবং নিঃস্বার্থভাবে ইসলামের মহামূল্যবান বাণী অপরের নিকট পৌঁছে দেন। তাঁরাই হলেন প্রকৃত আলেম। যাঁরা পরহেযগারী অবলম্বন করেন এবং সমাজ সংস্কারের জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। আল্লাহর বিধি-বিধান মোতাবেক নিজেদেরকে এবং সমাজের সকলকে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সর্বদা নিজেকে উৎসর্গ করেন তারাই প্রকৃত আলেম। তাই আলোচ্য অভিসন্দর্ভে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার আলেমগণের অবদান সম্পর্কিত তথ্য সন্নিবেশন করেছি। আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে এ জেলার আলেমগণ ব্যাপকভাবে অগ্রণী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে সারাদেশে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন।

এ গবেষণাকর্মে অনেক অজানা তথ্য উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন উৎস হতে তথ্য-উপাত্ত, উপকরণ সংগ্রহ করে গ্রহণযোগ্য ও যুক্তি-নির্ভর করার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচ্য এ গবেষণাকর্মে বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তথ্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্মরণিকা, সাময়িক পত্র-পত্রিকা, প্রতিষ্ঠানের প্রধান, মুহাদ্দিস, শায়েখুল হাদীস, আলেম-উলামাগণের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে বিভিন্ন আরবী ও ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রে সরেজমিনে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ও উপকরণসমূহকে নিরীক্ষণ পদ্ধতিতে অনুসন্ধান, যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করেছি। অপরদিকে মাধ্যমিক উৎস হিসেবে আরবী, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় লিখিত বিভিন্ন মৌলিক গ্রন্থ গবেষণা অভিসন্দর্ভে আলোচনা করা হয়েছে। যার ফলে নির্ভুল তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি এ গবেষণার ক্ষেত্রে বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, কুমিল্লা জেলায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষার ব্যাপকতা, আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বৃহত্তম কুমিল্লা জেলার আলেমগণের অবদান, বৃহত্তর কুমিল্লায় সমাজ ও সংস্কৃতিতে আলেমগণের অবদান ও সমাজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে আলেমগণের প্রত্যাশা এবং বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা সহজ ও সাবলীলভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমার এ গবেষণাকর্মটি সংশ্লিষ্টদের জন্য সামান্যতম উপকার হলেও আমি নিজেকে সার্থক মনে করবো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করুন। আমিন।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ক্র.নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১	প্রত্যয়নপত্র	২
২	ঘোষণাপত্র	৩
৩	কৃতজ্ঞতা প্রকাশ	৪-৫
৪	শব্দ সংক্ষেপণ	৬
৫	ভূমিকা	৭-৯
৬	সূচিপত্র	১০-১২
৭	**প্রথম অধ্যায় : বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি**	১৩-২৫
৮	পরিচ্ছেদ-১ : নামকরণ	১৪-১৫
৯	পরিচ্ছেদ-২ : সীমারেখা	১৫
১০	পরিচ্ছেদ-৩ : ভৌগোলিক অবস্থান	১৫
১১	পরিচ্ছেদ-৪ : প্রশাসনিক অবস্থান	১৬-১৭
১২	পরিচ্ছেদ-৫ : সামাজিক অবস্থান	১৭-২০
১৩	পরিচ্ছেদ-৬ : অর্থনৈতিক অবস্থান	২১
১৪	পরিচ্ছেদ-৭ : রাজনৈতিক অবস্থান	২১-২৫
১৫	**দ্বিতীয় অধ্যায় : কুমিল্লা জেলায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষার ব্যাপকতা**	২৬-৪৮
১৬	পরিচ্ছেদ-১ : ইসলাম আগমনের সময়কাল	২৭-৩৩
১৭	পরিচ্ছেদ-২ : কুমিল্লা জেলায় ইসলামের আগমন	৩৩-৪৩
১৮	পরিচ্ছেদ-৩ : আরবী ও ইসলামী শিক্ষার বিস্তার	৪৪-৪৮
১৯	**তৃতীয় অধ্যায় : আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বৃহত্তম কুমিল্লা জেলার আলেমগণের অবদান**	৪৯-২৭৫
২০	**পরিচ্ছেদ -১ : কুমিল্লা জেলার আলেমগণ**	৫০-১৫০
২১	পরিচ্ছেদ -১.১ : হাফেজ মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী (রহ.) (১৯০০-১৯৬৪ খ্রি.)	৫০-৬৮
২২	পরিচ্ছেদ -১.২ : মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন (রহ.) (১৯০৫-১৯৭৭ খ্রি.)	৬৯-৭৪
২৩	পরিচ্ছেদ -১.৩ : মাওলানা আবুল ফারাহ মো. মাকুছুদুর রহমান (রহ.) (১৯৪১-১৯৯৪ খ্রি.)	৭৫-৭৯
২৪	পরিচ্ছেদ -১.৪ : শায়খুল হাদীস মাওলানা আশরাফ উদ্দীন আহমেদ (রহ.) (১৯২১-২০০০খ্রি.)	৮০-৮৭
২৫	পরিচ্ছেদ -১.৫ : মাওলানা ইয়াসীন (রহ:) (১৮৮২-১৯৬৮ খ্রি.)	৮৮-৯১
২৬	পরিচ্ছেদ -১.৬ : মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রহ.) (১৯৩২-২০০৭ খ্রি.)	৯২-১০০
২৭	পরিচ্ছেদ -১.৭ : মাওলানা শাহ্ মুহিব্বুর রহমান (রহ.) (১৯০৫-১৯৯৯ খ্রি.)	১০১-১১০

Dhaka University Institutional Repository

ক্র.নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
২৮	পরিচ্ছেদ -১.৮ : মাওলানা শাহ্ সুফী আজীম উদ্দীন আহমদ (রহ.) (১৮৯৪-১৯৭৪ খ্রি.)	১১১-১২১
২৯	পরিচ্ছেদ -১.৯ : মাওলানা শাহ সুফী মোহাম্মদ হাতেম আলী সিদ্দিকী (রহ.) (১৮৮৫-১৯৭৬খ্রি.)	১২২-১২৮
৩০	পরিচ্ছেদ -১.১০ : শায়েখুল হাদীস মাওলানা তাফাজ্জল হোসাইন (রহ.) (১৯০৫-১৯৯৫ খ্রি.)	১২৯-১৩১
৩১	পরিচ্ছেদ -১.১১ : মাওলানা আবুল কাশেম (রহ.) (১৯৫২-২০১৪খ্রি.)	১৩২-১৩৫
৩২	পরিচ্ছেদ -১.১২ : আল্লামা শাহ্ সুফী মাওলানা মোহাম্মদ অলি উল্লাহ (রহ.) (১৯০৫-২০০৬খ্রি.)	১৩৬-১৪০
৩৩	পরিচ্ছেদ-১.১৩ : অধ্যাপক মাওলানা আবু নাঈম মোহাম্মদ ইব্রাহীম (রহ.) ১৯২৭-১৯৮৬ খ্রি.	১৪১-১৪৬
৩৪	পরিচ্ছেদ -১.১৪ : প্রিন্সিপাল মাওলানা আবুলাইচ মো. সফিকুল আলম	১৪৭-১৫০
৩৫	**পরিচ্ছেদ-২ : ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আলেমগণ**	**১৫১-২৩৮**
৩৬	পরিচ্ছেদ -২.১ : ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.) (১৮৯৬-১৯৬৭ খ্রি.)	১৫১-১৬৬
৩৭	পরিচ্ছেদ -২.২ : মাওলানা মুফতী নূরুল্লাহ (রহ.) (১৯৩০-২০১০ খ্রি.)	১৬৭-১৭৭
৩৮	পরিচ্ছেদ -২.৩ : মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (রহ.) (১৮৮১-২০০৬ খ্রি.)	১৭৮-১৮৩
৩৯	পরিচ্ছেদ -২.৪ : মাওলানা সিদ্দীকুর রহমান (রহ.) (১৮৮৯-২০০৩খ্রি.)	১৮৪-১৮৬
৪০	পরিচ্ছেদ-২.৫ : মাওলানা শাহ সুফী আবু সাঈদ আসগর আহমদ (রহ.) (১৮৭৫-১৯৩৭ খ্রি.)	১৮৭-১৯০
৪১	পরিচ্ছেদ-২.৬ : মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল বারী (রহ.) (১৯০১-১৯৭৫খ্রি.)	১৯১-১৯৫
৪২	পরিচ্ছেদ -২.৭ : মাওলানা শাহ মুহাম্মদ গোলাম রাব্বানী (রহ.) (১৯৩১-২০০৯ খ্রি.)	১৯৬-১৯৯
৪৩	পরিচ্ছেদ -২.৮ : মাওলানা আবদুল হাই (রহ.) (১৯০৭-১৯৯৪ খ্রি.)	২০০-২০২
৪৪	পরিচ্ছেদ -২.৯ : প্রফেসর মাওলানা আবদুল খালেক হুতুরাভী (রহ.) (১৮৯২-১৯৫৫ খ্রি.)	২০৩-২০৬
৪৫	পরিচ্ছেদ -২.১০ : মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহহাব (রহ.) (১৯০২-১৯৯৬খ্রি.)	২০৭-২১১
৪৬	পরিচ্ছেদ -২.১১ : মাওলানা আলী আকবর (রহ.) (১৯০৮-১৯৯৩খ্রি.)	২১২-১১৫
৪৭	পরিচ্ছেদ -২.১২ : মাওলানা মুফতী ফজলুল হক আমিনী (রহ.) (১৯৪৫-২০১২খ্রি.)	১১৬-২২১
৪৮	পরিচ্ছেদ -২.১৩ : মাওলানা ফয়জুদ্দীন (রহ.) (১৯২৪-২০০১খ্রি.)	২২২-২২৫
৪৯	পরিচ্ছেদ -২.১৪ : মাওলানা শাহ সৈয়দ মুছলেহ উদ্দীন (রহ.) (১৯০৬-১৯৮৯খ্রি.)	২২৬-২৩০

Dhaka University Institutional Repository

ক্র.নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
৫০	পরিচ্ছেদ -২.১৫ : অধ্যাপক মাওলানা মো. আবুল কালাম	২৩১-২৩৮
৫১	**পরিচ্ছেদ-৩ : চাঁদপুর জেলার আলেমগণ**	**২৩৯-২৭৫**
৫২	পরিচ্ছেদ -৩.১ : মাওলানা ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) (১৯৬৩-১৯৪৩ খ্রি.)	২৩৯-২৪৯
৫৩	পরিচ্ছেদ -৩.২ : মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান (রহ.) (১৯৩৫-২০০৬ খ্রি.)	২৫০-২৫৭
৫৪	পরিচ্ছেদ -৩.৩ : মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ্ (রহ.) (১৯০৮-১৯৯৬ খ্রি.)	২৫৮-২৬৮
৫৫	পরিচ্ছেদ -৩.৪ : মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ (রহ.) (১৯৩৭-২০০৫ খ্রি.)	২৬৯-২৭২
৫৬	পরিচ্ছেদ -৩.৫ : মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল হক (রহ.) (১৯২৩-২০০৯খ্রি.)	২৭৩-২৭৫
৫৭	**চতুর্থ অধ্যায়: বৃহত্তর কুমিল্লায় সমাজ ও সংস্কৃতিতে আলেমগণের অবদান**	**২৭৬-২৯২**
৫৮	পরিচ্ছেদ-১ : আলেমগণের চেতনা	২৭৭
৫৯	পরিচ্ছেদ-২ : আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তার	২৭৮
৬০	পরিচ্ছেদ-৩ : আত্মশুদ্ধিকরণ	২৭৯-২৮০
৬১	পরিচ্ছেদ-৪ : সামাজিক উন্নয়ন	২৮০
৬২	পরিচ্ছেদ-৫ : অর্থনৈতিক উন্নয়ন	২৮১-২৮২
৬৩	পরিচ্ছেদ-৬ : দ্বীনী শিক্ষা কার্যক্রম	২৮২-২৮৫
৬৪	পরিচ্ছেদ-৭ : অনৈসলামীক এনজিওদের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে ভূমিকা	২৮৫-২৮৬
৬৫	পরিচ্ছেদ-৮ : ইসলামী লেবাসে অনৈসলামীক কার্যক্রম	২৮৬-২৮৮
৬৬	পরিচ্ছেদ-৯ : বিভিন্ন কুসংস্কার দূরীকরণ	২৮৯
৬৭	পরিচ্ছেদ-১০ : রাজনৈতিক ভূমিকা	২৯০-২৯২
৬৮	**পঞ্চম অধ্যায় : সমাজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে আলেমগণের প্রত্যাশা এবং বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা**	**২৯৩-৩০০**
৬৯	পরিচ্ছেদ-১ : সমাজ উন্নয়নে নীতিমালা	২৯৪-২৯৬
৭০	পরিচ্ছেদ-২ : মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ	২৯৬-২৯৮
৭১	পরিচ্ছেদ-৩ : মদ-জুয়া নিষিদ্ধকরণ	২৯৮
৭২	পরিচ্ছেদ-৪ : যাকাতের বিধান প্রতিষ্ঠা করা	২৯৯
৭৩	পরিচ্ছেদ-৫ : জবাবদিহিতার ভয় নিশ্চিত করা	৩০০
৭৪	**উপসংহার**	**৩০১-৩০২**
৭৫	**তথ্যপঞ্জী**	**৩০৩-৩০৭**

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

পরিচ্ছেদ-১ : নামকরণ	১৪-১৫
পরিচ্ছেদ-২ : সীমারেখা	১৫
পরিচ্ছেদ-৩ : ভৌগোলিক অবস্থান	১৫
পরিচ্ছেদ-৪ : প্রশাসনিক অবস্থান	১৬-১৭
পরিচ্ছেদ-৫ : সামাজিক অবস্থান	১৭-২০
পরিচ্ছেদ-৬ : অর্থনৈতিক অবস্থান	২১
পরিচ্ছেদ-৭ : রাজনৈতিক অবস্থান	২১-২৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

পরিচ্ছেদ-১ : নামকরণ

বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলার নাম কুমিল্লা। ব্রিটিশ বেনিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে এর সৃষ্টি হলেও মূলত এটি ছিল প্রাচীন জনপদ। কুমিল্লা জেলা পূর্বে ত্রিপুরা জেলা নামে পরিচিত ছিল। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রত্নতত্ত্বে রয়েছে এ জেলার গৌরবময় ঐতিহ্য। ১ অক্টোবর ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে এটিকে কুমিল্লা জেলা নামে নামকরণ করা হয়।[৩] বর্তমানে এটি কুমিল্লা জেলা নামেই পরিচিত।[৪] কুমিল্লা জেলার নামকরণ নিয়ে অনেক মতপার্থক্য রয়েছে। কমলাঙ্ক ছিল কুমিল্লার উৎপত্তিগত নাম। চৈনিক পরিব্রাজক ওয়ান চোয়াঙ সমতট রাজ্যে আগমন করেছিলেন খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষ দিকে। আর একথাটি তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে জানা যায়। তাতে তিনি চীনা ভাষায় রূপান্তরিত কিয়ামলঙ্কিয়া (Kiamolonkia) নামক একটি স্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। এ স্থান সমতট দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ রাজ্যের পূর্ব-দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত সাগর-তীরবর্তী দেশ বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। গবেষকগণ অনুমান করেন যে, ওয়ান চোয়াঙ বর্ণিত এ কিয়ামলঙ্কিয়াই কমলাঙ্কই হলো কুমিল্লা। প্রত্নতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব গবেষকদের কেউ কেউ অনুমান করেন যে অতি প্রাচীনকালে কুমিল্লা জেলার দক্ষিণাংশের সাথে কলিঙ্গ দেশের সংস্রব ঘটেছিল এবং এখানে দ্রাবিড় ভাষাভাষী কলিঙ্গদের একটি প্রাচীন রাজ্য স্থাপিত হয়। তারা এ স্থানকে কমলিঙ্ক নামে অভিহিত করত। দ্রাবিড়ীয় ভাষায় এ কমলিঙ্ক নামটিই পরে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবান্বিত হয়ে কমলাঙ্ক নামে পরিণত হয়।[৫] প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্বজ্ঞ ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'রাঢ়, সুহ্ম, বঙ্গ, পুণ্ড্র আর কামরুপ, কম্বোজ, কামতা, কুমিল্লা প্রভৃতি নামের কাম বা কম শব্দ এগুলো আর্য ভাষার পদ নয়। আর অনার্য জাতির নাম হচ্ছে এগুলো। তাই তাদের অধ্যুষিত নাম থেকে তাদের প্রদেশের নামকরণ হয়েছে। ভগবৎচন্দ্র বিশারদ রচিত ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত 'ত্রিপুরা সংবাদ' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে 'কুমিল্লা নামপুর বিবরণ' পরিচ্ছেদ হতে যা জানা যায়, তার সারসংক্ষেপ হচ্ছে যখন হোসেন শাহ গৌড়ের অধিপতি এবং ধন্যমানিক্য ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ত্রিপুরা রাজ্যের অধীশ্বর সে

---

৩ কুমিল্লা জেলাটি বর্তমান ভারতের পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন এর নাম ছিল ত্রিপুরা জেলা। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ত্রিপুরাকে দুই অংশে বিভক্ত করে। (১) চাকলা রৌশনাবাদ যা বর্তমান ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলা ও পার্বত্য ত্রিপুরা নিয়ে গঠিত। (২) অপর অংশটি ছিল জেলা টিপারা (Tippera) যাতে কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরাইল পরগনা ব্যতীত কুমিল্লা জেলার বাকী অংশ ও নোয়াখালী জেলা নিয়ে একটি জেলা গঠন করে যার নাম হয় টিপার। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শুধু রাজস্ব আদায়ের জন্য এটিকে জেলা হিসেবে আখ্যা দেয়া হতো। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রশাসনিক ক্ষমতাসহ এটিকে জেলা হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ছাগলনাইয়া উপজেলা ছাড়া নোয়াখালী জেলার বাকী অংশ ত্রিপুরা জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে সরাইল পরগনা ত্রিপুরা জেলায় অর্ন্তভুক্ত হয় কিন্তু ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ছাগলনাইয়া উপজেলা ত্রিপুরা জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। পরবর্তীতে বর্তমান কুমিল্লা জেলার অঞ্চল ও পার্শ্ববর্তী স্থান নিয়ে যখন একটি জেলা গঠিত হয় তখন এ জেলার নাম হয় ত্রিপুরা জেলা ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যটির নাম হয় ত্রিপুরা রাজ্য Tippera State, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১৪ আগস্ট দেশ বিভাগের সময় ত্রিপুরা জেলা তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা জেলা কুমিল্লা নামে আখ্যায়িত হয়। ব্রিটিশ শাসনামলে কুমিল্লা নাম শুধু সদর মহকুমা ও জেলা শহর রূপেই ব্যবহৃত হতো।
আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া এর তত্ত্বাবধানে; কুমিল্লা জেলা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত, কুমিল্লা জেলার ইতিহাস (কু.জে.ই., ১৯৮৪খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ.৮৯।

৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

সময় 'কোমিল' নামক মুসলমান নায়ক এ স্থান অধিকার করে বসতি স্থাপন করেন। নিজের নামানুসারে পরবর্তীতে এ স্থানের নাম কুমিল্লা নামে পরিচিতি লাভ করতে থাকে।[৬]

পরিচ্ছেদ-২ : সীমারেখা

প্রতিটি এলাকা বা জনপদের নির্দিষ্ট সীমারেখা ও ভৌগোলিক অবস্থান সে এলাকার মানুষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান আর নির্দিষ্ট সীমারেখার মাধ্যমে সে এলাকার লোকের আচার-আচরণ, জীবনমান, কৃষ্টি-কালচার, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করে। আমাদের দেশের প্রতিটি জেলার মানুষের কৃষ্টি-কালচার ও আমাদের প্রতিবেশী দেশের অবস্থান পাশাপাশি হওয়া সত্ত্বেও সকলের জীবন-মানের বৈচিত্র্য ভিন্ন ভিন্ন। আঞ্চলিক ভাষা এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের বাস্তব প্রমাণ। মেঘনা নদীর পূর্ব তীর হতে ত্রিপুরা রাজ্যের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত সমতল ভূমিই হচ্ছে কুমিল্লা জেলা। অর্থাৎ মেঘনা অববাহিকার পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চল হতে ত্রিপুরা পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলই কুমিল্লা জেলা। ভিন্নভাবে বলা যায় যে, বঙ্গ অববাহিকার পূর্ব প্রান্তের ভঙ্গিল গিরিমালার পশ্চিমে ত্রিপুরা পাহাড়ের পাদদেশের সমভূমি যা বঙ্গখাতের পূর্বভাগেই কুমিল্লা জেলা অবস্থিত।[৭]

পরিচ্ছেদ-৩ : ভৌগোলিক অবস্থান

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে জেলাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। যার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। জেলাটি ৯০° ৩১′ পূর্ব দ্রাঘিমা ও ৯১° ২২′ পূর্ব দ্রাঘিমা এবং ২৩° ১০′ উত্তর অক্ষাংশ ও ২৪° ১৬′ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা পূর্ব গোলার্ধের ঠিক মধ্যভাগে অবস্থিত। অতএব জেলাটি পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধের প্রায় মাঝামাঝি স্থানেই অবস্থিত। অক্ষাংশের দিক দিয়ে ২৩° ২৭′ উত্তর অক্ষাংশ উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকালে সূর্য পরিক্রমার শেষ সীমা। ২৩$^{১}/_{২}$ উত্তর অক্ষাংশ চান্দিনার ওপর দিয়ে অতিক্রম করে গেছে। ঐ অক্ষাংশেই কর্কটক্রান্তি রেখা। অত্র জেলাটি পুরোপুরিভাবে ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত। এ জেলার উত্তরে সিলেট ও ময়মনসিংহ জেলা। পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য ও সিলেট। দক্ষিণে নোয়াখালী জেলা এবং পশ্চিমে ঢাকা ও ফরিদপুর জেলা। প্রকাশ থাকে যে, কুমিল্লা জেলা বলতে বৃহত্তর কুমিল্লাকে বুঝানো হয়েছে যা ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে মহকুমাসমূহকে জেলায় পরিণত করা হয়। বর্তমানে কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৃথক পৃথক জেলা হিসেবে পরিণত হয়েছে।[৮]

---

৬ কুমিল্লা জেলা মূলত ত্রিপুরা জেলা নামেই খ্যাত ছিল। এ ত্রিপুরা নামেরও একটি উৎপত্তি ইতিহাস রয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের রাজবংশের ইতিহাস বলে কথিত রাজমালা কাব্যগ্রন্থের বর্ণনামতে চন্দ্র বংশীয় রাজা যথাতি স্বীয় পুত্র দ্রুহ্যু বর্তমান ত্রিপুরা এলাকার রাজা ছিলেন। তার বংশে এক শক্তিশালী রাজ্য ত্রিপুর নামানুসারে ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি হয়। অন্য বর্ণনা মতে অনার্য কিরাতগণ ত্রিপুরা রাজ্যে বাস করত। তারা পরবর্তীতে ত্রিপ্রা বা টিপ্রা নামে পরিচিত হয়। তাদের ভাষায় পানিতে তুই বলা হতো। এই তুই শব্দের সঙ্গে প্রা শব্দের সংযোগে তুইপ্রা এবং তা হতে ত্রিপুরা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। (তুইপ্রা> তিপ্রা>তুপুর> ত্রীপুরা ও ত্রিপুরা)। শেষোক্ত মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য বলে পণ্ডিতদের ধারণা। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮-৮৯।

৭ প্রাগুক্ত; পৃ. ৬।

৮ প্রাগুক্ত; পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-৪ : প্রশাসনিক অবস্থান

১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও প্রশাসনিক সুবিধার্থে জেলাসমূহকে উপজেলায় বিভক্ত করে। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা জেলা গঠনের পর কালেক্টরের সাহায্যে জেলা প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে লর্ড কর্নওয়ালিশ ২২ নভেম্বর রেগুলেশন জারির মাধ্যমে জমিদারী পুলিশ ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে পুলিশকে পুরোপুরি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। জেলাসমূহকে কয়েকটি উপজেলায় বিভক্ত করে প্রতি উপজেলায় আয়তন ধরা হয় ৪০০ বর্গমাইল। উপজেলায় দারোগা নামে একজন অফিসার এবং তার নিয়ন্ত্রণে একজন জমাদার ও ১০ জন বরকন্দাজ থাকার বিধান করা হয়। উপজেলা ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রাম পর্যায়ে বলবৎ এবং জেলার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ছাগলনাইয়া ব্যতীত জেলাকে ১১টি উপজেলায় বিভক্ত করা হয়। এগুলো হচ্ছে- (১) কোতোয়ালী (কুমিল্লা সদর), (২) বড় কামতা (চান্দিনা), (৩) দাউদকান্দি, (৪) থোল্লা (মুরাদনগর), (৫) লাকসাম, (৬) জগন্নাথ দিঘী (চৌদ্দগ্রাম), (৭) কসবা, (৮) নাসিরনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), (৯) গৌরিপুর, (১০) জেবাকি বাজার (চাঁদপুর), (১১) হাজিগঞ্জ। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার মহকুমা গঠনের সিদ্ধান্ত নিলে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে নাসিরনগর এবং ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে চাঁদপুর মহকুমার সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে কুমিল্লা সদর উত্তর ও সদর দক্ষিণ নামে নতুন দুটি মহকুমাসহ মোট চারটি মহকুমার সৃষ্টি হয়। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে এ জেলার উপজেলার সংখ্যা ১২টিতে উন্নীত হয়। উপজেলাগুলো হলো- (১) কুমিল্লা সদর (২) দাউদকান্দি, (৩) মুরাদনগর, (৪) চান্দিনা, (৫) চৌদ্দগ্রাম, (৬) লাকসাম, (৭) কসবা, (৮) নবীনগর, (৯) ব্রাহ্মণবাড়িয়া, (১০) চাঁদপুর, (১১) হাজিগঞ্জ, (১২) মতলব বাজার। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ২১টি উপজেলা ছিল। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমায় ৬টি (নাসিরনগর, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কসবা, নবীনগর, বাঞ্ছারামপুর); চাঁদপুর মহকুমায় ৫টি (মতলব, চাঁদপুর, ফরিদগঞ্জ, হাজিগঞ্জ, কচুয়া); কুমিল্লা সদর উত্তর মহকুমায় ৫টি (হোমনা, দাউদকান্দি, চান্দিনা, দেবিদ্বার, মুরাগনগর) এবং কুমিল্লা সদর দক্ষিণ মহকুমায় ৫টি (কোতয়ালী, বুড়িচং, চৌদ্দগ্রাম, লাকসাম ও বরুড়া)। উল্লেখ্য, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে ১৫ ফেব্রুয়ারি বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা ভেঙ্গে কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুর জেলা গঠিত হয়। কুমিল্লা সদর উত্তর ও সদর দক্ষিণ মহকুমা নিয়ে কুমিল্লা; ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং চাঁদপুর মহকুমা নিয়ে চাঁদপুর জেলা গঠিত হয়।[৯]

বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া[১০] জেলার মোট আয়তন ১,৯২৭.১১ বর্গ কি.মি। উপজেলা ৯টি, পৌরসভা ৪টি, ইউনিয়ন ৯৮টি, গ্রাম ১৩৩১টি। উপজেলাগুলো হলো- ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, আশুগঞ্জ, আখাউড়া, নবীনগর, নাসিরনগর, কসবা, বাঞ্ছারামপুর, সরাইল ও বিজয়নগর। জনসংখ্যা ২০১১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী ২৮,৪০,৪৯৮। সাক্ষরতার হার ৪২.২৬। এ জেলায় কামিল মাদ্‌রাসা ৩টি, ফাযেল মাদ্‌রাসা ৮টি, আলিম মাদ্‌রাসা ২১টি, দাখিল মাদ্‌রাসা ৫২টি, স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্‌রাসা ২২টি। মোট ১০৬টি মাদ্‌রাসা রয়েছে। মোট মসজিদের সংখ্যা ৪৫০০টি।[১১]

বর্তমান কুমিল্লা জেলার আয়তন ৩,০৮,৫১৭ বর্গকিলোমিটার। কুমিল্লা জেলায় ১৬টি উপজেলা রয়েছে। এগুলো হলো- আদর্শ সদর, সদর দক্ষিণ, চৌদ্দগ্রাম, লাকসাম, মনোহরগঞ্জ, বরুড়া,

---

৯ Sirajul Islam (ed), Banglapedia, Vol.3, (Dhaka:Asiatic Society of Bangladesh, 2003), P.70-73.

১০ রাজা লক্ষণ সেনের সময় এক ব্রাহ্মণ পরিবার বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মৌলভীপাড়ায় বসতি স্থাপন করেন। এই প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণবাড়ি হতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া নামে উৎপত্তি হয়। Banglapedia, Vol. 2, P. 270-273.

১১ জেলা প্রশাসকের ওয়েবসাইট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

Dhaka University Institutional Repository

নাঙ্গলকোট, চান্দিনা, দাউদকান্দি, তিতাস, হোমনা, মেঘনা, মুরাদনগর, দেবীদ্বার, বুড়িচং ও ব্রাহ্মণপাড়া। এ জেলায় একটি সিটি করপোরেশন, ১৬টি উপজেলা, ৮টি পৌরসভা এবং ৩৬৮৭টি গ্রাম রয়েছে। জনসংখ্যা ২০১১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী ৫৬,০২,৬২৫। সাক্ষরতার হার ৬০.০২। এ জেলায় কামিল মাদ্রাসা ১০টি, ফাযেল মাদ্রাসা ৬৩টি, আলিম মাদ্রাসা ৭৫টি, দাখিল মাদ্রাসা ২৩৩টি, স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা ৭১টি। মোট ৪৫২টি মাদ্রাসা রয়েছে।[১২]

বর্তমান চাঁদপুর[১৩] জেলার আয়তন ১৭০৪.০৬ বর্গকিলোমিটার। এ জেলায় বর্তমানে ৮টি উপজেলা রয়েছে, এগুলো হলো চাঁদপুর সদর, হাজীগঞ্জ, শাহরাস্তি, হাইমচর, ফরিদগঞ্জ, কচুয়া, মতলব উত্তর ও মতলব দক্ষিণ। পৌরসভা ৭টি। মোট শিক্ষার হার ৬৮ জন।[১৪]

পরিচ্ছেদ-৫ : সামাজিক অবস্থান

ধর্ম বা মতবাদ প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে পৃথিবীর যে কোনো দেশ বা অঞ্চলে গ্রহণযোগ্য হওয়ার সুস্পষ্ট কারণ থাকে। প্রচলিত ধর্মমত, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও রাজনীতি যদি জনসাধারণের জীবনে কোনো কল্যাণ বয়ে না আনে বরং বিপরীত প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে, যেমন অত্যাচার, নির্যাতন, বিভেদ-বৈষম্য, ধর্মীয় হিংসা-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেয়ে রাজদণ্ডের প্রতাপে কোনো ধর্মমত জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলে যা জনগণ মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারে না তাহলে সেখানে নতুন ধর্মমত ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা প্রচলনের সুযোগ এসে যায়।[১৫] ইসলাম-পূর্বযুগে আরবের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিকসহ সার্বিক অবস্থা যেভাবে ভেঙ্গে পড়েছিল, তেমনি এ বাংলাসহ সমগ্র ভারতের সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থাও ভেঙ্গে পড়েছিল। এদিকে আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদের নিষ্পেষণের ফলে সেখানে বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছিল। কিন্তু তাদের ধর্মের প্রভাব মানুষের অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। যার ফলে ইসলামের দাওয়াত মানুষ সহজেই গ্রহণ করেছিল। তাই ইসলাম আগমনের পূর্বাপর কুমিল্লা তথা এ বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থার বর্ণনা দেয়া একান্ত আবশ্যক।

বাঙালি একটি সংকর জাতি। বিভিন্ন নর ও ভাষা গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ এতে ঘটেছে যুগে যুগে। সমাজ ও সংস্কৃতিতে এই সংকরতার প্রভাব সুস্পষ্ট। আর্যদের পূর্বে বাংলাদেশের আদি অধিবাসী কারা এ নিয়েও বিভিন্ন মতপার্থক্য দেখা যায়। কেউ কেউ বলেন, দ্রাবিড়দের একটি শাখা চের জাতির মানুষ বাংলাদেশে বাস করত। বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ M.R.H.I.T Riseley "the Gribes and castes of Bengal" নামক প্রখ্যাত গ্রন্থে এ দেশের আদি অধিবাসীদেরকে দ্রাবিড় বলে আখ্যায়িত করেছেন[১৬]। তবে ড. নিহার রঞ্জন রায়ের মতে, এটি একটি ভাষা তাত্ত্বিক শ্রেণিবিন্যাসের নাম বরং দ্রাবিড় কোনো জনগোষ্ঠীর নাম নয়। অনুরূপভাবে আর্য যদিও নরগোষ্ঠী হিসেবে অনেকে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু প্রকৃতভাবে আর্যও একটি জনগোষ্ঠীর নাম। কারও কারও মতে দ্রাবিড়ীয়রা ছিল এদেশের প্রধান জনগোষ্ঠী এবং তারা ছিল সেমেটিক ধর্মানুসারী তথা একত্ববাদে বিশ্বাসী। ফলে পৌত্তলিক আর্যদের আগমনের পর তাদের সাথে দ্রাবিড়দের বিরোধ চলতে থাকে।[১৭] অধিকাংশ পণ্ডিতদের মতে, এদেশের লোকেরা বৈদিক গোষ্ঠীর লোক ছিল। এ দেশের আর্য লোকেরা নিম্নবর্ণের

---

১২ কুমিল্লা জেলা তথ্য বাতায়ন। জেলা প্রশাসকের ওয়েবসাইট।

১৩ ইতিহাস খ্যাত বিক্রমপুরের জমিদার চাঁদ রায়ের নামে চাঁদপুর নামকরণ করা হয়। আবার অন্য মতে, শহর সংলগ্ন কোড়ালিয়া গ্রামের দরবেশ চাঁদ ফকিরের নামে চাঁদপুর নামকরণ করা হয়। Banglapedia, Vol. 2, P. 421-423.

১৪ চাঁদপুর জেলা প্রশাসক ও জেলা পরিষদের ওয়েবসাইট অবলম্বনে।

১৫ শ.ম. শওকত আলী, কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম, (ঢাকা : ই.ফা.বা., ১৯৯৩খ্রি.), পৃ. ২৯।

১৬ প্রাগুক্ত, (কু. জে. ই.), পৃ.২৪।

১৭ আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০খ্রি.),পৃ. ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু ছিল বলে অনেকে ধারণা পোষণ করেন। আজ হতে সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে এদেশে আর্যদের আগমন ঘটে। বৈদিক আর্যদের আগমনের পূর্বে এদের সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। আর্যরা এদেশে এসে তথা কুমিল্লা অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণবিন্যাস ও শ্রেণিবৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলে। কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার উপজেলার অন্তর্গত গুনাইঘর গ্রামে মহারাজাধিরাজ বৈণ্য গুপ্তের যে তাম্রলিপিটি ৫০৭-৫০৮ খ্রিস্টাব্দে পাওয়া যায়, তা হতে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, সে সময়ে কুমিল্লা অঞ্চলে বৈদিক আর্যদের প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এ চার বর্ণের ভিত্তিতে সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে। আর আর্যদের আগমনের ফলে এদেশের সমাজব্যবস্থা সম্পূর্ণ নতুন রূপে গড়ে ওঠে। ব্রাহ্মণদেরকে সমাজের সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন করা হয়। ভববাসের পরেই ছিল ব্রাহ্মণের স্থান। বৈশ্যরা ছিল অর্থ যোগানদাতা। ব্যবসা-বাণিজ্যে তাদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। অপরদিকে অস্ত্রবিদ্যা, যুদ্ধ পরিচালনা, রাজ্য শাসন একমাত্র ক্ষত্রিয়দের জন্য ছিল বিধিসম্মত। সর্বনিম্ন মানের লোকদিগকে শূদ্র বলা হতো। সমাজে এদের সংখ্যাই ছিল বেশি।

মূলত পূর্বের তিন শ্রেণির লোকেরা চতুর্থ শ্রেণির লোকদের শ্রমের ওপর নির্ভর করত। অথচ তাদের সামাজিক কোনো মর্যাদা ছিল না।[১৮] তবে কারো কারো মতে বাংলাদেশ তথা কুমিল্লায় শুধু ব্রাহ্মণ ও শূদ্ররাই ছিল। অন্য দু'জাত এ অঞ্চলে ছিল না। ব্রাহ্মণ্যবাদী শ্রেণি বৈষম্যমূলক আচরণ নিষ্পেষিত সমাজব্যবস্থা প্রায় ভেঙ্গে পড়ে। এক পর্যায়ে বাংলাসহ কুমিল্লা জেলায়ও বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করে। আর বৌদ্ধ ধর্মকে ভিত্তি করে বাংলায় পাল বংশীয় রাজত্ব গড়ে ওঠেছিল। এতে শ্রেণি বৈষম্য কিছুটা কমে আসে। তবে কারো কারো মতে, আর্যদের প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার গতির বিরুদ্ধে বৌদ্ধরা নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ার দুঃসাহস দেখাতে পারেনি।[১৯] কুমিল্লা জেলার ময়নামতি, পাহাড়পুর, কুটিলামুড়া, লালমাই ও শালবন বিহারে বৌদ্ধ বিহার ছিল। এতে কুমিল্লা জেলায় বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ রাজত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে। পরবর্তীতে সেন বংশীয় রাজত্বের আমলে ব্রাহ্মণ্যবাদ আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং বৌদ্ধরা বিতাড়িত হয়। ব্রাহ্মণরা আবার সমাজের অধিপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আর কুমিল্লা জেলার ও দেশের সাধারণ মানুষ ছিল কৃষিজীবী। ব্রাহ্মণরা এসব নিরীহ মানুষের ওপর সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। কুমিল্লা জেলার বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে অধিকাংশ লোকই ছিল কৃষিজীবী। এ জেলায় অনেক নদ-নদী, খাল-বিল থাকায় প্রচুর মৎস্যজীবী ছিল। তবে অন্যান্য পেশার লোকজনও ছিল। কিন্তু অধিকাংশ লোকই ছিল কৃষির ওপর নির্ভরশীল। আর্য ব্রাহ্মণদের এ শ্রেণিভিত্তিক সামাজিক নিষ্পেষণের ফলে এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ ইসলামের দাওয়াত অতি সহজেই গ্রহণ করেছিল।

ইখতিয়ারউদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মণাবতী দখলের মাধ্যমে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেও কুমিল্লা জেলায় সে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে আরও অনেক সময় লেগেছিল। খুব সম্ভব ১২৬০ ও ১২৮১-৮২ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি কোনো এক সময় সোনারগাঁয়ে তুর্কী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত এ জেলায় হিন্দু সেন বংশীয় রাজাদের রাজত্ব ছিল।[২০]

আর ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠায় বিলম্ব হলেও এ জেলায় ইসলামের দাওয়াতের কাজ পিছিয়ে থাকেনি। দেশের একাংশে ইসলামী রাজ্য প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ইসলামের বহু দায়ী এ অঞ্চলে এসে ইসলামের দাওয়াতের কাজে লিপ্ত হন। ইরান, তুরান, আফগান, আবিসিনিয়া, আরবসহ অন্যান্য স্থানের

---

[১৮] মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, ফরিদপুর জেলায় ইসলাম, (ঢাকা : ই.ফা.বা., ১৯৯৭খ্রি.), পৃ. ৩৩।
[১৯] আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।
[২০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানগণ এসে এদেশের মানুষদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে থাকেন। বহু নিম্নবর্ণের হিন্দু যেমন আদিবাসী মেচ ও কোচ জাতীয় এবং কতিপয় উচ্চ বর্ণের হিন্দুও ইসলাম গ্রহণ করে। রাজা গণেশের পুত্র যদুও ইসলাম গ্রহণ করেছিল। মূলত রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত না হলেও এ দেশ তথা কুমিল্লা অঞ্চলে ইসলাম প্রচারকদের আগমন বহু আগেই ঘটেছিল। কুমিল্লার ময়নামতিতে খনন কার্যের ফলে কতিপয় আরবী মুদ্রা পাওয়া যায়। এগুলো ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় আরব্য বণিকদের মাধ্যমে আনা হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। ময়নামতিতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে শালবন বিহার ও কুটিলা মুড়ায় বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফা আবু আহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মুতাসিম বিল্লাহর (১২৪২-১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ) স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। অতএব প্রতীয়মান হয় যে, বৌদ্ধ যুগেও কুমিল্লা অঞ্চলের সাথে আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল।[২১]

আরব দেশের বণিকেরা শুধু যে ব্যবসার জন্য এসেছিল তা নয় বরং ইসলামের দাওয়াতের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যও তাঁদের ছিল। যার ফলে এ দেশের বহু মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। সুতরাং এতে বুঝা যায় যে, ইসলামের দাওয়াতী কাজ ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বেই এ অঞ্চলে আরম্ভ হয়েছিল। কুমিল্লা জেলার মুসলমানদেরকেও স্থানীয় এবং বহিরাগত এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। বণিক, পীরদরবেশ ছাড়াও বহু রাজ কর্মচারী এবং সৈনিক এসে বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। তাঁরা এসেছিল দূরের পশ্চিমাঞ্চল থেকে ও পার্শ্ববর্তী ঢাকা, সোনারগাঁও থেকে। এদের মধ্যে পশ্চিম দেশীয় তথাকথিত আশরাফ শ্রেণির মুসলমান যে বেশি ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কাজী, খান, দেওয়ান, শিকদার, মীর্জা, সৈয়দ, মীর, খন্দকার, বেগ প্রভৃতি তথাকথিত অভিজাত শ্রেণির মুসলমান এ দলে অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৎসঙ্গে চাষাবাদের কাজে নিয়োজিত আতরাফ বা গৃহস্থ শ্রেণির মুসলমানও বিপুল সংখ্যায় পার্শ্ববর্তী অধিক ঘনবসতিপূর্ণ স্থান থেকে উর্বর ভূমির লোভে এ জেলায় এসে বসতি স্থাপন করে। জমির জায়গীরদারীর আশায় অনেক পশ্চিম দেশীয় ভাগ্যান্বেষী মুসলমান এ জেলায় আগমন করেছিল। কারণ কুমিল্লা জেলার অধিকাংশ অঞ্চল ছিল বালি মাটিতে উর্বর বিরল ভূমি। তাছাড়া ভূমি প্রশাসন সংক্রান্ত চাকরি নিয়েও যারা এখানে এসেছিল তারাও এখানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। পীর-আউলিয়া যাঁরা ইসলামের দাওয়াতী কাজে এসেছিলেন তাঁরা এদেশে বিবাহ শাদী করেন এবং এখানে স্থায়ীভাবে থেকে যান। কিন্তু মুসলিম সমাজে এরূপ বিভিন্ন শ্রেণির লোক থাকলেও হিন্দু সমাজের ন্যায় মুসলিম সমাজে বর্ণবৈষম্য ও শ্রেণিভেদ ছিল না। তবে অভিবাসী মুসলমানগণ চাকরির সুবিধা বেশি পেতেন আর স্থানীয় মুসলমানগণ তাদের পূর্বতন স্থানীয় পেশায় বেশি নিয়োজিত ছিলেন।[২২]

কুমিল্লা জেলার সামাজিক প্রেক্ষাপট কোম্পানি ও ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত বেশ ভালোই ছিল। বাংলা তথা মুসলিম সমাজে নেমে আসে আবার ঘোর অন্ধকার। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন লর্ড ক্লাইভের হাতে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর এক পর্যায়ে সমাজব্যবস্থায় হিন্দু জমিদারদের প্রভাব প্রবল হয়ে ওঠে। তখন মুসলমানগণ আবার সামাজিক অধঃপতনের শিকার হন। তখন কোম্পানির শাসনামলে কয়েকটি প্রাচীন জমিদার পরিবারের পতন ও নতুন জমিদারীর উত্থান কুমিল্লার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কুমিল্লা জেলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই জমিদার পরিবারগুলোর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কোম্পানির রাজস্বনীতি এ জেলার জমিদারদের ভাঙ্গা গড়ার জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের শাসনভার কোম্পানির হাত থেকে রাণী ভিক্টোরিয়া নিজ হাতে গ্রহণ করেন এবং লর্ড ক্যানিংকে প্রথম ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি করে উপ-

---

[২১] প্রাগুক্ত, (কু.জে.ই.), পৃ. ১০৬।
[২২] প্রাগুক্ত, (কু.জে.ই.), পৃ. ২১৭।

Dhaka University Institutional Repository

মহাদেশে পাঠান। তিনি জমিদারদের অত্যাচার এবং ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচার রোধ করার জন্য ব্যবস্থা নেন। পরবর্তী গভর্নর লর্ড এলগিনের ১৮৬১-১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের একটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। বাংলাদেশেও এর প্রভাব এসে পড়ে। অন্যদিকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানরাই অগ্রগামী ছিল, ফলে ব্রিটিশ শাসকরা মুসলমানদের সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলো। মুসলমানরা পরাজিত ও রাজ্য হারাবার দুঃখে ও বেদনায় ইংরেজদের বর্জন করে এবং ইংরেজি ভাষা পরিহার করে। নিজেদের উদাসীনতা আর ব্রিটিশ শাসকদের সন্দেহের ফলে মুসলমানদের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। হিন্দু সমাজ অনেক বাস্তববাদী পদক্ষেপ নিয়ে ইংরেজি ভাষা গ্রহণ করে এবং ইংরেজদের সাথে সহযোগিতা করে সরকারি কাজে অংশগ্রহণ করতে থাকে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে কুমিল্লার লোকেরা বিশেষ করে আলেম ওলামাগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ও ব্রিটিশ বর্জনসহ বিভিন্ন আন্দোলনে কুমিল্লার ওলামায়ে কেরামদের সাথে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা ও চাঁদপুর জেলা তথা সাবেক ত্রিপুরা জেলা বর্তমান যে সুনির্দিষ্ট সীমারেখা দ্বারা চিহ্নিত, এটা খুব বেশি দিন আগের কথা নয়। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম কালেকটরির সুবিধার জন্য এ প্রশাসনিক অঞ্চল গঠন করে। কালক্রমে নানা রকম রদ-বদলের পর সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা নিয়ে বর্তমান কুমিল্লা জেলা গঠিত হয়। এ জেলা গঠনের পূর্বে মেঘনা নদীর বাম তীরে অবস্থিত শুধু এ অঞ্চল স্বতন্ত্র কোনো নামে পরিচিত ছিল না।[২৩]

অতএব, ইসলাম আগমনের পূর্বে কুমিল্লা জেলার সামাজিক অবস্থা হিন্দু ব্রাহ্মণদের শ্রেণিভেদ ও কৌলিন্য প্রথার কারণে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব ঘটলে এবং কিছু কিছু বিষয়ে সাধারণ মানুষ সাময়িক মুক্তি পেলেও পুরোপুরি শ্রেণিভেদ হতে রক্ষা পায়নি। পরবর্তীতে বৌদ্ধরা বিতাড়িত হবার পর আবারও ব্রাহ্মণ্যবাদী শ্রেণি প্রথা সাধারণ মানুষের ওপর জেঁকে বসে। আর তা ইসলামের উদার নীতি সামাজিক ব্যবস্থায় সামনে ব্যাপকভাবে প্রভাব পড়ে। যার ফলে ইসলামী দাওয়াতের আগমনে দলে দলে নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষগণ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। এককথায় এ অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজব্যবস্থায় ক্ষত-বিক্ষত সমাজ যেন ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার আশায় উদগ্রীব হয়েছিল। ব্রিটিশ বেনিয়াদের আগমনে বাংলার মুসলমানগণ আবার সামাজিক অধঃপতনের শিকার হন। যার ফলে নিজেদের সামাজিক মর্যাদা পুনরুদ্ধারে অনেক অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। আর এ দেশের আলেম সমাজ এবং পীর মাশায়েখগণ সে আন্দোলনে শামিল হয়েছিল।

[২৩] প্রাগুক্ত, (কু.জে.ই.), পৃ. ১১১।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-৬ : অর্থনৈতিক অবস্থান

একটি দেশ ও জাতির উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে অর্থনীতি। বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার ন্যায় কুমিল্লা জেলার অর্থনৈতিক ও উন্নয়নের ইতিহাস অবিচ্ছেদ্য অংশ। নদী বিধৌত পলি মাটির দেশ হবার কারণেই প্রাচীনকাল হতেই বাংলায় কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে ওঠেছিল।[২৪] খ্রিস্টের জন্মের পূর্ব থেকেই এ বাংলা ছিল একটি কৃষি প্রধান দেশ। এ দেশের দ্রাবিড় ও অনার্য জাতিরা চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করত বলে আর্যরা তাদেরকে দাস বলত। কুমিল্লা জেলার অধিকাংশ সমতল অঞ্চলও পলি মাটি দ্বারা গড়া উর্বর ভূমি। মেঘনা, গোমতী, তিতাস ছাড়া আরও অনেক ছোট ছোট খাল-নদী প্রচুর পলি বয়ে নিয়ে আসত। এ জেলার মুসলমানরাও ছিল অধিকাংশ কৃষিজীবী। এতে ধারণা করা যায় কৃষিজীবী হওয়ায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আগ থেকেই ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাদের বংশধরদের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।[২৫] বিশেষ করে কুমিল্লার উত্তরাঞ্চলে এবং মেঘনা অববাহিকার চরাঞ্চলে মৎস্যজীবীর সংখ্যা ছিল বেশি। নদনদী, খালবিল ও নিম্নাঞ্চলীয় এলাকা থাকায় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ও এ জেলায় ছিল প্রচুর। কৃষিজীবীরা ধান ও পাট চাষের পাশাপাশি বিভিন্ন রকমের শাক-সবজি, আলু, গম, মশুরী, মুগ, তিল, তিষী ইত্যাদি রবি শস্যও চাষাবাদ করত। যার প্রচলন এখনও অব্যাহত রয়েছে। কৃষি প্রধান দেশ হলেও বস্ত্র শিল্পের জন্যও বাংলাদেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বিশেষ করে বাংলার মসলিন ছিল পৃথিবী বিখ্যাত। কুমিল্লা জেলায়ও অনেক তাঁত শিল্পী ও বস্ত্র প্রস্তুতকারী ছিল। যার ধারা এখনও বহাল আছে। বিশেষ করে উত্তর কুমিল্লার বাঞ্ছারামপুর ও নবীনগরে এ পেশার অনেক লোক এখনো তাঁত শিল্পের সাথে জড়িত রয়েছে। বস্ত্র শিল্প ছাড়া ধাতু ও মৃৎ শিল্প প্রসার লাভ করেছিল। বিলাসিতার উপকরণ যোগাবার জন্য স্বর্ণকার, মনিকার প্রভৃতি শিল্পও উন্নতি লাভ করেছিল। সপ্তম শতকে ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল। তবে পরবর্তী ৮ম শতকে শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য কমে আসে এবং এ জেলাসহ সারা বাংলায় কৃষি নির্ভর অর্থনীতি গড়ে ওঠে।[২৬] কুমিল্লা জেলার পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল উঁচু এবং লালমাই ময়নামতি এলাকা হচ্ছে পাহাড়ী উঁচু এলাকা। আর উত্তরাঞ্চল হচ্ছে নিচু ও ভাটি এলাকা। বিশেষ করে মেঘনা অববাহিকায় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বাঁক হয়ে প্রচুর উর্বর ও পলিযুক্ত হয়। এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ তরি-তরকারি, আলু, গম, শাক-সবজি ও রবিশস্য উৎপন্ন হয়। এ সময় এ অঞ্চলে প্রচুর কার্পাস তুলা উৎপন্ন হতো। ত্রিপুরার অধিপতি ধন্য মানিক্যের অধীনে ছিল কুমিল্লার পার্বত্য অঞ্চল।[২৭]

পরিচ্ছেদ-৭ : রাজনৈতিক অবস্থান

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে কুমিল্লার অবদান ছিল উজ্জ্বল। প্রাচীনকালে কুমিল্লার রাজনৈতিক ইতিহাস প্রাচীন সমতটের সাথে সম্পৃক্ত থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত এদেশ ও জাতির বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা লাভে কুমিল্লার জনগণের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। ১৪ শতকের প্রথম দিকে সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের শাসনকাল ১৩০১-১৩২২ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা জেলা ও তার উত্তরাঞ্চলে তুর্কী আধিপত্য প্রথমবারের মতো প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার সর্বশেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার মর্মান্তিক পরাজয় এবং বাংলায় ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর এদেশ, জাতির ক্রান্তিলগ্নে এবং ব্রিটিশবিরোধী সকল আন্দোলনে কুমিল্লার অংশগ্রহণ ছিল ঐতিহাসিক। সিপাহী বিপ্লব, ফরায়েজী আন্দোলন, সংস্কার আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, স্বাধীনতা

---

[২৪] আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।
[২৫] প্রাগুক্ত, (কু.জে.ই.), পৃ. ৩৪৮।
[২৬] আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।
[২৭] প্রাগুক্ত, (কু.জে.ই.), পৃ. ১৬৬-১৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনসহ সকল আন্দোলনে কুমিল্লার অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। এসব আন্দোলনে অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার ফলে দেশ ও জাতির স্বাধীনতা ও স্বাধিকারের চেতনা লাভ করে ইংরেজদের শাসন হতে এদেশকে মুক্ত করতে এবং পরবর্তীতে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা পেয়ে আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ গড়তে সক্ষম হয়েছে।

বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত করে পলাশীর আম্রকাননে কূট কৌশলের বিজয়ের মাধ্যমে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুসলিম জাতিকে নির্মূল করার কৌশল খুঁজতে থাকে। তাই বিভিন্ন প্রকার ট্যাক্স বসালো মুসলমানদের ওপর। মুসলমানদের হাত থেকে খাজনা আদায়ের ভার দেয়া হলো হিন্দুদের হাতে। হিন্দু জমিদাররা মুসলমানদের ওপর বিভিন্ন রকমের করসহ হিন্দুদের পূজা পার্বণে চাঁদা দিতে বাধ্য করল।

মুসলমানদের এ দুর্দিনে হাজী শরীয়তুল্লাহ ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদের মধ্যে সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর এ আন্দোলন ফরায়েজী আন্দোলন নামে প্রসিদ্ধ। উনবিংশ শতকের শুরুতে বাংলায় এটি একটি স্মরণীয় সংস্কার আন্দোলন। বাংলার মুসলমান সমাজকে কুরআন ও হাদীস শিক্ষার আদর্শে গড়ে তোলাই ছিল ফরায়েজী আন্দোলনের উদ্দেশ্য। এটা প্রথমে ধর্মীয় আন্দোলন রূপে শুরু হলেও পরবর্তীতে কৃষক ও প্রজা আন্দোলনে রূপ নেয়। ফরায়েজী আন্দোলন ত্রিপুরা জেলায় যা বর্তমান বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে।[২৮] নদী বন্দর চাঁদপুর ফরায়েজী প্রচারণার একটি বড় কেন্দ্র ছিল। কুমিল্লা জেলায় বহু ফরায়েজী কেন্দ্র, আস্তানা ও খলিফা ছিল। হাজী শরীয়তুল্লাহর নিকট চাঁদপুরে ফরায়েজী মতবাদের শিক্ষা লাভ করেন লাকসামের নিকটস্থ সিঙ্গারদাহ গ্রামের আমিন উদ্দিন খোন্দকার। আমিন উদ্দিনের নিকট তাঁর এলাকার খলিফা নিয়োগ করেন। হাজী শরীয়াতুল্লাহর পুত্র দুদু মিয়ার সময় আরও পাঁচ জন খলিফা নিয়োগ দেওয়া হয় বর্তমান বৃহত্তর কুমিল্লা এলাকায়।[২৯] ফরায়েজীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এবং তাঁদের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন ওপরস্থ খলিফা নিয়োগ করেন। চাঁদপুরের হাবিব উল্লাহ পাহলোয়ান গাযীও ছিলেন প্রখ্যাত ফরায়েজী খলিফাদের অন্যতম।[৩০]

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে উত্তর ভারতে সৈয়দ আহমদ বেরলভী (রহ.) (১৭৮৯-১৮৩১ খ্রি.)-এর তরীকাই-মুহাম্মদীয়া সংস্কার আন্দোলন নামে প্রকাশ পায়। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ এর বিকৃত নাম দিয়েছে ওহাবী আন্দোলন। মূলত এটি ছিল একটি জেহাদী আন্দোলন। ইংরেজ ঐতিহাসিক উইলিয়াম হান্টার তাঁর আন্দোলনের তীব্রতায় তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে অন্তর্জ্বালা মেটাতে সৈয়দ আহম্মদ (রহ.)-কে প্রাথমিক অবস্থায় দুর্বৃত্ত ও দস্যু আখ্যা দিয়েছেন। হান্টারের মতে এটি ছিল ক্রমাগত সীমান্ত বিদ্রোহের গোড়াপত্তন, যা উপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তিকে ক্রমাগতভাবে বিপদে জড়িয়ে ফেলে। ইসলামী আদর্শে জীবন নিয়ন্ত্রিত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য আর ইংরেজ দালালদের অনৈসলামীক রীতিনীতি ও কুসংস্কার মুসলিম সমাজ হতে দূর করে। ১৮২২ মতান্তরে ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ আহম্মদ শহীদ জেহাদের জন্য আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে তাঁর শত শত কর্মীকে নিয়ে হজ্জ পালনের লক্ষে মক্কা শরীফ গমন করেন।[৩১] হজ্জ গমনের পথে তিনি কলকাতায় আসেন।[৩২] এ সময়

---

[২৮] এম. এ. রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৭৬খ্রি.), পৃ. ৮২।
[২৯] ১৯৮৪-এর পর বর্তমান জেলা এলাকায়।
[৩০] এম.এ. খান ফরায়েজী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১-২২।
[৩১] জুলফিকার আহমদ কিসমতি, আজাদি আন্দোলনে সংগ্রামী ওলামাদের ভূমিকা, (ঢাকা : আল-ফালাহ.পা.২০০০ খ্রি.), পৃ. ২০।
[৩২] উইলিয়াম হান্টার: দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস, বাঙ্গানুবাদ, এম. আনিসুজ্জামান, (ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৭৫খ্রি.), পৃ. ১২।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার বহুলোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। গোলাম রসূল মেহের বলেন, বাংলাদেশ হতে বহু অর্থ সম্পদ এবং দলে দলে মুজাহিদ সৈয়দ আহম্মদ শহীদের সাথে মিলিত হয়েছিলেন। এরূপ একটি দলের তালিকায় ছয় জন বাংলাদেশী মুজাহিদ ছিলেন - (১) মৌলভী ইমাম উদ্দিন, (২) জহুরুল্লাহ, (৩) লুৎফুল্লাহ, (৪) তালেবুল্লাহ (৫) ফয়েজ উদ্দিন, (৬) কাজী মদনী। তাঁদের কয়েকজন ছিলেন নোয়াখালী ও কুমিল্লা অঞ্চলের। চট্টগ্রামের সুফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী এবং নোয়াখালীর মাওলানা ইমামুদ্দিন সাদুল্লাপুরী ছিলেন তাঁর বিশিষ্ট খলিফা ও মুজাহিদ।

১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বাসঘাতক ও ইংরেজদের চক্রান্তে শিখদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সৈয়দ আহমদ বেরলভী (রহ.) বালাকোটের ময়দানে শহীদ হন।[৩৩] ব্রিটিশ শোষণ নিপীড়ন আর তাদের এদেশীয় দালাল জমিদার, কম্প্রাডোর, বুর্জোয়া, মহাজন ও মুৎসুদ্দিদের নিস্পেষণে এ উপ-মহাদেশের জনগণের মধ্যে অসন্তোষ তীব্রভাবে ধুমায়িত হতে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে সিপাহী জনতার সম্মিলিত প্রতিবাদে সৃষ্টি হয় ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিপ্লব। আর বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে শুরু হয় ভারতীয় জনতার সত্যিকারের আযাদীর সংগ্রাম যা প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসেবে পরিচিতি পায়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে এ বিপ্লবের সময় কুমিল্লা জেলায় উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা পাওয়া যায় না। তবে চট্টগ্রামের সিপাহীদের বিদ্রোহের ঘটনায় কুমিল্লায় কিছুটা ভূমিকা পাওয়া যায়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১৮ইং নভেম্বর চট্টগ্রামের ৩৪ নং রেজিমেন্ট বিদ্রোহ হয়।[৩৪] এদের নেতৃত্বে ছিলেন হাবিলদার রজব আলি। প্রথমে তাঁরা সরকারি ধনাগার লুট করে এবং গোলাবারুদের গোডাউন উড়িয়ে দিয়ে কারাগার থেকে বন্দীদের মুক্ত করে। এরপর তাঁরা ঢাকার সিপাহীদের সাথে একত্রিত হওয়ার ইচ্ছায় ঢাকার পথে রওয়ানা হয়। কিন্তু নোয়াখালীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নদীঘাটে তাদের স্থানীয় নৌকা আটক করায় তাঁরা ফেনী নদী পার হতে না পারায় পার্বত্য ত্রিপুরায় প্রবেশ করেন। সেখানেও বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁরা পুনরায় কোম্পানি রাজ্যে ফিরে এসে কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। এখানেও তাঁরা ইংরেজ দালাল জমিদারদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন এবং কিছুটা ক্ষতির সম্মুখীন হন।[৩৫]

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পূর্ব বাংলার ইতিহাসে হিন্দু-মুসলিম চরম রাজনৈতিক মতানৈক্য সৃষ্টি হয় এবং একে অপর থেকে দূরে সরে যায়। কংগ্রেস নেতাদের আশঙ্কা ছিল এতে তাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লোপ পাবে। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, হিন্দুদের প্রাধান্য খর্ব, সর্বোপরি বাঙ্গালিদের প্রভাব খর্ব করাই ছিল বঙ্গভঙ্গের উদ্দেশ্য। পরবর্তীতে আস্তে আস্তে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলনে রূপ নেয়।[৩৬] ড. রমেশ চন্দ্রের মতে, বঙ্গভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে ব্রিটিশ রাজ্যের শান্তিময় যুগের (Pax Britannica) অবসান হয়ে খর্বাকৃতির বামনের সাথে বিশালাকৃতির দৈত্যের সংগ্রাম আরম্ভ হলো। ফলে মুসলিম নেতাগণ বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেন। এ সময় পূর্ব বাংলার অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন নবাব খাজা সলিমুল্লাহ।[৩৭] কুমিল্লা জেলার মুসলিম নেতাদের মধ্যে তখন উল্লেখযোগ্য ছিলেন নবাব সিরাজুল ইসলাম,[৩৮] নবাব স্যার সৈয়দ শামসুল হুদা,[৩৯] নবাব আলী নওয়াব চৌধুরী ও নবাব হোছছাম হায়দার চৌধুরী, তাঁরা সকলেই বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেন।

---

৩৩ জুলফিকার আহমদ কিসমতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

৩৪ ড. এম.এ. রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।

৩৫ প্রাগুক্ত, (কু.জে.ই.), পৃ. ১৭৪।

৩৬ মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, খাজা আবদুল মজিদ শাহ : জীবন ও কর্ম, (ঢাকা: ই.ফা.বা., ২০০১খ্রি.), পৃ. ৫২।

৩৭ প্রাগুক্ত, (কু.জে.ই.), পৃঃ ১৭৫।

৩৮ নবাব সিরাজুল ইসলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার পিয়ারাকান্দি গ্রামের অধিবাসী। তাঁর পিতা কাজী মোহাম্মদ কাজিম। তিনি জেল দারোগা ছিলেন। নবাব সিরাজুল ইসলাম কুমিল্লা জেলার ও ঢাকা কলেজের প্রথম মুসলমান গ্রাজুয়েট (১৮৬৭ খ্রিঃ) ছিলেন। তিনি কিছুকাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন করেন । অতঃপর তিনি পোগজ স্কুলে

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গভঙ্গের বিরোধী ছিলেন কুমিল্লা জেলায় অন্যতম বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ব্যারিস্টার আবদুর রসূল।[৪০] মুসলিম নেতাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই এর বিরোধিতা করেন এবং তিনি বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে বরিশালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে ভাষণের সময় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ব্যারিস্টার আব্দুর রসুল ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের বিরোধী থাকলেও পরবর্তীতে তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন হয়। নতুন প্রদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এবং ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বাংলা প্রাদেশিক কনফারেন্সে সভাপতির ভাষণে তিনি তা প্রকাশ করেন। হিন্দুদের চাপে পড়ে ব্রিটিশ সরকার অবশেষে বঙ্গভঙ্গ রদ করে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর যখন বঙ্গভঙ্গ রদের গোষণা করা হয় তখন মুসলমানগণ খুবই মর্মাহত হন। পূর্ব বাংলা ও আসাম মোহামেডানের অনুরোধে নবাব সলিমুল্লাহ খাজা মুহাম্মদ ইউসুফের সভাপতিত্বে ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় উভয় বাংলার মুসলিম নেতাদেরকে নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কুমিল্লার নবাব সৈয়দ হোচ্ছাম হায়দার চৌধুরী ও ব্যারিস্টার আব্দুর রসুল এ সভায় যোগদান করেন। এতে তাঁরা বিশেষত পূর্ব বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ উপেক্ষা করে বঙ্গভঙ্গ রদ করায় তাঁদের মনে যে দুঃখ ও নৈরাশ্য সৃষ্টি হয়েছে তা তাঁরা প্রকাশ করেন। তবে যেহেতু রাজ সম্রাট স্বয়ং বঙ্গ রদের ঘোষণা করেছেন সেহেতু তার প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধাবশত তাঁরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হতে বিরত থাকেন।

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস রাজভক্তি নীতি পরিহার করে। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজে উভয়দলের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগের পক্ষ হতে শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা রচনা একটি সংস্কার সংস্থা গঠিত হয়। এ সংগঠনে বাংলাদেশের ১১ জন সদস্য ছিলেন, এতে টাঙ্গাইলের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী এবং কুমিল্লার ব্যারিস্টার আব্দুর রসুলও ছিলেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মৌতে মুসলিম ও কংগ্রেস উভয় দলের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে আব্দুর রসুল যুক্ত শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনার প্রস্তাব আনয়ন করেন যা গৃহীত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশরা মুসলিম সাম্রাজ্য তুরস্কের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। ভারতীয় মুসলমানগণ এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। এটি খেলাফত আন্দোলন নামে পরিচিত। মাওলানা মুহাম্মদ আলী এর প্রধান প্রচারক ছিলেন। এ আন্দোলনও ব্রিটিশ বিরোধী এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিচায়ক ছিল। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে মাওলানা মুহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে একটি

সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন এবং ঢাকা কলেজ হতে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ল' পাস করেন। এরপর তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। শেষ জীবনে তিনি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। (প্রাগুক্ত, (কু.জে.ই.), পৃ. ১৭৫)।

[৩৯] নবাব সৈয়দ শামসুল হুদা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার গোকর্ন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম রিয়াজাত উল্লাহ তিনি কলকাতায় ফার্সী ভাষায় প্রকাশিত "দূরবীন" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সৈয়দ শামসুল হুদা পূর্ব বাংলা ও আসাম ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতা মাদ্রাসায় আরবী ও ফার্সী বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ল' পাস করেন এবং ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। সে সময় হতে তিনি রাজনীতিতে অগ্রণী ভূমিকায় পালন করেন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলার গভর্নরের শাসন পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন। তিনি ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে সংস্কারাধীন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রথম বাঙালি প্রেসিডেন্ট ছিলেন। (প্রাগুক্ত, (কু.জে.ই.), পৃ. ১৭৬)।

[৪০] ব্যারিস্টার আব্দুর রসূল ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসির নগর উপজেলার গুনিয়াকের জমিদার গোলাম রসূলের পুত্র। তিনি ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা গভর্নমেন্ট স্কুল হতে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৭ বৎসর বয়সে বিলাত যান। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে অক্সফোর্ড হতে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে এম.এ. এবং বি.সি.এস ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। তিনি ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফেরেন এবং ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন এবং কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে রাজনীতিতে যোগদান করেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বরিশালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিমলীগের বার্ষিক অধিবেশনে ব্যারিস্টার আব্দুর রসূল সভাপতিত্ব করেন। ঐ সময় তিনি মুসলিমলীগে যোগদান করেন। (প্রাগুক্ত, (কু.জে.ই.) পৃ. ১৭৯-১৮০)।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিনিধি দল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে ব্যর্থ হন।[৪১] পরবর্তীতে তিনি দেশে ফিরে এসে মাওলানা শওকত আলীসহ আবার খেলাফত আন্দোলন শুরু করেন। খেলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর মাওলানা মুহম্মদ আলী বিলেত ফিরে যান এবং নিজ দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তিনি দেশে ফিরবেন না বলে সংকল্প করেন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ৪ জানুয়ারি এশার নামাজান্তে লন্ডনের রাউন্ড বেল ব্যায়াকে তিনি ইন্তেকাল করেন। বাইতুল মোকাদ্দাসের হারামের অন্দরে বাদশাহ শরিফ হুসাইনের কবরের পার্শ্বে তাঁকে দাফন করা হয়। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের কৃষক প্রজা আন্দোলনের তীব্রতার মুহূর্তে ত্রিপুরা জেলা তথা বর্তমান বৃহত্তর কুমিল্লার তেজস্বী নেতা আশরাফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, অহিদ উদ্দিন আহমদ, রমিজউদ্দিন আহমদ, হাবিবুর রহমান চৌধুরী, শাহেদ আলী কৃষক প্রজাদের স্বার্থে ও সমর্থনে নেতৃত্ব দান করেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে কুমিল্লার গ্রামগঞ্জে ব্যাপক সাড়া পায়। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ কুমিল্লার টাউন হল ময়দানে ভাষণ দেন। তাঁর আগমনে কুমিল্লায় মুসলিম লীগ নবরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৩৭-১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে একেএম জহীরুল হক ও মফিজ উদ্দিন আহমদ যথাক্রমে মুসলিম লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। মূলত পাকিস্তান আন্দোলনে এদেশের উলামা মাশায়েখের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। পাকিস্তান গঠনের লক্ষ্যে ও সমর্থনে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম গঠিত হয়। কংগ্রেসের স্বাধীনতা ও জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের কংগ্রেসের প্রতি সমর্থনের কারণে পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম গঠন করা হয়। মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দি, মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী, মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা ইসমাইল হুসেন সিরাজি, মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানীসহ বিখ্যাত ওলামা মাশায়েখ এতে এগিয়ে আসেন।[৪২]

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন সভায় মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত সবকটি আসন মুসলীম লীগ লাভ করে। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাসে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বঙ্গীয় বিধান সভায় মুসলীম লীগ নতুন মন্ত্রী সভার শপথ গ্রহণ করে। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান এবং অবিভক্ত বাংলার পূর্বাংশ ও আসাম প্রদেশের অন্তর্গত শ্রীহট্ট জেলার অধিকাংশ অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়। হাজার মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত এ দু'অঞ্চল নিয়ে ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্ম হয়। ঐ দিন অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতের শেষ ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন পাকিস্তানের নতুন রাজধানী করাচীতে গিয়ে স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নিকট পাকিস্তানের ক্ষমতা অর্পণ করেন। করাচী সমগ্র পাকিস্তানের রাজধানী এবং ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিভিন্ন অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ প্রথম বাংলা ভাষার ব্যাপারে সোচ্চার হন। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে কুমিল্লার কংগ্রেস সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির সাথে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের দাবি জানান। ফলে এই দাবি এক পর্যায়ে দীর্ঘ সূত্রতা লাভ করে। পরবর্তীতে এ দাবি স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে ধাবিত হয়। যার ফলে নানা ঘটনার প্রেক্ষিতে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে এবং কুমিল্লা বাংলাদেশের একটি জেলা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।[৪৩]

---

[৪১] আবুল আসাদ, একশ বছরের রাজনীতি, (ঢাকা : বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৪খ্রিস্টাব্দে), পৃ. ৭৯।

[৪২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

[৪৩] মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস, কুমিল্লা জেলায় ইসলাম প্রচার, (ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৯৮৭খ্রি.), পৃ.১৮৯-১৯১।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

কুমিল্লা জেলায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষার ব্যাপকতা

পরিচ্ছেদ-১ : ইসলাম আগমনের সময়কাল	২৭-৩৩
পরিচ্ছেদ-২ : কুমিল্লা জেলায় ইসলামের আগমন	৩৩-৪৩
পরিচ্ছেদ-৩ : আরবী ও ইসলামী শিক্ষার বিস্তার	৪৪-৪৮

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

কুমিল্লা জেলায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষার ব্যাপকতা

পরিচ্ছেদ-১ : ইসলাম আগমনের সময়কাল

বাংলাদেশের কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে ইসলামের প্রচার ও প্রসার হয়নি। বাংলাদেশের কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে ইসলামের আগমন সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে সামগ্রিক বাংলায় ইসলামের আগমন সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক। তবে কুমিল্লা বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং মেঘনা উপকূলে অবস্থিত হওয়ায় অন্য অঞ্চলের তুলনায় কিছুটা আগে কোনো দায়ী ইলাল্লাহর সংস্পর্শে ইসলামের আগমন হতে পারে। কারণ ড. এম.এ. রহীম কর্তৃক উদ্ধৃত আরব্য ভূগোলবিদ ও পর্যটকদের বর্ণনামতে মেঘনার মোহনা হতে কক্সবাজার পর্যন্ত উপকূল অঞ্চলে আরব্য বণিকদের আগমন হয়েছিল।[৪৪] আরব বণিকরা প্রথমে বাংলাদেশের দ্বীপাঞ্চল হাতিয়া ও সন্দ্বীপে অবতরণ করে দেশের অন্যান্য এলাকায় গিয়েছেন। কারণ নৌ পথেই তাঁদের আগমন ঘটেছিল। আরব বণিকদের সাথে ইসলাম প্রচারকগণও এদেশে এসেছিলেন। তাঁরা এসব উপকূলীয় অঞ্চলে ইসলাম প্রচার অব্যাহত রাখেন।[৪৫] এমনকি বণিকগণও ইসলামী জ্ঞানে অভিজ্ঞ ছিলেন, তাঁরাও ইসলাম প্রসারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন বন্দর উপবন্দরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।[৪৬]

বাংলাদেশে কখন ইসলামের আগমন ঘটেছিল এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে সঠিক তথ্য নির্ধারণ করা কষ্টকর। প্রাক ইসলামী যুগ হতে আরব বণিকগণ বাণিজ্যের জন্য লোহিত সাগর, আরব সাগর এবং ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী বন্দরগুলোতে আসা যাওয়া করতেন। আরবদের এ বাণিজ্য ভ্রমণ চীন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আরব দেশের বণিকেরা বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দরগুলোতে এসে চন্দন কাঠ, হাতির দাঁত, মসলা এবং সূতী কাপড় ক্রয় করতেন এবং জাহাজ বোঝাই করে নিজেদের দেশে নিয়ে যেতেন।[৪৭]

বাংলাদেশের বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক মওলানা আকরম খাঁ তাঁর রচিত 'মুসলেম বঙ্গের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেন যে, আরব বণিকগণ এই পথ ধরেই মধ্যপথের প্রধান বন্দর আরাকান ও বার্মা বন্দরে যাত্রা বিরতি করত। কেননা দীর্ঘপথ পালে টানা জাহাজ একটানা সফর সম্ভব হতো না। এসব স্থানে তাঁরা আবশ্যিকভাবে থেমে জাহাজ মেরামত করে পরবর্তী গন্তব্যস্থলের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাব সংগ্রহ করত। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী হতে আরবের মুসলমানরা প্রাচ্যে বিশেষ করে চীনের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক সুসংহত করেছিলেন।[৪৮]

ভারতের বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক সাইয়েদ সুলায়মান নদভী 'আরবো কী জাহাজরানী' তাঁর লিখিত গ্রন্থে লিখেন যে, মিশর হতে সুদূর চীন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল আরবদের সামুদ্রিক বাণিজ্য যাতায়াত। মালাবার যা বর্তমান কেরালা উপকূল হয়ে তারা চীনের পথে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করত। মুহাদ্দিস

---

৪৪ এসব ভূগোলবিদদের মধ্যে রয়েছেন, ইবনে খুরদাযা (মৃত্যু : ৯০০ খ্রি.), আল ইদ্রিসী (মৃত্যু : ১১৬৬ খ্রি.) ও আল মাসুদী (১১ শতাব্দী)।

৪৫ A.K.M. Yaqub Ali. A spects of society and culture of the Bengal, 1200-1576 A.D. (Un-published Ph.D. Thesis, Rajshahi University, 1981), P. 186.

৪৬ আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩-৫৪।

৪৭ ড. মো. মোহর আলি, হিস্ট্রি অব দ্যা মুসলিম্স অব বেঙ্গল, ১৯৮৫খ্রি., পৃ. ৩০।

৪৮ এ.কে.এম. ইয়াকুব আলি, রাজশাহীতে ইসলাম, (ঢাকা : ই.ফা.বা., ১৯৯২খ্রি.), পৃ. ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবাদান মারওয়াযীর গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, রাসূল (সা.)-এর সাহাবী আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনু ওহাইব (রা.) নবুওয়াতের ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে হাবশা তথা ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন। নবুওয়াতের ৬১৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি কায়েস ইবনু আছাছা (রা.), আবু কায়েস ইবনুল হারিস (রা.) এবং কিছু সংখ্যক হাবশী মুসলিমসহ দুটি জাহাজে করে চীনের পথে সমুদ্র পাড়ি দেন। শায়েখ জয়নুদ্দিন তাঁর 'তুহফাতুল মুজাহেদীন ফী বাসে আহওয়ালিল বারতাকালীন' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, একদল আরব জাহাজে করে মালাবার এসেছিলেন এবং তাঁদের প্রভাবে মালাবার রাজা চেরুমল পেরুমল ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সময় মালাবারের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনে ওহাইব-এর হাতেই রাজা পেরুমল ইসলাম গ্রহণ করেছিল বলে প্রতীয়মান হয়। আবু ওয়াক্কাস দীর্ঘ নয় বছর সফর করেন। চীনে যাবার পথে বাংলাদেশের বন্দরগুলোতেও নোঙর করতে হয়েছে। সে হিসেবে মালাবার সাথে সাথে বাংলাদেশেরও কিছু সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এটাই স্বাভাবিক। তবে এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না। রাসূল (সা.)-এর নিকট সরবতক নামক জনৈক ভারতীয় শাসক একপাত্র যানজাবীল বা আদ্রক উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভারতীয় সুগন্ধি এমনকি এদেশীয় কিছু উপঢৌকন তাঁকে উপহার দেয়া হয়েছিল বলে তথ্য পাওয়া যায়। সুতরাং উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে রাসূল (সা.)-এর যুগেই বাংলাদেশে প্রথম ইসলামের আগমন ঘটে। তবে এসব তথ্য নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সূত্রে প্রমাণ করা দুঃসাধ্য।[৪৯]

রাসূল (সা.)-এর পর ওমর (রা.)-এর আমলে ১৩-২৪ হিজরিতে মামুন, মুহায়মেন, আবু তালিব, হামেদ উদ্দিন, হোসায়েন মর্তুজা প্রমুখ সাহাবীগণ ইসলাম প্রচারের বিশেষ উদ্দেশ্যে এদেশে আগমন করেন বলে জানা যায়। ওমর (রা.)-এর যুগে ভারত বর্ষ অভিযান ও ইসলাম প্রচারে আরও যেসব সাহাবী অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে - আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইতবান, আসেম ইবনে আমর তামিমী, সুহাব ইবনুল আবদী, সুহায়ল ইবনে আদী এবং হাকাম ইবন আবিল আস সাকাফী প্রমূখ এর নাম নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া যায়। এরপর ভারত ও বঙ্গদেশে প্রচারকগণের আগমন অব্যাহত থাকে।[৫০]

মূলত সপ্তম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত চারশ বছরের বাংলার ইসলাম প্রচারের বিস্তারিত ইতিহাস পাওয়া দুষ্কর। এজন্য কারো কারো ধারণা সপ্তশতকে এ অঞ্চলে আরব মুসলমানরা আসেনি। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। কারণ স্বল্প হলেও নির্ভরযোগ্য তথ্য এ ব্যাপারে রয়েছে। তবে একাদশ হতে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত সাতশত বছর বাংলায় ইসলাম প্রচারের একটি চিহ্নিত সময়কাল। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজির ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলা বিজয়ের পরই মূলত সমগ্র বাংলায় ব্যাপকভাবে ইসলামের প্রচার ও প্রসার শুরু হয়।[৫১]

বিভিন্ন গবেষকদের মতে, এদেশে মূলত তিনটি পদ্ধতিতে ইসলাম এসেছে। ১. আরব বণিকদের মাধ্যমে ২. মুসলমানদের রাজনৈতিক বিজয় যা বখতিয়ার খলজির বঙ্গ বিজয়ের মাধ্যমে ৩. সুফী সাধকদের মাধ্যমে। এ পদ্ধতিতেই মূলত বাংলায় ইসলামের বেশি প্রচার ও প্রসার ঘটেছে। গবেষকরা অনেক পর্যালোচনা করে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে রাজনৈতিক বিজয়ের দু'এক শতাব্দী পূর্ব

[৪৯] ড. কাজি দীন মুহাম্মদ, বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, (ঢাকা : ই.ফা.বা., ১৯৯৪খ্রি.), পৃ. ১৭৬।

[৫০] ড. মুহম্মদ ইসহাক, ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান, (ঢাকা : ই.ফা.বা., ১৯৯৩খ্রি.), পৃ. ১৩।

[৫১] এ.কে.এম. ইয়াকুব আলি, রাজশাহীতে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

থেকেই আরব বণিক ও ধর্ম প্রচারক সুফী সাধকদের মাধ্যমে এদেশে ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছিল।[৫২] এ সম্পর্কে Glipess of old Dhaka নামক বইটিতে লেখক Syed Muhammad Taifur বলেছেন - Infact the missionary activities were first started by Arab navigatoris and merchants much before the conquest of Bengal by Bukhtiar Khalji. অর্থাৎ বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের বহু পূর্বে আরব বণিকদের দ্বারাই এদেশে ইসলাম প্রচারের কাজ সর্বপ্রথম শুরু হয়।[৫৩] বাংলাদেশের সকল অঞ্চলে মুসলিম শাসনের পূর্বেই এসব সুফী-সাধকগণ ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। বাংলায় ইসলাম প্রচারক সুফী-সাধকগণের মধ্যে প্রখ্যাত কয়েকজন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

শায়েখ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা (রহ.) : বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী দাওয়াতের কাজে শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যান্য দা'য়ীগণ হতে তিনি ছিলেন ব্যতিক্রম। শায়েখ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা (রহ.) শেখ জালালুদ্দিন তাবরিযী এবং শাহ জালাল (রহ.)-এর মতো বাংলায় ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার আলো প্রজ্জ্বলিত করার ক্ষেত্রে অসামান্য ও অনবদ্য অবদান রাখেন। তাঁর জন্ম হয় তৎকালীন বুখারা নগরে।[৫৪] ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি দিল্লীতে আগমন করেন এবং ১২৭৪-৭৭ খ্রিস্টাব্দেমতান্তরে ১২৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি সোনারগাঁয়ে আগমন করেন।[৫৫] সোনারগাঁয়ে তিনি বিশাল এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তাঁর এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গোটা উপমহাদেশে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয়। ইলমে হাদীসে তিনি ছিলেন তৎকালীন যুগের বিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি শুধু ইলমে হাদীস ও তাসাউফ শিক্ষা দেননি বরং রসায়ন শাস্ত্র ও প্রকৃতি বিজ্ঞানেও ছিলেন অসাধারণ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন। সোনারগাঁয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে অসংখ্য মুহাদ্দিস, ইসলামী শিক্ষাবিদ এবং দা'য়ী ইলাল্লাহ তৈরি হয়ে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।[৫৬] এটিই হচ্ছে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং আরবী ও ইসলাম শিক্ষা চর্চা কেন্দ্র।[৫৭] তবে মাওলানা তকী উদ্দিন আরবী কর্তৃক রাজশাহীর মহিসন্তোষে প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসাকে বাংলার প্রথম ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলা হয়ে থাকে। তিনি ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। সোনারগাঁয়ের মোগরাপাড়ায় তাঁর মাযার অবস্থিত।

চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে রাজশাহী অঞ্চলে শাহ মাখদুম রূপোস ইসলাম প্রচার এবং মুসলিম রাজ্য বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৩৩১ খ্রিস্টাব্দে মতান্তরে ১৩২৬ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। রাজশাহী শহরের দারগাহ পাড়ায় তাঁর মাকবারা বা সমাধি সৌধ অবস্থিত।[৫৮] যশোর, খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় খান জাহান আলী (রহ.) উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি জনগণের কল্যাণে বহু রাস্তাঘাট নির্মাণ, দিঘি খনন এবং বহু সংখ্যক মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। তাঁর পুরো নাম ছিল উলুঘখান-ই-জাহান। বর্তমান বাগেরহাট শহর তাঁরই নির্মিত এবং এর নাম দিয়েছিলেন তিনি

---

[৫২] ড. এম.এ. কাদের, নোয়াখালীতে ইসলাম (ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৯৯১খ্রি.), পৃ. ২৯-৩১।

[৫৩] অধ্যাপক মো. সগির উদ্দিন মিঞা, গৌড়ে মুসলিম শাসন ও নূর কুতুবউল আলম, (ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৯১খ্রি.), পৃ. ৯।

[৫৪] মাওলানা ওবায়দুল হক, বাংলার পীর-আউলিয়াগণ, (ফেনী : হামিদিয়া লাইব্রেরি, ১৯৬৯খ্রি.), পৃ. ১৪।

[৫৫] আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

[৫৬] Islam in Bangladesh. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

[৫৭] ড. মো. সেকান্দর আলী, জুহুদুল মোহাদ্দেসিন ফি বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

[৫৮] ড. এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

খলিফাতাবাদ। বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ তাঁর অমর কীর্তি। পশ্চিম-দক্ষিণ বাংলায় ইসলাম প্রচারের সিংহভাগ কৃতিত্ব তাঁরই। ১৪৬৯ খ্রিস্টাব্দে ২৭ জিলহজ্জ তিনি ইন্তেকাল করেন। ষাট গম্বুজের পাশে তাঁর খননকৃত খাঞ্জালি দিঘির পাড়ে তাঁর মাযার অবস্থিত।[৫৯]

শাহ মোহাম্মদ সুলতান রুমী (রহ.) : বাংলায় যাঁরা ইসলাম প্রচার করেছেন একাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তাঁদের মধ্যে বগুড়া মহাস্থানগড়ের শাহ সুলতান বলখী মাহি সওয়ার (রহ.) এবং নেত্রকোনা জেলার শাহ মোহাম্মদ সুলতান রুমী (রহ.) অন্যতম। নেত্রকোনা জেলার মদনপুর নামক স্থানে শাহ মোহাম্মদ সুলতান রুমী (রহ.)-এর মাযার ও দরগাহ অবস্থিত। ১৬৭১ খ্রিস্টাব্দে ফার্সী ভাষায় লিখিত একটি সূত্র হতে জানা যায় যে, তিনি বলখ হতে তাঁর মুরশিদ সাইয়েদ শাহ সুর্খখুল আনতিয়াহ এবং একশ বিশ জন সহচর ও শিষ্যসহ ৪৪৫ হিজরি মোতাবেক ১০৫৩ খ্রিস্টাব্দে মদনপুরে আগমন করেন। আর বৃহত্তম ময়মনসিংহ এলাকায় রুমী (রহ.) প্রথম সারির ইসলাম প্রচারক।[৬০]

শাহ সুলতান বলখী মাহি সওয়ার (রহ.) : ১০৪৭ খ্রিস্টাব্দে মহাস্থানে শাহ সুলতান বলখী মাহি সওয়ার (রহ.) আগমন করেন। আরব বণিকরা প্রথমে তাঁকে মৎস্যাকৃতির জাহাজ হতে সন্দ্বীপ নামিয়ে দেন। ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রদত্ত সনদ অনুসারে তাঁর প্রকৃত নাম মীর সাইয়েদ সুলতান মাহমুদ মাহি সওয়ার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সন্দ্বীপে কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি ঢাকা জেলার হরিরামপুরে আগমন করেন। তখন বলরাম নামে এক হিন্দুরাজা হরিরামপুর শাসন করত। সে ছিল কালির উপাসক। তার মুসলিম নির্যাতনের কথা শুনে তিনি সোজা তার কালিমন্দিরে উপস্থিত হয়ে আযান দিলে সকল মূর্তি চুর্ণ বিচুর্ণ হয় এবং রাজার মন্ত্রীও ইসলাম গ্রহণ করলে শাহ সুলতান বলখী তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে ইসলাম প্রচারের দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। এখানে অবস্থানকালেই তিনি জানতে পারেন মহাস্থানগড়ের হিন্দু শাসক রাজা পরশুরাম কর্তৃক মুসলিম ও বৌদ্ধদের প্রতি উৎপীড়নের খবর। ফলে জনগণের মধ্যে চরম বিক্ষোভ ফুটে ওঠে।[৬১]

রাজার এহেন অত্যাচার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধেই শাহ সুলতান মাহি সওয়ার (রহ.) জনগণের এ অত্যাচারের কাহিনী শুনে তিনি মহাস্থানে আসেন এবং মুসলিম মুজাহিদদের লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিয়ে রাজা পরশুরাম ও তার তান্ত্রিক বোন শিলাদেবীকে পরাস্ত করে বগুড়ায় ইসলামের বাণী প্রজ্জ্বলিত করেন। এরপর তিনি মহাস্থানে একটি খানকাহ ও মসজিদ নির্মাণ করেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাওহীদের বাণী প্রচার করেন। মসজিদের পাশেই তাঁর এবং তাঁর অন্যতম শিষ্যের মাযার অবস্থিত।[৬২]

শায়েখ আব্বাস বিন হামজা নিশাপুরী (রহ.) : শায়েখ আব্বাস বিন হামজা নিশাপুরী (রহ.) ছিলেন মুসলিম রাজনৈতিক বিজয়ের পূর্বে ইসলাম প্রচারক পীর আউলিয়াগণের মধ্যে শীর্ষ ও প্রবীণতম। তিনি ২৮৮ হিজরি মোতাবেক ৯০০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন।[৬৩] তিনি বাংলায় ইসলাম প্রচার করেন বঙ্গ বিজয়ের তিনশত বছর পূর্বেই। এরপর প্রবীণতম যাঁদের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হচ্ছেন ঢাকায় শায়েখ আহমদ বিন মোহাম্মদ ওরফে জা'ফারুল হাজ্জার মৃত্যু ৯৫২ খ্রিস্টাব্দে। শায়েখ ইসমাইল বিন নজন্দ নিশাপুরী মৃত্যু ৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে। এ মহান সাধকদের এদেশে আগমন ও ইসলাম

---

৫৯ Dr. Enamul Hoque, History of Sufism in Bengal, (Dhaka, 1980), P. 79-82

৬০ ড. কাজি দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১।

৬১ ড. মোহাম্মদ গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সুফীসাধক, ৩য় সংস্করণ, (ঢাকা : ই.ফা.বা., ১৯৯৩খ্রি.), পৃ. ৫১।

৬২ ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯।

৬৩ মাও. মো. ওবায়দুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০-৯১।

Dhaka University Institutional Repository

প্রচার সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না। তবে এতটুকু অনুমান করা যায় যে, বখতিয়ার খলজির বঙ্গ বিজয়ের বহু পূর্বে অলি আউলিয়াদের আগমনের ধারাবাহিকতার মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঘটে।[৬৪]

বাবা আদম শহীদ (রহ.) : বাবা আদম শহীদ (রহ.) ছিলেন বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচারকদের অন্যতম। তিনি সম্ভবত তুর্কী ছিলেন। কারো কারো মতে তিনি ছিলেন ইরানী। তবে তিনি মূলত তুর্কী ছিলেন এবং ইরানের কোনো মুরশিদের কাছে বাই'আত গ্রহণ করে মুরশিদের নির্দেশে উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য এসেছিলেন। এমন সম্ভাবনাও প্রবল। রাজা বল্লাল সেনের রাজত্বকালে (১১৫৮-১১৭৯ খ্রিস্টাব্দে) গরু কুরবানীর অপরাধে নির্যাতিত জনৈক মুসলিম হজ্জযাত্রীর মুখে তার নির্যাতনের কথা শুনে তিনি ছোট একটি অনুচর দল নিয়ে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের আব্দুল্লাহপুর গ্রামে উপস্থিত হন। আব্দুল্লাহপুরেই তাঁর মাযার অবস্থিত । রাজা বল্লাল সেন ছিল বখতিয়ার খলজী কর্তৃক পরাস্ত লক্ষণ সেনের পিতা। বল্লাল সেনের মৃত্যু হয় ১১৭৯ খ্রিস্টাব্দে। সে হিসেবে বাবা আদম শহীদ ১১৭৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় আগমন করেন বলে অনুমান করা যায়। এ বছরেই তিনি শহীদ হন। বাবা আদম শহীদ রাজা বল্লাল সেনের সাথে দলবল নিয়ে যুদ্ধ করেন অবশেষে তিনি শহীদ হন। তাই তাকে শহীদ বলা হয়।[৬৫] বাবা আদম শহীদের মাযারের পাশে একটি প্রাচীন মসজিদ রয়েছে। এটি ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর অনেক পর সুলতান জালালুদ্দিন ফাতেহ শাহর আমলে মালিক কাফুর কর্তৃক নির্মিত হয়। মানুষ এটিকে বাবা আদমের মসজিদ বলে।

পাবনা জেলার শাহজাদপুরে মাখদুম শাহ দৌলার মাযার রয়েছে। তিনি ইয়েমেনের শাসনকর্তা রাসূল (সা.)-এর প্রখ্যাত সাহাবী মু'য়ায ইবনে জাবাল (রা.)-এর বংশধর ছিলেন। তিনি ২১ জন অনুচরসহ বাংলায় আগমন করেন। স্থানীয় হিন্দু রাজার সাাথে লড়াইয়ে তিনি এবং তাঁর ২১ জন অনুচরই শহীদ হন। তবে মুসলমানরা অবশেষে জয়লাভ করেন। পাবনা জেলায় ইসলাম প্রচারে তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে। তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে ১২৪০ খ্রিস্টাব্দের পরে এদেশে আসেন বলে অনেকের ধারণা।[৬৬]

১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর বিনা বাধায় অসংখ্য সুফী দরবেশ বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। বঙ্গে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর যে সকল মহান সাধক বঙ্গে ইসলাম প্রচারে অনবদ্য ভূমিকা রাখেন তাঁদের বিশিষ্ট কয়েকজন সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো। বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর হাজার হাজার অমুসলিমকে যাঁরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন শেখ জালাল উদ্দিন তাবরিযী[৬৭] তাঁদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। তিনি শেখ আবু সাইদ তাবরিযীর মুরিদ ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর শায়েখ শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দির মুরিদ হন এবং তাঁর এমন খেদমত করেন যে, কোনো মুরিদ স্বীয় পীরের এমন খেদমতের সুযোগ পাননি। খাজা কুতুবদ্দিন বখতিয়ার কাকী ও শেখ বাহাউদ্দিন যাকারিয়ার সাথে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।

খাজা বখতিয়ার কাকীর দিল্লীতে অবস্থান কালেই তিনি দিল্লীতে আসেন। শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ (১২১০-১২৩৬ খ্রি.) ছিলেন তখন দিল্লীর বাদশা। দিল্লীতে কিছুদিন অবস্থান করে তিনি ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলার পাণ্ডুয়ায় চলে আসেন। তাঁর বাংলায় আগমনের সন তারিখ নিয়ে মতপার্থক্য

---

[৬৪] আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

[৬৫] ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০।

[৬৬] আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

[৬৭] তাবিরীজ বর্তমান ইরানের একটি প্রদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে। তবে ১২১৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে তিনি বাংলায় আগমন করেন বলে ঐতিহাসিক সূত্রে বলা যায়। ১২৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।[৬৮] পাণ্ডুয়া হতে পনের মাইল উত্তরে দেওতলায় তাঁর মাযার অবস্থিত[৬৯]।

শাহ জালাল ইয়েমেনী (রহ.) : বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে বৃহত্তর সিলেট জেলায় ইসলাম প্রচারে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন শাহ জালাল ইয়েমেনী (রহ.)। তাঁর নেতৃত্বে এবং আধ্যাত্মিক অনুকম্পায় গৌড়ের সুলতান ফিরোজশাহের আমলে তাঁর ভাগ্নে সিকান্দার গাজী ও দিল্লীর সেনাপতি নাসির উদ্দিনের মাধ্যমে ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে সিলেট এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকা মুসলমানদের অধিকারে আসে।[৭০] তাঁর শিষ্যগণ শুধু শ্রীহাট্টে নয়; বরং সিলেটের পার্শ্ববর্তী এলাকা ময়মনসিংহ, কুমিল্লা তৎকালীন ত্রিপুরা, নোয়াখালী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর এবং আসাম প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত দার্শনিক ও সুপণ্ডিত অধ্যক্ষ দেওয়ান মো. আজরফ বলেন, শাহ জালাল (রহ.) কর্তৃক ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে সিলেটের গৌঢ় রাজ্য জয় করার পর সিলেটে ব্যাপকভাবে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয় এবং গৌঢ় রাজ্যের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চল পরবর্তীতে বিজিত হয়। এজন্য তাঁর বিজয়কে ইসলামের বিজয় বলে আখ্যায়িত করা যায়। তাঁর ৩৬০ শিষ্যের অন্যতম শিষ্য শাহ মো. ইসরাইল[৭১] কুমিল্লায় ইসলাম প্রচারে ব্যাপক অবদান রাখেন। কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলার ভারেল্লা গ্রামে তাঁর মাযার অবস্থিত এবং তাবেল্লাহ শাহ ইসরাইল কামিল মাদ্‌রাসা তাঁর নামেই প্রতিষ্ঠিত। সেখানে একটি প্রাচীন মসজিদও রয়েছে। যা তাঁর আমলে নির্মিত বলে ধারণা করা হয়। ফেনীর বিখ্যাত ওলী আমিরুদ্দিন ওরফে পাগলা মিয়া ও শাহ জালাল (রহ.)-এর অন্যতম শিষ্য সৈয়দ কুতুবুল আলম বাগদাদীর বংশধর ছিলেন। শাহ জালাল (রহ.) ত্রিশ বছর বয়সে সিলেটে আগমন করেন এবং সুদীর্ঘ ৩২ বছর সিলেটে দ্বীনী শিক্ষা দাওয়াত প্রচার করে ৬২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন এবং সিলেটে সমাহিত হন। বৃহত্তর নোয়াখালী ও কুমিল্লা অঞ্চলে শাহ জালাল (রহ.)-এর শিষ্যগণের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।[৭২]

শাহ আলী বাগদাদী (রহ.) : শাহ আলী বাগদাদী (রহ.) ছিলেন ঢাকা জেলায় অন্যতম ইসলাম প্রচারক। তিনি বাগদাদের স্বনামধন্য বাদশা ফখরুদ্দিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ১৪১১ খ্রিস্টাব্দে প্রায় একশত দরবেশসহ ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি দিল্লীতে আসেন। এই একশত জন হতে মাত্র তিন জনকে নিয়ে তিনি প্রথমে ফরিদপুর জেলায়, তারপর ঢাকায় আসেন। ঢাকায় আসার পর তিনি অত্র অঞ্চলের তৎকালীন কামিল পীর শাহ মোহাম্মদ বাহার (রহ.)-এর নিকট চিশতীয়া তরীকার বাই'আত গ্রহণ করেন এবং তাঁরই নির্দেশে ঢাকা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। মাওলানা রুহুল আমিন সাহেবের মতে তিনি হযরত শাহ জালালের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি প্রায় একশত বছর জীবিত ছিলেন। ৯২৩ হিজরি মোতাবেক ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার মীরপুরে তিনি ইন্তেকাল করেন। মীরপুরে তাঁর মাযার অবস্থিত।[৭৩]

---

[৬৮] Islam in Bangladesh, through ages o.p.cit., (Dhaka:I.F.B., 1995 A.D.), P-21.

[৬৯] আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।

[৭০] Journal of Asiatic Society of Bengla, 1922, P. 413.

[৭১] দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, তিনি শাহজালাল (রহ.)-এর শিষ্যগণের যে তালিকা দিয়েছেন তাতে ৩১৫ নম্বরে হযরত শাহ ইসরাইলের নাম রয়েছে। (দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, হযরত শাহজালাল (রহ.), (ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৯৮৩খ্রি.), পৃ. ২৫৯)।

[৭২] রশিদ আহমদ, বাংলাদেশের সুফীসাধক, (ঢাকা: মডার্ন লাইব্রেরি, ১৯৭৪খ্রি.), পৃ. ৭২।

[৭৩] মাও. রুহুল আমিন, বঙ্গ ও আসামের পীর আউলিয়া কাহিনী, (মারকাযে এশায়াতে ইসলাম, দারুস সালাম, মীরপুর, ১৯৮২খ্রি.), পৃ. ২০১।

Dhaka University Institutional Repository

নূর কুতুবুল আলম (রহ.) : রাজশাহী জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং পার্শ্ববর্তী ভারতের মালদহে তিনি ইসলাম প্রচার-প্রসারে ও মুসলিম সমাজ রক্ষায় অনন্য অবদান রাখেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল শেখ নুরুল হক। তবে তিনি নূর কুতুবুল আলম নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন এক সাধক ও জ্ঞান তাপস শেখ আলাউল হক পাণ্ডুবী। তাঁর পিতার পিতা ছিলেন ওমর বিন আসাদ খালিদী। তিনি মহাবীর খালিদের বংশধর ছিলেন। শায়েখ নূর কুতুবুল আলম ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে পাণ্ডুয়ায় জন্মগ্রহণ করেন।[৭৪] রাজা গণেশের অত্যাচার নিপীড়ন হতে মুসলমানদের রক্ষায় তিনি অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন। গণেশের পুত্র যদু তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। জালাল উদ্দিন যদু নাম ধারণ করে গৌড়ের অধিপতি হন। নুর কুতুবুল আলম সোনারগাঁওয়ের শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামার ন্যায় পাণ্ডুয়াতে খানকাহ ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তাঁর মাদ্রাসাটি তদানীন্তন বাংলার মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন গঠনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। ১৪১৫ খ্রিস্টাব্দে মতান্তরে ১৪৪৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। গৌড়ে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[৭৫]

নূর কুতুবুল আলম ছাড়াও চিশতিয়া ত্বরীকার যে সকল সাধক বাংলায় ইসলাম প্রচার করেন তন্মধ্যে আঁখি সিরাজুদ্দিন মৃত্যু ১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি শায়েখ নূর কুতুবুল আলমের পিতা শায়েখ আলাউল হক পাণ্ডুবীর পীর এবং দিল্লীর শায়েখ নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার খাস শিষ্য ছিলেন শেখ আব্দুল হক সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী।[৭৬] এ ছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচারে যে সকল সুফী-সাধক অনবদ্য অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে শাহ কামাল জামালপুর ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দ, খাজা শরফুদ্দিন চিশতী ঢাকা ১৫৫৬-১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে, শায়েখ বদরুল ইসলাম শহীদ পাণ্ডুয়া ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে, মাওলানা তাকী উদ্দিন আরাবী গৌড় ১২৫০ খ্রিস্টাব্দে, দেওয়ান শাহাদাত হোসেন জয়পুরহাট ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে। সৈয়দ নেক মর্দান দিনাজপুর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, সাইয়েদুল আরেফীন পটুয়াখালী ১৩৫০-১৪০০ খ্রিস্টাব্দে, শায়েখ আহমদ তন্নুরী ওরফে মিরান শাহ নোয়াখালী ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে, শাহ আমানত চট্টগ্রাম ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৭৭]

পরিচ্ছেদ-২ : কুমিল্লা জেলায় ইসলামের আগমন

কুমিল্লা জেলায় ইসলামের বাণী কত খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম কোন সাধকের মাধ্যমে এসেছিল তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা দুরুহ ব্যাপার। তবে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় কুমিল্লা জেলায়ও সুফী-সাধকদের দ্বারাই ইসলামের আগমন ঘটেছিল। কোনো কোনো গবেষকের মতে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দশকে এ জেলায় মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার আগেই এখানে ইসলাম প্রচার হয়েছিল। পার্শ্ববর্তী মুসলিম অঞ্চলসমূহ হতে মুসলিম ধর্ম প্রচারকদের প্রচেষ্টায় এরূপ প্রচার হতে পারে অথবা অন্যান্য এলাকায় নদী পথে মেঘনা অববাহিকা দিয়ে যাওয়ার পথে ইসলামের দাওয়াতী কাজ সাময়িক অবস্থানের দ্বারাও প্রচারকার্য হতে পারে। তবে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার পর এখানে ইসলাম প্রচারে ব্যাপকতা লাভ করে তাও সুফী-সাধকদের মাধ্যমে। কুমিল্লার ময়নামতিতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকালে কুটিলা মুড়াতেও বাগদাদের শেষ খলিফা মোতাসিম বিল্লাহর একটি মুদ্রা পাওয়া যায়।[৭৮] আর বিহারে কুফিক অক্ষরে লিখিত জনৈক আব্বাসীয় খলিফার একটি মুদ্রা পাওয়া যায়। এ সকল আবিষ্কারের

---

[৭৪] আইনে আকবরী মতে তাঁর জন্ম হয় লাহোরে। তবে এ ব্যাপারে কোনো তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। (ড. এনামুল হক, সুফী-ইজম ইন বেঙ্গল), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

[৭৫] আবদুল মান্না তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭-১৪৮।

[৭৬] ড. ইবনে গোলাম সামাদ, বাংলাদেশে ইসলাম (ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৯৮৫খ্রি.), পৃ. ২৪।

[৭৭] রশীদ আহমদ, বাংলাদেশের সুফী সাধক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

[৭৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে কোনো কোনো গবেষক মনে করেন যে, সীমাবদ্ধ সংখ্যক হলেও বেশ কিছু মুসলমান মুসলিম অধিকারের বহু পূর্বেই এ এলাকায় আগমন করেন। তবে এসব মুদ্রা ছাড়া আর কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও কুমিল্লা অঞ্চলে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠায় আরও শ'খানেক বছর লেগেছিল বলে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ আবুল কালাম মো. যাকারিয়া মত প্রকাশ করেছেন। খুব সম্ভব ১২৬০ ও ১২৮১-৮২ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে সোনারগাঁয়ে তুর্কি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সোনারগাঁয়ের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল কুমিল্লাতেও তখন ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু হয়েছিল এটা মোটামুটি নির্ভরযোগ্যভাবে বলা যায়। ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ফিরোজ শাহর রাজত্বকালে ১৩০১-১৩২২ খ্রিস্টাব্দে শাহজালাল (রহ.)-এর নেতৃত্বে সিকান্দার গাজীর মাধ্যমে সিলেট জয়ের সাথে পার্শ্ববর্তী কুমিল্লার উত্তরাঞ্চলের কিছু অংশ এ সময় মুসলিম অধিকারে আসে।[৭৯] সমগ্র কুমিল্লা তাঁর শিষ্যগণ কর্তৃক এবং অন্যান্য সুফী-সাধকগণ কর্তৃক ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার শুরু হয়। এ সময়কার ইসলাম প্রচারের মোটামুটি তথ্যসূত্র পাওয়া যায়। এ সময়ের সুফী-সাধকদের যে সকল জীবনী পাওয়া যায় তাতে বুঝা যায় শাহজালাল (রহ.)-এর শিষ্যগণ কর্তৃকই ব্যাপকভাবে এ এলাকায় ইসলাম প্রচারের কাজ সম্পন্ন হয়। আবুল কালাম মো. যাকারিয়া শাহজালাল (রহ.)-এর অন্যতম শিষ্য কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়িয়া খড়মপুরে সমাহিত সৈয়দ আহমদ শাহ গেছুদারাজ ওরফে কল্লা শহীদ (রহ.)-কে এ এলাকার প্রথম ইসলাম প্রচারক বলে উল্লেখ করেছেন। তবে এর পেছনে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য তিনি উপস্থাপন করেননি।[৮০]

কুমিল্লার ইসলাম প্রচারকদের সম্পর্কে বিশিষ্ট লেখক মো. আবদুল কুদ্দুস নিম্নোক্ত কবিতাটি রচনা করেছেন:

ইসলামেরই রৌশনীতে উজ্জ্বল হলো কুমিল্লা
বলরে ও মন বল আল্লাহ আল্লাহ।
তিতাস স্রোতে ভেসে এল শহিদী কল্লা
বুঝবে কে শানরে তাই
চারিদিকেতে শুধুই রব
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
চাঁদপুরে শাহ মোহাম্মদ বোগদাদী
আরও মজনুদের বেশ রাত্তি শাহ
গাইল না'ত
মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ।
লাকসামেতে শাহ শরীফ
কুমিল্লায় আব্দুল্লাহ
ঘুমিয়ে আছে জেলার মাঝে
তিনশ আউলিয়া।[৮১]

কুমিল্লা জেলায় ইসলাম প্রচার করে এ এলাকার মানুষকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় দিতে যে সকল মহান সাধক জীবন দিয়ে কঠিন ত্যাগ স্বীকার করে অসীম কষ্ট সহ্য করে অসামান্য অবদান রেখেছেন তাদের কয়েকজন সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

---

৭৯ মো. গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সুফী-সাধক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫-১০৯।

৮০ (কু.জে.ই.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২।

৮১ (কু.জে.ই.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ মোহাম্মদ বাগদাদী (রহ.) : শাহ মোহাম্মদ বাগদাদী (রহ.)-এর মাযার বৃহত্তম কুমিল্লার বর্তমান চাঁদপুর জেলায় শাহতলী গ্রামের খন্দকার বাড়িতে অবস্থিত। শাহতলী এলাকাই ছিল তাঁর প্রচার কেন্দ্র। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক তাঁকে শাহতলী মৌজাটি নিষ্কর সম্পত্তি হিসেবে দান করেছিলেন। তিনি সম্ভবত ১৩৫০-১৩৫৫ খ্রিস্টাব্দে রাস্তি শাহ ও শায়েখ আহমদ তন্নুরী (রহ.)-এর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাত্রিকালে বাঘের পিঠে আরোহন করে বেড়াতেন। ঢাকার সুবেদার শেখ এনায়েত উল্লাহ তাঁর পৌত্র শাহ কলিমুল্লাহ হতে অনুমতি নিয়ে ৯৬০ শতক জমি তাঁকে দিয়ে শাহতলী মৌজা নিজ অধিকারভুক্ত করে নেন। শাহতলী এলাকায় তাঁরই প্রচেষ্টায় ইসলাম প্রচারে ব্যাপকভাবে অগ্রগতি সাধিত হয়। বহুদিন পর্যন্ত তাঁর বংশধরদের মধ্যে অনেকেই ইসলামের দাওয়াতী কাজ চালু রাখেন।[৮২]

হযরত রাস্তি শাহ (রহ.) : বৃহত্তম কুমিল্লার বর্তমান চাঁদপুর জেলায় ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে রাস্তি শাহ (রহ.) সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলার বহু লোক তাঁর প্রচেষ্টায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি আব্দুল কাদির (রহ.)-এর বংশধর বলে পরিচিত। মেহার কালিবাড়ি রেল স্টেশনের পূর্বপার্শ্বে শ্রীপুর গ্রামে তাঁরই খননকৃত ৫৮ একর দীঘির দক্ষিণ পাড়ে চিরকুমার রাস্তি শাহের মাযার অবস্থিত[৮৩]। দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের আমলে ১৩৫৮-১৩৮৮ খ্রিস্টাব্দে নোয়াখালী জেলার কাঞ্চনপুরে আগত বিখ্যাত ইসলাম প্রচারক শায়েখ আহমদ তন্নুরী (রহ.)-এর সাথে তিনি কুমিল্লায় আগমন করেন। তিনি আরব মুলক হতে কয়েকজন শিষ্যসহ এদেশে আসেন। সুলতান ফিরোজ শাহ অনেক লাখেরাজ সম্পত্তি তাঁকে দান করেছিলেন। তাঁর প্রভাবে অত্র অঞ্চলের বহু অমুসলিম পরিবার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। বহুদিন ধরে তিনি অত্র অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। তাঁর নামেই এই এলাকার নাম হয় শাহরাস্তি। দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী শাহজালাল (রহ.)-এর জীবনী গ্রন্থে শাহজালালের শিষ্যদের তালিকায় রাস্তি শাহের নাম ৩৩৭ নম্বরে উল্লেখ করেছেন। অতএব বুঝা যায় যে, তিনি শাহজালাল (রহ.)-এর শিষ্য ছিলেন এবং তাঁর নির্দেশক্রমে অত্র এলাকায় ইসলাম প্রচারে আগমন করেন।[৮৪]

শাহ শরীফ বাগদাদী (রহ.) : শাহ শরীফ বাগদাদী (রহ.)-এর প্রচার কেন্দ্র ছিল কুমিল্লা জেলার তৎকালীন হিন্দু প্রধান চিতোষি অঞ্চলে। অত্র এলাকায় ইসলাম প্রচারে তিনি অনবদ্য অবদান রাখেন। শাহ শরীফ বাগদাদী (রহ.)-এর পূর্ব পুরুষগণ বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। দুর্ধর্ষ মোঙ্গোলীয় বীর হালাকু খানের বাগদাদ নগরী লুণ্ঠনের সময় তাঁর পূর্বপুরুষ দিল্লীতে আগমন করেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। আর দিল্লীতেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে শাহজালাল (রহ.) শ্রীহট্ট বিজয়ের পর তাঁকে কুমিল্লার এ অঞ্চলে পাঠানো হয়। কারো কারো মতে তিনি শাহজালাল (রহ.)-এর সাথেই দিল্লী হতে এদেশে আসেন। কুমিল্লার চিতোষিতে আসার পূর্বে তিনি তাঁর অনুরক্ত হায়াত আবদ করিমকে হিন্দুপ্রধান চিতোষি অঞ্চলের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠান।[৮৫] রাজ্যে কোনো মুসলমান তার বিনা অনুমতিতে থাকতে পারত না। শাহ শরিফ বাগদাদীর অনুরক্ত হায়াত আবদ করিম রাজা নাটেশ্বরের অনুমতি নিয়ে তার রাজ্যে প্রবেশ করেন এবং কিছুদিন অবস্থানের পর কোতয়ালের চাকরি গ্রহণ করেন। কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর কোতয়াল আবদ করিম জমিদার নাটেশ্বর রায়কে বলেন- যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে আমি আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীর জন্য

---

[৮২] মাও. রুহুল আমিন, বঙ্গ ও আসামের পীর আউলিয়া কাহিনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭-১০৮।

[৮৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪।

[৮৪] দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, হযরত শাহজালাল (রহ.), (ঢাকা:ই.ফা.বা.১৯৮৩খ্রি.), পৃ. ২৬০।

[৮৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

একটি মসজিদ নির্মাণ করবো। জমিদার আপত্তি না করে অনুমতি দেওয়ায় তিনি ডাকাতিয়া নদীর দক্ষিণ তীর সংলগ্ন এবং নাটেশ্বর রায়ের বাগান বাড়ির পূর্ব উত্তর কোণে একটি মসজিদ নির্মাণ শুরু করেন।[৮৬]

মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ হয় দীর্ঘ বিশ বছরে। ডাকাতিয়া নদীর দক্ষিণ তীরে নাটেশ্বর রায়ের দিঘীর পূর্ব-উত্তর কোণে মসজিদটি এখনও বিদ্যমান আছে। কোতয়াল কর্তৃক নির্মিত মসজিদ বলে এটিকে কোতয়ালের মসজিদ, আবার শাহী আমলে নির্মিত বলে কেউ কেউ শাহী মসজিদও বলে থাকে। অবশেষে শাহ শরীফ শিষ্যের সাথে এসে মিলিত হন। মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষে যখন শাহ শরীফ চিতোষিতে আগমন করেন ঠিক সে দিনই তাঁর শিষ্য কোতয়াল ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালে শাহ শরীফ খুবই মর্মাহত হন এবং বাকি সময় এখানে থেকেই ইসলাম প্রচার-প্রসারে অতিবাহিত করতে মনস্থ করেন। কিন্তু শাহ শরীফ (রহ.) আগমনের ফলে বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। তাই রাজা তাঁর ওপর বিভিন্ন অত্যাচার চালান এবং তাঁকে এখান থেকে উৎখাতের জন্য চেষ্টা করেন। অবশেষে তাঁর কাছে তার সর্বশক্তি ও প্রচেষ্টা বিফল হলে স্ত্রীর পরামর্শে নাটেশ্বর রায় তার স্ত্রীসহ শাহ শরীফের হাতে ইসলাম কবুল করেন এবং মাযার ও মসজিদের জন্য ভূসম্পত্তি দান করেন। শাহ শরীফ বাকী জীবন ইসলামের দাওয়াতী কাজ করে অসংখ্য অমুসলিমকে মুসলমান করে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি কখন আগমন করেন এবং কখন ইন্তেকাল করেন তাঁর নির্দিষ্ট দিন তারিখ পাওয়া যায়নি। তবে উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বা ১৩২৩-২৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে তিনি চিতোষি আগমন করেন। বর্তমান চিতোষি রেল স্টেশনের সাড়ে পাঁচ মাইল দক্ষিণে কুমিল্লা জেলার প্রান্তসীমা চিতোষি বাজারের নিকটে নাটেশ্বর দিঘির পূর্ব পাড়ে তাপস প্রবর শাহ শরীফ বাগদাদী (রহ.) এবং তাঁর পরম ভক্ত শিষ্য হায়াত আবদ করিমের মাযার অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। তাঁর নামানুসারে এ গ্রামের নাম হয় শরীফপুর। আর তার পাশেই রয়েছে একটি ফাযেল মাদ্রাসা ও একটি হাফেজিয়া মাদ্রাসা। যা দীর্ঘদিন যাবৎ দ্বীনের তা'লিম ও তরবিয়তের কাজ খুব সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে।[৮৭]

সৈয়দ আহমদ শহীদ গেছুদারাজ (রহ.) : কুমিল্লা জেলার বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়া রেল স্টেশনের সন্নিকটে তিতাস নদীর তীরে খড়মপুর নামক স্থানে একটি মাটির টিবির ওপর সৈয়দ আহমদ ওরফে কল্লা শহীদ (রহ.)-এর মাযার অবস্থিত। সৈয়দ আহমদ (রহ.) শাহজালাল ইয়েমেনী (রহ.)-এর অন্যতম শিষ্য ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন গাউসুল আযমের বংশধর এবং শাহজালালের শিষ্য। অতএব এর দ্বারা বুঝা যায় ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে বা তার কাছাকাছি সময়ে তিনি কুমিল্লার উত্তরাঞ্চলে ইসলাম প্রচারে আগমন করেন। শাহজালাল (রহ.) সিলেট জয়ের পর তাঁর শিষ্যদেরকে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে বাংলা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে তরফপুর পরগণায় ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব অর্পিত হয় সাইয়েদ নাসিরুদ্দিনের নেতৃত্বে এগারজন শিষ্যের ওপর। এ দলে ছিলেন সাইয়েদ আহমদ (রহ.)। তাঁর মাথায় চুল লম্বা ছিল বলে তাঁকে গেছুদারাজ বলা হতো। ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে তিনি অমুসলিমদের কর্তৃক বাধার সম্মুখীন হন এবং তরফের হিন্দু রাজা আচক নারায়ণের বিরুদ্ধবাদীদের সাথে যুদ্ধ করতে হয়। যুদ্ধে মুসলমানরা জয়ী হলেও সৈয়দ আহমদ শহীদ হন। সম্ভবত তাঁর কোনো ভক্ত তাঁর কর্তিত মস্তকের সন্ধান পান এবং এ স্থান হতে পনের ষোল মাইল দূরে খড়মপুর এনে তা সমাধিস্থ করেন। যুদ্ধে শহীদ হয়ে তাঁর কর্তিত মস্তক ছিন্ন হওয়া এবং তাঁর কর্তিত মস্তক দাফন করা হয়েছে বলে তাঁকে কল্লা শহীদ বলা হয়।

---

[৮৬] রশীদ আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২-১০৪।

[৮৭] (কু.জে.ই.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

এ নামেই তিনি সকলের কাছে পরিচিতি লাভ করেন।[৮৮] কারো বর্ণনা মতে তিনি, ধর্ম প্রচারের জন্য আদিষ্ট হবার পর গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পূর্বেই তিনি যুদ্ধে শহীদ হন। দেহ মোবারক হতে শির মোবারক বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। দেহ মোবারকের সন্ধান কেউ পায়নি। অতঃপর তাঁর ছিন্ন শির ও একটা খড়ম নদীতে ভেসে এসে চৈতন দাস জেলের জালে আটকা পড়ে।[৮৯]

শাহ সৈয়দ সোলায়মান (রহ.) : কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার আন্দিকোট নামক স্থানে বুড়ি নদীর তীরে জনাকীর্ণ অঞ্চলে তাঁর এক অধস্তন পুরুষ শাহ্ সোলায়মান অবস্থান গ্রহণ করেন। মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.)-এর খলিফা ও ধর্ম প্রচারক শাহ্ সৈয়দ নাসিরুদ্দিন (রহ.) ধর্ম প্রচারের জন্য বাংলা ও আসাম ভ্রমণ করেন। একটি উঁচু স্থানে বসে তিনি সবসময় আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন থাকতেন। কথিত আছে যে, তাঁর নিকটেই অন্য এক উঁচু স্থানে এক ব্রাহ্মণও সাধনায় রত ছিলো। তাঁর দাওয়াতী প্রচেষ্টায় আন্দিকোট এলাকার বহু অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর সাধনার স্থানকে এখনও লোকেরা পীরের মুড়া বলে। আন্দিকোটেই তাঁর মাযার রয়েছে। তাঁর বংশধররা এখনও আন্দিকোটে সৈয়দ বংশ নামে পরিচিত।[৯০]

শাহ কামাল (রহ.) : কুমিল্লাঞ্চলে শাহজালাল (রহ.)-এর তিন শিষ্য ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হন। উটের ওপর ছওয়ার হয়ে আগমন করেন। তাঁরা কোন জায়গায় ইসলামের দাওয়াত প্রচার করবেন, আসার পূর্বে শাহজালাল (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করেন। জবাবে তিনি বলেন, যেখানে গিয়ে তোমরা পরিবেশ অনুকূল দেখবে সেই জায়গাকেই তোমাদের হেদায়েতের কেন্দ্রস্থল মনে করবে। তাঁদেরকে বহনকারী উটগুলো বর্তমান দেবিদ্বার উপজেলার এলাহাবাদ গ্রামে এসে থামে। যেখানে এসে তাঁদের উটগুলো থামে সে স্থানের নাম হয় উটখাড়া।[৯১] তিনজন শিষ্যের মধ্যে শাহ কামাল (রহ.) এখানেই অবস্থান করেন এবং দেবিদ্বার এলাকায় মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করেন। দেবিদ্বার উপজেলা সদরের দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বে উটখাড়া গ্রামেই শাহ কামালের মাযার অবস্থিত। দেবিদ্বার ও আশেপাশের এলাকায় ইসলাম প্রচারে তিনি প্রধান ভূমিকা পালন করেন।[৯২]

শাহ মোহাম্মদ ইসমাইল (রহ.) ও শাহ মোহাম্মদ নুরুদ্দিন (রহ.) : শাহজালাল (রহ.)-এর তিনজন অনুসারীর মধ্যে দুইজন হচ্ছেন শাহ ইসরাইল (রহ.) এবং শাহ মোহাম্মদ নুরুদ্দিন (রহ.)। শাহ কামাল উটখাড়াতে দাওয়াতী কাজে থেকে যান আর শাহ ইসরাইল (রহ.) এবং শাহ মোহাম্মদ নুরুদ্দিন (রহ.) দেবিদ্বার হতে কয়েক মাইল দক্ষিণে জাফরগঞ্জ বাজারের দক্ষিণ-পশ্চিমে ময়নামতি বাজারের অদূরে উত্তর-পশ্চিমে ভারেল্লা নামক স্থানে দাওয়াতী কাজে গমন করেন। কারও কারও মতে শাহজালালের তিন শিষ্য হচ্ছেন শাহজামাল, শাহকামাল ও শাহ মো. ইসরাইল, আর শাহ নুরুদ্দিন ছিলেন শাহ ইসরাইলের ভাগ্নে।[৯৩] শাহ জামাল ও শাহ কামাল উটখাড়াতেই থেকে যান। আর শাহ মো. ইসরাইল স্বীয় ভাগ্নে শাহ মো. নুরুদ্দিনকে নিয়ে ভারেল্লা গ্রামে চলে আসেন। দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী শাহজালাল (রহ.)-এর জীবনী গ্রন্থে তাঁর শিষ্যদের যে তালিকা দিয়েছেন তাতে শাহ মোহাম্মদ ইসরাইলের নাম ৩২৫ নম্বরে উল্লেখ করেছেন।[৯৪] ভারেল্লা এলাকায় তখন বহু যুদ্ধকায় বসবাস করত। তাঁর আগমনের পর তিনি তাদেরকে তথা হতে অন্যত্র চলে যেতে বলেন।

---

[৮৮] মো. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫।

[৮৯] (কু.জে.ই.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮।

[৯০] (কু.জে.ই.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০।

[৯১] উটখাড়া গ্রামটি এখনও সে নামেই বহাল আছে।

[৯২] (কু.জে.ই.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯।

[৯৩] মাও. রুহুল আমিন, বঙ্গ ও আসামের পীর আউলিয়া কাহিনী, প্রাগুক্ত, ১২৪।

[৯৪] দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, হযরত শাহজালাল (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের দাওয়াতের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে পরে এসব যুদ্ধকারেরা তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গী বা ভাগ্নে[৯৫] শাহ মো. নুরুদ্দিন বুজর্গ ও কামেল পীর ছিলেন। তাঁরা ইসলাম প্রচার ও ইবাদত-বন্দেগী করার নিমিত্তে তথায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তাঁদের স্থাপিত কাঁচা মসজিদটি ১১২৯ হিজরিতে পাকা করা হয়। মসজিদের পাশেই তাঁদের এবং শাহ ইসরাইলের চাচাত বোনের মাযার অবস্থিত। যিনি শাহ জামালের কন্যা বলে পরিচিত। বর্তমানে ঐ মসজিদটি বহাল আছে এবং এখানে একটি কামিল মাদ্‌রাসাও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মাদ্‌রাসাটি শাহ মো. ইসরাইলের নামেই প্রতিষ্ঠিত। শাহ ইসরাইল ও শাহ মো. নুরুদ্দিনের নামে বহু লাখেরাজ সম্পত্তি রয়েছে।[৯৬]

হোব্বে আলী শাহ (রহ.) : হোব্বে আলী শাহ (রহ.) ইরান থেকে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে আগমন করেন। কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার পাঁচ পুকুরিয়া গ্রামে তিনি অবস্থান করেন। পাঁচ পুকুরিয়া এলাকাসহ উত্তর কুমিল্লার নিম্নাঞ্চল এলাকায় তিনি ইসলাম প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। হিন্দু প্রধান এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে এ বুজর্গের অসামান্য অবদান রয়েছে। শাহ সাহেব তাঁর জীবদ্দশাতেই দেবিদ্বার উপজেলার উত্তর প্রান্তে আড়িখলায় তাঁর সমাধিস্থান চিহ্নিত করেন এবং পর্যায়ক্রমে ভূমির মালিকানা লাভ করেন। কুমিল্লা-দাউদকান্দি রাস্তার পাশে চান্দিনা উপজেলা সদরের পশ্চিমে তাঁর মাযার অবস্থিত। সম্ভবত চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি অত্র অঞ্চলে দাওয়াতী কাজে আগমন করেছিলেন। আর পাঁচ পুকুরিয়াতে সমাহিত আছেন তাঁর পৌত্যপুত্র সাধক মেনালী শাহ (রহ.) ।[৯৭]

শাহ আবদুল্লাহ গাজিপুরী (রহ.) : শাহ আবদুল্লাহ গাজিপুরী (রহ.) ১২৯৭ খ্রিস্টাব্দে রেঙ্গুনের পথে কুমিল্লা আগমন করেন। তিনি ছিলেন ভারতের যুক্ত প্রদেশের অধিবাসী। কুমিল্লা দারোগা বাড়ির মৌলভী আশরাফ উদ্দিন সাহেবের সাথে পরিচয় সূত্রে কুমিল্লা শাহতলী এলাকায় বার বছর অবস্থান করেন। অত্র এলাকায় তিনি ইসলামের প্রচার-প্রসারে এবং ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বহু লোক তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ১৩০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। দারোগা বাড়ির মসজিদের দক্ষিণ পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[৯৮] উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া আরও বহু পীর আউলিয়া, সুফীসাধক কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। যাঁদের অনেকেরই বিস্তারিত জীবন ও কর্ম সংকলিত হয়নি।

বাংলাদেশে তুর্কী বীর বখতিয়ার খলজির মাধ্যমে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর ইসলামের প্রচারকগণ আগমন করতে থাকেন। কুমিল্লা জেলায়ও তাঁদের আগমনে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে। গোটা, সুলতানী আমল জুড়ে ইসলাম প্রচারক সুফী-সাধকগণের আগমন অব্যাহত থাকে। মোগল আমলেও কিছু ইসলাম প্রচারকদের আগমন হয়েছিল। তবে সে সময় ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়া কিছুটা স্তিমিত হওয়ার পর্যায়। কারণ বাংলার প্রায় সব অঞ্চলেই তখন ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছিল। তবে ধর্ম প্রচারকদের তখন প্রধান কাজ ছিল ধর্মান্তকরণ নয়; বরং ধর্ম সংস্কার। অর্থাৎ যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল তাদেরকে সঠিক ধর্ম পথের অনুগামী করা।[৯৯]

পলাশীর আম্রকাননে বাংলার মুসলিম শেষ রাজশক্তির পতনের সাথে সাথে বাংলার মুসলমানদের জীবনে আবার নেমে আসে ঘোর নিশা। মোগলামল তথা নবাবী আমল পর্যন্ত মুসলমানদের অবস্থা

---

৯৫ ভায়েল্লা এলাকার জনশ্রুতি মতে।

৯৬ মাও. রুহুল আমিন, বঙ্গ ও আসামের পীর আউলিয়া কাহিনী, প্রাগুক্ত, ১২৫।

৯৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০।

৯৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

৯৯ (কু.জে.ই.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫।

Dhaka University Institutional Repository

মোটামুটি ভালোই ছিল। কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠার পর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিকসহ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও আবার হিন্দুদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ইসলামের মূলনীতি একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়েও বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় কুমিল্লা জেলার মুসলমানদের মধ্যেও অনেক অনৈসলামীক আচার-আচরণ, ভূতপ্রেত, কালি সাধনা ইত্যাদি বাতিল বিশ্বাস ঢুকে পড়ে।

বাঙালি মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনেও বিভিন্ন ধর্ম ও সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের ফলে এক বিচিত্র সমন্বয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। এ জেলার আলেম ওলামাগণ মুসলমানদের মধ্যে খাঁটি ইসলামী ভাবধারাকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।[১০০] কিন্তু তাদের এসব প্রচেষ্টার পরও জেলার সাধারণ মুসলমানগণ নিজেদেরকে এ সকল অপসংস্কৃতি হতে মুক্ত করতে পারেনি। ফলে ইসলাম প্রচারের ন্যায় বহিরাগত ইসলামী সাধকগণ আবার বাংলার মুসলমানদেরকে কুসংস্কার মুক্ত করার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালান। বৃহত্তর কুমিল্লা জেলাসহ বাংলার মুসলমানদের কুসংস্কারমুক্ত করার ক্ষেত্রে আলিয়া মাদ্‌রাসা শিক্ষা ভিত্তিক, কওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষা তথা দেওবন্দ আন্দোলন, জৌনপুর ও ফুরফুরা সিলসিলা সংস্কার আন্দোলনের ভূমিকা অপরিসীম। নিম্নে এ সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

আলিয়া মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা : মাদ্‌রাসার শিক্ষার মূল উৎস আল-কুরআন ও আল-হাদীস। পবিত্র কুরআন নাযিলের প্রথম আয়াতগুলোতেই আল্লাহ শিক্ষার কথা বলেছেন। 'পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। জমাট বাঁধা রক্ত কণিকা থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পড় এবং তোমার রব বড় মেহেরবান, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা সে জানত না'।[১০১] জ্ঞান বা শিক্ষাই মানুষকে সত্য-অসত্য ভালো-মন্দ কল্যাণ-অকল্যাণ সম্পর্কে বুঝতে সাহায্য করে। অশান্তির পথ পরিহার করে শান্তির পথে অগ্রসর হতে অনুপ্রাণিত করে। আল্লাহর রাব্বুল আলামিন তাই মানব জন্মের উপাদান দিয়ে শিক্ষাদানের যাত্রা শুরু করেছিলেন।

বর্তমান শিক্ষাদান পদ্ধতি আর রাসূল (সা.) এর আমলের শিক্ষার পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আল্লাহ তা'আলা জিবরাইল (আ.) এর মাধ্যমে রাসূল (সা.)-কে সরাসরি শিক্ষা দান করেন। আর রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কেরামদের সরাসরি শিক্ষা দেন। পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে সেই শিক্ষা দান পদ্ধতি বর্তমান মাদ্‌রাসা শিক্ষা পদ্ধতিতে রূপ লাভ করে। সেই শিক্ষার ধারায় একটি পদ্ধতি হলো আলিয়া মাদ্‌রাসা শিক্ষা।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের হাতে রাষ্ট্রীয়ভাবে মুসলিম শাসকদের পতনের পর মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে মহসিন ট্রাস্টের অর্থে ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসা যা বর্তমান সরকারি কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রূপ নেয়, চট্টগ্রাম দারুল উলূম মোহসেনীয়া মাদ্‌রাসা যা বর্তমানে সরকারি মহসীন কলেজ হিসেবে রূপ নেয় ও রাজশাহী মাদ্‌রাসা যা বর্তমান রাজশাহী গভ. মাদ্‌রাসা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর আলিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই ধারাবাহিকতায় তৎকালীন সরকার ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে আরও ৩টি আলিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করে।

---

[১০০] (কু.জে.ই.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯।

[১০১] সুরা আলাক ৯৬:১-৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রা ৫৮২টি দাখিল, ২৯৮টি আলিম, ৪২৮টি ফাযেল এবং ৪৩টি কামিলসহ মোট ১৩৫১টি মাদ্‌রাসা পাওয়া যায়। ১৯৭৮-১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড স্বায়ত্ব শাসন লাভের পর দাখিল মাদ্‌রাসা ১১৯৬, আলিম মাদ্‌রাসা ৫২৯, ফাযেল মাদ্‌রাসা ৪৭৪ এবং কামিল মাদ্‌রাসা ৬০টিসহ সর্বমোট মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা হয় ২২৫৯টি।

বাংলাদেশে আলিয়া মাদ্‌রাসা শিক্ষা পদ্ধতিতে ওলামায়ে কেরামদের ব্যাপক অবদান রয়েছে। তাঁদের অবদানের ধারাবাহিকতায় বৃহত্তর কুমিল্লায় বহু আলিয়া মাদ্‌রাসা গড়ে ওঠে। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা আলিয়া মাদ্‌রাসা, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে সোনাকান্দা আলিয়া মাদ্‌রাসা, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ধামতি আলিয়া মাদ্‌রাসা, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে গাজিমুড়া আলিয়া মাদ্‌রাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অত্র মাদ্‌রাসাগুলোর মাধ্যমে বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামগণ আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন।[১০২]

মসজিদ ভিত্তিক আরবী ও ইসলামী শিক্ষা : বাংলাদেশে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার অন্যতম একটি দিক হলো মসজিদ ভিত্তিক ফুরকানীয় মাদ্‌রাসা। এসকল মাদ্‌রাসা মূলত কুরআনে কারিম বিশুদ্ধভাবে পড়া এবং দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের বিভিন্ন মাসয়ালা মাসায়েল শিক্ষা দেওয়া হয়। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাকে মসজিদের শহর বলা হয়। এ বাক্যটির ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় তাৎপর্য রয়েছে। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে বাংলার মুসলমান সুলতান, পাঠান, সম্রাট ও মোগল শাসকদের দ্বারা শাসিত হয়ে আসছিল। এসব শাসকদের মাধ্যমে বহু মসজিদ নির্মাণ হয়েছিল। সেই স্বাধীন সুলতানী আমল থেকে মসজিদ নির্মাণ শুরু হয়। আজ পর্যন্ত সে ধারা অব্যাহত আছে। মসজিদগুলো প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইবাদতের সাথে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করা। ফলে প্রতিটি মসজিদের সঙ্গে এক একাধিক ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, মকতব, হাফেজিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালিত হয়ে আসছে। মসজিদ কেন্দ্রিক মাদ্‌রাসা ও মাদ্‌রাসা কেন্দ্রিক মসজিদ উভয়টির অস্তিত্ব সারাদেশে পাওয়া যায়। এ সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ওলামায়ে কেরাম আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রচার প্রসারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।[১০৩]

দেওবন্দ তথা কওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষা কার্যক্রম : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র উপমহাদেশব্যাপী সিপাহী জনতা ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবে লিপ্ত ছিল। এ আন্দোলন শুরু হয় কোলকাতার ব্যারাকপুর থেকে। পরে সমগ্র উপমহাদেশে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তা ছিল বিক্ষিপ্তভাবে। তখন কেন্দ্রীয়ভাবে কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য উপজেলা ভবনের ওলামা ও পীর মাশায়েখ সম্মেলন থেকে একটি উদ্যোগ নেয়া হয় এবং ঘোষণা করা হয় চলমান সশস্ত্র বিপ্লব ইসলামী জিহাদ হিসেবে গণ্য হবে। তাই সকলের জন্য এই জিহাদের জন্য অংশগ্রহণ করা একান্ত জরুরি। তবে জিহাদের ঘোষণা ও জিহাদের ডাক দেওয়ার জন্য ইসলামী সরকার প্রয়োজন।[১০৪] তখন ঐ সম্মেলন থেকে একটি অস্থায়ী ইসলামী সরকার গঠন করা হয়। আমীরুল মু'মেনিন নির্বাচিত হন হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মককী (রহ.), কাযিউল কুযাত বা চীফ জাস্টিজ নির্বাচিত হন মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) এবং প্রধান সেনাপতি নির্বাচিত হন মাওলানা কাসেম নানাতুবী (রহ.)।

---

102 Dr. A.K.M. Ayub Ali, History of Traditional Education in Bangladesh, (I.F.B. 1983) (Dhaka: Islamic Education in Bangladesh, 1983), P. 13.

১০৩ ড. আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন, ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, (ঢাকা : ই.ফা.বা., ২০০৫খ্রি.), পৃ.১৩৯-১৪০।

১০৪ ড. আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন, ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৮-৯০।

Dhaka University Institutional Repository

এ সরকার জিহাদের ঘোষণা দিলে শামেলী রণাঙ্গনসহ বেশ কয়েকটি রণাঙ্গনে অংশগ্রহণ করেন। এর সাথে চলমান বিপ্লবকে নিয়ন্ত্রণ করারও পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এ পদক্ষেপ কার্যকর হওয়ার পূর্বেই ব্রিটিশ বেনিয়া সরকার দিল্লীতে তাদের দখল পাকাপোক্ত করে নেয়। ফলে সশস্ত্র আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়। সিপাহী জনতার এ গণবিপ্লব অসফল হওয়ায় গোটা উপমহাদেশে নেমে আসে ওলামায়ে কেরামদের ওপর অত্যাচারের স্টিম রোলার ও বিভিন্নভাবে নির্যাতন। আর ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বিপ্লবে জীবন দিতে হলো সাড়ে একান্ন হাজার ওলামায়ে কেরামের। তারপর গুপ্তহত্যা, প্রহসন মূলক বিচারের ফাঁসি দিয়ে মুজাহিদ হবার অপরাধে বিনা বিচারে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে, কালা পানিতে নির্বাসন দিয়ে প্রভৃতি কৌশলে লক্ষ লক্ষ ওলামায়ে কেরামের জীবনাবাসন ঘটানো হল। ফলে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে, তখন স্বাধীনতার কথা বলা বা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করার মতো কাউকে খুঁজে পাওয়া ছিল দুষ্কর। অপর দিকে মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হলো। আর ওয়াকফ সম্পত্তিসমূহ নিলামে বিক্রি করা হলো। ফলে প্রতীভাদীপ্ত মানুষ তৈরির কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে গেলো।

রাষ্ট্র কর্তৃক ওলামা নিধনের করাল গ্রাস হতে যে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি প্রাণে বেঁচেছিল, তাদের বিরুদ্ধেও হুলিয়া জারি থাকলো। এ অবস্থার মধ্য দিয়ে কেটে গেলো প্রায় ১০ বছর। এরপর কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা উপমহাদেশের ভবিষ্যতের জন্য বেছে নেন তারা হলেন স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনার নিমিত্তে গঠিত অস্থায়ী সরকারের চিফ জাস্টিস মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি মাওলানা কাসেম নানুতুভী (রহ.)। এরা উপমহাদেশের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ভারতের দেওবন্দ নামক স্থানে গড়ে তোলেন দারুল উলূম নামে একটি মাদ্রাসা। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল :

- উপমহাদেশ থেকে ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিতাড়িত করার নিমিত্তে নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি করা।
- স্বাধীনতার জিহাদ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা
- মাদ্রাসা শিক্ষা পুনরায় চালু করা
- মুসলমানদের ইমান আকিদাহ ও আমল আখলাক হিফাজত করা
- ব্রিটিশ কর্তৃক প্রবর্তিত পাশ্চাত্যের ধর্ম ও নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষা ও সংস্কৃতির ছোবল থেকে মুসলমানদের রক্ষা করা,
- খ্রিস্টান ষড়যন্ত্র হতে মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষা করা,
- মুসলমানদের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সংরক্ষণ এবং প্রচার-প্রসারকল্পে সারা উপমহাদেশে মাদ্রাসার শিক্ষার প্রসার ঘটানো,
- নতুন উদ্যমে ইসলামের দাওয়াত, তাবলীগ, তাহরীক ও সংস্কার চালু করা,
- ইসলামের হিফাজত ও প্রচার-প্রসারকল্পে বিভিন্নমুখী ব্যক্তিত্ব ও সংগঠন গড়ে তোলা,
- মদীনার মাদ্রাসায়ে সুফফার আদর্শ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা।

দারুল উলূম দেওবন্দ তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে বেশ সফলতা অর্জন করে উপমহাদেশে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এ দারুল উলূম দেওবন্দেরই চিন্তাধারার ফসল হচ্ছে আজকের বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসাসমূহ। বস্তুত দারুল উলূম দেওবন্দের চিন্তাধারার ওপর আজ বাংলাদেশে প্রায় সাত হাজার দ্বীনী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে আরবী ও ইসলামের শিক্ষা প্রচার-প্রসারে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। দারুল উলূমকে উপমহাদেশের মুসলিম অধিকার পুনরুদ্ধারের মারকায বানানো হয়েছিল। এ মারকায থেকে বহু ইসলামী মনীষী চিন্তাবিদ, গবেষক, ফকিহ, মুজতাহিদ, মুজাহিদ জন্ম নিয়েছে। যারা পরবর্তীতে

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন মাদ্‌রাসা, মসজিদ ও মারকায প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে এ উপমহাদেশে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন।[১০৫]

জৌনপুরী সিলসিলার শিক্ষা কার্যক্রম : কুমিল্লা জেলাসহ পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে যে সকল হিন্দুরীতি-নীতি ও কুসংস্কার ঢুকে পড়ে তা বিদূরিত করে ইসলামী আদর্শে আদর্শবান করার ক্ষেত্রে জৌনপুরী সিলসিলার অবদান অপরিসীম।[১০৬] মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহ.)-এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১১ জুন ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গ ভারতের উত্তর প্রদেশের গোমতী নদীর তীরে জৌনপুর শহরে মুল্লাটোলা মহল্লায় ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে শায়েখ বংশে জন্মগ্রহণ করেন।[১০৭]

১৮২০-১৮২২ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ আহমদ (রহ.) যখন বাংলা ও উত্তর ভারতে একদল শিষ্য সংগ্রহ করেন যুবক অনুচরদের মধ্যে মাওলানা কারামত আলী (রহ.) ছিলেন অন্যতম। সৈয়দ আহমদ (রহ.)-এর নির্দেশে তিনি বাংলায় আগমন করেন এবং এদেশে ইসলামী দাওয়াত প্রচারে তিনি অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রথমে কলিকাতায় আসেন। ১৮৩৪-৩৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি সপরিবারে বাংলায় আগমন করেন। কলিকাতা হয়ে তিনি প্রথম ফরিদপুর ও বরিশালে আগমন করেন।[১০৮] এবং সেখানে অল্প কিছুদিন ইসলাম প্রচার করেন। অতঃপর, বরিশালে কিছুদিন ইসলামের প্রচার করে তিনি নদীপথে নোয়াখালীতে আগমন করেন। নোয়াখালীর লোকজন তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন। বলা হয় যে, নোয়াখালীর লোকদেরকে তিনি ধূতি বাদ দিয়ে লুঙ্গি পরা শিখান এবং এখানকার অসংখ্য লোক তাঁর হাতে মুসলমান হন। নোয়াখালীর লোকজন তাঁরই প্রচেষ্টা ও দোয়ার বরকতে বাংলাদেশের সর্বত্র ইসলামী শিক্ষা প্রদানে আজও অনবদ্য অবদান রেখে যাচ্ছেন। নোয়াখালীতে তিনি বিবাহ করেন এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা প্রদান করে কুসংস্কার হতে নোয়াখালীর মুসলমানদেরকে মুক্ত করেন। তাঁর অসংখ্য মুরিদ তাঁর পদাংক অনুসরণ করে নোয়াখালীতে তাঁর নামে একাধিক আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তার মধ্যে উল্লেযোগ্য হলো- নোয়াখালী কারামতিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, চন্দ্রগঞ্জ কারামতিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, রামগতি কারামতিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, ভবানীগঞ্জ রব্বানিয়া হাইস্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান আজও তাঁর পবিত্র স্মৃতি বহন করে যাচ্ছে।[১০৯]

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ মহান ইসলাম প্রচারক ও সংস্কারক কুমিল্লা জেলায় আগমন করেন এবং এ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্ম সংস্কারের কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর সংস্কারের ফলে এ জেলার মুসলমানগণ কুরআন-হাদীস বহির্ভূত কুফর, শিরক, বিদ'আতসহ অনেক অনৈসলামীক আচার অনুষ্ঠান হতে বিরত থাকে এবং তাঁর প্রচেষ্টায় এ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তার লাভ করে। ফলে বহু মাদ্‌রাসা-মসজিদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১১০]

---

[১০৫] প্রাগুক্ত, পৃ.৮৯-৯০।

[১০৬] সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ : (ঢাকা : ই.ফা.বা., ১৯৯৬খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২১, ।

[১০৭] মাওলানা আবদুল বাতিন, সীরাত-ই মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী, (ঢাকা:আল-কারনী প্রেস, ১৯৭৮খ্রি.), পৃ. ৯।

[১০৮] মাওলানা আবদুল বাতিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

[১০৯] মুহাম্মদ আফাজ উদ্দিন; ইসলামী দাওয়াত বিস্তার ও ধর্মীয় সামাজিক সংস্কারে আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (১৮৬৭-১৯২০ খ্রি.)-এর অবদান। (অপ্রকাশিত পি. এইচ.ডি. থিসিস ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ১৯৯৭), পৃ. ১২৩।

[১১০] (কু.জে.ই.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯।

Dhaka University Institutional Repository

ফুরফুরা সিলসিলার শিক্ষা কার্যক্রম : ব্রিটিশ দুঃশাসনে ভারত ও বাংলাদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক জীবনের সাথে সাথে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনও বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। বৃটিশের সাথে সাথে হিন্দু জমিদারদের নিষ্পেষণে মুসলমানদের জীবনে যখন নাভিশ্বাস ওঠে তখন ভারত ও বাংলা আসামের মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে ইসলামের সঠিক জীবনধারায় ফিরিয়ে আনতে ফুরফুরা পীর আবু বকর ছিদ্দীক (রহ.)-এর সংস্কার আন্দোলন ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। এ সংস্কারের কারণে তিনি মুজাদ্দিদে জামান খ্যাতি লাভ করেন। শুধু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে নয়, বরং মুসলমানদের রাজনৈতিক জীবনেও তিনি অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন। তিনিও ছিলেন মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহ.)-এর ন্যায় বালাকোট কেন্দ্রিক ইসলামী আন্দোলনেরই আর এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সিলসিলাই ফুরফুরা সিলসিলা নামে পরিচিত।[১১১]

তিনি বাংলার মানুষের মধ্যে আরবী ও ইসলামের শিক্ষা প্রচারে এগিয়ে আসেন। প্রথমেই মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ইসলামের মৌলিক আদর্শে ফিরিয়ে আনতে তিনি সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। বাংলা আসামের মুসলমানদের মধ্য হতে শিরক, কুসংস্কার দূরীকরণ এবং ব্রিটিশ ও হিন্দুত্বের প্রভাব হতে এদের মুক্ত করতে তিনি রীতিমতো আন্দোলন চালিয়ে যান।[১১২] তাঁর এ সংস্কার আন্দোলন কুমিল্লাসহ বাংলাদেশের সর্বত্র ইসলামের পুনর্জাগরণের ঢেউ ওঠে। তাঁর এ আন্দোলন ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষিত সকল শ্রেণির মুসলমানদেরকে এক প্লাটফর্মে সমবেত করতে সক্ষম হয়।[১১৩] তন্মধ্যে তাঁর খলিফা প্রফেসর আবদুল খালেক সাহেব শাহ সুফী নেছারউদ্দিন আহমদ, মাওলানা রুহুল আমিন, এবং বিখ্যাত ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহিদুল্লাহর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, চারিত্রিক গুণাবলী, দার্শনিক যুক্তি এবং আধ্যাত্মিক শক্তি মানুষকে অভিভূত করে তোলে। বহু অমুসলিম তাঁর হাতে ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করে। বাংলা আসামসহ ভারতের লক্ষ লক্ষ মুসলমান তাঁর হাতে মুরিদ হন। উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীতে কুমিল্লা নোয়াখালী অঞ্চলে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রচার-প্রসারে এবং অত্র এলাকায় মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী পুনর্জাগরণ সৃষ্টিতে অনবদ্য অবদান রাখেন।

সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মতো আধুনিক প্রচার পদ্ধতিতে ফুরফুরা পীর সাহেব অবদান ব্যাপক। তাঁর প্রচেষ্টায় অনেক দ্বীনী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হয়। বিশ শতকের গোড়ার দিকে গ্রাম বাংলা স্বল্প শিক্ষিত মুসলিম জনসাধারণের কাছে অতিপ্রিয় 'মুসলিম হিতৈষি' পত্রিকার তিনি প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এছাড়াও তাঁর দীর্ঘ জীবনে তিনি মিহির ও সুধাকর, ইসলাম প্রচারক, নবনূর, ইসলাম দর্শন, হানাফী, মোহাম্মদী, শরীয়তে মোসলেম, ইসলাম, ছুন্নাতুল জামায়াত, হেদায়েত, সোলতান ইত্যাদি বহু পত্রিকার তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেন।[১১৪]

---

[১১১] জুলফিকার আহমদ কিসমতি, আজাদি আন্দোলনে সংগ্রামী ওলামাদের ভূমিকা, (ঢাকা : আল-ফালাহ.পা.২০০০খ্রি.), পৃ. ৬৬।

[১১২] জুলফিকার আহম্মদ কিসমতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

[১১৩] মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, খাজা আবদুল মজিদ শাহ : জীবন ও কর্ম, (ঢাকা:ই.ফা.বা.২০০১খ্রি.), পৃ. ৬৮।

[১১৪] জুলফিকার আহম্মদ কিসমতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-৩ : আরবী ও ইসলামী শিক্ষার বিস্তার

শিক্ষার পরিচিতি : শিক্ষা দ্বারা একটা জাতির মান নির্ণয় করা যায়। এ শিক্ষা এমন একটি অস্ত্র যা দিয়ে চিন্তা জগতের জয়-পরাজয় নির্ধারণ হয়ে থাকে। ইসলামী শিক্ষা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। এ শিক্ষার মধ্যে প্রতিটি মানুষের গোটা জীবনের সবসমস্যার সমাধান আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন ইসলাম একটি সার্বজনীন মানসম্পন্ন স্বীকৃত ধর্ম। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনিত দ্বীন হলো ইসলাম'।[১১৫] শিক্ষার আরবী প্রতিশব্দ হলো ইল্‌ম বা জ্ঞান এবং বিশেষ ক্ষেত্রে হিকমত বা কৌশল হিসেবেও এর প্রয়োগ হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন,

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভুত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান।[১১৬]

শিক্ষা শব্দটি সংস্কৃত 'শাস' ধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ শাসন, নিয়ন্ত্রণ বা আদেশ নিষেধ। শিক্ষা হলো অভ্যাস, চর্চা, অনুসরণ বা অনুশীলন দ্বারা কোনো বিষয় আয়ত্তে আনা। শিক্ষার অর্থ হচ্ছে একটি শিশুর শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নে তাকে লালন-পালন করা অথবা তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া অথবা নির্দেশ দেয়া। আভিধানিক অর্থে শিক্ষা মানে হচ্ছে- প্রকাশ করা বা প্রণোদিত করা। প্রকৃতপক্ষে Education শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Educare থেকে আগত, যার অর্থ হচ্ছে প্রকাশ করা। E মানে বাইরে এবং Duco অর্থ নীসা। শিক্ষার পদ্ধতির কৌশল বিবর্তনে আধুনিক শিক্ষকরা দ্বিতীয় উৎপত্তিকে বেছে নেয়।[১১৭] শিক্ষার অর্থ হচ্ছে অবগতি ও জ্ঞান প্রদান এবং এ বিষয়ে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ। দার্শনিক সক্রেটিস বলেন, মিথ্যার অপনোদন এবং সত্যের আবিষ্কারই শিক্ষা। প্লেটো বলেন, দেহ ও আত্মার পূর্ণতা সাধনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তাই হলো শিক্ষা। তিনি আরও বলেন, শিক্ষা মানে আত্মার লালন করা।

ইসলামী শিক্ষা বলতে মূলত তাওহীদ ভিত্তিক শিক্ষাকে বুঝায়। এ শিক্ষার মূল উৎস দু'টি; আল-কুরআন ও আল-হাদীস। এ দু'টি নীতি অনুসরণের মাধ্যমে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণীত হয়েছে এরই নাম ইসলামী শিক্ষা। আল কুরআন নাযিলের প্রথম আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা শিক্ষার কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)

পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।[১১৮]

---

১১৫ আল-কুরআন; সূরা আলে ইমরান : ১৯।

১১৬ আল-কুরআন; সূরা আল-বাকারা : ২৬৯।

117 Madhury R. Shah, Instruction in Education and Teaching Technology (New Delhi: Sumaiya Publications Pvt. Ltd, Bombay), P. 23.

১১৮ আল-কুরআন; সূরা আল-আলাক্ব : ১-৫।

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞান বা শিক্ষাই মানুষকে সত্য ও অসত্য ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, কল্যাণ-অকল্যাণ সম্পর্কে বুঝতে সাহায্য করে। অশান্তির পথ পরিহার করে শান্তির পথে অগ্রসর হতে অনুপ্রাণিত করে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য এবং মানবজাতির জন্য কল্যাণকর একমাত্র প্রমাণ সিদ্ধ, নির্ভরযোগ্য ও সর্বাধুনিক জীবন ব্যবস্থার নাম ইসলাম। শিক্ষাই জীবনের আলো, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। অবশ্যই জ্ঞান মহামূল্যবান সম্পদ যা মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ অবদান। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

আল্লাহ আপনার প্রতি ঐশী গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহর করুণা অসীম।[১১৯]

শিক্ষা সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেন-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ،

আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, প্রত্যেক মুসলমানের ওপর বিদ্যা অর্জন করা ফরজ।[১২০]

রাসূল (সা.) আরও বলেন,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

আবি দারদা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী।[১২১] প্রকৃতপক্ষে এ শিক্ষার শিক্ষক হলেন রাসূল মুহাম্মদ (সা.)। স্বাভাবিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সমন্বয় সাধনে এ ধারাবাহিকতাও তখন থেকে শুরু হয়। মহানবী (সা.) এর জীবদ্দশায় স্বয়ং তিনিই শিক্ষকের গুরু দায়িত্ব পালন করেন। আর সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন তাঁর ছাত্র। তাঁরা পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ করে জ্ঞান গরিমা ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হন।

ইসলামী শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান মহানবী (সা.) কর্তৃক প্রবর্তিত প্রতিষ্ঠান 'দারুল আরকাম'।[১২২] এ প্রতিষ্ঠানে মহানবী (সা.) নিজেই শিক্ষা দিতেন এবং পরবর্তীকালে নিয়মিতভাবে শিক্ষাদানের জন্য তিনি কতিপয় সাহাবীকে দায়িত্ব প্রদান করেন। ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক এ অবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় পদ্ধতিতে শিক্ষা ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক প্রবর্তিত ইসলামী শিক্ষার প্রচার প্রসার সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।[১২৩] ঠিক তেমনিভাবে বৃহত্তর কুমিল্লাসহ তথা সারা বাংলায় ইসলামের আগমনের প্রাথমিক অবস্থায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা ছিল ধর্মপ্রচার কেন্দ্র, খানকাহ ও মসজিদ কেন্দ্রিক। সুফী-সাধকগণ ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে তাঁদের খানকায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করেন। শুধু ইসলাম ধর্ম নয়, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষাও ছিল মন্দির,

---

১১৯ আল-কুরআন; সূরা আন-নিসা : ১১৩।

১২০ সুনান ইবনে মাযাহ, হাদীস নং-২০ (মাকতাবাতুস শামিলা), পৃ. ২৬০

১২১ সুনান আত-তিরমিযি, ৯ম খণ্ড, হাদীস নং-২৬০৬ (মাকতাবাতুস শামিলা), পৃ. ২৯৬

১২২ রাসূল (সা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশিষ্ট সাহাবী আরকাম ইবনে আবিল আরকাম (রা.)-এর বাড়িতে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মক্কায় নও-মুসলিমদের শিক্ষা দানের জন্য রাসূল (সা.) এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। (ড. আব্দুস সালাম হারুন, সিরাতে ইবনে হিশাম কুয়েত: দা.ব.ই. ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৪৯।

১২৩ ড. আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন, ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

গির্জা ও টোল কেন্দ্রিক। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম শাসনামলের সময় থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শুরু হয়। বাংলায় ও মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কার্যক্রম শুরু হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ প্রান্তে অথবা চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুতে কুমিল্লা জেলায় তুর্কী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কীদের আগমনের ফলে এ জেলার শিক্ষানীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। সম্ভবত এ জেলায় তখন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ এবং জেলার অধিবাসীদের অধিকাংশ ছিল ব্রাহ্মণ ধর্মাবলম্বী। এ হিন্দু অধিবাসীদের শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি বহিরাগত ও স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানদের নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থাও গড়ে ওঠেছিল। মুসলমানদের এ শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল মসজিদ কেন্দ্রিক। ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাধারণভাবে আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। সে সঙ্গে বাংলা ভাষা, গণিত ইত্যাদি ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল খুব সম্ভব পাঠশালা বা সে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এতে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ছেলেরাই শিক্ষা গ্রহণ করত। গুরুরা নিজগৃহে এসব শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করতেন।[১২৪] সুলতানী আমলে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছিল বলে প্রত্ন-প্রমাণে জানা যায়। তবে কুমিল্লা জেলায় সে ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল কিনা সে প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। কিন্তু কুমিল্লার পার্শ্ববর্তী ঢাকার সোনারগাঁয়ে শায়েখ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় অনন্য অবদান রাখে। পাঠান আমলেও শিক্ষা ক্ষেত্রে কোনো আমূল পরিবর্তন পাওয়া যায় না। সুলতানী আমলের ধারাই প্রচলিত থাকার সম্ভাবনা বেশি। মুঘল আমলেও সে ব্যবস্থায় কোনো নতুনত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

১২০৩-১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খলজির বঙ্গ বিজয় থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর অম্রকাননে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন এবং ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী লাভ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ছয়শ বছরের মতো বাংলাদেশ ছিল মুসলিম শাসনাধীন। মুসলমানদের মসজিদকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা বাংলাদেশেও তখন প্রবর্তিত হয় এবং কুমিল্লা জেলায়ও এর প্রভাব পড়ে। এ জেলার শিক্ষা ব্যবস্থায় তখন নতুনরূপ পরিগ্রহ করে। বিত্তশালীরা শিক্ষার জন্য নিষ্কর জমি ওয়াকফ ও লাখেরাজ সম্পত্তি দান করে নতুন নবীর স্থাপন করেন। এতে শিক্ষাব্যবস্থা প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের মিশনারি ম্যাক মূলারের জরিপ হতে তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থার একটি চিত্র পাওয়া যায়। এ জরিপে দেখা যায় বাংলাদেশ ভূখণ্ডেই তখন ৮০ হাজার মাদ্রাসা বিদ্যমান ছিল এবং প্রতি চারশ জন লোক অধ্যুষিত অঞ্চলে একটি প্রাথমিক মাদ্রাসা ছিল। মূলত এসব স্কুল ছিল মসজিদকেন্দ্রিক মক্তব-মাদ্রাসা, মন্দিরকেন্দ্রিক ছিল পাঠশালা আর পারিবারিক বিদ্যালয়। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক হান্টারও স্বীকার করেছেন যে, মুসলিম পারিবারিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে খানদানী মুসলমানগণ তাদের নিজেদের ছেলেমেয়েদের সাথে প্রতিবেশী গরীব অসহায় পরিবারের ছেলেমেয়েদেরকেও বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুধু প্রাথমিক শিক্ষাই দেওয়া হত না, বরং এগুলোর কোনো কোনোটিকে উচ্চশিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। এসবের পাশাপাশি 'ফার্সীয়ান' স্কুল নামে আর এক শ্রেণির বিদ্যালয় ছিল। রাষ্ট্রীয় ও অফিস আদালতের ভাষা ফার্সী হওয়ায় হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা ফার্সী ভাষা শিক্ষা লাভ করতো।[১২৫]

---

[১২৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৩।
[১২৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৪।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের অবস্থা দ্রুতগতিতে অবনতির দিকে ধাবিত হলে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর নতুন রাজস্বব্যবস্থা প্রবর্তনের ওসীলায় ব্রিটিশদের পাঁচসালা, দশসালা বন্দোবস্ত, সূর্যাস্ত আইন ইত্যাদির মাধ্যমে জায়গীরদারী, জমিদারী খুব দ্রুত হস্তান্তরিত হতে থাকে। আর ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে চূড়ান্ত আঘাত আসে। যার ফলে বহু মুসলমান স্বল্প সময়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এরপরও মুসলমানদের শাসন আমলে মাদ্‌রাসা শিক্ষায় জন্য প্রদত্ত ওয়াকফ, লাখেরাজ সম্পত্তি মাদ্‌রাসা মসজিদ এবং খানকাহর প্রদত্ত সম্পত্তির বদৌলতে মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা কিছুকাল পর্যন্ত চলতে থাকে। আর এসব প্রদত্ত সম্পত্তির পরিমাণও ছিল প্রচুর। কিন্তু এগুলোও ব্রিটিশদের নজর কাড়ে। আয়কর ক্ষুণ্ন হয় বলে ব্রিটিশ সরকার ১৮২৮-১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এসব লাখেরাজ ও ওয়াকফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণের মাধ্যমে ছিনিয়ে নেয়। ফলে মুসলমানদের শিক্ষার দ্বার বন্ধ হয়ে যায় এবং বেকার হয়ে যায় শিক্ষক সমাজ।

ব্রিটিশ কর্তৃক সর্বশেষ আঘাত করে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে উড-এর শিক্ষা ডেচপাচের নির্দেশে মসজিদকেন্দ্রিক মকতবের সরকারি সাহায্য বন্ধের মাধ্যমে। আরবী ও ইসলামী শিক্ষার দ্বার একেবারে চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার জন্যই ব্রিটিশরা এসব পরিকল্পনা করে। ব্রিটিশরা এদেশে তখন ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে। বৃহত্তর কুমিল্লাতেও এরূপ ইংরেজি শিক্ষার স্কুল স্থাপিত করে। কুমিল্লার মোঘলটুলিতে মুন্সী মিয়াজানের স্থাপিত প্রাইমারি বিদ্যালয়টি বঙ্গ বিদ্যালয় নাম দিয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করে। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা জেলা স্কুল স্থাপিত হয়। তবে এ চরম দুর্দিনের মুসলিম সমাজ বহু কষ্ট সাধন করে মসজিদকেন্দ্রিক আরবী ও ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখে।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিপ্লবের মূলে ছিল মুসলমান সমাজ। আর এর কারণ হিসেবে যখন নিপীড়ন অত্যাচার চরমভাবে মেতে ওঠে তখনই আলেম সমাজ ভারতকে দারুল হরব হিসেবে ঘোষণা করে এবং ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থা হারাম বলে ফতোয়া দান করেন। যার ফলে মুসলমানগণ ইংরেজি শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ে, আর হিন্দুরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে নবজাগরণে উদ্বুদ্ধ হয়। তাই এ সময় ইংরেজদের দমন নিপীড়ন নির্যাতনের মুখে মুসলমানদের আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া অপরিহার্য হয়ে ওঠে। শিক্ষা-দীক্ষায় হারানো পূর্ব গৌরব ও ঐতিহ্য ফিরে পাবার প্রাণান্তকর চেষ্টা চলে। যার ফলশ্রুতিতে দূরদর্শী মুসলিম শিক্ষাবিদ স্যার সৈয়দ আহমদ আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এর পূর্বেই এ উপমহাদেশে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ইসলামী তথা আরবী শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে ওঠে। সেগুলোর মধ্যে উপমহাদেশের আরবী মাদ্‌রাসার ইতিহাস আলোচনায় সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হন মাওলানা শিবলী নু'মানী। সে পথ ধরেই লাখনৌর নাদওয়াতুল উলামা ও আযমগড়ের দারুল মুসান্নিফিনের বড় বড় আলেম উলামার সৃষ্টি। তাঁদের মধ্যে সৈয়দ আব্দুল হাই বেরেলবী, সৈয়দ সোলায়মান নদভী, আবুল হাসান আলী নদভী প্রমূখ আরবী তথা ইসলামী শিক্ষার অবদান উল্লেখযোগ্য।[১২৬]

বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশের দিকে দিকে যুগে যুগে ইসলামী তথা আরবী শিক্ষার এসব কেন্দ্র গড়ে ওঠে যাতে মুসলিম শাসনের গোড়া থেকে তার ক্রান্তিলগ্ন পর্যন্ত প্রায় ৭০০ বছর ধরে ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত থাকে। ব্রিটিশ আমলেও উপমহাদেশের ইসলামী তথা আরবী শিক্ষা-ধারায় ভাটা পড়েনি, বরং এদেশে ব্রিটিশ সরকারের আমদানিকৃত ইউরোপীয় সভ্যতায় পরশ লেগে তা আরও সঞ্জীবনী শক্তি লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সাহারানপুর জেলায় ১৮৬৬

---

[১২৬] প্রাগুক্ত, (কু.জে.ই.), পৃ.৩০১-৩০৪।

Dhaka University Institutional Repository

খ্রিস্টাব্দে মাযাহিরুল উলুম মাদারাসা; সে জেলার অন্তর্গত ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে দারুল উলূম দেওবন্দ মাদারাসা; রিয়াসাতে রামপুরে রামপুর মাদ্রাসা এবং লাখনৌতে নাদওয়াতুল উলামা কর্তৃক ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে দারুল উলূম মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উত্তর ভারতে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে জামিয়া-এ মিল্লিয়া, ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের হাটহাজারী মুঈনুল ইসলাম মাদ্রাসা, ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে সিলেট আলিয়া মাদ্রাসা, ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম দারুল উলূম মাদ্রাসাসহ অসংখ্যা দ্বীনী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

এদেশের মাতৃভাষা আবহমান কাল থেকেই বাংলা এবং এ ভাষা উপমহাদেশে অন্যান্য অংশের, অন্তত উত্তর ভারতের মাতৃভাষার তুলনায় আরবী ভাষা থেকে অনেকটা স্বতন্ত্র। তা সত্ত্বেও এদেশের বিভিন্ন অঞ্চল গৌড়, পাণ্ডুয়া, বিহার, মঙ্গলকোট, কলকাতা, ঢাকা, সোনারগাঁও, চট্টগ্রাম, হাটহাজারী ও বৃহত্তম কুমিল্লাতে আরবী-ফার্সী ভিত্তিক অনেক ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে ওঠে এবং সেগুলো থেকে হাজার হাজার বিজ্ঞ আলেম উলামার সৃষ্টি, যারা আরবী, উর্দু, ও ফার্সী ভাষার শত শত ইসলামী সাহিত্য গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে অসামান্য অবদান রাখেন।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বৃহত্তম কুমিল্লা জেলার আলেমগণের অবদান

পরিচ্ছেদ -১ : কুমিল্লার আলেমগণ	৫০-১৫০
পরিচ্ছেদ-২ : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আলেমগণ	১৫১-১৩৮
পরিচ্ছেদ-৩ : চাঁদপুরের আলেমগণ	২৩৯-২৭৫

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বৃহত্তম কুমিল্লা জেলার আলেমগণের অবদান

পরিচ্ছেদ-১ : কুমিল্লার আলেমগণ

পরিচ্ছেদ-১.১ : হাফেজ মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী (রহ.) (১৯০০-১৯৬৪ খ্রি.)

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। বস্তুত আল্লাহর ইবাদত করার জন্যই মানুষের সৃষ্টি। মানুষকে এ মহাসত্য কথাটি স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। নবীগণের সে ধারাবাহিক দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে ঐশী প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে আলেমগণ যুগে যুগে শিক্ষার আলোকবর্তিকা হাতে ধারণ করে দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। আর তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেন অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকা, যার মাধ্যমে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তার লাভ করতে থাকে। এ ধারাবাহিকতায় তাঁদের সার্থক উত্তরসূরি হিসেবে আবির্ভূত হন হাফেজ মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী (রহ.) তিনি বৃহত্তম কুমিল্লাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা এবং সঠিক আধ্যাত্মিক শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়ে মানুষকে কুসংস্কার ও অনৈসলামিক চালচলন থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখেন। যা বাংলাদেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে।

হাফেজ মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী (রহ.) ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে[১২৭] বর্তমান কুমিল্লা জেলার তৎকালীন ত্রিপুরার মুরাদনগর উপজেলার সোনাকান্দা গ্রামের[১২৮] ঐতিহ্যবাহী গাজী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী (রহ.)-এর পিতা শাহ্ সুফী গাজী আফসার উদ্দিন মুন্সি ছিলেন মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহ.) (১৮০০-১৮৭৩খ্রি.)[১২৯] এর সুযোগ্য পুত্র মাওলানা হাফেজ আহমাদ জৌনপুরী (রহ.)-এর বিশিষ্ট মুরিদ। প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন তাঁর পিতা গাজী আফসার উদ্দিন মুন্সির নিকট। খুব স্বল্প সময়ে কুরআনের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে শ্রীকাইল গ্রামের ঘট্যা ঠাকুরের নিকট বাংলা, অংক ও ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেন। সে সময় আলিয়া ও কওমি মাদ্রাসায় প্রথমে ফার্সী কিতাবসমূহ পড়ানো হতো।[১৩০] তাই তিনি জনাব আশরাফ মুন্সির[১৩১] নিকট

---

১২৭ প্রাগুক্ত, (কু.জে.ই.), পৃ. ২৪৩।

১২৮ সোনাকান্দা এলাকাটি কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার একটি নিচু জলাভূমি। আবদুর রহমান হানাফী (রহ.)-এর দাদা গাজী আলী প্রথম এ এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করেন। (আব্দুর রহমান হানাফী (র.), আনিসুত তালেবীন, ৫ম খণ্ড, (ঢাকা: রূপালী প্রিন্টিং লি., ১৩৪৫ বা.), পৃ. ২৩৯।)

১২৯ মাওলানা কারামত আলী (রহ.) ভারতের উত্তর প্রদেশের জৌনপুরী শহরের মোল্লাটোলা মহল্লায় ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম আলী, পিতার নাম আবু ইব্রাহীম। তিনি পবিত্র মক্কা শরীফে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন, সাইয়েদ আহমদ (রহ.) থেকে খেলাফত লাভ করেন এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সফর করেন। আর তিনি যেখানেই যেতেন সেখানেই মাদ্রাসা-মসজিদ স্থাপনের চেষ্টা করতেন। বিশেষ করে নোয়াখালী-কুমিল্লা অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য বেশ কয়টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তিনি ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। (এম.এ.সাঈদ, তারীখুল ইসলাম, (ঢাকা: ফাতাহ পাবলিকেশন, ২০০৮খ্রি.), পৃ. ৪০৭।)

১৩০ বর্তমান দরসে নিজামী বা কওমী মাদ্রাসার নেছাবের মতো।

১৩১ জনাব আশরাফ মুন্সি মালাই বাঙ্গরা বাজারের পার্শ্ববর্তী বাড়ির অধিবাসী ছিলেন। এটি সোনাকান্দা হতে প্রায় ৩/৪ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত।

Dhaka University Institutional Repository

কয়েক বছর ফার্সী ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের প্রাথমিক কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন। এরপর 'চৈনপুর'[১৩২] মাদ্রাসার ওস্তাদদের তত্ত্বাবধানে থেকে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহের জ্ঞান লাভ করেন এবং মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত চান্দিনা উপজেলার হারং মাদ্রাসায়।[১৩৩] সেখানে মাওলানা ইদ্রিস সাহেবের[১৩৪] তত্ত্বাবধানে জামা'আতে পাঞ্জাম পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। অতঃপর ঢাকার তৎকালীন ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা হাম্মাদিয়া মাদ্রাসায়[১৩৫] জামা'আতে চাহারামে ভর্তি হয়ে জামা'আতে উলা পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। প্রথম শ্রেণির বৃত্তি নিয়ে সুনামের সাথে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে হাম্মাদিয়া মাদ্রাসায় পড়ালেখা শেষ করেন। বাড়িতে আসার পর পিতার নির্দেশক্রমে নোয়াখালীর দৌলতপুর গিয়ে প্রখ্যাত বুযুর্গ, আলেম ও ক্বারী মাওলানা ইব্রাহীম (রহ.)(১৮৬৩-১৯৪৩খ্রি.)[১৩৬] এর নিকট দু'বছর ইল্‌মুল ক্বিরা'আতে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। উচ্চশিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৩৫ খ্রি. আরব দেশে সফর করেন এবং জীবনের প্রথম হজ্জ পালন করে মদিনা মুনাওয়ারায় গমন করেন। মদীনা শরীফের প্রখ্যাত আলিম, হাফিজ, ও বুযুর্গ শায়েখ দাউদ আফরুন্দী সাহেবের নিকট কুরআনে কারীমের হিফ্‌জ শুরু করেন। যিলহজ্জ মাসের ২০/২৫ তারিখ হতে পরবর্তী বছরের শা'বান মাস পর্যন্ত মাত্র ৮ মাস কয়েকদিনে ১৮ পারা হিফ্‌জ করেন। বাকী ১২ পারা খুব অল্প সময়ে মক্কা শরীফের প্রখ্যাত হাফেজ শায়েখ আবদুল হক সাহেবের নিকট হিফ্‌জ সমাপ্ত করেন।[১৩৭] অতঃপর সেখানকার প্রসিদ্ধ আলেমদের নিকট ইল্‌মুত তাফসীর, ও ইল্‌মুল হাদীসের উচ্চশিক্ষা লাভ করে দ্বিতীয় বার হজ্জ পালন শেষে ১৯৩৮ খ্রি. দেশে ফিরে আসেন। জীবনে সর্বমোট চারবার হজ্জ পালন করেন এবং চতুর্থবার ১৯৫৭ খ্রি. স্ত্রীসহ পবিত্র হজ্জ আদায় করেন।[১৩৮] মাওলানা আবদুর রহমান আরব দেশ ভ্রমণকালে বিভিন্ন মাযহাবের লোকদের সাথে উঠাবসা করায় নিজ মাযহাবের প্রতি তাঁর আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পায়। পবিত্র মক্কা, মদীনা ও বায়তুল মুক্বাদ্দাস ভ্রমণের পর যখন বাগদাদ ভ্রমণে যান, তখন তিনি ইমামে 'আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর পবিত্র মাযারও যিয়ারত করেন। মাযার যিয়ারত করার পর ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাঁর মাযহাবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির ফলে তিনি তাঁর নামের শেষে হানাফী শব্দ সংযুক্ত করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে তিনি হানাফী উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[১৩৯] তিনি জামা'আতে শশম বা পাঞ্জাম[১৪০] তথা মাধ্যমিক শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে টনকী[১৪১] নিবাসী জনাব মুন্সি আহসান উল্লাহ সরকারের কন্যা সাহেরা খাতুনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর উরশে চার ছেলে এবং পাঁচ মেয়ে জন্মগ্রহণ

---

[১৩২] সোনাকান্দা থেকে সোজা ৪/৫ মাইল পূর্ব-দক্ষিণে মুরাদনগর উপজেলাধীন একটি গ্রাম।

[১৩৩] চান্দিনা হতে এক মাইল দক্ষিণে এখনও মাদ্রাসাটি বিদ্যমান আছে।

[১৩৪] মাওলানা ইদ্রিস সাহেব মুরাদনগর উপজেলাধীন পরমতোলা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

[১৩৫] হাম্মাদিয়া মাদ্রাসা ঢাকার বংশাল রোডের নিকট অবস্থিত। এটি পরবর্তীতে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে হাই স্কুলে পরিণত হয়। প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান নাম হাম্মাদিয়া উচ্চবিদ্যালয়। ছারছীনার পীর মাওলানা নেছার উদ্দিন আহমদসহ বহু খ্যাতনামা ইসলামিক পণ্ডিতগণ এ হাম্মাদিয়া মাদ্রাসা হতে শিক্ষালাভ করেন। (হাম্মাদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের বর্তমান হেড মাওলানা মুহা. বেলায়েত হোসেন হতে ১০.০৮.২০১৬ খ্রিস্টাব্দে সাক্ষাত সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য।)

[১৩৬] ক্বারী ইব্রাহীম সাহেব পরবর্তীতে কুমিল্লা জেলার কচুয়া উপজেলার উজানীতে এসে বসতি স্থাপন করেন এবং সেখানে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যা বর্তমানে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত উন্নীত।

[১৩৭] আব্দুর রহমান হানাফী (র.), আরবের সফরনামা, (ঢাকা: রূপালী প্রিন্টিং লি., ১৩৫২ বা.), পৃ. ২১।

[১৩৮] আব্দুর রহমান হানাফী (র.), চার তরিকার অজিফা ও শাজরাহ, (ঢাকা: রূপালী প্রিন্টিং লি., ১৩৯৫ বা.), পৃ. ৫৬-৫৭।

[১৩৯] ড. মো: আবু ছালেহ পাটোয়ারী, হাফেজ মাওলানা আব্দুর রহমান হানাফী (র.): ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সংস্কারে তাঁর অবদান, (ঢাকা: ই.ফা.বা., ২০১৩খ্রি.), পৃ. ১১৯

[১৪০] বর্তমানে নবম দশম শ্রেণি।

[১৪১] সোনাকান্দা হতে ৫/৬ মাইল পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত একটি গ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

করে। তাঁরা হলেন- মোসাম্মৎ ফাতেমা খাতুন, আব্দুল আউয়াল[১৪২], মোসাম্মৎ জাহেরা খাতুন, মোসাম্মৎ জমিলা খাতুন, মোসাম্মৎ জোবেদা খাতুন, আবু বকর মো. শামসুল হুদা, আবু সাঈদ সুলতান আহমদ, সকিনা খাতুন, ও আবু নাসের মো. আব্দুল কুদ্দুস। তিনি ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে যুগশ্রেষ্ঠ আলেম আবু বকর সিদ্দিক ফুরফুরাভী (রহ.) (১৮৪৬-১৯৩৮খ্রি.)[১৪৩]-এর নিকট বাই'আত গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে খেলাফত লাভ করেন। এবং বাগদাদ ভ্রমণকালে মাওলানা সাইয়েদ আহমদ শরফুদ্দিন আল কাদেরী সাহেবের নিকট দ্বিতীয়বার বাই'আত গ্রহণ করে কাদেরিয়া তুরীকার খেলাফত লাভ করেন।[১৪৪] ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ১৮ মে রোজ সোমবার দুপুর ১টা ২০ মিনিটে ঢাকার শাহজাহানপুরস্থ দারুল আবরার খানকা শরীফে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর।[১৪৫]

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে হাফেজ মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী (রহ.)-এর অবদান

হাফেজ মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী (রহ.) পুরো জীবনটাই ইসলামের প্রচার-প্রসারে অতিবাহিত করেন। সমাজের মানুষকে আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসার করাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। কুরআন ও হাদীস ইসলামী শিক্ষার মুল উৎস। কুরআন-হাদীস বুঝার জন্য আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণ জানা একান্ত অপরিহার্য। এ উদ্দেশ্য বাস্তাবায়নের জন্য তিনি অনেকগুলো দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তিনি চিন্তা করলেন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়া তাঁর এ মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন অসম্ভব। কেননা ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাসূল (স.) হযরত যায়দ বিন আরকাম (রা.) (মৃত্যু ৬৮ হি.) এর বাড়িতে "দারুল আরকাম" নামে একটি দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। দ্বিতীয় হিজরিতে হযরত মাখরামাহ ইবনে নওফেল (রা.) (মৃত্যু ৫৪ হি.) নামক আনসারী সাহাবীর বাড়িতে "দারুল কুররা" নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। প্রতিষ্ঠানটি ছিল আবাসিক।[১৪৬] তাই ইসলামের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে যোগ্য, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও আদর্শবান দা'য়ী তৈরির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য। কেননা প্রত্যেক যুগেই ইসলামের দা'য়ীগণ ইসলামের প্রচারের জন্য দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দশক থেকে কোলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার আদলে বাংলাদেশে মাদারাসা প্রতিষ্ঠার যাত্রা শুরু হয়। এ ধারাবাহিকতায় মাওলানা আব্দুর রহমান হানাফী (রহ.) বৃহত্তর কুমিল্লাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বহু মাদ্রাসা,[১৪৭] মসজিদ, মক্তব ও খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান পেশ করা হলো-

---

[১৪২] বড় ছেলে মো. আব্দুল আউয়াল কিশোর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

[১৪৩] শাহ্ সুফী আবু বকর সিদ্দিক ফুরফুরাভী (রহ.) ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা আবদুল মুক্তাদির ও মাতার নাম মহাব্বতুন নেসা। ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তাঁর উর্ধ্বতন পুরুষ বলে সিদ্দিক বলা হয়। তিনি বাগদাদ হতে ইসলাম প্রচারের জন্য ভারতের হুগলী জেলায় আগমন করেন, যিনি কতুবুল ইরশাদ শাহ্ সুফী সৈয়দ ফতহে আলী (রহ.)-এর খলিফা ছিলেন। তিনি ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। (ড. আ.ফ.ম.আলী হায়দার, শিক্ষা বিস্তার ও সংস্কারে ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিক (রহ.), (ঢাকা: ই.ফা.বা., ২০১০খ্রি.), পৃ. ৩-৬।)

[১৪৪] আব্দুল্লাহ মামুন আরিফ আল-মান্নান, ফুরফুরার ইতিহাস, (ঢাকা : ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ২০০৫খ্রি.), পৃ. ১১৬

[১৪৫] প্রাগুক্ত, (কু.জে.ই.), পৃ. ২৪৩।

[১৪৬] অধ্যক্ষ মো. আলমগীর, ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি, (ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৯৮৭খ্রি.), পৃ. ১২।

[১৪৭] কুমিল্লা জেলার সর্বপ্রথম প্রাচীন মাদ্রাসা যা দরসে নেজামী নেসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তা হলো 'জামেয়া মিল্লিয়া' মাদ্রাসা। নওয়াব হোছাম হায়দার চৌধুরী ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান কুমিল্লা শহরের সৈয়দ বাড়িতে মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। মাওলানা আলাউদ্দিন আলী আজহারী, মাওলানা আতাহার আলি এবং মাওলানা তাজুল ইসলাম এ তিন বিখ্যাত আলেম এ

Dhaka University Institutional Repository

খামার গ্রামে মাদ্‌রাসা, মসজিদ, ঈদগাহ্ স্থাপন ও দ্বীনী শিক্ষা প্রদান : হাফেজ মাওলানা আব্দুর রহমান হানাফী (রহ.) জামা'আতে উলা (বর্তমান ফাযেল) পাস করার পর ওস্তাদগণ তাঁকে হাম্মাদিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করার জন্য প্রস্তাব দেন। এ ব্যাপারে তিনি পিতার সাথে পরামর্শের উদ্দেশ্যে বাড়িতে আসলে পার্শ্ববর্তী আটাশ[১৪৮] নামক গ্রামে হাজী বশির উদ্দিন সাহেবের বাড়িতে আগত কয়েকজন আলেমের সাথে সাক্ষাৎ করেন। বিজ্ঞ আলিমগণ ও রসুলপুর গ্রামের মৌলভী বক্স আলী সাহেবের পরামর্শে হাম্মাদিয়া মাদ্‌রাসায় না গিয়ে ১৯২৬ খ্রি. খামার গ্রামে বর্তমান দাখিল মাদ্‌রাসার[১৪৯] ভিত্তি স্থাপন করেন এবং নিজেই শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন।[১৫০] ছাত্ররা যাতে কুরআন, হাদীস ও ফিকহশাস্ত্র সহজে বুঝতে পারে এ জন্য মাওলানা আব্দুর রহমান হানাফী (রহ.) আরবী ভাষা ও সাহিত্য পড়ানোর প্রতি বিশেষ নজর দিতেন এবং এলাকার সাধারণ মানুষকে দ্বীনী শিক্ষা, ইসলামী তাহযীব তামাদ্দুন সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে মাদ্‌রাসা সংলগ্ন একটি মসজিদও প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রতি শুক্রবার জুমু'আর খুৎবা উপলক্ষে সাধারণ মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা-মাসাইল আলোচনা করতেন। এভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে শরীয়ত ও ত্বরীকতের শিক্ষা দান করে অত্র এলাকায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে অতুলনীয় অবদান রাখেন এবং মাদ্‌রাসার ময়দানে একটি ঈদগাহও প্রতিষ্ঠা করেন।[১৫১]

সোনাকান্দা দারুল হুদা বহুমুখী কামিল মাদ্‌রাসা কমপ্লেক্স স্থাপন : মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী (রহ.) ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে আরবদেশ সফর করার পর দেশে এসে নিজ এলাকাসহ সকল মুসলমানদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অবস্থা দেখে খুবই ব্যথিত হন। অতঃপর ইসলামের প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে সোনাকান্দা দারুল হুদা বহুমুখী কামিল মাদ্‌রাসা কমপ্লেক্স স্থাপন করেন। সেখানে তিনি পর্যায়ক্রমে মাদ্‌রাসা, মসজিদ, হিফ্‌জখানা, কুতুবখানা, লিল্লাহ বোর্ডিং, খানকায়ে সিদ্দিকীয়া ও মুসাফিরখানা স্থাপন করেন। অত্র প্রতিষ্ঠানসমূহের ভিত্তি স্থাপনের জন্য তিনি সর্বপ্রথম নিজ পৈতৃক সম্পত্তি হতে এক একর এগার শতাংশ জমি দান করেন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রথমত হাফিজিয়া ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং তিনি নিজেই এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। পর্যায়ক্রমে মাদ্‌রাসাটি উন্নতির দিকে ধাবিত হতে থাকে[১৫২]। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে উক্ত মাদ্‌রাসাটি দাখিল, ১৯৫৮ খ্রি. আলিম, ১৯৬০ খ্রি. ফাযেল শ্রেণির অনুমতি লাভ করে এবং ১৯৬৪ খ্রি. মাদ্‌রাসা বোর্ডের রেজিস্ট্রার ও পূর্ব-পাকিস্তানের মুফতীয়ে আযম আল্লামা সাইয়েদ মুহাম্মদ

প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে মাদ্‌রাসাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে জুনিয়র শিক্ষক মাওলানা মো. জাফর মাদ্‌রাসাটি লাকসাম রোডে স্থানান্তরিত করেন এবং তিনি অত্র মাদরাসায় অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। বর্তমানে এর নাম কাসেমুল উলূম মাদ্‌রাসা। ১৯৪২খ্রিস্টাব্দে নতুন করে মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে । (কু.জে.ই.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৬।

১৪৮ সোনাকান্দা হতে ৫/৬ মাইল সামান্য দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটি গ্রাম।

১৪৯ খামার গ্রামের মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠায় কারণ সম্পর্কে পীর সাহেবের বিশিষ্ট খলিফা এবং দরবারের প্রাক্তন সেক্রেটারি মাওলানা আলী আকবর লেখেন- "বহুকাল যাবৎ উত্তর কুমিল্লায় ইসলামী তাহজীব-তমুদ্দুনের দুরবস্থা চলে আসছিল। সে দুরবস্থার কঠিন ব্যাধি মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে জর্জরিত করে ফেলেছিল। অত্র এলাকার মুসলিম সমাজের এরূপ দুর্দিন ও দুরবস্থা অনুধাবন করে মাওলানা আবদুর রহমান কোন পন্থা অবলম্বন করলে এতদাঞ্চলের মুসলিম সমাজকে অপসংস্কৃতি আর অনৈসলামীক কার্যকলাপ হতে হেদায়েতের আলোর দিকে পরিচালিত করা যায়। তাই তিনি তাঁর শিক্ষাজীবন শেষ করে খামার গ্রামে মাদ্‌রাসায় ভিত্তি স্থাপন করেন এবং দ্বীনের আলো বিতরণে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যায়।" ড. মোঃ আবু ছালেহ পাটোয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।

১৫০ আব্দুর রহমান হানাফী (র.), চার তরিকার অজিফা ও শাজরাহ, (ঢাকা: রূপালী প্রিন্টিং লি., ১৩৯৫ বা.), পৃ. ৫৭

১৫১ ড. মোঃ আবু ছালেহ পাটোয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৮

১৫২ চার ত্বরিকার অজিফা ও শাজারা; প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬১।

Dhaka University Institutional Repository

আমিমুল ইহসান (রহ.) (১৯১১-১৯৭৪খ্রি.)[১৫৩] ও শিক্ষামন্ত্রী জনাব মফিজউদ্দিন আহমদের সুপারিশক্রমে সোনাকান্দা আলিয়া মাদ্রাসাটি কামিল হাদীস বিভাগের অনুমতি প্রাপ্ত হয়।[১৫৪] পরবর্তীতে ১৯৮৮ খ্রি. ফিকহ বিভাগ, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে তাফসীর বিভাগ ও আদব বিভাগের অনুমতি লাভ করে। বর্তমানে মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা প্রায় ১০০০ এরও উর্ধ্বে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত ছাত্র ও বিশেষত গরীব ছাত্রদের অল্প ও ফ্রি খরচে শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে লিল্লাহ বোর্ডিং প্রতিষ্ঠা করেন। অধিকাংশ সময় এ লিল্লাহ বোর্ডিংয়ের খরচ তিনি নিজেই বহন করতেন। বর্তমানে এ লিল্লাহ বোর্ডিং-এ প্রায় তিনশত ছাত্র নিয়মিতভাবে ফ্রি ও অল্প খরচে কুরআন- হাদীসের জ্ঞান লাভ করছে। তাছাড়া মাদ্রাসার ছাত্রদের বিনামূল্যে কিতাব প্রদানের জন্য একটি কুতুবখানাও প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে অসংখ্য তাফসির, হাদীস, ফিকহ ও আরবি সাহিত্যের গ্রন্থসহ বিভিন্ন বিষয়ের মূল্যবান কিতাব রয়েছে। যার বর্তমান মূল্য প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। তাঁর সুযোগ্য পুত্র আবু বকর মোহাম্মদ শামসুল হুদা (রহ.) পরবর্তীতে এটিকে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরিতে পরিণত করেন। দারুল হুদা দরবার শরীফে খানকায়ে সিদ্দিকায়ে নামে একটি খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন, যাতে মাদ্রাসার ছাত্র এবং আগত মুসলমানরা শরীয়তের ইলমের সাথে সাথে মা'রিফাতের ইল্মও লাভ করতে পারে এবং বিভিন্ন স্থান হতে আগত লোকদের সুবিধার্থে দরবারে একটি মুসাফিরখানা প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তাদের ফ্রি থাকা-খাওয়া ব্যবস্থাও রয়েছে।[১৫৫] মাদ্রাসার ছাত্রসহ এলাকার মুসলমানগণের নিয়মিত জামা'আতের সাথে নামায আদায়ের সুবিধার্থে মাদ্রাসা সংলগ্ন একটি মসজিদ স্থাপন করেন। অত্র কমপ্লেক্সে প্রতি বছর ১৪ ও ১৫ই ফাল্গুন বার্ষিক ইছালে ছাওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাহফিল ও মাদ্রাসা পরিদর্শনের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে অনেক আলেম-ওলামা ও বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ মাহফিলের ওয়াজ নসিহত শুনে নিজের এসলাহের জন্য দরবারে আগমন করেন।[১৫৬]

সোনাকান্দা প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠা: তিনি এলাকার ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার কথা চিন্তা করে ফোরকানিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

দ্বীমুড়া রহমানিয়া ফাযেল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা : আবদুর রহমান হানাফী (রহ.)-এর নির্দেশনায় তাঁর বিশিষ্ট খলিফা হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলার দ্বীমুড়া গ্রামের মাওলানা মোহাম্মদ আসগর আলী সাহেবের বাড়িতে দ্বীমুড়া রহমানিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠানটি তাঁর নির্দেশে প্রতিষ্ঠা হওয়ায় তাঁর নামের সাথে যুক্ত করে মাদ্রাসার নাম "দ্বীমুড়া রহমানিয়া মাদ্রাসা" নামকরণ করা হয়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ফাযেল পর্যন্ত উন্নতি লাভ করে দ্বীনী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

মহিষারকান্দি রহমানিয়া দাখিল মাদ্রাসা স্থাপন : কিশোরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত মিঠামইন উপজেলায় অবস্থিত মহিষারকান্দি গ্রামে "মহিষারকান্দি রহমানিয়া দাখিল মাদ্রাসাটি" অবস্থিত। কিশোরগঞ্জের এ ভাটি অঞ্চলে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার আলো ছড়ানোর উদ্দেশ্যে তাঁর শিষ্য মাওলানা মতলুব উদ্দিন

---

[১৫৩] মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান মোজাদ্দেদী বরকতী (রহ.)। তাঁর পিতার নাম হাকিম সাইয়েদ আব্দুল আজীম মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান। তিনি ভারতের মুঙ্গির জেলার অন্তর্গত পাঁচনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশ পরম্পরা সাইয়েদ বিন আলী বিন হোসাইন ও ফাতেমা বিনতে রাসূলুল্লাহ (স.) পর্যন্ত সমাপ্ত হয়। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ আরবদেশ থেকে উপমহাদেশে আগমন করেন। তিনি ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাসা-ই-আলিয়াতে হেড মুদাররেছ এবং ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতীব হিসেবে নিযুক্ত হন। (জুলফিকার আলী কিসমতি, বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর-মাশায়েখ, (ঢাকা: প্রগতি প্রকাশনী, ১৯৮৮খ্রি.), পৃ. ২০৮-২১২।)

[১৫৪] চার তরিকার অজিফা ও শাজারা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

[১৫৫] আলহাজ্জ আব্দুল হক মাস্টার, খলিফা, কিশোরগঞ্জ হতে ২৮ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে হতে প্রাপ্ত তথ্য।

[১৫৬] ড. মোঃ আবু ছালেহ পাটোয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০।

Dhaka University Institutional Repository

সাহেব হানাফি (রহ.)-এর পরামর্শে তাঁর বাড়িতে মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। পীর সাহেব (রহ.)-এর পরামর্শে মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা হওয়ায় তাঁর নামে নামকরণ করা হয়। বর্তমানে মাদ্রাসার সাথে একটি নূরানী ও হিফজ বিভাগ চালু রয়েছে।

পুবাইল রহমানিয়া দাখিল মাদ্রাসা স্থাপন : দ্বীনী শিক্ষা প্রচারের লক্ষ্যে গাজীপুর জেলার টঙ্গী উপজেলার পুবাইল গ্রামে তাঁর ভক্তবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতায় একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এলাকাবাসী তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা করে মাদ্রাসাটির নামকরণ করেন 'পুবাইল রহমানিয়া দাখিল মাদ্রাসা'। অত্র এলাকায় এ প্রতিষ্ঠানটি শরীয়ত ও তরিকতের প্রচার-প্রসারের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

অলুয়া ইসলামীয়া সিনিয়র মাদ্রাসা স্থাপন : কুমিল্লা জেলার বর্তমান ব্রাহ্মণপাড়ার অলুয়া গ্রামে তাঁর ছাত্র, শিষ্য ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আলহাজ্জ আবদুল খালেক ভূঞার মাধ্যমে "অলুয়া ইসলামীয়া সিনিয়র মাদ্রাসা" স্থাপন করেন এবং তিনি নিজেই অত্র প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। বর্তমানে এটি আলিম পর্যন্ত চালু আছে, সেই সাথে একটি হিফজ বিভাগও চালু রয়েছে।

কুমিল্লা আলিয়া মাদ্রাসা স্থাপন : কুমিল্লা চকবাজার আলিয়া মাদ্রাসার প্রথম প্রস্তাবক ছিলেন হাফেজ মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী (রহ.)।[১৫৭] তাঁর পরামর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী হাজী হারুনুর রশীদ ও হাজী আবদুস সালাম "চকবাজার আলিয়া মাদ্রাসা" প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে আসেন। অতঃপর ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় কামিল হাদীস ও ফিকহ বিভাগ চালু রয়েছে।

গাজীমুড়া আলিয়া মাদ্রাসার কামিল মঞ্জুরিকরণ : গাজীমুড়া আলিয়া মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৫ খ্রি.। কিন্তু মাদ্রাসাটির কামিল শ্রেণির মঞ্জুরি না থাকায় হানাফি (রহ) এর মুরিদ তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী মফিজ উদ্দিন আহমাদকে গাজীমুড়া মাদ্রাসাটিকে কামিল ক্লাসের মঞ্জুরির জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। তাঁর অনুরোধক্রমে গাজীমুড়া মাদ্রাসা কামিল ক্লাসের মঞ্জুরি লাভ করে।[১৫৮] বর্তমানে অত্র মাদ্রাসায় প্রায় ১৫০০ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত আছে।[১৫৯]

পরমতলা ফাযেল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা : কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার অন্তর্গত পরমতলা ফাযেল মাদ্রাসাটি একটি ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা। মাওলানা ইদ্রিস সাহেব পরমতলা মাদ্রাসাটি প্রথমত প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে এ মাদ্রাসার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করেন তাঁর স্নেহভাজন ছাত্র মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী (রহ.)-কে। তিনি দায়িত্ব পেয়ে মাদ্রাসাটি নতুনভাবে ঢেলে সাজান এবং মাদ্রাসার সকল কার্যক্রম সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন।

শ্রীকাইল কলেজ পুনঃচালুকরণ : ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলে কলেজের ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিভিন্ন আন্দোলনের কারণে শ্রীকাইল কলেজের মঞ্জুরি বাতিল হয়ে যায়। দীর্ঘ প্রায় তের বছর পর্যন্ত এ কলেজটি বন্ধ থাকে। এলাকাবাসী ও ছাত্ররা আবদুর রহমান হানাফী (রহ.)-এর নিকট কলেজটি পুনরায় চালু করার জন্য তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর কাছে অনুরোধের জন্য বিনীতভাবে প্রার্থনা করেন। অবশেষে তাঁর অনুরোধক্রমে ১৯৬৩ খ্রি. শিক্ষামন্ত্রী জনাব মফিজ উদ্দিন আহমাদ শ্রীকাইল কলেজটি পুনরায় চালু করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার দ্বার খুলে দেন।[১৬০]

---

[১৫৭] আলহাজ্জ আব্দুল হক মাস্টার, কলিকা, কিশোরগঞ্জ হতে ২৮ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে হতে প্রাপ্ত তথ্য।

[১৫৮] ড. মোঃ আবু ছালেহ পাটোয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০।

[১৫৯] গাজীমুড়া আলিয়া মাদ্রাসাটি দক্ষিণ কুমিল্লার লাকসাম উপজেলাধীন একটি ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা।

[১৬০] ড. মোঃ আবু ছালেহ পাটোয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ের ওপর প্রকাশনার মাধ্যমে অবদান

মাওলানা আব্দুর রহমান হানাফী (রহ.) বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর ভক্ত মুরিদদের মাঝে দ্বীনী তা'লিম প্রদানের সাথে সাথে ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ের ওপর বই রচনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি চিন্তা করলেন শরীয়তের কোন জটিল ও কঠিন বিষয়ের ইসলাম ভিত্তিক সুষ্ঠু সমাধানের জন্য শিক্ষকতা, দ্বীনী প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে সমাধান হলেও এর স্থায়ী ও সুদূর প্রসারী সমাধানের জন্য এসব বিষয়ে গ্রন্থ রচনা একান্ত আবশ্যক। তাই তিনি ১৯৩৮ খ্রি. আরব সফর শেষে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বই রচনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এদেশে ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশৃঙ্খলা দেখে তাঁর স্বীয় অভিজ্ঞতা বর্ণনাসহ সমাজের বিভিন্ন কুসংস্কার রোধ ও সঠিক ইসলামী আদর্শ প্রচারের কথা চিন্তা করে অন্যান্য সংস্কারমূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি মূল্যবান কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তথা আকাইদ, ইবাদত, মোয়ামেলাত, মোয়াশারাত, আখলাক ইত্যাদি বিষয়ের ওপর প্রকাশিত অপ্রকাশিত ও সর্বমোট ১৩টি বই রচনা করেন। তৎকালীন সময়ে বইগুলো সামাজিক কুসংস্কার, বিদ'আত, গোমরাহি, অপরাধ রোধ ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তাঁর রচিত কয়েকটি বইয়ের সারসংক্ষেপ আলোচনা করা হলো-

• انيس الطالبين (*আনিসুত তালেবীন*) : তিনি বিদ'আত, কুসংস্কার ও ভণ্ড পীরদের বিরুদ্ধে বই রচনার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে ব্যাপক অবদান রেখেছেন। তাঁর বিখ্যাত রচনা আনিসুত তালেবীনে তিনি বিদ'আত ও কুসংস্কার সম্পর্কে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে কুরআন-হাদীসের আলোকে শরীয়তের বিধি-বিধান বর্ণনা করেছেন। এই বইটি প্রকৃতপক্ষে তিনি ভণ্ড পীর ও বিদ'আতী ফকিরদের প্রতিরোধের জন্যই রচনা করেন। শিরকে জ্বালি, শিরকে খফি, হাসি তামাসাচ্ছলে কুফরিমূলক কথাবার্তা উচ্চারণ করা এসব ব্যাপারে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন। কারো থেকে এরূপ কিছু ঘটে গেলে সাথে সাথে তিনি তওবা করাতেন এবং ভবিষ্যতের ব্যাপারে সতর্ক করে দিতেন। এ গ্রন্থে তিনি এসব ব্যাপার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থটি পাঁচ খণ্ডে রচিত।[১৬১]

- প্রথম খণ্ডে ওয়াজ-নসিহত সম্পর্কিত বিষয়াদি বর্ণনা করেন। বইটি মুসলিম সমাজকে মৌলিক বিষয় ও আদর্শ সম্পর্কিত বিষয়সমূহের প্রতি সচেতনতা ও আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তার মূল লক্ষ্য। বইটি ১০৪ পৃষ্ঠায় রচিত। এতে ২টি অধ্যায়ে ৫৫টি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। ১ম অধ্যায়ে - হামদে খোদা ও না'তে রাসূল (সা.), নবী (সা.) পবিত্র জন্ম ও মে'রাজ সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ঈমান, নামায, মসজিদ ও জামাতের ফযিলত, জুমআর নামায, রমজানের রোজা, হজ্জ ও ওমরার বিবরণ, জাকাত; ২য় অধ্যায়ে - পিতা-মাতার হক্ব, আত্মীয়র হক্ব, প্রতিবেশীর হক্ব, মুসলমানের হক্ব, সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গ বা ফাসেক, সদুপদেশ প্রদান, সৎ স্বভাব, বিনয় ও নম্রতা, এতিমের হক্ব, ওয়াদা পূর্ণ করা, হালাল রুজি, ছবরের বিবরণ, তাওয়াক্কুল, স্বামী-স্ত্রীর হক্ব, পর্দা, গিবত, রিয়া, কৃপণতা, সুদ গ্রহণ, জেনা ব্যভিচার, নরহত্যা, হালাল ও হারামের বিবরণ ইত্যাদি।
- দ্বিতীয় খণ্ডে কুফরি কাজ ও ইবাদত সম্পর্কিত বিষয়াদি বর্ণনা করেন। বইটি ৬০ পৃষ্ঠায় রচিত। এতে ৩৪টি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। তার মধ্যে - কবিরা গুনাহ, শিরক, বিদ'আত, শরীয়ত সংক্রান্ত কুফরি কার্যকলাপের বিবরণ, কুরআনের ফযিলত, দু'আর ফযিলত, তাহাজ্জুদ

[১৬১] আনিসুত তালেবীন, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-১৫।

Dhaka University Institutional Repository

নামাযের ফযিলত, শবে কদরের ফযিলত, কুরবানির ফযিলত, আকিকার ফযিলত, কবর জিয়ারত ইত্যাদি।

- তৃতীয় খণ্ডে ক্বিয়ামত ও আখেরাত সম্পর্কিত বিষয়াদি বর্ণনা করেন। এ বইটিও ৭২ পৃষ্ঠায় রচিত এবং ২৪টি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। যেমন- কিয়ামতের আলামত এবং ইমাম মাহদী (আ.) এর আবির্ভাব, দাজ্জালের আবির্ভাব, ঈসা (আ.) এর আগমন, ইয়াজুজ মাজুজ এর আগমন, হাশরের ময়দানের বিবরণ, মিজান ও পুলসিরাত, বেহেশত দোযখের বিবরণ ইত্যাদি।[১৬২]

- চতুর্থ খণ্ডে তাসাউফের দলিল সম্পর্কিত গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা করেন। ১৭০ পৃষ্ঠায় রচিত বইখানায় ৩২ টি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। যেমন- মানব দেহ সৃষ্টির বিবরণ, ইল্ম ও আমলের বিবরণ, শরীয়ত ও তরিকতের বিবরণ, ইলমে তাসাউফের বিবরণ, বায়াতের বিবরণ, সালাম ও মোসাফাহার বিবরণ, ইসতেখারা নামাযের বিবরণ ইত্যাদি।[১৬৩]

- পঞ্চম খণ্ডে আধ্যাত্মিক শিক্ষা সম্পর্কিত মূল্যবান বিষয়াদি বর্ণনা করেন। বই খানায় তিনি ধারাবাহিক যিকির আযকারের পদ্ধতি ফযিলতসহ বিভিন্ন বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা করেন। উক্ত বইখানাও ২৩৮ পৃষ্ঠায় ১৮৩টি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে তাওহীদের বিবরণ, চার তরিকার বিভিন্ন ছবকের বিস্তারিত বয়ান, যিকির আজকারের পদ্ধতি ও ফজিলত, চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশবন্দিয়া বিভিন্ন যিকির আজকার, ইলমে জাতের পাছ আনফাস যিকিরের নিয়ম, নফী ইসবাতের যিকির, তওবার বিবরণ, বিশেষ করে পীর মুরিদী নামে যে অনৈসলামীক কর্মকাণ্ড চলছে তা থেকে মুক্তি লাভের উপায় ইত্যাদি বর্ণনা করেন।[১৬৪]

- **যাদুল হুজ্জাজ বা হাজীদের সম্বল :** তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ যাদুল হুজ্জাজ। ইসলামের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হলো হজ্জ। হজ্জ-এর গুরুত্ব, তাৎপর্য ও বিভিন্ন মাসায়েল সম্পর্কে তথ্য সংবলিত প্রমাণভিত্তিক বাংলা প্রাঞ্জল ভাষায় বইটি রচনা করেন। আমাদের দেশের অনেক লোক পবিত্র হজ্জকার্য সম্পদানের জন্য মক্কা শরীফ গমন করেন। কিন্তু সঠিক নিয়মনীতি ও মাসয়ালা-মাসায়েলসমূহ জানা না থাকার কারণে অনেকের হজ্জই ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়। তাই সর্বস্তরের বাংলা ভাষাভাষীদের কথা চিন্তা করে মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী (রহ.) হজ্জ সম্পর্কিত জরুরি মাসয়ালা-মাসায়েল বর্ণনা করে এ বইটি লিখেন। যা হাজিদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী। ১০৮ পৃষ্ঠায় রচিত ১২ বিষয়ে বর্ণিত আছে। আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়গুলো হলো, যেমন- হজ্জের বিবরণ ও ফজিলত, হজ্জের হুকুম আহকাম, সফরের আদব, বদলি হজের বিবরণ, মিকাতের বিবরণ, ইহরামের বিবরণ, ওমরাহর বিবরণ, তাওয়াফের বিবরণ, আরাফাতের বিবরণ, জামরাহের বিবরণ, কুরবানী ও দমের বিবরণ এবং মক্কা শরিফের গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহ জিয়ারতের বিবরণ এবং রাসূল (সা.)-এর রওজা জিয়ারতের বিবরণ ইত্যাদি।১৬৫

- ***আকসামুল মুসলিমীন:*** মুসলিম সমাজকে বাতিল ফেরকাসমূহ হতে সচেতন করে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সঠিক পথে পরিচালনা করার লক্ষ্যে তিনি "আকসামুল মুসলিমীন" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত-এর পরিচিতি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। গ্রন্থটিকে বাংলায় অত্যন্ত সরল ও সাবলীল ভাষায় রচনা করা হয়েছে, যাতে সাধারণ

---

[১৬২] আনিসুত তালেবীন, ১ম, ২য় ও ৩য় ভূমিকা হতে উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-৬।

[১৬৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

[১৬৪] আনিসুত তালেবীন, ৫ম খণ্ড, ভূমিকা হতে উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

[১৬৫] আব্দুর রহমান হানাফী (র.), যাদুল হুজ্জাজ, (ঢাকা: রূপালী প্রিন্টিং লি., ১৩৯৫ বা.), পৃ. ৮-১০।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে। পাশাপাশি বিদ'আতী পীর ফকির ও ভণ্ড পীরের মুখোশ উন্মোচিত হয়। এতে করে সাধারণ মানুষ অনৈসলামীক চাল-চলন থেকে নিজেকে মুক্ত করে ইসলামের সঠিক পথে পরিচালিত করে আত্মশুদ্ধি লাভ করতে পারেন। বইটি ৩৪ পৃষ্ঠায় রচিত। ১২ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে হামদে বারী তা'আলা ও নাতে রাসূল (সা.), ফিরকায়ে নাযিয়ার বিবরণ, ফিরকায়ে নারীয়ার বিবরণ ইত্যাদি।[১৬৬]

- ***চার তুরীকার অযীফা ও শাজারা:*** তুরীকত সম্পর্কিত 'চার তুরীকার অযীফা ও শাজারা' নামক বইতে তিনি মারেফাত সম্পর্কিত জরুরি বিষয়াদি লিপিবদ্ধ করেন। এতে হক্কানী পীরের প্রয়োজনীয়তা, তুরীকত পন্থীদের জরুরি আমলের বিবরণ, দুরূদ শরীফের ফযিলত, নফী ও এছবাত যিকরের নিয়ম, তাওবার নিয়ম, ইলমে জাতের পাছ আনফাছ, কাদেরিয়া তুরীকার অযীফা ও সুলতানুল আযকারের মোরাকাবার বিবরণসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত চার তুরীকার মাশায়িখদের শাজারা বর্ণিত হয়েছে। সাধারণ মানুষও আশিকীনে মারেফাতদের জন্য এ বই এক আলোকবর্তিকা। বইটি ৮০ পৃষ্ঠায় রচিত। মোট ৫৪ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যথা - কামেল পীরের প্রয়োজন, তরীকত পন্থীদের জরুরি মাসায়েল, মোরাকাবার নিয়ম, নফি ও এসবাত জিকিরের নিয়ম, তওবার ফযিলত, ইসমে জাতের বিবরণ, দরুদ শরিফ পড়ার নিয়ম, খতমে খাজেগানার বিবরণ, সোনাকান্দা পীর সাহেবের সংক্ষিপ্ত নসবনামা, ইলমে তাসাউফের বিবরণ ইত্যাদি।[১৬৭]

- ***দু'আয়ে হিজবুল বাহার:*** "হেজবুল বাহার" একটি গুরুত্বপূর্ণ দু'আর গ্রন্থের সংকলন। বিভিন্ন মসিবতের সময় এ দু'আসমূহ পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা কঠিন মসিবতসমূহ থেকে রক্ষা করেন। বিশেষ করে নদী বা সমুদ্র পথে ভ্রমণ কালে এবং বিভিন্ন বিপদ-আপদে এ দু'আসমূহ পাঠ করলে খুবই উপকারে আসে। মিসরের প্রখ্যাত আলেম এবং আধ্যাত্মিক সাধক কায়রো নিবাসী শায়েখ আবুল হাসান শাযেলী (রহ.) একবার হজ্জের সফরের সময় সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ দেখা দেয়। যার ফলে জাহাজ সাতদিন পর্যন্ত আটকা পড়ে যায়। অপরদিকে হজ্জের সময়ও অতি নিকটে ছিল। শায়েখ শাযেলী (রহ.)-এর পেরেশানি অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি এ দু'আসমূহ ইলহাম করেন। শায়েখ আবুল হাসান (রহ.) উল্লিখিত দু'আসমূহ পড়া শেষে সমুদ্র শান্ত হয়ে যায় এবং নিরাপদে তাঁরা সকলেই মক্কা শরীফ পৌঁছেন। এই গ্রন্থটি তিনি শায়েখ আবদুল হক মোহাজেরে মক্কীর বিশিষ্ট খলিফা শাহ্ সুফী যফর উদ্দিন সাহেব হতে দু'আয়ে "হেজবুল বাহার" পাঠের ইজাযত লাভ করেন। বইটি ১৯ পৃষ্ঠায় রচিত।

---

[১৬৬] আব্দুর রহমান হানাফী (র.), আকছামুল মুসলেমীন, (ঢাকা: রূপালী প্রিন্টিং লি., ১৩৯৫ বা.), পৃ. ২-৩।

[১৬৭] আবদুর রহমান হানাফী (র.), চার তুরীকার অযীফা ও শাজারা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-৫ ও ২৪-৩১।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ মানুষের উপকারার্থে বইটি রচনা করেন। দু'আ শুরু করার পূর্বে তিনি উল্লেখ করেন -

حزب البحر

لهذا الحزب اعتصام ويبدأ به عند الشروع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمْ

وَبِهِ الْحَوْلُ وَالْقُوَّةُ رَبِّ سَهِّلْ وَيَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ يَا مُيَسِّرَ كُلِّ عَسِيْرٍ

ثمّ يهلل ثلثا ثم يستغفر ثلثا ثم يكبر التشريق ثم يصلّى على النبى صلى الله عليه وسلم
عشر مرات ثم ينوى بخير المقاصد مما اراد ويرفع يديه مع الفاتحة
ثم يمسح وجهه ثم يشرع فى قراءة الحزب

অতঃপর দু'আর ভূমিকায় উল্লেখ করেন-

دعاء حزب البحر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ط
يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيْمُ يَا حَلِيْمُ يَا عَلِيْمُ اَنْتَ رَبِّيْ وَعِلْمُكَ حَسْبِيْ فَنِعْمَ
الرَّبُّ رَبِّيْ وَنِعْمَ الْحَسْبُ حَسْبِيْ تَنْصُرُ مَنْ تَشَاءُ وَاَنْتَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ
[১৬৮] نَسْئَلُكَ الْعِصْمَةَ فِي الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ

• وظيفة النافعة (*অযীফায়ে নাফি'আহ*): কুরআনুল কারীম ও হাদীস শরীফ হতে গুরুত্বপূর্ণ দু'আসমূহ আরবি ভাষায় রচিত "অযীফায়ে নাফেয়া" নামে একটি মূল্যবান দু'আর গ্রন্থ রচনা করেন। তা ছাড়া এটি আরবী মুনাজাতের কিতাব হিসেবেও পরিচিত। ৮০ পৃষ্ঠায় রচিত বইয়ের দু'আসমূহ উর্দু ভাষা-ভাষীদের সুবিধার্থে তিনি নিজেই উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেছেন। বইখানায় প্রথমত কুরআনুল কারীমের দু'আসমূহ এরপর হাদীস শরীফের দু'আসমূহ অতঃপর বিভিন্ন বুজুর্গের পঠিত দু'আসমূহ উল্লেখ রয়েছে। বইয়ের সূচনায় এ খুতবাটি উল্লেখ করেন, যেমন-

دیباچہ وظیفۂ نافعہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ الدُّعَاءَ لِرَدِّ الْقَضَاءِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ
الَّذِىْ عَلَّمَنَا مَا نَتَّقِىْ بِهِ الْبَلَاءَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهِ الْهَادِيْنَ اِلٰى مَا نَخْرُجُ بِهٖ مِنْ كُلِّ عَنَاءٍ وَّعَلٰى عُلَمَاءِ
[১৬৯] اُمَّتِهٖ وَاَوْلِيَاءِ زُمْرَتِهِ الَّذِيْنَ بَذَلُوْا جُهْدَهُمْ فِىْ جَمْعِ اَسْبَابِ الشِّفَاءِ عَنْ كُلِّ دَاءٍ-

---

১৬৮ আব্দুর রহমান হানাফী (র.), দু'আয়ে হিযবুল বাহার, (ঢাকা: আরেফিন প্রেস, ১৩৪৫ বা.), পৃ. ৮-১০।

Dhaka University Institutional Repository

বইয়ের দু'আ সমূহের মধ্য থেকে একটি দু'আ উল্লেখ করা হলো, যেমন

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اٰخِرَ كَلَامِنَا مِنَ الدُّنْيَا عِنْدَ انْتِهَاءِ اٰجَالِنَا قَوْلَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ
رَّسُوْلُ اللهِ وَاَحْيِيْنَا عَلَيْهِ يَا حَيُّ وَاَمِتْنَا عَلَيْهِ يَا مُمِيْتُ وَابْعَثْنَا عَلَيْهِ مِنْ قُبُوْرِنَا يَا بَاعِثُ
وَانْفَعْنَا وَارْفَعْنَا بِهٖ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ۔ [১৭০]

- ***অসিয়তনামা:*** "অসিয়তনামা" গ্রন্থটি একটি পথ-নির্দেশনামূলক গ্রন্থ। এর মূল বিষয়বস্তু তাঁর মুরশিদ মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক ফুরফুরাভী (রহ.)-এর অসীয়তনামা হতে সংকলন করা হয়েছে। তাছাড়া নিজের পক্ষ হতেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ অসিয়ত এবং দিক-নির্দেশনা বর্ণনা করেছেন। তিনি নিজ সন্তান, আলেমে দ্বীন, জ্ঞান পীপাসু এবং মুরিদগণের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ অসিয়তনামা পুস্তিকাটি রচনা করেন। বইটি মুসলিম মিল্লাতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও ফলদায়ক। বইটি ২০ পৃষ্ঠায় রচিত।[১৭১]

- شمس القران ***(শামসুল কুরআন)*** : মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী (রহ.) বাংলাদেশের প্রখ্যাত বুজুর্গ ক্বারী মাওলানা ইব্রাহীম উজানী (রহ.)-এর স্নেহভাজন ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁর নিকট প্রায় তিন বছর ইল্‌মুল ক্বিরআতের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ক্বিরআতের সাব'আসহ ইল্‌মুল ক্বিরআতের ওপর পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করেন। অতঃপর তিনি ইল্‌মুল ক্বিরআত সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু এর কোনো কপি কারও নিকট না পাওয়ায় এটি সম্পর্কে তেমন কিছু লেখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তার ত্বরীকার 'অযীফা ও শাজারাহ' গ্রন্থের কভার পৃষ্ঠায় আবদুর রহমান হানাফী (রহ.)-এর কিতাবসমূহের তালিকার মধ্যে "শামসুল কুরআন" গ্রন্থের নামে একটি গ্রন্থ পাওয়া যায়। যার মাঝে ৭ ক্বারী ও ১৪ রাবীর বিশ্লেষণ বর্ণনা করা হয়েছে এবং কুরআন পাঠের বিবরণসহ নিয়মাবলি এতে উল্লেখ রয়েছে।[১৭২]

- ***আরবের সফরনামা*** : "আরবের সফরনামা" নামক বইটি একটি ভ্রমণ কাহিনীমূলক চমৎকার গ্রন্থ। এটি একটি ভ্রমণ কাহিনীমূলক গ্রন্থ হলেও কুরআনুল কারীমে উল্লেখিত অনেক আম্বিয়ায়ে কিরাম, তাঁদের জন্ম-মৃত্যু, কর্মপরিধি এবং উল্লেখযোগ্য অনেক আউলিয়ায়ে কিরামের মাযার সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। ইসলামের ঐতিহ্যবাহী অনেক স্থানের বিবরণও এতে উদ্ধৃত হয়েছে, যার ফলে মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাই এই গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মর্যাদাও ব্যাপক। গ্রন্থটির বিভিন্ন ঘটনাবলি সাধারণ মানুষ ও আলেম সমাজের মাঝে ব্যাপক প্রসারতা লাভ করে। বইটিতে ৪৬টি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৩। বিষয়গুলো হলো- বাড়ি থেকে বায়তুল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে রওনা, কা'বা শরিফের যিয়ারত, জান্নাতুল মু'আল্লার বিবরণ, জমজমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, মক্কা শরিফের প্রসিদ্ধ মাদ্‌রাসা সমূহের বিবরণ, তায়েফের বিবরণ, মদিনা মুনাওয়ারার বিবরণ, মসজিদে কুবার বিবরণ, মদিনা শরিফের বিভিন্ন কূপের বিবরণ,

---

[১৬৯] আব্দুর রহমান হানাফী (র.), অযীফায়ে নাফেয়া, (ঢাকা: রূপালী প্রিন্টিং লি., ১৩৯২ বা.), পৃ. ৭।
[১৭০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।
[১৭১] আব্দুর রহমান হানাফী (র.), অসিয়তনামা, (ঢাকা: রূপালী প্রিন্টিং লি., ১৩৪৬ বা.), পৃ. ৩।
[১৭২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২-৪।

Dhaka University Institutional Repository

বায়তুল মুকাদ্দাসের বিবরণ, মিশরের বিবরণ, বাগদাদ শরিফের বিবরণ, কারবালার বিবরণ, পাহাড় সমূহের বিবরণ, আজমিরের বিবরণ ইত্যাদি।[১৭৩]

যোগ্য উত্তরসূরি তৈরির মাধ্যমে দ্বীন প্রচার : হাফেজ মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী (রহ.) ইসলাহে নাফ্স ও ইসলাহে কওম উভয় প্রকার সংশোধনের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় দু'শোর কাছাকাছি খলিফা তৈরি করেন, যাঁদেরকে তিনি কুরআন-হাদীসের সঠিক জ্ঞান দানের মাধ্যমে যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলেন - যোগ্যতা অর্জন করার পর কেবল তিনি তাঁদেরকে খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করেন। যারা ইসলামের সঠিক শিক্ষা নিয়ে সমাজের মানুষদেরকে সঠিক পথ নির্দেশনা এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারে ব্যাপক অবদান রাখছেন।

নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকজন খলিফার নাম উল্লেখ করা হলো-

- আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল জাব্বার, পিতা- মুন্সি আমান উদ্দিন, বুড়িচং, কুমিল্লা।
- মৌলভী আবদুল হালীম, পিতা- মুন্সি হায়দার আলী, মুরাদনগর, কুমিল্লা।
- আলহাজ্জ মৌলভী সাঈদুর রহমান, পিতা- মোঃ জাফর আলী সরকার, বুড়িচং, কুমিল্লা।
- আলহাজ্জ মাওলানা ফজলুল হক, পিতা- মোঃ ফজর আলী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।
- আলহাজ্জ প্রফেসর আবদুস সাত্তার সাহেব, শাহজাহানপুর, ঢাকা।
- আলহাজ্জ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক, পিতা- মৌলভী আছগর আহমদ, বুড়িচং, কুমিল্লা।
- মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল হাই, পিতা- মুন্সি আফসার উদ্দিন, বুড়িচং, কুমিল্লা।
- মাওলানা মোহাম্মদ আবদুস সোবহান, পিতা- মোহাম্মদ আবদুল জলিল, বুড়িচং, কুমিল্লা।
- মাওলানা জাব্বর আলী, পিতা- মোঃ মাঈন উদ্দিন, বুড়িচং, কুমিল্লা।
- মাওলানা মো. ইয়াকুব আলী, পিতা- মৌলভী আলফাজ আলী, গ্রাম-দৌলতপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা।
- মৌলভী মোহাম্মদ মোস্তফা, পিতা-শরাফ আলী সরদার, চট্টগ্রাম।
- মুন্সি আলিম উদ্দিন, পিতা- গাজী মোহাম্মদ, নরসিংদী।
- মাওলানা আবদুর রাজ্জাক, পিতা- মৌলভী আশেক উল্লাহ, কিশোরগঞ্জ।

উপরোল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও তিনি আরও অনেক আলেম ওলামা ও বিখ্যাত মুবাল্লিগ তৈরি করেছেন। যারা আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারে ব্যাপক অবদান রাখছেন।[১৭৪]

বিদ'আত, কুসংস্কার রোধ ও ভণ্ডপীরদের স্বরূপ উন্মোচন : হাফেজ মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী (রহ.) ছিলেন একজন হক্কানী আলেম ও সমাজ সংস্কারক। সমাজ থেকে বিভিন্ন কুসংস্কার দূর করার লক্ষ্যে ইসলামের প্রচার-প্রসারে জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিকতার উচ্চস্তরের একজন কামেল পীর। পীরের নামে বিভিন্ন প্রকার ভণ্ডামি, অনৈসলামীক কার্যকলাপ শিরক, বিদ'আত, কুফর ও বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সোচ্চার। কুরআন-হাদীসের সঠিক জ্ঞান থাকায় বিদ'আত, কুসংস্কার, শিরক, কুফরি এবং অনৈসলামীক কর্মকাণ্ড তাঁর আসে পাশেও স্থান পায়নি। বরং এসবের বিরুদ্ধে আজীবন তিনি ছিলেন আপোষহীন। বিশেষ করে তাঁর নিজ এলাকাসহ পুরো উত্তর কুমিল্লা বিদ'আতি ও ভণ্ডপীরদের আস্তানা হওয়ায় তিনি

---

[১৭৩] আনিসুত তালেবীন, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮।

[১৭৪] ড. মোঃ আবু ছালেহ পাটোয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১-২৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

এসবের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে। নিম্নে সংক্ষেপে তাঁর প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

অনৈসলামীক কার্যকলাপ ও ভণ্ডদের প্রতিরোধ : কুমিল্লা জেলায় মুরাদনগর উপজেলার দক্ষিণ ভাঙ্গরা গ্রাম ও নবীনগর উপজেলার লাউভি নামক গ্রামসহ অনেক জায়গায়ই কবর পূজা, বিদ'আত ও বিভিন্ন শিরকি কার্যক্রম চলতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের সঠিক শিক্ষার অভাবেই এসকল অনৈসলামীক কর্মকাণ্ড চালু হয়েছে। শরীয়ত ও মারেফাতের নামে পীর পূজা, কবরে সেজদা করা, মাজারে গান-বাজনা, ঢোল-তবলাসহ অন্যান্য অনৈসলামীক কার্যকলাপ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের মানুষদেরকে ধ্বংসের পথে পরিচালিত করে। তাই সমাজের মানুষের মাঝে সঠিক ইসলামী আদর্শ তুলে ধরে জীবনের সমস্ত শক্তি ও কৌশল অবলম্বন করে এসব ইসলামের দুশমন ও ভণ্ডপীরদেরকে কঠিনভাবে প্রতিরোধ করেন এবং এরই সাথে ইসলামের সঠিক দিকনির্দেশনা সাধারণ মানুষের মাঝে তুলে ধরে ইসলামের পথে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। যার কারণে উত্তর কুমিল্লাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলামের সঠিক শিক্ষা বিস্তারে এবং ভণ্ডপীরদের প্রতিরোধে গণজাগরণ সৃষ্টি করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। যার কারণে তিনি সকলের মাঝে চির স্মরণীয় হয়ে আছেন।[১৭৫]

ওয়াজ ও নসীহতের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার: পীর সাহেব (রহ.) সাধারণ মানুষের ইসলাহের উদ্দেশ্যে সারা বছরই বিভিন্ন স্থানে ওয়াজ মাহফিল করতেন। বক্তব্যের সময় কুরআন-হাদীসের আলোকে বিদ'আতি ও ভণ্ডফকিরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত জোরালো বক্তব্য পেশ করতেন এবং এরই সাথে হক্কানী পীর মুরিদ, সঠিক আধ্যাত্মিকতা ও শরীয়তের সঠিক ব্যাখ্যা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতেন। আর সমাজের বিভিন্ন অনৈসলামীক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ করার জন্য বিশেষ কৌশল অবলম্বন করতেন। অধিকাংশ সময় বলতেন, 'তুমি কোথাও মদের দোকান দেখলে তাঁর পাশে একটি মধুর দোকান দাও এবং মধুর স্বাদ মানুষকে আস্বাদন করাও, তাহলে মানুষ আস্তে আস্তে মধুর স্বাদ পেয়ে মদ ছেড়ে মধু খেতে আসবে'। তাই তিনি বিভিন্নভাবে ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে ভণ্ডফকিরদের প্রকৃতরূপ তুলে ধরার পাশাপাশি শরীয়ত ও ত্বরীকতের শিক্ষা দিয়ে মানুষকে ইসলাহের পথে ফিরিয়ে আনতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। তাঁর বক্তব্য শুনে সাধারণ মানুষ খুব সহজেই তাঁর ভক্ত হয়ে যেতো।[১৭৬]

মোনাজারার মাধ্যমে কুসংস্কার দূরীকরণ: হানাফি (রহ.) মোনাজারা ও বিতর্কের মাধ্যমে ভণ্ডপীর, মাযারপূজারীদের প্রতিরোধ করেন। কুমিল্লা জেলায় মুরাদনগর উপজেলার দক্ষিণ বাঙ্গরা[১৭৭] গ্রামে 'যশোদা সুন্দরী' নামে এক ভণ্ড মহিলা তার নিজ বাড়িতে নারী-পুরুষের আস্তানা কায়েম করে গান-বাজনা, মদ-জুয়ার আসরসহ নানা রকম শরীয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতো। মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী (রহ.) এলাকার লোকজনকে সাথে নিয়ে তা প্রতিরোধ করেন। অনুরূপভাবে নবীনগর উপজেলার লাউভি নামক গ্রামের এক ভণ্ড পীরের সংবাদ পেয়ে তাকে মুনাযারায় অংশগ্রহণের প্রস্তাব দেন। কিন্তু লাউভির ভণ্ড পীর মাওলানা আবদুর রহমান (রহ.)-এর সাথে বাহাছ করার সাহস না পেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যান। মুরাদনগর উপজেলার মোছাগারা গ্রামে এক অমুসলিম ব্যক্তির অসামাজিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হলে তাকেও সংশোধনের চেষ্টা চালান। এভাবেই তিনি মুসলমানদের মাঝে ইসলামী মতাদর্শ, তাহজিব-তামুদ্দুন, কৃষ্টি-কালচার, সভ্যতা, ঈমান-আকিদা

---

[১৭৫] ড. মোঃ আবু ছালেহ পাটোয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০।

[১৭৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫।

[১৭৭] সোন্দাকান্দা হতে ৩/৪ মাইল পূর্ব দক্ষিণে অবস্থিত গ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। যার ফলে কবরপূজারি, পীর পূজারি, মাযার পূজারি ও বিদ'আতীরা ইসলাম বিরোধী কাজ করতে সাহস পেতো না।[১৭৮]

ইসলামী আন্দোলনে অংশগ্রহণ : ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, অর্থ ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাসহ সর্বক্ষেত্রে রয়েছে ইসলামের সুন্দর দিকনির্দেশনা। তিনি ছিলেন একজন দেশপ্রেম ও শান্তিপ্রিয় সচেতন নাগরিক। তিনি জীবনের প্রথম দিকে রাজনীতির সাথে সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন না বরং দ্বীনী শিক্ষার মাধ্যমে কুসংস্কার রোধ করে সর্বস্তরের জনগণকে পরিশুদ্ধ করাই অধিকতর ভালো মনে করেন। কেননা আত্মশুদ্ধি ও সমাজ সংস্করণ না হলে মুসলিম জাতিকে সংশোধন করা অত্যন্ত কঠিন। তাই মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী (রহ.) প্রথমে আত্মশুদ্ধি ও সমাজ সংস্করণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তবে তাঁর মুর্শিদ মোজাদ্দেদে জামান আবু বকর সিদ্দিক ফুরফুরাভী (রহ.)-এর দিকনির্দেশনায় তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থন করতেন।[১৭৯] এদেশ হতে ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিতাড়িত করে ইসলামী সভ্যতা ও কৃষ্টি কালচার বাস্তবায়ন করার জন্য মুসলিম রাজনীতিবিদদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করতেন। মুসলিম লীগের নেতা তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী জনাব মফিজ উদ্দিন সরকার ছিলেন তাঁর একান্ত ভক্ত ও মুরিদ। পরবর্তীতে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কারণে তিনি জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের প্রতি সমর্থন দেন। আল্লামা আতাহার আলী (রহ.) (১৮৯১-১৮৭৬খ্রি.)[১৮০] নেজামে ইসলাম পার্টি গঠন করলে মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী (রহ.) নেজামে ইসলাম পার্টির প্রতি সমর্থন দেন। এভাবে তিনি দ্বীনী শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দিয়ে নিজের পুরো জীবনকেই ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে অতিবাহিত করেন।[১৮১]

আধ্যাত্মিক ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে অসংখ্য তা'লিমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন : হাফেজ মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী (রহ.) আত্মার উন্নতিকল্পে আধ্যাত্মিক ও ইসলামী শিক্ষা প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে অসংখ্য তা'লিমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে যান। যেখানে আত্মশুদ্ধির জন্য নিয়মিত কুরআন-হাদীসের তা'লিম, যিকির-আযকার ও ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা হতো। যার মাধ্যমে তিনি সমাজের কুসংস্কার, শিরক, বিদ'আত, কুফর ও বিভিন্ন অশিক্ষা দূর করে ইসলামের সঠিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। নিম্নে তাঁর কিছু তা'লিমী খানকা বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নাম উল্লেখ করা হল।

---

[১৭৮] ড. মোঃ আবু ছালেহ পাটোয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬।

[১৭৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯।

[১৮০] মাওলানা আতাহার আলী (রহ.) সিলেট জেলার বাজার উপজেলার ঘুঙ্গাদিয়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী আবদুল আজীম। তিনি ইরানের অধিবাসী ছিলেন। ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করেন। হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর খলিফা ছিলেন। তিনি কিশোরগঞ্জের জামিয়া ইমদাদিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কার্যকরী সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। তিনি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। (হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, আমরা যাদের উত্তরসূরি, (ঢাকা: আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০০৬খ্রি.), পৃ. ২২৪)।

[১৮১] ড. মোঃ আবু ছালেহ পাটোয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০।

Dhaka University Institutional Repository

আধ্যাত্মিক ও তা'লিমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ -

- **সোনাকান্দা তা'লিমী সেন্টার :** দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অসংখ্য লোক এখানে এসে তাঁর কাছ থেকে কুরআন-হাদীসের শিক্ষা লাভ করে ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন সম্পর্কে অবগত হয়ে মহান প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করেন। সেজন্য তিনি সোনাকান্দা দারুল হুদা দরবার ও খানকা শরীফ তাঁর বাড়িতে স্থাপন করেন। আজও তাঁর বাড়িতে এ আধ্যাত্মিক শিক্ষাকেন্দ্রটি চালু রয়েছে।
- **নূর মোহাম্মদপুর তা'লিমী সেন্টার:** হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার নূর মোহাম্মদপুর গ্রামের আবদুল কাদির মাস্টারের বাড়িতে এ আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানটি চালু রয়েছে।
- **ফরিদগঞ্জ রহমানিয়া তা'লিমী সেন্টার :** চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত তাঁর সুযোগ্য খলিফা মাওলানা আবদুল ওয়াহাব সাহেবের বাড়িতেও এ তা'লিমী শিক্ষা চালু রয়েছে।
- **আড়াই সিধা রহমানিয়া তা'লিমী সেন্টার (১):** ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত আশুগঞ্জ উপজেলার আড়াই সিধা গ্রামে মাওলানা আবদুজ জাহের সাহেবের বাড়িতে খানকায়ে রহমানিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- **নাগাইশ রহমানিয়া তা'লিমী সেন্টার:** সোনাকান্দার দরবারের প্রাক্তন সেক্রেটারি তাঁর বিশিষ্ট খলিফা কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলাধীন মাওলানা আবদুর রাজ্জাক সাহেবের বাড়িতেও তা'লিমী কার্যক্রম চালু রয়েছে।
- **শাকির মোহাম্মদ তা'লিমী সেন্টার :** হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার শাকির মোহাম্মদ গ্রামে আবদুশ শহীদ চৌধুরীর বাড়িতে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে পীর সাহেব (রহ.)-এর তা'লিমী কার্যক্রম চালু রয়েছে ।
- **মহিষার কান্দি রহমানিয়া তা'লিমী সেন্টার:** কিশোরগঞ্জ জেলার ভাটি অঞ্চল মিটাইন উপজেলার মহিষারকান্দি গ্রামে পীর সাহেব (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলিফা মাওলানা মতলুব উদ্দিন সাহেবের বাড়িতেও এ ইসলাহী শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে।[১৮২]
- **ন্বীনুড়া তা'লিমী সেন্টার:** এ সেন্টারটি হবিগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাহুবল উপজেলাধীন মাওলানা আজগর আলী সাহেবের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত আছে।[১৮৩]
- **চৌয়ারা রহমানিয়া তা'লিমী সেন্টার:** কুমিল্লা শহরতলীর উপকণ্ঠে চৌয়ারা বাজারস্থ মসজিদ সংলগ্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত।
- **চৈনপুর তা'লিমী সেন্টার:** কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলাধীন গ্রামে মোহাম্মদ ফজর আলীর বাড়িতে পীর সাহেব (রহ.)-এর তা'লিমী কার্যক্রম চালু রয়েছে।
- **ভৈরব তা'লিমী সেন্টার (২) :** এই তা'লিমী সেন্টারটি ভৈরব উপজেলার বিশিষ্ট খলিফা আয়াতুল্লাহ নূরীর বাড়িতে অবস্থিত।
- **দারুল আবরার তা'লিমী সেন্টার:** পীর সাহেব (রহ.)-এর তা'লিমী কার্যক্রম ঢাকার উত্তর শাহজাহানপুরস্থ খিলগাঁও রেলক্রসিং-এর পশ্চিম-উত্তর পাশে অবস্থিত আলহাজ্জ প্রফেসর আবদুস সাত্তার সাহেবের বাড়িতে চালু আছে।
- **রাধাগঞ্জ রহমানিয়া তা'লিমী সেন্টার:** নরসিংদী জেলার রাধাগঞ্জ এলাকার নয়াচরের মোহাম্মদ হুকাদার আলী ক্বারীর বাড়িতে এ তা'লিমী কেন্দ্র অবস্থিত।

---

[১৮২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২।
[১৮৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২।

Dhaka University Institutional Repository

- **নরসিংদী সদর তা'লিমী সেন্টার:** নরসিংদী সদরের ব্যাপারী পাড়া এলাকায় শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- **দেবিপুর রহমানিয়া তা'লিমী সেন্টার :** চাঁদপুর জেলাধীন কচুয়া উপজেলার অন্তর্গত দেবিপুর গ্রামের মাওলানা আবদুর রশীদ সাহেবের বাড়িতে এ সেন্টারটি অবস্থিত।
- **খামার গ্রামে তা'লিমী সেন্টার:** পীর সাহেব (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার মধ্যে তিনি তা'লিমী শিক্ষার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মসজিদে প্রতি বছর পবিত্র রমজান মাসের শেষ দশ দিন ই'তেকাফ করেন এবং পাশাপাশি দাওয়াতী কাজও করেন।
- **আড়াই সিধা তা'লিমী সেন্টার (২):** মান্নানিয়া খানকা শরীফ নামে প্রতিষ্ঠিত খানকাটি আশুগঞ্জের আড়াই সিধা গ্রামের আলহাজ্জ মাওলানা আবদুল মান্নান সাহেবের বাড়িতে চালু রয়েছে।
- **চন্ডিপুর তা'লিমী সেন্টার:** কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার চন্ডিপুর গ্রামে অবস্থিত খানকায় এ শিক্ষা চালু রয়েছে।
- **অলুয়া রহমানিয়া তা'লিমী সেন্টার:** ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার অলুয়া গ্রামে আবদুল খালেক ভূঁইয়ার বাড়িতেও তা'লিমী কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- **কোটনা তা'লিমী সেন্টার:** কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলার কোটনা গ্রামের আলহাজ্জ মৌলভী সাঈদুর রহমান সাহেবের বাড়িতে সেন্টারটি প্রতিষ্ঠিত।
- **চকমতি তা'লিমী সেন্টার:** ময়মনসিংহ জেলাধীন নান্দাইল উপজেলার অন্তর্গত চকমতি গ্রামে আলহাজ্জ মাওলানা আবদুর রাজ্জাক সাহেবের বাড়িতে অবস্থিত।
- **ভৈরব (১) :** ভৈরব উপজেলার বলাই মোল্লারবাড়িতে দ্বীনী শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- **জারুলিয়া তা'লিমী সেন্টার:** হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার জারুলিয়া গ্রামে আবদুল ওয়াহাবের বাড়িতে বর্তমানে দ্বীনী শিক্ষা চালু রয়েছে।
- **গেরারুক তা'লিমী সেন্টার:** হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার গেরারুক গ্রামে মোহাম্মদ সাহেবের বাড়িতেও পীর সাহেব (রহ.)-এর তা'লিমী কার্যক্রমটি চালু রয়েছে ।
- **শিদলাই দারুল ইসলাম তা'লিমী সেন্টার:** কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলাধীন শিদলাই গ্রামে তাঁর বিশিষ্ট খলিফা মাওলানা আবদুল জাব্বার সাহেবের বাড়িতে তা'লিমী কার্যক্রম চালু রয়েছে।
- **দৌলতপুর তা'লিমী সেন্টার:** কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলাধীন দৌলতপুর গ্রামে পীর সাহেব (রহ.)-এর অন্যতম খলিফা মাওলানা ইয়াকুব আলী সাহেবের বাড়িতে অবস্থিত।
- **উবাহাটা তা'লিমী সেন্টার:** হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার উবাহাটা গ্রামে শফিকুল হক সাহেবের বাড়িতে মাওলানা আব্দুর রহমান (রহ.)-এর আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু আছে।এছাড়াও তাঁর অনেক খলিফার বাড়িতে এ ধরনের সেন্টার প্রতিষ্ঠিত আছে।[১৮৪]

হাফেজ মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী (রহ.)-এর কতিপয় মূল্যবান উপদেশ : হাফেজ মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী (রহ.) আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং সমাজের বিভিন্ন কুসংস্কার দূর করার জন্য তিনি সব সময় চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। এ সম্পর্কে তাঁর নির্দেশনা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর কতিপয় মূল্যবান উপদেশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল-

---

[১৮৪] আব্দুর রহমান হানাফী (র.), আনিসুত তালেবীন, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

- জীবিত বা মৃত্যু পীরের সুরত হাযির নাযির জেনে ধ্যান বা মোরাকাবা করা হারাম। কেউ করলে কাফির হবে।
- পুত্র কন্যাদিগকে দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষা দিবেন।
- স্ত্রী, কন্যা, মাতা, ভগ্নিদেরকে শরীয়তের পর্দায় রাখবেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দেয়ার সময়ও পর্দা করাবেন।
- মেয়ে বা ছেলের যৌতুকের টাকা হারাম। এদের যেয়াফত খাবেন না। যারা কোনো প্রকার হারাম খায় তাদের কাছে মুরিদ হবেন না।
- আমার মুরিদ, খলিফা এবং আওলাদের মধ্যে কেউ কুরআন, হাদীস ও ফিকহ-এর বিরুদ্ধে কোনো মত প্রকাশ করলে তাকে কেউ মানবেন না।
- ইলমে গায়েব আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যতটুকু জানিয়েছেন ততটুকু জানেন। গায়েবের মালিক আল্লাহ, এরূপ আক্বিদা রাখবেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে গায়েব জানেন তাকে এলমে হুযুরী বা আতায়ী বলে।
- বাজে লোকমুখে শুনে বা লিখিত দেখে কোনো আলেমের মতের বিরুদ্ধে কোনো ফতোয়া বা ইশতেহার জারি করবেন না। যতক্ষণ না তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বিষয়টি তাহকিক না করেন।
- অনেক স্থানে দেখা যায়, পীরের ছেলে কিছু না জেনে পীর সেজে বসে ও মুরিদ করতে থাকে। আমার ছেলেদের মধ্যে যারা শরীয়ত মোতাবেক আমল করবে ও ত্বরীকতের যিকিরের তা'লিম করবে তাঁদের অনুসরণ করবেন।
- কেউ কট বন্ধক রাখবেন না। দায় সুদী ও ছলনা দ্বারা সুদ খাবেন না ও কোনোরূপ জুলুম করবেন না।
- কেউ ফাসিকের দাওয়াত কবুল করবেন না। তাকে দাওয়াত করে খাওয়াবেনও না।
- আলিমদের প্রতি বিনীত অনুরোধ এই যে, আপনাদের মাঝে যদি কোনো মাসয়ালায় মতপার্থক্য হয়, তাহলে সকলে মিলে কিতাব দেখে মীমাংসা করে সমাজে সঠিক মত প্রকাশ করবেন।
- কদমবুচি কিংবা তাজিমার্থে মাতা, পিতা, পীর, ওস্তাদ ও অন্যান্য মুরুব্বিগণের পায়ে হাত দিয়ে সেই হাত মুখে চুমা দিতে পারবে। তবে শরীয়তের নীতির বহির্ভূত যেন না হয়। যেমন- মাথা নুয়ে ফেলা।
- বাজারের ভেজাল ঘি বা অমুসলমানদের তৈরি মিষ্টি ইত্যাদি খাওয়া হতে বেঁচে থাকবেন। কারণ তারা এতে হারাম বস্তু যেমন- গোবর, চেনা ইত্যাদি ব্যবহার করে।
- সকলেই হজ্জ ও মদীনা মোনাওয়ারা, রওযা মোবারক যিয়ারতের মহব্বতে জিন্দেগী যাপন করবেন। ইত্যাদি।

হাফেজ মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী (রহ.)-এর এ অসিয়তনামা রাজতন্ত্রের ন্যায় পীর মুরিদী বর্জন এবং যোগ্যতা অর্জন করে ত্বরীকতের শায়েখীয়াত অর্জনের জন্য একটি বাস্তব দিক-নির্দেশনা।[১৮৫]

[১৮৫] আব্দুর রহমান হানাফী (র.), অসিয়তনামা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

হাফেজ মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী (রহ.) সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার-

মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী (রহ.) ছিলেন বিংশ শতাব্দীর ক্ষণজন্মা এক সমাজ সংস্কারক। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সাত বছর পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তাই তাঁর কোনো সহকর্মী বা সহপাঠী বর্তমানে জীবিত নেই। তবে অনেক অনুসন্ধান করে তাঁর কয়েকজন ছাত্র ও খলিফার খোঁজ পাওয়া গেছে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত সোনাকান্দা কামিল মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ মহোদয়সহ দরবারের কয়েকজন বিশিষ্ট খাদেম, যারা তাঁকে খুব কাছ থেকে ও দূর থেকে দেখেছেন তাঁদের সাথে দেখা করে মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী (রহ.) সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া গিয়েছে। সাক্ষাৎকারগুলো ২০ জানুয়ারি থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে সেসব তথ্য সন্নিবেশিত করা হলো:

১. **মাওলানা মো. ইয়াকুব আলী পীর সাহেব দৌলতপুর :** খলিফা হাফেজ মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী (রহ.)। তিনি বলেন, হাফেজ মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী (রহ.) ছিলেন একজন হক্কানী আলেম ও উঁচু স্তরের আধ্যাত্মিক সাধক। তিনি সবসময় পরিপূর্ণ সুন্নাতের অনুসরণ করতেন। তিনি শরীয়তের জাহিরী ইল্‌ম শিক্ষার প্রসারে মাদ্‌রাসা, মসজিদ স্থাপনের পাশা-পাশি আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রসারের জন্যও অসংখ্য খানকা ও তা'লিমী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। যার ফলে তিনি সমাজের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে ইসলামী আদর্শে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি ইসলামের মৌলিক বিষয়ের দিক-নির্দেশনামূলক ১৩টি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর বিনয়ী স্বভাব ও মধুবচনের কারণে শুধু মুসলমান নয় বরং হিন্দুরাও গভীরভাবে তাঁকে শ্রদ্ধা করত এবং দোয়ার জন্য আসত। তিনি সমাজের সর্বস্তরের লোকজনের সাথে সুমধুর আচরণের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শের প্রচার-প্রসার করেন। ফলে তাঁর হাতে অনেক হিন্দুও মুসলমান হন।[১৮৬]

২. **মাওলানা আবু নসর মো. আব্দুল কুদ্দুস বিন আব্দুর রহমান হানাফী (রহ.)** বলেন, আমার বাবা ছিলেন নিরহংকার, দুনিয়াবিরাগী উচ্চমার্গীয় আলেম ও আধ্যাত্মিক সাধক। তিনি সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে সমাজের মানুষকে বাস্তবমুখী ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে আমৃত্যু প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তিনি ইসলামের মৌলিক বিষয়ের ওপর অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। বন্দেগীর ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন কঠোর সাধক। তাঁর বিনয়ী স্বভাব ও সুমিষ্ট বচন তাঁকে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের নিকট প্রিয়ভাজন করে তোলে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন রাসূল (স.)এর সুন্নাতের অনুসারী। সমাজ থেকে কুসংস্কার ও বিদ'আত দূরীকরণে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর।[১৮৭]

৩. **মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান, সাবেক অধ্যক্ষ-সোনাকান্দা কামিল মাদ্‌রাসা।** মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান তিনি ৪৩ বছর যাবৎ সোনাকান্দা কামিল মাদ্‌রাসা পরিচালনা করেন। তিনি বলেন, হাফেজ মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী (রহ.)-এর পিতা আফছার উদ্দিন মুন্সি ছিলেন সমাজের একজন প্রভাবশালী বিচক্ষণ সর্দার। পিতার যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে তিনি সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে ও কর্মকাণ্ডে আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করতেন। কারণ তিনি মনে করতেন সমাজ সেবা ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। কেননা সামাজিকভাবে জনগণের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকলে সহজে তাদের কাছে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও ইসলামী আদর্শ তুলে ধরা যায় এবং সমাজের

---

১৮৬ সাক্ষাৎকার : ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে।

১৮৭ সাক্ষাৎকার : ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা যায়। তাই তিনি সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সরাসরি অংশগ্রহণ করে অনৈসলামীক আচার-আচরণ ও কুসংস্কারের কুফল সম্পর্কে অবহিত করে ইসলামের মৌলিক আদর্শের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি ইসলামের প্রচার-প্রসারের সাথে বিভিন্ন মাদ্‌রাসা, মসজিদসহ অনেক খানকা স্থাপন করেন এবং বিভিন্ন কিতাব রচনা করেন। তিনি তাঁর পুরো জীবনকে ইসলামের প্রচার-প্রসারে ব্যয় করেন। বিশেষ করে সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক অবদান রাখেন।[১৮৮]

৪. **আলহাজ্ব আব্দুল হক মাস্টার, খলিফা ঝাউতলা, কিশোরগঞ্জ :** তিনি হাফেজ মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী (রহ.)-এর একনিষ্ঠ মুরিদ ছিলেন। তিনি বলেন, হাফেজ মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী (রহ.) ছিলেন একজন বড় আলেম ও বুযুর্গ ব্যক্তি। তাঁর ওয়াজ-নসীহতের ভাষা ছিল সহজ-সরল কিন্তু চমৎকার, যা সকলে সহজেই অনুধাবন করতে পারত। তিনি সর্বদা করুণ আকুতিতে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করতেন। তাঁর মাধ্যমে সমাজের বহু বিদ'আত ও কুসংস্কার দূরীভূত হয়েছে। তিনি ইসলামের মর্মবাণী সঠিকভাবে তুলে ধরে মানুষের হৃদয়কে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করে তোলেন। তিনি ইসলামের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে তৎকালীন বড় বড় আলেমদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান হল অসংখ্য দ্বীনী প্রতিষ্ঠান স্থাপন। যার মাধ্যমে বর্তমানে হাজার হাজার মানুষ কুরআন হাদীসের সঠিক ইল্‌ম অর্জন করে নিজেকে একজন যোগ্য ইসলামের উত্তরসূরি হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছে। তিনি আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রসারে সমাজে ইসলামী তাহজীব তামাদ্দুন প্রতিষ্ঠায় সুদূরপ্রসারী অবদান রাখেন।[১৮৯]

৫. মাওলানা মাহমুদুর রহমান, বর্তমান গদ্দিনিশীন পীর- সোনাকান্দা দরবার শরীফ ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সোনাকান্দা কামিল মাদ্‌রাসা। তিনি বলেন, আমার দাদা হাফেজ মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী (রহ.) ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলেমেদ্বীন ও সঠিক আধ্যাত্মিক শিক্ষার ধারক-বাহক। বিশেষ করে উত্তর কুমিল্লাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ওয়াজ মাহ্‌ফিলসহ শরীয়ত ও ত্বরীকতের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসার ও সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণে সমাজের মানুষকে এক নতুন দিগন্তের পথে সঠিকভাবে জাগিয়ে তোলেন। তিনি বহু কিতাব রচনা ও বিভিন্ন মাদ্‌রাসা, মসজিদ এবং খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। যার মাধ্যমে সমাজের মানুষ আজও হিদায়াতের আলোয় আলোকিত হচ্ছে এবং হাজারও মানুষ ইসলামের প্রচার-প্রসারক হিসেবে তৈরি হচ্ছে। তিনি ইসলাহে নফস ও ইসলাহে কওম উভয় প্রকার সংশোধনের জন্য নিজের পুরো জীবনকে অতিবাহিত করেন।[১৯০]

---

[১৮৮] সাক্ষাতকার : ২০ জানুয়ারি, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে।

[১৮৯] সাক্ষাতকার : ২৯ জানুয়ারি, ২০১৬খ্রিস্টাব্দে।

[১৯০] সাক্ষাতকার : ২০ জানুয়ারি, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-১.২ : মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন (রহ.) (১৯০৫-১৯৭৭ খ্রি.)

শায়েখুল ইসলাম মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.)-এর সুযোগ্য খলীফা, ওলীয়ে কামেল মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন (রহ.) ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত লাকসাম উপজেলাধীন ঐতিহ্যবাহী কেনুয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মৌলভী ইমাম উদ্দীন মোল্লা। দাদার নাম ফসল উদ্দীন মোল্লা। এই হিসেবে তাঁর বংশ মোল্লা বংশ নামেই খ্যাত। মাতার নাম আমেনা খাতুন। তিনিও ছিলেন একজন দ্বীনদার মহিলা। মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন (রহ.) ছোট বেলা থেকেই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা তাঁর বুদ্ধিমতী মায়ের কাছেই গ্রহণ করেন। অতঃপর উত্তর হাওলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করেন। বাল্য বয়সে পিতা-মাতার ইন্তেকাল হয়। এরপর শুরু হয় মাদ্‌রাসার শিক্ষা জীবন। তাঁর একমাত্র চাচা মৌলভী মেহেরুল্লাহ (রহ.)-এর তত্ত্বাবধানে তিনি কুমিল্লা জেলাধীন বাংলাদেশের প্রাচীনতম দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম বরুড়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। সেখানে মাওলানা আবুল কসিম (রহ.)-এর তত্ত্বাবধানে জামাতে পাঞ্জম পর্যন্ত খুব সুনামের সাথে পড়াশুনা করেন।[১৯১] অতঃপর তিনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ ইসলামী বিদ্যাপীঠ নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে কৃতিত্বের সাথে ফাযেল পাশ করেন।

অতঃপর ভারতের খ্যাতনামা বিদ্যাপীঠ 'দারুল উলূম দেওবন্দে' উচ্চশিক্ষা লাভ করার উদ্দেশ্যে দেওবন্দ যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং এ সংকল্পের কথা স্বীয় ওস্তাদগণ ও মেঝো ভাই, যার ওপর তখন সংসার পরিচালনার দায়-দায়িত্ব ছিল তাঁকে জানান। তাঁরা প্রথমে অসম্মতি প্রকাশ করলেও পরবর্তীতে আগ্রহ দেখে তাঁরা সম্মতি প্রদান করেন। অতঃপর তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের উদ্দেশ্যে সকলের নিকট দোয়া চেয়ে ভারতের গোয়ালন্দ ঘাটে পৌঁছলেন। সেখান থেকে ট্রেনে করে দারুল উলূম দেওবন্দে পৌঁছে মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে যান। ভর্তি হওয়ার পর থেকে তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে পড়াশুনা করেন এবং কৃতিত্বের সাথে দাওরায়ে হাদীস পাশ করেন।

মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন (রহ.) দারুল উলূম দেওবন্দে অধ্যয়নকালে সবসময় শায়েখুল ইসলাম হোসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.)-এর নিকট নিয়মিত যাতায়াত করেন। দাওরায়ে হাদীস পাশ করার পর তিনি কার নিকট বাই'আত হবেন এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন। পরিশেষে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বাই'আত হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে থানভী (রহ.) তাঁকে মাদানী (রহ.)-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। অবশেষে ইস্তেখারার মাধ্যমে মাদানী (রহ.) হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন। মাদানী (রহ.) তাঁর মাঝে সুলূক ও মা'রিফাতের প্রবল প্রতিভা দেখে বাই'আতের মাত্র তের দিন পর খেলাফত প্রদান করেন। এরপর থেকে তিনি ত্বরীকতের কাজে আগ্রসর হন এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে কর্মজীবনে পদার্পণ করেন।

মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাহেব (রহ.) হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ অবস্থায় মহান আল্লাহর নিকট বিশেষভাবে দুআ করেন। দুআ শেষে তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র নিকট বিশেষভাবে প্রার্থনা করেছি যে, হে আল্লাহ্! আমাকে হজ্জ করানো ছাড়া দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিও না। পাশে উপবিষ্ট লোকজন তাঁর কথায় প্রথমে কিছুটা আশ্চর্যান্বিত হলেও পরবর্তীতে তাঁরা উপলব্ধি করেন আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া সত্যিই কবুল করেছেন। কেননা এই দোয়ার পর তিনি আবার সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন।

---

[১৯১] মাওলানা আবূ মূসা, মুরশীদে কামেল হযরত মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন (র.), জীবন ও আদর্শ, (ঢাকা : ইছামতি অফসেট প্রেস, ১৯৯৬খ্রি.), পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন (রহ.) ফাযেল পাশ করার পর তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি চারদিকে ছাড়িয়ে পড়ে। তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অনেকেই স্বীয় কন্যা তাঁর নিকট বিবাহ প্রদানের জন্য আকাঙ্ক্ষা পেশ করতে থাকে। পরিশেষে নাঙ্গলকোট উপজেলার অধিবাসী মৌলভী ওয়ায়েজ উদ্দীন সাহেবের দ্বিতীয় কন্যা মুহতারামা মাছুমা খাতুনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। পরবর্তীতে তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন। উভয় বিবির ঘরে মোট ৮ কন্যা ৫ পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তারা হলেন, মাওলানা আসেম বিল্লাহ, মৌলভী মো. হারুন, মাওলানা আসআদ আল হোসাইনী, হাফেজ মো. নিজামউদ্দিন ও হাফেজ মো. আলাউদ্দিন। পীরে কামেল মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন (রহ.) ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ ইন্তেকাল করেন। নতুন বাড়ির পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[১৯২]

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন (রহ.)-এর অবদান-

মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন (রহ.) আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে বিভিন্ন মাদ্‌রাসা মসজিদ প্রতিষ্ঠা, কুরআন হাদীসের শিক্ষা দান, সমাজের বিভিন্ন কুসংস্কার দূরীকরণ ও সমাজ সংস্কারসহ বিভিন্ন কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রাসারে উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

দেওবন্দ থেকে দাওরায়ে হাদীস পাস করার পর বিভিন্ন মাদ্‌রাসা থেকে তাঁকে দ্বীনের খেদমতের জন্য প্রস্তাব আসতে থাকে। কিন্তু তিনি নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদারাসা থেকে দেওবন্দের উদ্দেশ্য বিদায় নেয়ার প্রাক্কালে সেখানকার ওস্তাদগণকে এই ওয়াদা দিয়ে ছিলেন যে, আমি দেওবন্দ থেকে ফিরে এসে এখানেই শিক্ষকতা করব, ইনশাআল্লাহ। তাই তিনি অন্যান্য সকল প্রস্তাব গ্রহণ না করে নোয়াখালী ইসলামীয়া মাদ্‌রাসায় চলে আসেন। তিনি সেখানে যাওয়ার পর মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত খুশী হন এবং তাঁকে মুহাদ্দিস পদে নিয়োগদান করেন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদ্‌রাসায় হাদীসের কিতাবসমূহের দারস প্রদান করেন। পরবর্তীতে বহু ছাত্র দেশের বিভিন্ন মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে ইলমে হাদীসের শিক্ষা প্রদান করে আসছেন।

দারুল উলূম বরুড়া মাদ্‌রাসার শায়েখুল হাদীস মাওলানা কুরবান আলী (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর শায়েখুল হাদীসের গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত করা হয় মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন (রহ.) কে। তিনি ১৯৭৪-১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সর্বমোট ৪ বৎসর অত্যন্ত সুনামের সাথে দারুল উলূম বরুড়া মাদ্‌রাসায় শায়েখুল হাদীস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন (রহ.) ফেনী আলিয়া মাদ্‌রাসায় শায়েখুল হাদীস হিসেবে অনেকদিন কর্মরত ছিলেন। সে সময় ফেনী আলিয়া মাদ্‌রাসায় আহলে ইল্‌ম ও বড় বড় আলেম ওলামার মারকায হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। তখন ফেনী আলিয়া মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন চট্টগ্রাম সাতকানিয়া নিবাসী মাওলানা ওবায়দুল হক (রহ.)। ফেনী আলিয়া মাদ্‌রাসাটি ছিল তৎকালীন পূর্ব বাংলার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তিনি অত্র মাদ্‌রাসায় সবসময় বুখারী শরীফের দারস দিতেন। তখন তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামিয়া ইউনুসিয়া মাদ্‌রাসার মুরুব্বি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন (রহ.) এলাকার সাধারণ মানুষকে দ্বীনী শিক্ষা প্রদানসহ ইসলামী তাহযিব-তামাদ্দুন সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে নিজ গ্রামে 'ফেনুয়া হোসাইনিয়া মাদ্‌রাসা'-র ভিত্তি স্থাপন করেন। বর্তমানে মাদ্‌রাসার সংলগ্ন একটি বিশাল মসজিদও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এ মাদ্‌রাসার মাধ্যমে সমাজের অবহেলিত মানুষ ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন।

---

[১৯২] হাফেজ মাওলানা মো. হাবিবুর রহমান, আমরা যাদের উত্তরসূরি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯।

Dhaka University Institutional Repository

এলাকাবাসী তার প্রতি শ্রদ্ধা করে পরবর্তীতে মাদ্রাসাটি নামের সাথে মিলিয়ে নামকরণ করেন 'ফেন্নুয়া হোসাইনিয়া মাদ্রাসা'।

আরবী ও ইসলামী শিক্ষার আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করার নিমিত্তে মুন্সিরহাট হোসাইনিয়া নামে একটি দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করেন এবং মাদ্রাসার পরিচালনা ও শিক্ষকতার দায়িত্ব তিনি নিজেই পালন করেন। অত্র অঞ্চলে এই প্রতিষ্ঠানটি আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।[১৯৩]

মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন (রহ.) শিক্ষকতার পাশাপাশি অনেক যোগ্য উত্তরসূরি তৈরি করেন। যাঁদের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসারে বিশেষ অবদান রয়েছে। তিনি বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক খলিফা তৈরি করেন। যাঁদেরকে তিনি কুরআন হাদীসের সঠিক জ্ঞানে অধিকারী হিসেবে বিবেচিত করতেন। নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকজন খলিফার নাম দেয়া হলো :

১. মাওলানা আফতাব (রহ.) ব্রাহ্মণবাড়িয়া

২. মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

৩. মাওলানা আফতাব উদ্দিন প্রতিষ্ঠাতা, দারুল উলূম বরুড়া।

সমাজে বিভিন্ন কুসংস্কার দূরীকরণে তাঁর অবদান : মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন (রহ.) সবসময় বলতেন, 'যেখানে সুন্নাত আছে সেখানে বিদ'আত থাকতে পারে না, আর যেখানে বিদ'আত আছে সেখানে সুন্নাত থাকতে পারে না'। তিনি আরও বলতেন, 'হক হলো যারা সুন্নাতের পক্ষে কথা বলে, আর না হক হলো যারা বিদ'আতের পক্ষে কথা বলে'। তিনি সারা জীবন সুন্নাতের অনুসারী এবং বিদ'আত ও কুসংস্কার বিরোধী ছিলেন। যেখানে সুন্নাত সেখানেই তাঁর আগমন। যেখানে বিদ'আত সেখান থেকে তাঁর প্রস্থান। বিদ'আতি কোনো প্রোগ্রামে তাঁর যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ছিল না। বিশেষ করে বর্তমানে বিয়ে-শাদীতে সে সকল কুসংস্কার ও বিদ'আতের প্রচলন রয়েছে, তিনি এগুলোর বিরুদ্ধে চরমভাবে বিরোধিতা করতেন এবং যতদূর সম্ভব প্রতিহত করতেন। অন্তরে ঘৃণা করতেন। সম্ভব হলে না যেয়ে বেঁচে থাকতেন। আর যদি কোথাও একান্ত যেতেই হতো, তাহলে শর্ত জুড়ে দিতেন। যেমন বিয়েতে গেইট থাকতে পারবে না, গায়ে হলুদ হতে পারবে না, বেগানা ছেলে-মেয়ে একসাথে ঘুরা ফেরা করতে পারবে না, বে-পর্দায় কেউ আসা-যাওয়া করতে পারবে না ইত্যাদি। আমাদের দেশে আরেকটি কুসংস্কার হলো, অধিক কাবিননামা বা মহর ধার্য করার ব্যাপারটি। প্রত্যেকে ভাবে যত বেশি মহর ধার্য করা হবে, ততই বিবাহের সাফল্য ফুটে উঠবে। সমাজে বুক ফুলিয়ে বলা যাবে। জামাই বাবুকে কাবু করা যাবে। অথচ একজনও চোখ উঁচিয়ে দেখে না যে, যা মহর ধার্য করা হচ্ছে, তার ব্যাপারে জামাই বাবুর আর্থিক সামর্থ কেমন। আদৌ পরিশোধ করতে পারবে কি না? যদি সে তা পরিশোধ না করে মারা যায়, তাহলে সে গুনাহগার হয়েই মারা যাবে। তাই তিনি মহরে ফাতিমীর ব্যাপারে সকলকে উদ্বুদ্ধ করতেন। তা ছাড়া তিনি প্রচলিত কিয়াম ও মিলাদের কঠোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলতেন, যে কাজ রাসূলের (সা.) যুগে কেউ করেননি, সাহাবায়ে কিরাম করেননি, তাবিঈনগণ করেননি, মুজাদ্দিদগণ করেননি, মুহাদ্দিসগণ করেননি, সুলাহায়ে উম্মত করেননি, বুযুর্গানে দ্বীন করেননি, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসাঈ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইবনে মাজাহ, ইমাম মালেক, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)-সহ কোনো ইমামই

---

[১৯৩] মাওলানা আবূ মূসা, মুরশীদে কামেল হযরত মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন (র.) জীবন ও আদর্শ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

Dhaka University Institutional Repository

করেননি-তা আমরা কেন করতে যাব? অধিকন্তু প্রচলিত এই মিলাদের প্রবর্তন ঘটে ৬০৪ হিজরির পরে। প্রচলিত এই ধরনের অনুষ্ঠানে যা কিছু করা হয় তা সবই সুন্নাত পরিপন্থী কাজ। হাদিয়া তুহফা, হালুয়া রুটি, বাতাশা, রসগোল্লা, সিন্নি, পিলাপী ইত্যাদি খাওয়ার বিশাল আয়োজন। একমাত্র রাসূলের (সা.) মুহাব্বতেই যদি এ সকল করা হয়, তাহলে হাদিয়া তুহফা কেন? হালুয়া বাতাশা রসগোল্লার আয়োজন কেন? আর যদি মিষ্টান্ন ভোজের আয়োজনই করা হয়, তাহলে এতে কমদামী মিষ্টি কেন? রাসূলের মুহাব্বত কি ৩০/৩৫ টাকা দরে জিলাপীর সমান? এটাই কি ভালোবাসার নমুনা!

তিনি সবসময় বলতেন, এটা রাসূল (সা.)-এর কেমন মুহাব্বতের নমুনা! নামাযের খবর নেই, রোযার খবর নেই, যাকাত দেয়ার নামে প্রহসন, হজ্জের বেলায় বাহানা, নবীর সুন্নাত নেই, দাড়ি নেই, লম্বা লম্বা মোঁচের বিশাল বাহার। অথচ নবীর মুহাব্বতের দাবীদাররা উপরোক্ত আয়োজনের জন্য মহাব্যস্ত। এগুলো নবীর শিক্ষার পরিপন্থী কাজ নয় কি?

ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসার : আমাদের মহানবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজাতিকে মানবতার বন্ধনে আবদ্ধ করে গেছেন। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দিয়ে গেছেন। সর্বপ্রথম নিজেকে সুন্নাতে নববীর রঙ্গে রঙ্গীন করতে হবে। তারপর নিজ পরিবার পরিজন, এরপর সমাজের পরিমণ্ডল, তারপর ধীরে ধীরে সমাজের সকল পরিমণ্ডলে সুন্নাতের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে যেতে হবে। সাথে সাথে আল্লাহর কাছে ব্যাপক দুআ চালিয়ে যেতে হবে, তিনি যেন তাঁর খাঁটি বান্দা হয়ে তাঁর নবীর সুন্নাত মুতাবিক চলার তাওফিক দান করেন। তাহলেই কেবল নবীর প্রকৃত উম্মত হওয়ার দাবীদার হওয়া সঠিক হবে। মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন কোনো এক বক্তব্যে বলেছেন, যদি আপনি রফিক হতে পারেন তাহলে বুঝবেন আপনার ভিতরে ইখলাস আছে আর যদি আপনি রফিক হতে না পারেন; বরং ফরীক হয়ে যান, তাহলে বুঝবেন আপনার ভিতরে ইখলাস নেই। কাজেই 'রফিক বনো, ফরীক না বনো'। অর্থাৎ কেউ কোনো দ্বীনী কাজ শুরু করার পর যদি আপনি সেই কাজকে সহযোগিতা করার মন-মানসিকতা রাখতে পারেন তাহলে আপনি রফিক হতে পারবেন। আর যদি আপনি সহযোগিতার মানসিকতা রাখতে না পারেন; বরং আলাদাভাবে একই এলাকায় নতুন করে আপনিও সেই কাজ শুরু করেন তাহলে আপনি ফরীক হয়ে গেলেন। যাহোক, আমাদেরকে এ অবস্থার পরিবর্তন করার ফিকির করতে হবে।

ইসলামী আলোচনা ছিল তাঁর অন্যতম অভ্যাস: তাঁর অন্যতম অভ্যাস ছিল কোনো মাদ্রাসার ছাত্র দেখলে তিনি তাঁকে কাছে ডেকে বসাতেন। আদর-সোহাগ করতেন। আপ্যায়ন করাতেন। সার্বিক লেখাপড়ার খবরা-খবর নিতেন। তারপর তার সাথে ইল্মী আলোচনা জুড়ে দিতেন। জটিল জটিল প্রশ্ন করতেন। আরবী ও ইসলামী শিক্ষাসহ আকীদা, নাহু সরফ তারকীব বিশুদ্ধ ইবারত এ সকল ব্যাপারে বেশি প্রশ্ন করতেন। পরে তার সুন্দর সমাধানও দিয়ে দিতেন। আর বলতেন, 'আমরাতো আলিয়া মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছি তোমরাতো কওমী মাদ্রাসায় পড়ো' জবাব দাও! এতে তাঁর ইলমের গভীরতা ফুটে উঠত।[১৯৪]

মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন (রহ.)-এর খলিফাবৃন্দ : মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন (রহ.) তাযকিয়ায়ে নফসের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনকে খলিফা হিসেবে রেখে যান। যাঁরা শরীয়ত ও ত্বরিকতের ধারক ও বাহক। যার মাধ্যমে সমাজের মানুষ আজও হেদায়েতের আলোয় আলোকিত হচ্ছে এবং হাজারও মানুষ ইসলামের প্রচারক ও প্রসারক হিসেবে তৈরি হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য খলিফাবৃন্দ হলেন- (১) মাওলানা আবতারুজ্জামান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, (২)

[১৯৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, (৩) মাওলানা আলী আকবর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, (৩) মাওলানা ইসমাইল, প্রাক্তন মুহতামিম, ফরিদাবাদ, ঢাকা, (৪) মাওলানা আনোয়ার উল্লাহ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা, (৫) মাওলানা আলী হোসাইন, কিশোরগঞ্জ, (৬) মাওলানা আব্দুল মান্নান, ফেনী, (৭) মাওলানা সুফী আব্দুল জাব্বার, নোয়াখালী, (৮) মাওলানা মোশাররফ হোসাইন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন (রহ.)-এর উল্লেখযোগ্য শিষ্যবৃন্দ : (১) মাওলানা ইবরাহীম, প্রাক্তন, বোর্ড কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, (২) মাওলানা আনোয়ার উল্লাহ, প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম, নবাবকরা মাদ্রাসা চৌদ্দগ্রাম, (৩) মাওলানা নুর হোসেন কাসেমী, শায়েখুল হাদীস ও প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম জামিয়া মাদানিয়া, বারিধারা, ঢাকা (৪) মাওলানা ইসমাইল হোসেন, প্রিন্সিপাল, সিরাজগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসা, (৫) মাওলানা আব্দুস সাত্তার, খতীব, বিএলআর জামে মসজিদ, ঢাকা, (৬) মাওলানা সফিকুল আলম (চিলুয়া), সাবেক প্রিন্সিপাল, লাল চাঁদপুর মাদ্রাসা, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা (৭) মাওলানা আসেম বিল্লাহ, সাবেক মুহতামিম, মুন্সিহাট হোসাইনিয়া মাদ্রাসা, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা প্রমূখ।[১৯৫]

মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন (রহ.)-এর কিছু মূল্যবান উপদেশঃ

- কুরআন সুন্নাহর মতো জীবন-যাপন করবে।
- আহলুল্লাহ ও আহলে ইলমের সাথে সুসম্পর্ক রাখবে।
- যে কোন ধরনের বেয়াদবি থেকে নিজেকে দূরে রাখবে।
- মৃত্যুর পর যতশীঘ্র দাফন করবে, লাশ দাফনে দেরি করবে না।
- সব সময় আল্লাহর ফয়সালার ওপর রাযি থাকবে।
- কর্ম জীবনে নিষ্ঠার সাথে কাজ করবে।
- সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে, বিদ'আতের সাথে কোনো আপোষ করবে না।
- হকের ওপর থাকবে, নিজের নাজাতের জন্য হককে মাপকাঠি বানাবে।[১৯৬]

মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন (রহ.) সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার-

১। **মাওলানা নুর হোসাইন কাসেমী, প্রিন্সিপাল, বারিধারা মাদ্রাসা, ঢাকা** - তিনি বলেন, আমি তাঁর জীবনে যে বিষয়টি বারংবার লক্ষ্য করেছি তাহলো তাঁর মেধার পরিধি এতে ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল যে, তিনি কিতাবের কঠিন কঠিন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে অতি সংক্ষেপে স্বল্পসময়ে সাবলীল ভাষায় ছাত্রদের সামনে পেশ করতেন পারতেন। যার ফলে বিষয়টি বুঝতে খুবই সহজবোধ্য হয়েছে এবং সময়ও কম লেগেছে। তিনি তাঁর দারস ও তাদরীসের ব্যাপারে এতে গুরুত্বারোপ করতেন যে, দারস ও তদারীসের নির্দিষ্ট সময়ে অন্য কোন কাজ মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি ছিলেন একজন কামেল পীর। বিভিন্ন বিদ'আত ও কুসংস্কারে দূরীকরণে তাঁর ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।[১৯৭]

---

[১৯৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১-৬২।

[১৯৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

[১৯৭] সাক্ষাৎকার : তারিখ ২৫ এপ্রিল ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

২। **মাওলানা শফিকুল আলম, প্রিন্সিপাল, লালচাদপুর মাদ্রাসা, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা-** তিনি বলেন, শায়েখুল হাদীস মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন (রহ.) আমাদের জন্য যেমনিভাবে শোকের কারণ তেমনিভাবে আমাদের জন্য সান্ত্বনা। শোক তো এজন্য যে, তাঁর মৃত্যুতে এতো বড় একজন মহামনীষী আমাদের মাঝ থেকে চলে গেছেন, আর সান্ত্বনা এ জন্য যে, দুনিয়ার ফিতনা থেকে তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। তিনি ছিলেন বহুমুখী গুণের অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অনেক কিছু দান করেছেন। আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার প্রসারে তিনি ছিলেন খ্যাতিমান আলেম। সমাজে তিনি ছিলেন একজন সুহৃদয় ব্যক্তি, সদালাপী, দিল-দরাজ, সকল মানুষ তাঁকে ভালোবাসতো।[১৯৮]

৩। **শায়েখুল হাদীস মাওলানা আস'আদ বিন দেলোয়ার হোসাইন -** তিনি বলেন, আমার আব্বাজন একজন আলেম ও ফকীহ ছিলেন। আলেম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ অর্থাৎ একমাত্র আলেমরাই আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে।[১৯৯] পরহেযগার শুধুমাত্র আলেমরাই। এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, আলেমের মর্যাদা আল্লাহর নিকট কত বেশি, আলেম আল্লাহর নিকট কত পছন্দনীয়। সুতরাং আমার বাবা একজন প্রকৃত আলেম হিসেবে পুরো জীবনই দ্বীনের খেদমতে কাটিয়ে গেছেন।[২০০]

৪। **মাওলানা বদিউল আলম, প্রিন্সিপাল মান্দ্রা মাদ্রাসা, লাঙ্গলকোট -** তিনি বলেন, মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন (রহ.) ছিলেন একজন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, সমাজ সংস্কারক ও আদর্শ জীবনের এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তিনি ছিলেন বাতিলের বিরুদ্ধে খুবই কঠোর। সত্যের পথে ছিলেন অবিচল এক অসাধারণ মহান ব্যক্তিত্ব, অপর দিকে তিনি অসহায় দরিদ্র ও নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের বন্ধু। তিনি স্বভাবগতভাবে অল্প কথা বলতেন। তাঁর প্রতিটি কথা ছিল জ্ঞান ও হিকমত পূর্ণ। সত্যকথা বলতে তিনি যেমন বাতিলের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করতেন না তেমনি বাতিল শক্তি তাঁকে সত্যের পথ থেকে একবিন্দুও সরাতে পারেনি।

---

[১৯৮] সাক্ষাতকার : তারিখ ২০ মার্চ ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ।
[১৯৯] আল-কুরআন; সূরা ফাতির : ২৮।
[২০০] সাক্ষাতকার : তারিখ ১১ মে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-১.৩ : মাওলানা আবুল ফারাহ মো. মাকুছুদুর রহমান (রহ.) (১৯৪১-১৯৯৪ খ্রি.)

মাওলানা আবুল ফারাহ মো. মাকছুদুর রহমান কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম[২০১] উপজেলার ৮নং মুন্সীরহাট ইউনিয়নের সিংরাইশ গ্রামে ১ মার্চ ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[২০২] পিতার নাম মুন্সী বাদশা মিয়া ও মাতার নাম আম্বারুন্নেসা।[২০৩] স্বীয় মাতা আম্বারুন্নেসার কাছেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার হাতে খড়ি হয়। তাঁর পিতা তাঁকে পার্শ্ববর্তী খিরনশাল গ্রামের মুন্সী জিন্নাত আলী সাহেবের নিকট মক্তবের শিক্ষা গ্রহণ করার পর তাঁকে মাস্টার আকমত আলী সাহেবের তত্ত্বাবধানে খিরনশাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর পার্শ্ববর্তী লাকসাম উপজেলাধীন যুক্তিখোলা মাদ্রাসায় ভর্তি করেন। সেখানে তিনি মাওলানা ইব্রাহীম সাহেবের তত্ত্বাবধানে থেকে অত্যন্ত সুখ্যাতির সাথে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ দাখিল পাস করেন।[২০৪] অতঃপর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য নোয়াখালী জেলার লক্ষ্মীপুর উপজেলার তৎকালীন ঐতিহ্যবাহী ইসলামী বিদ্যাপীঠ টুমচর ইসলামীয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় আলিমে ভর্তি হন। অত্র মাদ্রাসায় তিনি ফাযেল পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। তখনকার সময়ে টুমচর মাদ্রাসাটি ছিল ঐতিহ্যবাহী একটি মাদ্রাসা। সেখানে শিক্ষকতা করতেন অনেক বড় বড় প্রসিদ্ধ আলেমগণ তিনি সে সকল বিগদ্ধ পণ্ডিত শিক্ষকদের সংস্পর্শে এসে ইসলামী শিক্ষায় ব্যাপক বুৎপত্তি অর্জন করেন। সেখান থেকে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে আলিম পরীক্ষায় ১ম বিভাগে এবং ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে সরকারি বৃত্তি সহকারে ফাযেল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে পাস করেন।[২০৫] এরপর ইলমে হাদীসে উচ্চতর জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বর্তমান বাংলাদেশ ইসলামী শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় কামিল হাদীস বিভাগে ভর্তি হয়ে উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিগগণের সংস্পর্শে এসে ইলমে হাদীসে বুৎপত্তি অর্জন করেন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে কামিল হাদীস বিভাগ মেধা তালিকায় ১ম শ্রেণিতে ৩য় স্থান অধিকার করেন।[২০৬] অতঃপর ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ফিকহ্ বিভাগ থেকে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে মেধাতালিকায় ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার করেন।[২০৭] মাওলানা মাকছুদুর রহমান অনেক মুহাদ্দিসের নিকট ইলমে হাদীসের শিক্ষা অর্জন করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-[২০৮] মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্সান

---

[২০১] কুমিল্লা জেলার ১১টি উপজেলার মধ্যে একটি উপজেলা হলো চৌদ্দগ্রাম। এর আয়তন ২৬৮.৪৮ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে কুমিল্লা সদর উপজেলা, দক্ষিণে ফেনী সদর, দাগনভূইয়া উপজেলা, পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, পশ্চিমে সদর দক্ষিণ, নাঙ্গলকোট, লাকসাম ও মনোহরগঞ্জ উপজেলা। (অফিস রেকর্ড, উপজেলা নির্বাহী অফিস, চৌদ্দগ্রাম: বাংলা পিডিয়া, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯-৪০০)।

[২০২] স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষক সম্পর্কিত তথ্য ২০.১০.১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা মাকুছুদুর রহমান কর্তৃক ব্যানবেইস জরিপ ফরম হতে পূরণকৃত। যা কুমিল্লা আলিয়া মাদ্রাসার অফিস রেকর্ড থেকে প্রাপ্ত।

[২০৩] মাওলানার বড় ছেলে মাওলানা আ.ন.ম মুখলেছুর রহমান, সুপার, সিংরাইশ মহিলা দাখিল মাদ্রাসা হতে সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়।

[২০৪] মাওলানা মাকুছুদুর রহমান (রহ.)-এর জীবনী, অপ্রকাশিত। তাঁর জামাতা মাওলানা শাহ মোহাম্মদ মহিউদ্দীন, (উপাধ্যক্ষ, দৌলতগঞ্জ গাজীমুড়া আলিয়া মাদ্রাসা)-এর নিকট সংরক্ষিত।

[২০৫] ব্যানবেইস ফরম, প্রাগুক্ত; ড. আহসান সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪।

[২০৬] ব্যানবেইস ফরম, প্রাগুক্ত; মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১।

[২০৭] ব্যানবেইস ফরম, প্রাগুক্ত; ড. আহসান সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪।

[২০৮] কামিল হাদীস সনদ, তখনকার সময়ে সর্বশেষ সনদে ঐ শ্রেণির শিক্ষকগণের স্বাক্ষর থাকত। মাওলানা মাকছুদুর রহমানের কামিলের হাদীস সনদ, ১৩ জন শিক্ষকের স্বাক্ষর ছিল। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

(রহ.), আল্লামা আবদুর রহমান কাশগরী (রহ.)[২০৯], মাওলানা আবদুস সাত্তার বিহারী (রহ.)[২১০], মাওলানা উবায়েদুল হক (রহ.), আবু তাহের মুহাম্মদ আবদুল হক (রহ.) প্রমূখ। মাওলানা মাকছুদুর রহমান (রহ.) ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুন ইন্তেকাল করেন। পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[২১১]

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা মাকছুদুর রহমান (রহ.)-এর অবদান-

মাওলানা মাকছুদুর রহমান উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করে জ্ঞান শিক্ষাদানের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষকতার পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমে তিনি নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জস্থ সোনাইমুড়ী হামিদিয়া আলিয়া মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। সেখানে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইলমে দ্বীনের প্রচার-প্রসারে তিরমিযি শরীফ, নাসাঈ শরীফ, মেশকাত শরীফসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ শিক্ষা দান করেন। অতঃপর ধনুয়াখোলা আহমদিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কর্মরত থেকে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারে ব্যাপক অবদান রাখেন। পরবর্তীতে কুমিল্লা আলিয়া মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। সেখানে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন।[২১২] অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ পদে কর্মরত থেকে তিনি কুরআন হাদীসের শিক্ষা দানের ব্যাপারে আন্তরিকভাবে তেমন তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না। তাই তিনি প্রত্যক্ষভাবে মুহাদ্দিস পদে যোগদান করে সিহাহ্ সিত্তার পাঠদান করার জন্য অতিশয় উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। যার ফলে তিনি ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে সোনাকন্দা আলিয়া মাদ্রাসায় মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। সেখানে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বুখারী, তিরমিযি শরীফসহ হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ শিক্ষাদানের পর পুনরায় ১৯৭৫ সালে কুমিল্লা আলিয়া মাদ্রাসায় মুহাদ্দিস পদে ফিরে আসেন। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি এখানে কর্মরত থেকে কুরআন, তাফসির ও হাদীস শিক্ষাদানে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ কুরআন তাফসীর সংসদ কুমিল্লা-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং ফতুয়া ও ধর্মীয় প্রচার দপ্তর কুমিল্লা এর মুফতীর দায়িত্ব পালন করেন।[২১৩]

হাদীস চর্চায় তাঁর বিশেষ অবদানঃ মাওলানা মাকছুদুর রহমান কুমিল্লা জেলায় বিশেষ করে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক খিদমত করেছেন। তাঁর অসামান্য অবদান সর্বজন স্বীকৃত। কারণ তিনি দীর্ঘ

---

[২০৯] আল্লামা আবদুর রহমান কাশগরী (রহ.) চীনা তুরস্কের কাশগড় নগরে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় আলিমগণের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা শেষ ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ভারতের নদওয়াতুল উলামা মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে দাওরায়ে হাদীস পাস করেন। কিছুদিন নদওয়াতুল উলামায় শিক্ষকতা করার পর ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢকা আলিয়া মাদ্রাসায় হাদীসসহ অন্যান্য কিতাবসমূহ শিক্ষাদান করেন। অবশেষে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ১ এপ্রিল ইন্তেকাল করেন। (ড. আহসান সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১-১৩২)।

[২১০] মাওলানা আবদুস সাত্তার বিহারী (রহ.) পাটনায় বিহার প্রদেশের সারায়ে নামক পল্লীতে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় আলিমদের নিকট সমাপ্ত করে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ হুগলী মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে আলিম, ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ফাযেল এবং ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে কামিল (টাইটেল) পাস করেন। শিক্ষাজীবন শেষ করে ১৯২৮-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেন্ট্রাল মাদ্রাসায় পরীক্ষা বোর্ডের সহকারী রেজিষ্ট্রারের দায়িত্ব পালন করে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় এসে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় হাদীসসহ অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করে। (ড. এ.এফ.এম. আমীনুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭)।

[২১১] কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলায় ৮নং মুন্সীরহাট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. শাহ্ আলম মোল্লা কর্তৃক স্বাক্ষরিত মৃত্যু সনদ।

[২১২] মাওলানার জীবনী, অপ্রকাশিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫।

[২১৩] মো. আবুল খায়ের, অধ্যক্ষ, ইসলামীয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, আদালত, কুমিল্লা ও সেক্রেটারি জেনারেল বাংলাদেশ কুর'আন তাফসীর সংসদ, কুমিল্লা হতে প্রাপ্ত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

৩৫ বছর যাবৎ আরবী ও ইসলামী শিক্ষাসহ বিশেষ করে হাদীসে দারস, গ্রন্থরচনা, মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা, ওয়াজ-মাহফিল, জুমার খুতবা প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন। এ দীর্ঘ সময়ে তিনি বিভিন্ন মাদ্‌রাসায় সিহাহ্ সিত্তাসহ ফাযেল ও কামিলে অধিকাংশ কিতাব পাঠদান করাতেন। তাঁর নিকট ইলমে হাদীসের শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্ত থেকে অনেক ছাত্র ও শিক্ষক আগমন করতেন। বিশেষ করে কুমিল্লা জেলায় তৎসময়ে কুমিল্লা আলিয়া মাদারাসায় আরবী ও ইসলামী বিষয়ে শিক্ষাদানের একটি উচ্চাংগের প্রতিষ্ঠানরূপে খ্যাতি লাভ করে। কামিল হাদীস বিভাগের কারণে কুমিল্লা আলিয়া মাদ্‌রাসা যে খ্যাতি অর্জন করে এর পিছনে তাঁর অবদান বিজড়িত। শুধু তাই নয়, মাওলানা মাকছুদুর রহমান ও তাঁর এ সকল প্রতিষ্ঠনকে ঘিরে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রচার-প্রসারে এক নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি যে সকল প্রতিষ্ঠানে কুরআন-হাদীসের শিক্ষা দিয়েছিলেন সেখান থেকে অনেক আলিম ও মুহাদ্দিস তৈরি হয়েছিল। যারা দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কুরআন-হাদীসসহ অন্যান্য দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষাদানে নিয়োজিত আছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-[২১৪]

১. প্রফেসর ড.এ.বি.এম ছিদ্দিকুর রহমান আশ্রাফী, আল-কুরআন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
২. প্রফেসর ড.এম. এয়াকুব আলী, আল-কুরআন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
৩. মাওলানা আ.ন.ম. তাজুল ইসলাম, অধ্যক্ষ, দৌলতগঞ্জ গাজীমুড়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, কুমিল্লা।
৪. মাওলানা মো. ছানা উল্লাহ বাশারী, মুহাদ্দিস, কুমিল্লা ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা।
৫. মাওলানা মো. গোলাম মোস্তফা শাহ্, মুহাদ্দিস, কুমিল্লা ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা।
৬. মাওলানা আলী আকবর ফারুকী, অধ্যক্ষ, বরুড়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, কুমিল্লা।
৭. মাওলানা মো. একরাম হোসেন, অধ্যক্ষ, ভাদুঘর ডি.এস. কামিল মাদ্‌রাসা, বি. বাড়িয়া।
৮. মাওলানা আবু হামেদ মো. নোমান, সাবেক অধ্যক্ষ, বরুড়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, কুমিল্লা।
৯. মাওলানা মো. নেয়ামত উল্লাহ আযহারী, অধ্যক্ষ, পাঁচথুবী ফাযেল মাদ্‌রাসা, বরুড়া, কুমিল্লা।
১০. ফরিদ আহমদ মজুমদার, সহযোগী অধ্যাপক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১. মো. আবুল খায়ের, অধ্যক্ষ, ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, কুমিল্লা ও সেক্রেটারি জেনারেল বাংলাদেশ কুর'আন তাফসীর সংসদ, কুমিল্লা।
১২. মাওলানা কাজী শহীদ উল্লাহ, উপাধ্যক্ষ, চৌয়ারা ইসলামিয়া ফাযেল মাদ্‌রাসা, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।
১৩. মাওলানা মোহাম্মদ ওয়াহীদুর রহমান, উপাধ্যক্ষ, চৌয়ারা ইসলামিয়া ফাযেল মাদ্‌রাসা। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন এলাকায় ওয়াজ-মাহফিলের মাধ্যমে সমাজের অবহেলিত মানুষকে কুর'আন ও হাদীসের শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য আজীবন চেষ্টা চালিয়ে যান। তিনি নারীদেরকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য নিজ গ্রামে সিংরাইশে একটি মাদ্‌রাসা[২১৫] প্রতিষ্ঠা

---

[২১৪] মাওলানা শাহ মো. মহিউদ্দীন, উপাধ্যক্ষ, দৌলতগঞ্জ গাজীমুড়া আলিয়া মাদ্‌রাসা ও তদীয় জামাতা হতে সাক্ষাতকার সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য।

[২১৫] মাওলানা মাকছুদুর রহমান ১-১-১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে নিজ গ্রাম সিংরাইশ মহিলাদের জন্য একটি মাদ্‌রাসা করেন। এ মাদ্‌রাসা ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের দাখিলের সরকারি মঞ্জুরি লাভ করে। মাদ্‌রাসার বর্তমান ছাত্রী সংখ্যা ৫০০ জন, শিক্ষক ১৭ জন এবং কর্মচারী ৫ জন। প্রতিষ্ঠাতা সুপার ছিলেন নাঙ্গলকোট উপজেলার মাওলানা এ.জেড.এম ইয়াছিন ভূঁইয়া এবং ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে অদ্যাবধি ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ সুপারের দায়িত্ব আছেন মাওলানা মাকছুদুর রহমান-এর বড় ছেলে মাওলানা আ.ন.ম. মুখলেছুর রহমান। (অফিস রেকর্ড, সিংরাইশ মহিলা দাখিল মাদ্‌রাসা, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা)।

Dhaka University Institutional Repository

করেন। যা নারীদের মাঝে আরবী ও ইসলামী শিক্ষাসহ অন্যান্য দ্বীনী ইল্‌ম প্রসারে আগ্রহী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।[২১৬] তিনি ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে চাকরি থেকে অব্যাহতি নেন।

উল্লেখযোগ্য রচনাবলি : মাওলানা মাকছুদুর রহমান দীর্ঘ সময় ধরে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। যা আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচাস প্রসারে তৎকালীন সময়ে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। নিম্নে তার রচিত গ্রন্থগুলো উল্লেখ করা হলো-

১. **তাছাওয়ুফাতে আউলিয়া:** উক্ত গ্রন্থে তিনি সুফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুর থেকে শুরু করে সোনাকান্দার পীর মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী পর্যন্ত ঐ সিলসিলার যত পীর ছিলেন তাঁদের সম্পর্কে এবং তাঁদের ধারাবাহিকক সূত্র সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

২. **মাখজানুত তাহকীক:** উক্ত গ্রন্থে তিনি আরবী বর্ণমালার ধারাবাহিকতায় কঠিন শব্দসমূহের বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন আলিফ দিয়ে কুর'আন-হাদীসে যেসব কঠিন শব্দ এসেছে সেগুলোর তাহকীক করে কুর'আন-হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে ঐ শব্দের ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখিয়েছেন।

৩. **দোয়ার ভান্ডার:** উক্ত গন্থে তিনি কুর'আন-হাদীসের মধ্যে যেসব দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো একত্রিত করে কোন কোন রোগের জন্য কি দোয়া পড়তে হয় হাদীসের আলাকে তা বর্ণনা করেছেন।

৪. **বিতর্ক মাসায়েলের মীমাংসা:** কবরের ভিতরে দাঁড়িয়ে আযান, আযানের মুনাজাত, খুতবার আযান, মিলাদ, কিয়াম এবং রাসূল (স.) হাজের নাজের কিনা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অত্র এলাকায় যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল তিনি উক্ত গ্রন্থে কুর'আন-হাদীসের আলোকে তার সমাধান দিয়েছেন।

৫. **আধুনিক পঞ্চভাষা ওয়ার্ড বুক:** ভাষাগুলো হল বাংলা, আরবী, উর্দু, ফার্সী ও ইংরেজি। তবে আরবদের কিছু ব্যবহারিক আরবীও এতে সংযোজন করা হয়েছে।

৬. **মিজান (উর্দু ভাষায়) :** যা সরফ বুঝার জন্য খুবই উপকারী।

মাওলানা মাকছুদুর রহমান (রহ) সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত-

১. মাওলানা আলী হোসাইন, সাবেক অধ্যক্ষ কুমিল্লা আলিয়া মাদ্‌রাসা। তিনি বলেন, মাওলানা মকছুদুর রহমান অনেক বড় মুহাদ্দিস ছিলেন। কুরআন-হাদীস সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান থাকায় তিনি অনেক জটিল বিষয় অতি সহজে সমাধান দিতে পারতেন। শিক্ষক হিসেবেও তিনি ছিলেন সফল। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করতেন। তিনি সহজ-সরল, মুত্তাকী, মিষ্টভাষী, সদালাপী, স্নেহশীল, বিনয়ী, নম্র-ভদ্র উচুঁমানের মুহাদ্দিস ছিলেন।[২১৭]

২. মাওলানা মো. গোলাম মোস্তফা শাহ্‌, মুহাদ্দিস কুমিল্লা আলিয়া মাদ্‌রাসা। তিনি বলেন, মাওলানা মাকসুদুর রহমান ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারী একজন হক্কানী আলেম, বুজর্গ ও ছাত্র হিতৈষী মুহাদ্দিস। তিনি যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী একজন আদর্শ, খোদাভীরু ও স্নেহশীল শিক্ষক ছিলেন। তাঁর ক্লাসগুলো ছিল খুবই আকর্ষণীয়, যার কারণে আমরা তাঁর ক্লাসেগুলো মনোযোগের সাথে করতাম।[২১৮]

---

[২১৬] মাওলানা আ.ন.ম. মুখলেছুর রহমান, সুপার সিংরাইশ মহিলা দাখিল মাদ্‌রাসা, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা, ২০ এপ্রিল ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে সাক্ষাতকার সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য।

[২১৭] কুমিল্লা আলিয়ার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা আলী হোসাইন-এর নিকট থেকে গবেষক ০৫-১০-২০১৬ খ্রিস্টাব্দে ব্যক্তিগত সাক্ষাতরারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়।

[২১৮] মাওলানা গোলাম মোস্তফা শাহ, বর্তমান মুহাদ্দিস, কুমিল্লা আলিয়া মাদ্‌রাসা গবেষক ১৫-১২-২০১৬ খ্রিস্টাব্দে হতে সাক্ষাতকার সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

৩. মাওলানা আলী আকবর ফারুকী, অধ্যক্ষ সুন্নিয়া ফাযেল মাদ্‌রাসা। তিনি বলেন, মাওলানা মাহফুজুর রহমান ছিলেন কুরআন হাদীসের জ্ঞানের ভান্ডার। যখনই কোন হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করতাম সাথে সাথে কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতির মাধ্যমে তা বলে দিতেন। শুধু তাই নয়, কুরআন-হাদীসের কোন গ্রন্থের কোন অধ্যায়ে আছে তাও বলে দিতেন এবং কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা কুর'আন বা অন্য হাদীসের মাধ্যমে সমাধান করতেন।[২১৯]

৪. মাওলানা আ.ন.ম তাজুল ইসলাম বলেন, তিনি খুবই নরম প্রকৃতির ছিলেন। ছাত্রদের সাথে বন্ধু সুলভ সম্পর্ক ছিল। তিনি দু'পদ্ধতিতে হাদীস শিক্ষা দিতেন। প্রথমত: তিনি নিজে হাদীসের ইবারত পড়তেন ছাত্ররা শুনত। হাদীস পড়া শুনে মনে হত সমস্ত হাদীস তাঁর মুখস্থ। দ্বিতীয়ত: ছাত্ররা হাদীসের ইবারত পড়ত তিনি তা শুনতেন। হাদীস পড়ার পর প্রথমে রাবীদের সম্পর্কে আলোকপাত করে কঠিন শব্দগুলো নিয়ে আলোচনা শেষে ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ করতেন। অতঃপর হাদীস সংশ্লিষ্ট ফিকহী মাসা'আলা থাকলে তা বর্ণনা করতেন। কখনও হাদীস বর্ণনার কারণ, হাদীসের বিষয়বস্তুর সাথে কুর'আনের আয়াতের মিল থাকলে সে বস আয়াতের উদ্ধৃতি দিতেন। সর্বোপরি তিনি হাদীসকে এমনভাবে উপস্থাপন করতেন যে ছাত্ররা তা সহজেই আয়ত্ব করতে পারত।[২২০]

পরিশেষে বলা যায়, মাওলানা মাহফুজুর রহমান আরবী ও ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা, ওয়াজ-মাহফিল, গ্রন্থ-রচনা ও খতীবের দায়িত্ব পালনসহ আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে যে অবদান রেখেছেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

---

[২১৯] মাওলানা আলী আকবর ফারুকী, বর্তমান অধ্যক্ষ, বরুড়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা গবেষক ০৬-১১-২০১৬ খ্রিস্টাব্দে হতে সাক্ষাতকার সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য।

[২২০] মাওলানা আ.ন.ম তাজুল ইসলাম, বর্তমান অধ্যক্ষ, দৌলতগঞ্জ গাজীমুড়া আলিয়া মাদ্‌রাসা গবেষক ২৬-০৮-২০১৬ খ্রিস্টাব্দে হতে সাক্ষাতকার সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-১.৪ : শায়খুল হাদীস মাওলানা আশরাফ উদ্দীন আহমেদ (রহ.) (১৯২১-২০০০খ্রি.)

শায়েখুল হাদীস মাওলানা আশরাফ উদ্দীন আহমেদ ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা জেলার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিগত দুই শতাব্দীর ধরে কুমিল্লা জেলায় যারা ইসলামের প্রচার-প্রসারে বিশেষ অবদান রেখেছেন তাঁর পূর্বপুরুষদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পিতার নাম মৌলভী কলীমুল্লাহ, মাতার নাম সালেহা খাতুন। পড়ালেখা শুরু হয় দাদা রওশন আলী সাহেবের মাধ্যমে। সে সময় মাওলানা আশরাফ উদ্দীন আহমেদের বড় চাচা মৌলভী ফয়জুল্লাহ সাহেব বাড়িতে একটি প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং অত্র প্রতিষ্ঠানে তিনি নিজেই শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করতেন।[২২১] আশরাফ উদ্দীন এ স্কুলে চাচার নিকট দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। অতঃপর পার্শ্ববর্তী গ্রাম কমলাপুর[২২২] স্কুলে ভর্তি হয়ে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। সে সময় প্রধান শিক্ষক ছিলেন রায়চো গ্রামের চন্দ্রসাগর সাহা। আশরাফ উদ্দীন সৈয়দপুর স্কুলে অধ্যয়নকালে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে শেরেবাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক স্কুলটির মঞ্জুরি দেওয়ার জন্য স্কুল পরিদর্শনে আসেন। তখন তিনি ছিলেন তৎকালীন যুক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী। আশরাফ উদ্দীন উদ্দীন স্কুলের প্রতিটি পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করেন। ষষ্ঠ শ্রেণি পাস করার পর এক বছর যাবৎ অলীতলা মাদ্‌রাসায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষার জ্ঞান লাভ করেন। অলীতলা মাদ্‌রাসায় এক বছর পড়ার পর তাঁর নানা ছমিরুদ্দীন মিয়াঁজী তাঁকে কৈকরী মাদ্‌রাসায় ভর্তি করিয়ে দেন। কৈকরী মাদ্‌রাসাটি তখন জামাতে নাহম পর্যন্ত ছিল। তাছাড়া সেখানে ছিল উন্নতমানের একটি ক্বিরাত বিভাগ। সেখানে অনেক দূর-দূরান্ত থেকে আগত ছাত্ররা ক্বিরাত বিভাগে ভর্তি হয়ে ইলমে-কেরাতের ওপর বিশেষ জ্ঞান লাভ করতো। আশরাফ উদ্দীন অত্র মাদ্‌রাসায় এক বছরে জমাতে দাহম-নাহমসহ ক্বিরাত বিভাগের পড়ালেখা শেষ করেন। অতঃপর কৈকরী মাদ্‌রাসা থেকে বরুড়া মাদ্‌রাসায় জামাতে হাশ্‌তমে ভর্তি হয়ে মেশকাত জামাত পর্যন্ত অত্যন্ত কৃতিত্বেও সাথে পড়ালেখা করেন। উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন। তখন দেওবন্দ মাদ্‌রাসার দারুল একামার দায়িত্বে ছিলেন মাওলানা হাবীবুল্লাহ (রহ.)। মাওলানা আশরাফ উদ্দীন দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম বছর ছুল্লাম, মাক্বামাতে হারীরী, মাইবুযী ও দ্বিতীয় বছর মেশকাত জামাত এবং তৃতীয় বছর দাওরায়ে হাদীস পড়েন। চতুর্থ বছর তাফসীর জামাত শেষ করেন।[২২৩] মাওলানা আশরাফ উদ্দীন দাওরায়ে হাদীস শেষ করার পর শায়েখুল ইসলাম মাওলানা সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদনীর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। শায়েখুল ইসলাম মাদানী (রহ.) ছিলেন মাওলানা আশরাফ উদ্দীনের সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি।

মাওলানা আশরাফ উদ্দীন সাহেব বরুড়া মাদ্‌রাসার মাওলানা জাফর সাহেবের ভাইয়ের মেয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর ৩ ছেলে ও ৪ মেয়ে ছিল। তিনি ১৯ ডিসেম্বর ২০০০ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তাঁর জানাযার নামাজের ইমামতী করেন মাওলানা জাফর আহমদ আশরাফী (রহ.)। পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[২২৪]

---

[২২১] মাওলানা আশরাফ উদ্দিন আহমদ, স্মারক গ্রন্থ, (ঢাকা: জাভেদ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২০০৩খ্রি.), পৃ. ৩০৪।

[২২২] এ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সৈয়দপুরের আকমত আলী মাস্টার। বাবুটিপাড়ার শাহেদ আলী ভূঁইয়া তালুকদার স্কুলের খরচ চালাতেন। এ জন্যে স্কুলের নাম দেওয়া হয় সৈয়দপুর আলী হাইস্কুল। (কু.জে.ই.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০২।

[২২৩] মাওলানা আশরাফ উদ্দিন আহমদ, স্মারক গ্রন্থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫-৩১৮।

[২২৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫-৩১৮।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা আশরাফ উদ্দীন আহমেদ (রহ.)-এর অবদান-

মাওলানা আশরাফ উদ্দীন আহমেদ ছিলেন একজন হাক্কানী আলেম ও সমাজ সংস্কারক। সমাজের মানুষকে আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসার করাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তাছাড়া তিনি সমাজ থেকে বিভিন্ন কুসংস্কার দূর করার লক্ষ্যে ইসলামের প্রচার প্রসারে জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। প্রতিষ্ঠা করেন বিভিন্ন মাদ্‌রাসা। তাঁর উদ্ভাবনীমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার ও আরবী ও ইসলামী শিক্ষার যে উন্নতি সাধিত হয় তা ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন। নিম্নে তার উল্লেখযোগ্য অবদান পেশ করা হলো।

বরুড়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা: মাওলানা আশরাফ উদ্দীন আহমেদ দারুল উলূম দেওবন্দে পড়াকালীন সময় দেশের ওস্তাদদের নিকট পত্র মারফত যোগাযোগ রাখতেন। তাঁদের মধ্যে কুমিল্লা জেলার মাওলানা ইয়াসীন (রহ.) এবং সদরুল মুদাররিসীন মাওলানা কোরবান আলী (রহ.) ছিলেন উল্লেখযোগ্য। মাওলানা আশরাফ উদ্দীন তাকমীলে অধ্যয়নকালে বরুড়া মাদ্‌রাসার মুহতামিম সাহেব তাকে অত্র মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতার প্রস্তাব দেন। ওস্তাদদের নির্দেশ মোতাবেক শিক্ষক হিসেবে বরুড়া মাদ্‌রাসায় যোগদান করেন এবং তাঁর যোগদানের মাধ্যমে বরুড়া মাদ্‌রাসায় নতুন করে দাওরায়ে হাদীসের ক্লাস খোলা হয়। তিনি শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করে হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ কিতাব নাসায়ী শরীফ, আবু দাউদ শরীফসহ বিভিন্ন কিতাব পড়ান। তিনি যখন হিদায়া পড়াতেন তখন উদ্ভূত ফিকহের মাসয়ালাগুলো চার মাযহাবের আলোকে বর্ণনা করতেন। বিভিন্ন কঠিন কঠিন মাসয়ালা এমনভাবে বর্ণনা করতেন, যাতে ক্লাসের সকল ছাত্র বিষয়টি সহজভাবে বুঝতে পারে, সে আলোকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও করতেন। মাসয়ালা বর্ণনায় কুরআন হাদীসেরও উদ্ধৃতি ব্যবহার করতেন।

ধনুয়াখলা মাদ্‌রাসা স্থাপন ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন : মাওলানা আলী আহমদ (রহ.) গ্রামবাসীর সার্বিক সহযোগিতায় ধনুয়াখলা উত্তর পাড়ায় ১৩৫২ বাংলা সনে অত্র মাদ্‌রাসাটি স্থাপন করেন। মাদ্‌রাসাটি তখন কওমী নেসাবের শরহে বেকায়া পর্যন্ত ছিল। মাওলানা আলী আহমদকে মাদ্‌রাসার প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন। তাঁর মৃত্যুর পর মাদ্‌রাসা প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এলাকাবাসী মাওলানা আশরাফ উদ্দীনকে মাদ্‌রাসাটি পরিচালনার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। মাওলানা আশরাফ উদ্দীন এলাকাবাসীর অনুরোধক্রমে বরুড়া মাদ্‌রাসা থেকে চার মাসের ছুটি নিয়ে এসে ধনুয়াখলা মাদ্‌রাসার পরিচালনা ও শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। মাদ্‌রাসাটির শিক্ষা কার্যক্রম পরিপূর্ণভাবে চালু হলে চার মাস পর আবার বরুড়া মাদ্‌রাসায় ফিরে যান। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটিকে আলিয়া নেসাবের মাদ্‌রাসায় রূপান্তরিত করা হয়। এ মাদ্‌রাসাটি বর্তমানে ফাযেল শ্রেণি পর্যন্ত অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে।[২২৫]

বলিয়া মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন : মাওলানা আশরাফ উদ্দীন বরুড়া থেকে চলে এসে বলিয়া মাদ্‌রাসার দ্বিতীয় মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। মাওলানা আশরাফ উদ্দীন বলিয়া মাদ্‌রাসায় সর্বমোট তিন বছর শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সেখানে মুসলিম শরীফ, হিদায়া, কাফিয়া, শরহে জামীসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে পড়াতেন। তাঁর হাদীস পড়ানোর পদ্ধতি ছিল খুবই চমৎকার। হাদীস পড়ানোর সময় হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হাদীসের সনদের মান সম্পর্কে ইমামদের মন্তব্য ও হাদীস থেকে উদ্ভূত ফিকহি মাসয়ালা চার মাযহাবের আলোকে বর্ণনা করতেন।

---

[২২৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭-৩৩০।

Dhaka University Institutional Repository

কুমিল্লা কাসেমুল উলূম মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে এবং কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট মসজিদের খতীব হিসেবে দায়ীত্ব পালন : কুমিল্লা কাসেমুল উলূম মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা মোহাম্মদ জাফর মাওলানা আশরাফ উদ্দীনের বাড়িতে এসে তাঁকে কাসেমুল উলূম মাদ্রাসায় শিক্ষক পদে যোগদান করতে অনুরোধ করেন। মাওলনানা আশরাফ উদ্দীন পিতার সঙ্গে পরামর্শক্রমে অত্র মাদ্রাসায় শিক্ষক পদে যোগদান করেন। তখন এ মাদ্রাসাটি জামাতে হিদায়া পর্যন্ত ছিল। তিনি অত্র মাদ্রাসায় এক বছর শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। মাদ্রাসার সামান্য দক্ষিণে নিউ হোস্টেল নামে ভিক্টোরিয়া কলেজের একটি ছাত্রাবাস রয়েছে। নিউ হোস্টেলের সম্মুখে অবস্থিত পুকুরের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে অস্থায়ীভাবে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয় এবং জুমআর বয়ানের জন্য একজন লোক দেওয়ার আবেদন করেন। মাওলানা জাফর তখন আশরাফ উদ্দীন সাহেবকে এ দায়িত্ব প্রদান করেন। মাওলানা আশরাফ উদ্দীন বিশুদ্ধ উর্দুতে বয়ান দিয়ে তাদের সকলকে মুগ্ধ করে ফেলেন। মাওলানার বয়ান শুনে অফিসারগণ মন্তব্য করেন, "তাঁকে তো উর্দুভাষী বলে মনে হয়।"

কুমিল্লা ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন অফিসারগণ অনুরোধে সরকারি ইমাম ও খতীব হিসেবে চাকরি নেন। তিনি ক্যান্টনমেন্টের পাশে অবস্থিত ঈদগাহের ইমামতি করেন।

বরুড়া মাদ্রাসায় দ্বিতীয় মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান : জামেয়া এমদাদিয়া কিশোরগঞ্জের মুহতামিম মাওলানা আতহার আলী (রহ.) একটি পত্র লিখেন, আমাদের মাদ্রাসায় দাওরায়ে হাদীসের ক্লাস চালু করা হবে এবং আপনি আমাদের মাদ্রাসার দ্বিতীয় মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করবেন। এ সংবাদ শুনে বরুড়া মাদ্রাসার মুহতামিম সাহেব মাওলানা আশরাফ উদ্দীন আহমদকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি অন্যত্র যাচ্ছেন, এটা হতে পারে না। আপনাকে বরুড়া মাদ্রাসায় থাকতে হবে। অতঃপর তিনি পিতা-মাতার পরামর্শ ক্রমে কিশোরগঞ্জ না গিয়ে বরুড়া মাদ্রাসায় আরবী ও ইসলামের প্রচার-প্রসারে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি বরুড়া মাদ্রাসায় মুসলিম শরীফ, জালালাইন শরীফ, মুখতাসারুল মাআনী ও কাফিয়াসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কিতাব পড়ান।

নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদ্রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে দয়িত্ব পালন : ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে নোয়াখালীর সোনাপুর ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় হেড মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। তখন এ মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের ভূতপূর্ব খতীব মুফতী আবদুল মুঈজ (রহ.)-এর ভগ্নিপতি মাওলানা আবদুল গণী। তিনি ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের ছাত্র এবং মাদানী (রহ.)-এর ভক্ত ও মুরিদ। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদ্রাসার হেড মুহাদ্দিস মাওলানা আবুল কাসেম ইন্তেকালের পর হেড মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। তিনি অত্যন্ত সুনামের সাথে সেখানে দায়িত্ব পালন করেন। এ মাদ্রাসায় তিনি মোট চার বছর যাবৎ শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। তখন অনেক মেধাবী ছাত্র নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদ্রাসায় পড়ালেখা করতো। যারা বর্তমানে দেশে-বিদেশে শিক্ষাদানসহ আরবী ও ইসলামের প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।[২২৬]

পুনরায় বরুড়া মাদ্রাসায় শায়খুল হাদীস হিসেবে দায়িত্ব পালন : বরুড়া মাদ্রাসার শায়েখুল হাদীস ছিলেন লাকসাম উপজেলার ফেনুয়ার মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন (রহ.) তিনি সকলের নিকট শায়েখুল হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং কামেল পীর হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি মাদ্রাসার মুহতামিম সাহেবের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে বরুড়া মাদ্রাসা থেকে অব্যাহতি

---

২২৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭-৩৫১।

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে চলে যান। এর ফলে বরুড়া মাদ্‌রাসায় হাদীস পড়ানোর মতো যোগ্য লোকের শূন্যতা সৃষ্টি হয়। মাওলানা আশরাফ উদ্দিন আহমদ নোয়াখালী থেকে বরুড়া মাদ্‌রাসার শায়েখুল হাদীস পদে যোগদান করেন।

কুমিল্লা কাসেমুল উলূম মাদ্‌রাসায় শায়েখুল হাদীস হিসেবে যোগদান : ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লার বিশিষ্ট আলেম মাওলানা মোহাম্মদ জাফর (রহ.) তাঁর প্রতিষ্ঠিত কাসেমুল উলূম মাদ্‌রাসায় দাওরায়ে হাদীসের ক্লাস চালু করার ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি কুমিল্লা শহরে একটি দাওরায়ে হাদীস মাদ্‌রাসার চালু করার ব্যাপারে মাওলানা আশরাফ উদ্দীনকে সক্রিয় সহযোগিতা করতে অনুরোধ করেন। তাঁকে বিভিন্নভাবে বুঝানোর পর মাওলানা আশরাফ উদ্দীন বুখারী শরীফের দারস দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হন। এখানে তিনি সতেরো বছর যাবৎ বুখারী শরীফের দারস দেন।[২২৭]

কালাকচুয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা : মাওলানা আশরাফ উদ্দীন (রহ.) ক্যান্টনমেন্ট থেকে সামান্য পশ্চিমে কালাকচুয়া নামক গ্রামে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সকাল থেকে জোহর পর্যন্ত তিনি অত্র মাদ্‌রাসায় ছাত্রদেরকে কুরআন হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করেন এবং মাওলানা মাজহারুল হক সাহেবকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগদান করেন। মাওলানা আশরাফ উদ্দীন জুমআর বয়ানে অত্যন্ত সারগর্ভ আলোচনা করতেন। তাঁর ভাষাও ছিল অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সাবলীল। উর্দুভাষী পাঞ্জাবী অফিসারগণ তাঁর ওপর খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন অফিসার থেকে সাধারণ সিপাই পর্যন্ত সকলের প্রিয়পাত্র। তাঁর এই সুনাম-সুখ্যাতি হিংসুকদের দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ধনুয়াখলা উত্তরপাড়ার জনৈক ব্যক্তি সেনাবাহিনীর অফিসারদের কাছে এই মর্মে লিখিত দরখাস্ত পেশ করেছিল যে, আপনাদের ইমাম একজন ওহাবী, দেওবন্দ থেকে ওহাবী মতবাদের দীক্ষা নিয়ে এসেছেন এই ইমামকে বাদ দিয়ে দিন। কিন্তু এই দরখাস্তের ফলে তিনি সকলের কাছে আরও প্রিয় হয়ে যান।

রাজনীতিতে অংশগ্রহণ : মাওলানা আশরাফ উদ্দীন নেজামে ইসলামীর রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রাজনৈতিক প্রোগামে বাংলাদেশের বড় বড় নেতৃবৃন্দ তখন বরুড়া মাদ্‌রাসায় আসতেন। এদের মধ্যে চট্টগ্রামের মৌলভী ফরীদ আহমদ, কুমিল্লার আশরাফ উদ্দীন চৌধুরী, মাওলানা আশরাফ আলী ধর্মন্ডলী, মাওলানা মুসলিহ উদ্দীন মাসিহাতী, কুমিল্লার মাওলানা মোহাম্মদ জাফর, মাওলানা জাফরের পুত্র এম.এ. হারুনুর রশীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাওলানা আশরাফ আলী ধর্মন্ডলীর আশরাফ উদ্দীন সাহেবের সাথে খুবই বন্ধুত্ব ছিল। তিনি আশরাফ উদ্দীন সাহেবকে সবসময় মিতা বলে ডাকতেন। তখন নেজামে ইসলাম পার্টির অফিস ছিল বরুড়া বাজারে অবস্থিত। মাদ্‌রাসার দালানের পশ্চিম পার্শ্ব থেকে শুরু করে মাদ্‌রাসার তৃতীয় রুম পর্যন্ত। তৎকালে নেজামে ইসলাম পার্টির অধিকাংশ মিটিং বরুড়ার কৃষ্ণসাগরের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত ঐতিহাসিক ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত হত। মাওলানা আশরাফ উদ্দীন সাধারণত এসব রাজনৈতিক সভা পরিচালনা করতেন। কখনো কখনো বক্তৃতাও দিতেন। বরুড়া মাদ্‌রাসায় বার্ষিক সভার গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনের পরিচালনাও তিনি করতেন।

চুয়ান্ন সনের নির্বাচনে সক্রিয় অংশগ্রহণ : ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হওয়ার পর বরুড়া এলাকার সর্বস্তরের জনগণ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, যুক্তফ্রন্ট থেকে বাঘমারার হুযুর মাওলানা কোরবান আলী সাহেবকে নির্বাচনে দাঁড় করানো হবে। বাঘমারার হুযুর নির্বাচনের কাজের উদ্দেশ্যে তাঁর সুযোগ্য শাগরিদ মাওলানা আশরাফ উদ্দীনের প্রয়োজন অনুভব করেন। আশরাফ উদ্দীন বরুড়া এলাকায় এসে নির্বাচনী কাজে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করেন। মাওলানার নিজ

[২২৭] আল্লামা শাহ মুহিব্বুর রহমান (রহ.), স্মারক গ্রন্থ, (আঞ্জুমানে মাদানীয়া মুহিব্বিয়া, বাংলাদেশ, ২০১১খ্রি.), পৃ. ৪১৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়নটিও বরুড়ার নির্বাচনী এলাকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মাওলানা আশরাফ উদ্দীন মাওলানা কোরআন আলী সাহেবের সঙ্গে বিভিন্ন এলাকায় যেতেন এবং মিটিং ও জনসভায় যোগদান করতেন। এই নির্বাচনে মাওলানা আশরাফ উদ্দীন অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করেন। কিন্তু নির্বাচনে মাওলানা কোরবান আলী পাস করতে পারেননি। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম লীগের প্রার্থী জয়ী হন।

উনসত্তরের নির্বাচনে সক্রিয় অংশগ্রহণ : ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা আশরাফ উদ্দীন সাহেবের এলাকায় বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির থেকে বই মার্কা নিয়ে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন করেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনাব আশরাফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী। আর আওয়ামী লীগ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন জনাব খোরশেদ আলম। মাওলানা আশরাফ উদ্দীন নেজামে ইসলাম পার্টির নেতা হিসেবে নিজ অঞ্চলে চৌধুরী সাহেবের পক্ষে ব্যাপক গণসংযোগ চালান। চৌধুরী সাহেব বেশ কয়েক বার মাওলানা আশরাফ উদ্দীনের বাড়ি আসেন এবং অনেক কর্মীসহ আপ্যায়িত হন। মাওলানা আশরাফ উদ্দীনের কর্মস্থল ছিল বরুড়া। বরুড়া এলাকায় বই মার্কা নিয়ে নির্বাচন করেন বিশিষ্ট ওয়ায়েজ ও তাফসীরে নূরুল কোরআনের সংকলক আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম। আর নৌকা মার্কা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পাস করেন জনাব আবদুল হাকীম। মাওলানা আশরাফ উদ্দীন বরুড়া অঞ্চলেও বই মার্কার পক্ষে নির্বাচন করেন।[২২৮]

বাহাস বা মোনাজারার মাধ্যমে কুসংস্কার দূরীকরণ : আলেম সমাজ যুগে যুগে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বিভিন্ন কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করেছেন। যখন যে পদ্ধতি ফলপ্রসূ ও কার্যকর বলে মনে করা হয়েছে, তখন সে পদ্ধতিই গ্রহণ করা হয়েছে। ইসলাম ও মুসলিম জাতির ওপর বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে আক্রমণ হয়েছে। এ আক্রমণ যেমনিভাবে বাহ্যিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে হয়েছে, তেমনি চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও হয়েছে। যেমনিভাবে চিহ্নিত বহিঃশত্রু দ্বারা হয়েছে, তেমনিভাবে এমন শত্রু দ্বারাও হয়েছে, যারা আক্ষরিকভাবে ভেতরের লোক হলেও মূলত এরা ছিল বাইরের চিহ্নিত শত্রুদের এজেন্ট। এদের দ্বারা প্রধানতঃ চিন্তাধারার ক্ষেত্রেই আক্রমণ হয়েছে। ইতিহাসের জাবরিয়া, কাদরিয়া, খারেজিয়া, রাফেজিয়া, মুরজিয়া, মোতাযেলা, বাতেনিয়া ও শিয়া, ইমামিয়া ইসনা আশারিয়া ইত্যাদি নামের সম্প্রদায়গুলি-এসব ঘরের শত্রুদেরই বিভিন্ন রূপ। এ শত্রুদের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে মুসলিম জাতির এতো বেশি ভয়ানক ক্ষতি হয়েছে, যা পাশ্চাত্য জগতের চিহ্নিত শত্রুদের দ্বারাও সম্ভবপর হয়নি। সমাজ সংস্কারক ওলামায়ে কেরাম এসব দূরাচার লোকদের মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে যখন যে পদ্ধতি যুক্তিগ্রাহ্য ও কার্যকর হবে বলে মনে করেছেন, তখন সে পদ্ধতিতেই অগ্রসর হয়েছেন। কখনো বিরোধ সৃষ্টি না করে বুঝানোর মাধ্যমে, কখনো ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে, কখনো মাদ্রাসা ও খানকায় তালীম ও তরবিয়াতের মাধ্যমে, কখনো ফতোয়া প্রদানের মাধ্যমে এবং কখনো গ্রন্থাদি প্রণয়নের মাধ্যমে, বাহাস বিতর্ক ও মোনাযারার মাধ্যমে এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে মোকাবিলা করেছেন। মাওলানা আশরাফ উদ্দীন একজন সমাজ সংস্কারক হিসেবে যেমনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলামের মূল শিক্ষা ও আদর্শের প্রসার ঘটিয়ে জাতির খেদমত করেছেন, তেমনিভাবে তিনি বিদ'আত, কুসংস্কার ও বাতিলপন্থীদের বিরুদ্ধে বাহাস ও বিতর্কে অংশগ্রহণ করে, জাতীয় খেদমতের এক বৃহত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি তাঁর জীবনে বহুবার বহুস্থানে বাতিলপন্থীদের বিরুদ্ধে বাহাস ও বিতর্কে অংশগ্রহণ করে ইসলামের সঠিক রূপ প্রতিষ্ঠিত করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। যেহেতু তিনি দ্বীন ও শরীয়তের অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, যুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, স্পষ্টভাষী ও সচেতন ছিলেন এবং মনের কথা প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত

২২৮ মাওলানা আশরাফ উদ্দিন আহমদ, স্মারক গ্রন্থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১।

Dhaka University Institutional Repository

করতে সক্ষম ছিলেন, তাই তিনি যখনই বাহাস ও মোনাযারায় অবতীর্ণ হয়েছেন, তখনই সফল ও কামিয়াব হয়েছেন এবং শত্রুপক্ষ অপমানজনক পরাজয়ের শিকার হয়েছে। তিনি জীবনে বহুবার বাহাস ও মোনাযারা করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হল।

তাঁর কর্মজীবনের দ্বিতীয় বছর বরুড়ায় বাঘমারার নিকটবর্তী বরল নামক গ্রামে এক মোনাযারা অনুষ্ঠিত হয়। একপক্ষে ছিলেন মাওলানা কোরবান আলী ও মাওলানা আশরাফ উদ্দীন এবং অপরপক্ষে ছিলেন বরুড়ার মাওলানা ওসমান সাহেব ও তাঁর লোকজন। মাওলানা কোরবান আলী ও মাওলানা আশরাফ উদ্দীনের দাবী ছিল, প্রচলিত মিলাদ ও মিলাদে কেয়াম করা বিদ'আত। আর ওসমান সাহেবের দাবী ছিল, তা মুসতাহসান অর্থাৎ শরীয়তের দলীল প্রমাণে সুন্দর কর্ম হিসেবে স্বীকৃত। প্রথমে মাওলানা ওসমান সাহেব বক্তব্য রাখেন। অতঃপর মাওলানা কোরবান আলী সাহেব কুরআন, হাদীস, এজমা ও যুক্তির আলোকে প্রমাণিত করেন যে, এগুলো বিদ'আত। এর এক বছর পর একই বিষয়ে বরুড়ার বাকশার মাদ্রাসায় পুনরায় মোনাযারা অনুষ্ঠিত হয়। এখানেও প্রতিপক্ষ ছিলেন ছিলেন ওসমান সাহেব। এ বাহাসে মাওলানা কোরবান আলী ও মাওলানা আশরাফ উদ্দীন বলিষ্ঠ যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, প্রচলিত মিলাদ ও কেয়াম ইসলামে কখনো ছিল না, এখনো নেই। কিন্তু কুরআন-হাদীসের এতো দলিল, এতে যুক্তির পরও প্রতিপক্ষ তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। তারা হঠকারিতা প্রদর্শন করে বলে, আজ এ বাহাসে কোন ফায়সালা দেওয়া যাবে না। ফয়সালা দেবেন কুমিল্লার ডিসি সাহেব। অতএব, ডিসি সাহেবের উপস্থিতিতে পুনরায় বাহাস হবে। হকপন্থীরা তা মেনে নেন। অতঃপর চূড়ান্ত মীমাংসার উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত হয়, ডিসি সাহবের মধ্যস্থতায় এ বিষয় শেষবারের মতো মোনাযারা হবে। কুমিল্লার তৎকালীন মাননীয় জেলা প্রশাসক এতে সম্মত হন। তাঁর নাম ছিল জনাব ওবায়দুল্লাহ। সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যাপক আকারে নির্দিষ্ট তারিখে বাহাসের আয়োজন করা হয়। যথাসময়ে বাহাস শুরু হলে প্রথমে বক্তব্য রাখেন মাওলানা ওসমান সাহেব। তিনি কয়েকটি ছোট ছোট পুস্তক-পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, মিলাদের মধ্যে কেয়াম করা মুসতাহসান। এরপর প্রথমে মাওলানা কোরবান আলী ও পরে মাওলানা আশরাফ উদ্দীন বক্তব্য রাখেন। তাঁরা উভয়ে কুরআন-হাদীসের অত্যন্ত জোরালো বক্তব্যের মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত করেন যে, বর্তমানে প্রচলিত প্রথার মিলাদ ও কেয়াম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিল না এবং আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের মধ্যেও কেউ কোনদিন করেছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমনকি সহীহ হাদীসে সুস্পষ্টভাবে রয়েছে যে, রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁর আগমন ঘটলে সাহাবায়ে কেরাম ভক্তিভরে দাঁড়িয়ে গেলে তিনি তা অপছন্দ করতেন, এ জন্য সাহাবায়ে কেরাম দাঁড়াতেন না। অতএব প্রচলিত প্রথার মিলাদ ও মিলাদের মধ্যে কেয়াম করা বা দাঁড়িয়ে যাওয়া বিদ'আত। আর সকল বিদ'আতই বিভ্রান্তিকর। সুতরাং তা পরিত্যাজ্য ও বর্জনীয়। হকপন্থীদের কথা খণ্ডন করার মতো কোন যুক্তি-প্রমাণ প্রতিপক্ষ পেশ করতে পারেনি। এ জন্য মাননীয় ডিসি সাহেব মিলাদের কেয়াম বিদ'আত হওয়ার পক্ষে এক যুগান্তকারী রায় ঘোষণা করেন। এ ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে বিদ'আতীদের উৎপাত বহুলাংশে হ্রাস পায়। এই বহুল আলোচিত বাহাসের অংশিক বিরবণ সংবলিত একটি পুস্তিকাও তখন মুদ্রিত হয়। এমনিভাবে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পানিশ্বর নামক গ্রামে এক বিশাল বাহাস অনুষ্ঠিত হয়। এতে একপক্ষে ছিলেন ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম, মাওলানা কোরবান আলী ও মাওলানা আশরাফ উদ্দীন প্রমূখ এবং অপরপক্ষের প্রধান ছিলেন চট্টগ্রামের আযীযুল হক। যাকে তার ভক্ত ও অনুচরেরা 'শেরেবাংলা' নামে অভিহিত করত। এ বাহাসেও বিতর্কের বিষয় ছিল, মিলাদ ও কেয়াম। সেখানেও প্রতিপক্ষ পরাজিত হয়। এসব বিষয়ে মূলত বাহাস ও মোনাযারা করতেন মাওলানা কোরবান

Dhaka University Institutional Repository

কোরবান আলী ও মাওলানা আশরাফ উদ্দীন। তাঁরাই মেহনত করতেন। আর বাহাস যখন কায়েম হত, তখন কোথাও কোথাও মাওলানা তাজুল ইসলাম মুরুব্বী হিসেবে থাকতেন।

পদক প্রাপ্তি : আল এহসান পরিষদ নামে কুমিল্লায় একটি সামাজিক সংগঠন বিগত ২০ সেপ্টেম্বর ২০০২ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা আশরাফ উদ্দীনকে মরণোত্তর স্বর্ণপদক প্রদান করেন। কুমিল্লার শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে এ পদক প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে কুমিল্লার সর্বস্তরের কয়েক হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া বাংলাদেশের খ্যাতনামা একদল ওলামায়ে কেরামের সমাবেশ এখানে ঘটেছিল। পদকের নিম্নাংশে সোনালী হরফে লেখা: ইসলামী শিক্ষার প্রসার এবং বিদ'আত ও কুসংস্কার প্রতিরোধে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শায়েখুল হাদীস আলহাজ্ব মাওলানা আশরাফ উদ্দীন সাহেবকে মরণোত্তর স্বর্ণপদক প্রদান করা হল। তখন উক্ত অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মন্তব্য করেন এই সংগঠন একটি মহৎ কাজ করেছে। এ জন্য আল এহসান পরিষদের সকল সদস্যকে ধন্যবাদ। আর এর ফলে কুমিল্লাবাসীর একটি ঋণ লাঘব হয়েছে। সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার।[২২৯]

শায়েখুল হাদীস মাওলানা আশরাফ উদ্দীন আহমদ (রহ:) সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার-

১. মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক মুহতামিম কাসেমুল উলুম মাদ্‌রাসা তিনি বলেন, শায়েখুল হাদীস মাওলানা আশরাফ উদ্দীন সাহেব তিনি ছিলেন অনেক বড় বুযুর্গ। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত মোনাযের, মোতাকাল্লেম ও উপস্থিত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি। এটা সকলেরই জানা আছে যে, তিনি কাউকে কোনো কথা বলতে পরওয়া করতেন না, প্রকাশ্যে কথা বলে ফেলতেন। অনেক সময় হয়তো কথা শুনতে খারাপ মনে হতো কিন্তু তা ছিল বাস্তব সত্য। বাংলাদেশের বাইরেও তাঁর সুখ্যাতি রয়েছে, তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস। শুধু আমাদের এ মাদ্‌রাসার নন, বরুড়ার শায়েখুল হাদীস ছিলেন, সদরুল মুদাররিসীন ছিলেন। এ রকমভাবে আরও বিভিন্ন জায়গায় হাদীসের খেদমত করেছেন। যারা তাঁর কাছে পড়েছেন তিনি তাঁদের সকলের শায়েখ এই হিসেবে তিনি শুধু কাসেমুল উলুমের শায়েখুল হাদীস নন রবং সারা বাংলাদেশের শায়েখুল হাদীস।[২৩০]

২. মাওলানা মুহাম্মদ আশরাফ আলী, মুহতামিম, জামেয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা, তিনি বলেন, জামেয়া আরাবিয়া কাসেমুল উলুমের শায়েখুল হাদীস, প্রখ্যাত ফেকাহ শাস্ত্রবিদ, সুযোগ্য আলেমে দ্বীন, বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ও নেতৃস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম ও মুফতীগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, মাওলানা আশরাফ উদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বিগত পনেরো বছরে এ জামেয়া আরাবিয়া কাসেমুল উলুমে আমি স্বচক্ষে যা দেখেছি, আমি যতটুকু উপলব্ধি করেছি তা হল, যতদিন পর্যন্ত কিতাব মোতালাআর শক্তি ছিল, নিয়মিত মোতালাআ করতেন। তাঁর দুটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। একটি হল, তাঁর অধিক স্মরণশক্তি, অপরটি হল, তাঁর যথেষ্ট মা'লূমাত, অনেক বিষয় তাঁর জানা ছিল। আমি আরও লক্ষ্য করেছি, আমাদের শায়েখুল হাদীস মাওলানা আশরাফ উদ্দীন ছিলেন অত্যন্ত খোশ মেজাজের অধিকারী। এমনকি, বুড়ো বয়সেও তিনি খোশ মেজাজের মানুষ হিসেবে জীবনকে অতিবাহিত করেন।[২৩১]

---

[২২৯] এস.এম আজিজুল হক আনসারী, বাংলাদেশের পীর-আউলিয়া, (সোনালী বুক হাউস, ঢাকা: ২০১২খ্রি.), পৃ. ২৩৮।

[২৩০] সাক্ষাতকার : তারিখ ১০ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ।

[২৩১] সাক্ষাতকার : তারিখ ১৫ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

৩. জনাব এবিএম সিদ্দীকুর রহমান, সভাপতি, মজলিসে আমেলা, কাসেমুল উলুম মাদ্রাসা তিনি বলেন, শায়েখুল হাদীস মাওলানা আশরাফ উদ্দীন (রহ.) এমন একজন আলেম ছিলেন, যার তুলনা বর্তমান যুগে নেই। তাঁকে যে কোন সময় যে কোন মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করা হত, তিনি সঙ্গে সঙ্গে এর জওয়াব দিতে পারতেন। আমি মনে করি, শায়েখুল হাদীস মাওলানা আশরাফ উদ্দীন ছিলেন এলমে ফিকহের একটি কম্পিউটার। কম্পিউটারে বোতাম টিপলে সঠিক উত্তরটা পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, রেফারেন্স পাওয়া যায় না। তবে আমাদের মরহুম শায়েখুল হাদীসকে যখনই কোন মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করতাম, তিনি সাথে সাথে বলে দিতেন। কিতাবের রেফারেন্স দিতেন এবং সঠিক ব্যাখ্যা দিতেন। এর মধ্যে কী ইখতিলাফ আছে তাও বলে দিতেন। অতএব এই ধরনের একজন আলেম বর্তমান যুগে পাওয়া খুবই দুরূহ। তিনি শুধু যে মাসয়ালা বলতে পারতেন, তা-ই নয়, বরং যেটা সঠিক ও ফতোয়া সেটা যুক্তির আলোকে বলে দিতে পারতেন।[২৩২]

---

[২৩২] সাক্ষাতকার : তারিখ ২৫ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-১.৫ : মাওলানা ইয়াসীন (রহ:) (১৮৮২-১৯৬৮ খ্রি.)

হিদায়াতের পথকে যে সকল খ্যাতিমান আলেমে দ্বীন মুসলিম উম্মাহকে নবী (সা.) এর আদর্শের সাথে পূর্ণাঙ্গরূপে পরিচয় করে দিয়েছেন তাঁদেরই অন্যতম হলেন মাওলানা ইয়াসীন (রহ.)। তিনি ছিলেন আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলূম বরুড়া মাদ্‌রাসার চতুর্থ মুহতামিম। তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাধর ও তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী।

মাওলানা ইয়াসীন (রহ.) ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলার নলুয়া চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম দানিশ মুহাম্মদ মিয়াজী। বংশগত দিক থেকে তিনি মিয়াজী হিসেবে পরিচিত। পরবর্তীতে নিজ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মাওলানা ইয়াসীন (রহ.)-এর পিতা ছিলেন সমকালীন যুগের প্রখ্যাত আলিম। পবিত্র কুরআনুল কারীমের প্রাথমিক শিক্ষা পিতার নিকট থেকে লাভ করেন। অতঃপর তৎকালীন বিখ্যাত দ্বীনী প্রতিষ্ঠান নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে তিনি জমাতে ছুয়াম পর্যন্ত লেখাপড়া করেন।

নোয়াখালী ইসলামীয়া মাদ্‌রাসায় লেখাপড়া করার পর উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে মিশকাত পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সাথে পড়ালেখা করেন। পিতার ইন্তেকালের কারণে দাওরায়ে হাদীসে পড়ালেখা করার ইচ্ছা থাকা স্বত্তেও অনেক কিছু ভেবে-চিন্তে পরিবারের সুবিধা-অসুবিধাগুলোর দিকে তাকিয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন। ফলে আর দাওরায়ে হাদীস পড়ার সুযোগ হয়নি।[২৩৩]

মাওলানা ইয়াসীন (রহ.) শায়েখুল ইসলাম সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর নিকট বাই'আত গ্রহণ করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর চট্টগ্রামের মাওলানা সুলতান আহমদ নানুপুরী (রহ.)-এর নিকট পুনরায় বায়'আত হন এবং অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর থেকে খেলাফত লাভ করেন। নানুপুরী (রহ.)-এর অনেক খলীফাদের মধ্যে তিনিই হলেন প্রথম।

মাওলানা ইয়াসীন (রহ.) ছিলেন পাঁচ ভাই ও তিন বোনের মাঝে সবার বড়। লেখাপড়ার প্রাথমিক জীবনেই তাঁর মাতা ইন্তেকাল করেন। অতঃপর মিশকাত পড়া শেষ হওয়ার পর তাঁর পিতাও ইন্তেকাল করেন। ফলে বাধ্য হয়ে তাঁকে সংসারের দিকে মনোনিবেশ করতে হয়।

বাংলার আধ্যাত্মিক সুফী, ওলীয়ে কামেল, মাওলানা ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.)-এর সাথে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তিনি তাঁকে খুব মহব্বত করতেন ও ভালোবাসতেন। ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন। মাওলানা ইয়াসীন (রহ.) কচুয়া উপজেলাধীন শাহারপাড় গ্রামের যুবাইদা খাতুনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর ওরশে জন্মগ্রহণ করেন দুই পুত্র ও চার কন্যা। মাওলানা ইয়াসীন (রহ.) ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে নিজগ্রাম নলুয়া চাঁদপুরে ইন্তেকাল করেন। তার জানাজায় নামাযের ইমামতি করেন বরুড়া মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা আব্দুল ওহাব সাহেব। পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[২৩৪]

---

[২৩৩] হিফজুর রহমান, মাশায়েখে কুমিল্লা, (কুমিল্লা : আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়া, দারুল উলূম, বরুড়া, ২০০০খ্রি.), পৃ. ৪০।

[২৩৪] হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, আমরা যাদের উত্তরসূরি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা ইয়াসীন (রহ.)-এর অবদান-

মাওলানা ইয়াসীন (রহ.) কর্মজীবনের শুরু করেন মাদ্রাসা পরিচালনা ও শিক্ষকতার মাধ্যমে। তিনি কয়েক বছর জুরির হাকীম হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে দারুল উলূম বরুড়া মাদ্রাসার শিক্ষক হিসেবে আত্মনিয়োগ করেন। অক্লান্ত পরিশ্রম করে মাওলানা ইয়াসীন (রহ.) প্রায় তের বছর পর্যন্ত শিক্ষকতার মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসারে নিজের মূল্যবান সময় অতিবাহিত করেন।

তিনি ছিলেন আরবী ও ফার্সী সাহিত্যের সুপণ্ডিত। তিনি মিশকাত শরীফ, সিকান্দার নামা ও মহব্বত নামা-এর দারস দিতেন। ফিক্হ শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য কিতাব হিদায়ার পাঠদান করাতেন। তাঁর পড়ানো পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায়। তাই ছাত্ররা তাঁর তাকরীর শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহী ছিল।

দারুল উলূম বরুড়া মাদ্রাসার সর্বপ্রথম মুহতামিম ছিলেন অত্র মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আফতাব উদ্দীন (রহ.)। তারপর কিছুদিনের জন্য মাওলানা আবুল কাসেম (রহ.) কে ইহতিমামের দায়িত্ব দেওয়া হয়। অতঃপর মাওলানা সাইয়েদ খান (রহ.) তৃতীয় মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ৪র্থ মুহতামিম হিসেবে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা ইয়াসীন (রহ.)-কে দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাঁর পরিচালনায় বর্তমানে বরুড়া-ঝলম সড়কের পার্শ্বে লম্বা দালানটি নির্মিত হয়। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে বাংলার প্রথম মুহাদ্দিস মাওলানা সাঈদ আহমদ (রহ.)-এর পরামর্শে বরুড়া মাদ্রাসায় দাওরায়ে হাদীসের ক্লাস খোলা হয় এবং ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান দারুল হাদীস ভবনটি তিনি নির্মাণ করেন। মাদ্রাসা পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার পর তিনি অতি সুচারুরূপে দক্ষতার সাথে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সফলভাবে এ দায়িত্ব পালন করেন। অত্র মাদ্রাসার মাধ্যমে হাজার হাজার ইল্ম পিপাসু ছাত্ররা আরবী ও ইসলামী শিক্ষা অর্জন করে ইসলামের প্রচার-প্রসারে ব্যাপক অবদান রাখেন।

সামাজিক সংস্কার ও উন্নয়ন : মাওলানা ইয়াসীন (রহ.) সামাজিক ক্ষেত্রেও অনেক অবদান রয়েছে। মাওলানা ইয়াসীন (রহ.) যখন দারুল উলূম দেওবন্দে জামাতে উলায় অধ্যয়নরত তখন তাঁর এলাকার পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত নাজুক। মারামারি, চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস, হাইজ্যাক ইত্যাদি অপরাধজনিত কর্মকাণ্ড ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এলাকার মানুষের একান্ত অনুরোধে তিনি এদিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তাঁর দক্ষতা, যোগ্যতা ও নিরলস প্রচেষ্টায় তিনি আল্লাহর রহমতে যাবতীয় সামাজিক দুর্নীতি-অনাচার সমূলে উৎখাত করতে সক্ষম হন। তাঁর মাধ্যমে সমাজের অনেক বিবাহ-সাদী সম্পাদিত হয়।

বিচার কার্য পরিচালনা : মাওলানা ইয়াসীন (রহ.) ছিলেন জুড়ির হাকিমদের অন্যতম। বিচারক হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সূক্ষ্ম-তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী। মাদ্রাসা পরিচালনা কঠিন দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি এলাকার যাবতীয় কঠিনতর মামলা-মোকাদ্দমার ফায়সালা করতেন। যুগযুগ ধরে পড়ে থাকা অমীমাংসিত বিষয়াদি এমন হিকমতের মাধ্যমে ফায়সালা করে দিতেন যে, ফায়সালার মাঝে কারো কোনো আপত্তি থাকতো না। বিচারকার্যে বসে রায় প্রদানের পূর্বে তিনি মাথার টুপির ওপর হাত বুলাতেন। তারপরই রায় ঘোষণা করতেন। বিচারকের আসনে উপবিষ্ট হলে তাঁর চেহারায় গাম্ভীর্যতার ছাপ প্রকাশিত হত। প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে ও শুক্রবার দিনে তাঁর বাড়িতে ইজলাস বসতো। প্রতি সপ্তাহ শেষে বাড়িতে গিয়ে তিনি সাধারণত ৬/৭টি বিচারকার্য সম্পাদন করতেন।[২৩৫]

---

[২৩৫] হিফজুর রহমান, মাশায়েখে কুমিল্লা, পৃ. ৩৩১-৩৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

সে সময় মুফতী ফয়েযুল্লাহ (রহ.) বলতেন, যদি এদেশে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে মাওলানা ইয়াসীন সাহেব প্রধান বিচারপতির গুরু-দায়িত্ব অতি সূচারুরূপে আঞ্জাম দিতে পারতেন। একবার তালাকের একটি মাসয়ালা নিয়ে প্রখ্যাত মুনাযির আল্লামা মাওলানা ফুরবান আলী (রহ.) ও জনৈক বিদ'আতী আলিমের মধ্যে এক মুনাযারা অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা ইয়াসীন সাহেব (রহ.) ছিলেন বিচারক। বিদ'আতী আলিম স্বীয় অভিমতের সমর্থনে ফতোয়ার একটি কিতাবের বরাত পেশ করে। বরাতটি টীকা হিসেবে কিতাবের নীচে সন্নিবেশিত ছিল। মাওলানা ইয়াসীন (রহ.) বললেন, কিতাবখানা আমার কাছে দিন। অতঃপর তিনি মাথায় হাত বুলায়ে তৈলাক্ত হাত টীকায় ওপর ঘুরালেন। সাথে সাথে লেখার কালি হাতে লেগে গেল। তিনি তখন বলে উঠলেন, দেখো এটা চাপানো নয়। বরং তার নিজ হাতের লেখা।

দ্বীনী দাওয়াতে বিভিন্ন স্থানে সফর : দাওয়াত ও তাবলীগের সিলসিলায় তিনি বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। তিনি ইসলামের প্রচার-প্রসারে বিভিন্ন মাদ্‌রাসা ও মসজিদে ইলমে দ্বীনের প্রচার প্রসারে নিজের জীবনের মূল্যবান সময়-টুকু ব্যয় করেন এবং সমাজে বিভিন্ন কুসংস্কার দূরকরণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশ ও জাতির ক্রান্তিলগ্নে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালান এবং সমাজ থেকে অনৈসলামীক কার্যকলাপ দূরীকরণে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করেন।[২৩৬]

রাজনীতিতে অংশগ্রহণ : মাওলানা ইয়াসীন (রহ.) রাজনীতির ক্ষেত্রেও অবদান রাখেন। ব্রিটিশ স্বৈরশাসন অবসানের পর যখন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নতুন ইস্যুতে দ্বন্দ্বমুখর হয়ে উঠেছিল, তখন তিনি মুসলমানদের স্বার্থে অখণ্ড ভারতের দাবিদার হয়ে কংগ্রেসকে সমর্থন দিয়ে বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

মাওলানা ইয়াসীন (রহ.)-এর উত্তরসূরি : মাওলানা ইয়াসীন (রহ.) দীর্ঘ ৪১ বছর পর্যন্ত অনেক যোগ্য উত্তরসূরি তৈরি করেন। যাঁরা আজ বিভিন্নভাবে দেশ ও জাতির খিদমতে নিয়োজিত রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: (১) মাওলানা ইউসুফ (রহ.), গামরুয়া, মুহাদ্দিস বরুড়া মাদ্‌রাসা (২) মাওলানা আশ্রাফ উদ্দীন সাহেব, ধনুয়াখাল, শায়েখুল হাদীস, কাসেমুল উলুম মাদ্‌রাসা কুমিল্লা (৩) মাওলানা আব্দুল মুবীন, ভিমভুল, শায়েখুল হাদীস, উজানী মাদ্‌রাসা। (৪) মাওলানা ইদ্রীস সাহেব, মুহতামিম, হুরুয়া মাদ্‌রাসা, কুমিল্লা, (৫) মাওলানা তোরাব আলী সাহেব, কামেস্তা, শায়েখুল হাদীস, উজানী মাদ্‌রাসা (৬) মাওলানা তোরাব আলী, রাজাপুর, মুহাদ্দিস জাফারাবাদ মাদ্‌রাসা, চাঁদপুর (৭) মাওলানা আলী আশ্রাফ সাহেব, এগারো গ্রাম, মুহাদ্দিস, উজানী মাদ্‌রাসা (৮) মাওলানা ইয়াকুব সাহেব, ফেনুয়া, মুহাদ্দিস, দারুল উলুম বরুড়া, কুমিল্লা (৯) মাওলানা হেফায উদ্দীন (রহ.), সাতবাড়িয়া, মুহাদ্দিস, দারুল উলুম বরুড়া, কুমিল্লা। (১০) মাওলানা আলী আকবর (রহ.), আমীর তাবলীগ জামাত (১১) মাওলানা ইছমত আলী সাহেব, নায়েবে মুহতামিম, দারুল উলুম বরুড়া মাদ্‌রাসা (১২) মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমী, মুহতামিম, জামেয়া মাদানিয়া বারিধারা, ঢাকা।[২৩৭]

---

[২৩৬] হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, আমরা যাদের উত্তরসূরি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০।
[২৩৭] আল্লামা শাহ মুহিব্বুর রহমান (রহ.), স্মারক গ্রন্থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা ইয়াসীন (রহ.) সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার-

মাওলানা ইয়াসিন (রহ.) সম্পর্কে বিভিন্ন ওলামায়ে কেরাম থেকে অনেক তথ্য পাওয়া গিয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো :

১। মাওলানা শফিকুর রহমান, খতিব, বশির উদ্দিন রোড জামে মসজিদ, মিরপুর, ঢাকা, তিনি বলেন, মাওলানা ইয়াসীন (রহ.) যখন দারুল উলূম দেওবন্দে জমা'আতে উলায় অধ্যয়নরত, তখন আমাদের এলাকার পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক ছিল। মারামারি, চুরি-ডাকাতি, সন্ত্রাস, হাইজ্যাক ইত্যাদি অপরাধজনিত কর্মকাণ্ড ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এলাকার মানুষের একান্ত অনুরোধে তিনি অত্র বিষয়গুলো সমাধানের জন্য দৃষ্টিপাত করলেন। তাঁর দক্ষতা, যোগ্যতা ও নিরলস প্রচেষ্টায় তিনি আল্লাহর রহমতে যাবতীয় সামাজিক দুর্নীতি, জুলুম, অনাচার সমূলে উৎখাত করতে সক্ষম হন। তিনি বরুড়ার মাদ্রাসা পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে মাদ্রাসাটি দাওরায়ে হাদীসে উন্নীত করেন এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারে নিজের জীবনকে অতিবাহিত করেন।[২৩৮]

২। মাওলানা হিফজুর রহমান, প্রধান মুফতী জামিয়া রহমানিয়া আরাবিয়া সাত মসজিদ ঢাকা, তিনি বলেন, মাওলানা ইয়াসীন (রহ.) আজ আমাদের মাঝে নেই। আছে শুধু তাঁর অমর স্মৃতি, আদর্শ ও অনুসরণীয় পদচিহ্ন। আজকের পরিবেশ, দেশ ও জাতি তাঁর মতো একজন সুবিচারক, ইলম প্রিয়, সুদক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিত্বকে খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু সে সমস্ত যোগ্য ব্যক্তির অভাব অপূরণীয়। আমরা চাই তাঁদের মতো ব্যক্তিত্বের অনুসরণ করে তাঁদের আদর্শকে উজ্জীবিত রাখতে।[২৩৯]

[২৩৮] সাক্ষাতকার : তারিখ : ৩০ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ।

[২৩৯] সাক্ষাতকার : তারিখ : ২৩ এপ্রিল ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-১.৬ : মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রহ.) (১৯৩২-২০০৭ খ্রি.)

ইসলামী চিন্তাবিদ, তাফসীরকারক, বহু গ্রন্থ প্রণেতা মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রহ.) ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলার অন্তর্গত, বাঘমারা মিয়াবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মোহাম্মদ আলী মিয়া।[২৪০]

তিনি রহমতগঞ্জ মাদ্রাসা মুহতামিম মাওলানা আবদুর রহমান সাহেবের নিকট কুরআনের প্রাথমিক শিক্ষা, ইলমে ক্বেরাত, উর্দু, ফার্সী এবং আরবীসহ অন্যান্য গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার বিখ্যাত দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বড় কাটারা আশরাফুল উলূম মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এ সময় বিখ্যাত ওলামায়ে কেরাম এ মাদ্রাসায় সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন, মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী (রহ.), (১৮৮৭-১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ)[২৪১] মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.), (১৮৯৫-১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ)[২৪২] মাওলানা আবদুল ওহাব পীরজী হুজুর (রহ.), (১৮৯০-১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ)[২৪৩], মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) (১৩১৪-১৪০৭ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি অত্র মাদ্রাসায় দীর্ঘ তিন বছর লেখাপড়া করেন। আর মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী (রহ.) ছিলেন ঢাকায় তাঁর মুরুব্বী, তাই তিনি সে যুগে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার হেড মাওলানা হওয়া সত্ত্বেও প্রতিদিন সকালে মাওলানা আমিনুল ইসলামকে মেশকাত শরীফ পড়াতেন। মাওলানা ওসামানী (রহ.)-এর পরামর্শে তিনি ঢাকা আলিয়া মাদরাসায় আলিম ক্লাসে ভর্তি হন। ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় লেখাপড়ার মান উন্নত না থাকায় পরবর্তীতে তাঁকে নোয়াখালী ইসলামীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে আলিম পরীক্ষায় তিনি মেধা তালিকায় নবম স্থান অধিকার করেন এবং সরকারি স্কলারশিপ লাভ করেন। এরপর দু'বছর নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন।[২৪৪]

সে সময় শিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে সকল স্কুল মাদ্রাসায় বাংলা, উর্দু, আরবী এবং ইংরেজি ভাষায় বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি সারা বাংলাদেশের এ চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ঘোষিত হন। পরের দিন দৈনিক আজাদ পত্রিকায় তাঁর জীবন-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়। তখন নোয়াখালী

---

২৪০ মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম জীবন ও সাধনা, (ঢাকা: আল-নূর পাবলিকেশন, ২০০৩খ্রি.), পৃ. ১৯।

২৪১ মুফতী মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী (রহ.)। তাঁর পিতার নাম আবদুল লতিফ উসমানী। তিনি মাজাহিরুল উলুম, সাহারানপুরের প্রশিদ্ধ মুহাদ্দিস মাওলানা খলিল আহমদ নিকট হতে হাদীস ও ফিকহ বিষয়ের ওপর পাণ্ডিত্ব লাভ করেন। তিনি ছিলেন ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার প্রধান মুহাদ্দিস। তিনি ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। (হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, আমরা যাদের উত্তরসূরি, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৬)।

২৪২ মাওলানা শামসুলহক ফরিদপুরী (রহ.) তিনি ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে গোপালগঞ্জ জেলায় গওহর ডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নাম আবদুল্লাহ ও মাতার নাম আমিনা বেগম। তিনি উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হয়ে সেখানে ফিকহ, হাদীস ও তাফসীরশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল ঢাকা লালবাগ মাদ্রাসার এবং নিজ গ্রামের প্রসিদ্ধ গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসার। তিনি ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। (হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, আমরা যাদের উত্তরসূরি, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৮)।

২৪৩ মাওলানা আবদুল ওয়াহহাব (রহ.), তিনি ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা হোমনা উপজেলার রামকৃষ্ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী আহসান উল্লাহ। তিনি ঢাকায় বড় কাটারা হুসাইনিয়া আশরাফুল উলূম মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম ছিলেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ তিনি ইন্তেকাল করেন। (হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, আমরা যাদের উত্তরসূরি, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৩)।

২৪৪ মোহাম্মদ মাহমুদূল হাসান, হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম জীবন ও সাধনা,প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন মাওলানা গিয়াসউদ্দিন সাহেব (১৮৭৫-১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ)।[২৪৫] তিনিও অত্যন্ত বুজর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আমিনুল ইসলামকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

সেখান থেকে ফাযেল পাশ করার পর তিনি ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় কামেল ক্লাসে ভর্তি হন। তখন তিনি মুফতী আমীমুল ইহসান (রহ.) (১৯১১-১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ)[২৪৬] নিকট বুখারী শরীফ পড়েন। তাঁর সান্নিধ্যে এসে তিনি জ্ঞান-সাধনায় এক অপূর্ব অনুপ্রেরণা লাভ করেন। তিনি ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে কামেল পরীক্ষায় মেধা তালিকায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেন এরপর দু'বছরের জন্যে হাদীসের ওপর একটি বিশেষ বিষয়ে গবেষণা জন্য সরকারের পক্ষ থেকে রিসার্চ স্কলারশিপ গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক মাওলানা আবদুস সাত্তার সাহেবের তত্ত্বাবধানে গবেষণার কাজটি সম্পন্ন করেন।

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রহ.) প্রথমত বাই'আত গ্রহণ করেন পীর মোহাম্মদ আলী মিয়ার নিকট দ্বিতীয়ত বাই'আত গ্রহণ করেন আলে রাসূল সৈয়দ আব্দুল করীম মাদানী (রহ.)-এর নিকট। তৃতীয়ত বাই'আত গ্রহণ করেন, দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম মাওলানা ক্বারী তৈয়্যের (রহ.) (১৮৯৭-১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ)[২৪৭] এর নিকট। চতুর্থত বাইআত গ্রহণ করেন, বাংলাদেশের বুযুর্গ পীরে কামেল মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর (রহ.)-এর নিকট। হাফেজ্জী হুযুর (রহ.) ছিলেন মুজাদ্দিদে মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) (১২৮০-১৩৬২ খ্রিস্টাব্দ)[২৪৮]-এর একজন বিশিষ্ট খলীফা। মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রহ.) ১৯ নভেম্বর ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ ইন্তেকাল করেন তাঁর নামাযের জানাযায় ইমামতি করেন তাঁর কণিষ্ঠ পুত্র হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম। তাঁকে লালবাগ শাহী মসজিদ প্রাঙ্গনে অবস্থিত কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।[২৪৯]

499721

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

২৪৫ মাওলানা গিয়াস উদ্দিন (রহ.), তিনি ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে চাঁদপুর জেলায় শহরতলী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুসলিম উদ্দিন। তিনি ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে টাইটেল পাশ করেন। অতঃপর তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ নোয়াখালী ইসলামীয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ ইন্তেকাল করেন। (আল্লামা শাহ মুহিব্বুর রহমান (রহ.), স্মারক গ্রন্থ, প্রাগুক্ত, পৃ.৫২৭)।

২৪৬ মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান (রহ.), তিনি ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ভারতের বিহার প্রদেশের মঙ্গির জেলায় পাবনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তিনি কামিল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণ পদক লাভ করেন। অত:পর তিনি কলকাতা আলী মাদ্রাসায় অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। পরবর্তীতে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার হেড মুদাররিস ও জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররম এর খতিবের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। (জুলফিকার আহমদ কিসমতী, বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ, (ঢাকা: ই.ফা. বা., ২০০৫খ্রি.) পৃ.২৫১)।

২৪৭ হাকীমুল ইসলাম মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ তৈয়্যের (রহ.) ভারতে উত্তর প্রদেশ দেওবন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। (হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, আমরা যাদের উত্তরসূরি, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫২)।

২৪৮ মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) ওমর (রা.)-এর বংশধর ছিলেন। তিনি ১৩০১ হি. দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে উচ্চ ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। তিনি ছিলেন একজন সমাজ সংস্কার ও ধর্ম প্রচারক। হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজের মক্কী (রহ.) থেকে খেলাফত লাভ করেন। তিনি ১৩৬২ খ্রিস্টাব্দ ইন্তেকাল করেন। (হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, আমরা যাদের উত্তরসূরি, প্রাগুক্ত, পৃ.৮১)।

২৪৯ মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম জীবন ও সাধন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা আমিনুল ইসলাম (রহ.)-এর অবদান -

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রহ.) ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে কামেল পাশ করার পর আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে হাদীস শাস্ত্রে বিশেষ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দু'বছর মেয়াদী হাদীসের একটি বিশেষ বিষয়ে গবেষণা করার জন্যে সরকারের পক্ষ থেকে রিসার্চ স্কলারশিপ দেওয়া হয়। তিনি ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক মাওলানা আবদুস সাত্তার সাহেবের তত্ত্বাবধানে গবেষণা কাজটি অব্যাহত রাখেন এবং আরবী ভাষায় রচিত গবেষণা রিপোর্ট দাখিল করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল تخريج احاديث شرح معاني الاثار للطحاوى। অর্থাৎ তাঁর কাজ ছিল ইমাম ত্বহাবী (রহ.) তাঁর "শরহে মাআনিল আসার" গ্রন্থের যে সকল হাদীস সংকলন করেছেন, সে সকল হাদীস কুতুবে সিত্তার কোন গ্রন্থের কোথায় রয়েছে তা খুঁজে বের করে সূত্রসহ লিপিবদ্ধ করা। যা আজো অপ্রকাশিত অবস্থায় সংরক্ষিত রয়েছে। মাওলানা আবদুস সাত্তার সাহেব তাঁর গবেষণালব্ধ পাণ্ডুলিপিটি পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং আলিয়া মাদ্রাসার তদানীন্তন হেড মাওলানা মুফতী আমীমুল ইহসান (রহ.)-এর নিকট তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। আর তিনি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "বাবা! একগীর ও মুহকাম গীর হও"। তুমি জ্ঞান সাধনার এ কাজটিই কর এবং এর ওপর সুদৃঢ় থাক"।[২৫০]

সৈয়দ আবদুল করিম মাদানী (রহ.)-এর সাথে ইসলামের প্রচার-প্রসার : মুফতী আমীমুল ইহসান সাহেবের নসিহত দ্বারা মাওলানা আমিনুল ইসলাম (রহ.)-এর পূর্ণ মাত্রায় অনুপ্রাণিত হন। তিনি তাঁর জীবনকে জ্ঞান-সাধনায় এবং দ্বীন ইসলামের খেদমত তথা প্রচার-প্রসারে উৎসর্গ করেন। এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম তিনি ইসলামের ইতিহাসের ওপর গবেষণা আরম্ভ করেন এবং "তারিখে ইসলাম" নামে উর্দু ভাষায় একখনি গ্রন্থ রচনা করেন যা দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা শহরে তখন ৫৫টি মসজিদ ছিল। এ মসজিদ গুলোতে প্রায় সময় দ্বীনী মাহ্ফিল অনুষ্ঠিত হতো। নবীন বক্তা হিসেবে চতুর্দিকে তখন তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। কুমিল্লা শহরের এ মসজিদগুলোতে প্রতিদিনই তাঁকে বয়ান করতে হতো। সে সময় কুমিল্লায় আগমন করেন সৈয়দ আবদুল করীম মাদানী (রহ.)। তিনি মদীনা শরীফ থেকে প্রথমে বার্মা, পরে চট্টগ্রামে আগমন করেন। তিনি তখন চট্টগ্রাম আন্দরকিল্লা শাহী মসজিদের খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কুমিল্লা শহরে একটি মাহ্ফিলে আগমন করেন। তিনি আরবী ভাষায় বক্তব্য দিতেন। মাওলানা আমিনুল ইসলাম সাহেব তাঁর আরবী বক্তব্য বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার সুযোগ লাভ করেন। তার অনুবাদে সন্তুষ্ট হয়ে সৈয়দ আবদুল করিম (রহ) যখন যেখানে বয়ান করতেন, তিনি অনুবাদ করতেন। বিশেষত প্রতি শুক্রবার সৈয়দ সাহেব (রহ.) যে আরবীতে খুতবা প্রদান করতেন, তিনি তা উর্দু ও বাংলায় তরজমা করতেন এবং পরবর্তী জুম'আর পূর্বেই উভয় ভাষায় এই অনুবাদ প্রকাশ করতেন এবং তা প্রচার-প্রসারের জন্য বিতরণ করা হতো। দারুল এশাআত, আন্দরকিল্লা শাহী মসজিদের তরফ থেকে এই ভাষণ প্রকাশিত হতো। সৈয়দ আব্দুল করিম (রহ.)-এর ইসলাম প্রচার ও প্রসারের খেদমত তিনি পূর্ণ দু'বছর যাবৎ করেন।[২৫১]

রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে ইসলামের খেদমত : ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ শেষের দিকে তদানীন্তর ঢাকা রেডিও তাঁকে ইকবাল দর্শনের ওপর ধারাবহিক কথিকা পেশ করার জন্যে মনোনীত করে। ইকবাল দর্শনের ওপর তাঁর অনেক সুচিন্তিত প্রবন্ধ তৎকালীন মোহাম্মদী, মাহে নাওসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়

---

২৫০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

২৫১ প্রাগুক্ত,পৃ. ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত হয়েছিল। রেডিওতে এ অনুষ্ঠানটি প্রতি বুধবার রাত দশটায় প্রচারিত হতো। সুদীর্ঘ দু'বছর নিয়মিতভাবে ইকবাল দর্শনের ওপর এ অনুষ্ঠানটি তিনি পরিচালনা করেন। তিনি ঢাকা রেডিও থেকে "কুরআনে হাকীম ও আমাদের জিন্দেগী" শিরোনামে নিয়মিত কথিকা পেশ করতেন, যা বর্তমানে পথ ও পাথেয় শিরোনামে প্রচারিত হচ্ছে। এমনিভাবে মাহে রমজানের সাহরী প্রোগ্রাম এবং পবিত্র রবিউল আউয়ালের সিরাত মাহফিল পরিচালনার দায়িত্বও তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ পালন করেন। ঢাকা রেডিওতে দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত প্রোগ্রাম করার ফলে তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে দীর্ঘ ৪৫ মিনিট প্রচারিত হয়। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান টিভির ঢাকা কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত করেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তিনি বিটিভিতে পবিত্র কোরআনের তাফসিরও পেশ করেন। আধুনিক প্রচার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার প্রচারের গুরুত্ব সমধিক। তাই তিনি ইসলামী বিধানসমূহের আধুনিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রায় ৩৪ বছর রেডিও ও টিভির মাধ্যমে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করেন।

ঢাকা ইসলামীয়া মাদ্‌রাসার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন : ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ মাঝামাঝি সময়ে ঢাকাস্থ ইসলামীয়া মাদ্‌রাসার বার্ষিক মাহফিলে দারুল উলূম দেওবন্দের তদানীন্তন মুহতামিম বিশ্ববরেণ্য আলেম মাওলানা তৈয়্যেব (রহ.)-কে প্রধান মেহমান হিসেবে দাওয়াত করা হয়। উক্ত মাহফিলে প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার লোকের সমাগম ঘটে। কিন্তু তিনি যথাসময়ে উপস্থিত হতে না পারায় মাহফিল কমিটি অনন্যোপায় হয়ে অবশেষে মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম সাহেবের নিকট উপস্থিত হন এবং মাহফিলটি রক্ষা করার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে সম্মত হলেন।

আছর থেকে মাগরিব এবং মাগরিব থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর বয়ান করেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিনও তার ঢাকায় আগমন সম্ভব হয়নি। তাই তিনি দ্বিতীয় দিনও রাত এগারটা পর্যন্ত যথানিয়মে মাহফিলে বয়ান করেন। নবাব বাড়ির মাহফিলের সাফল্যের কারণে ওলামায়ে কেরাম খুশি হয়ে তাঁকে "তাজুল খুতবা" উপাধিতে ভুষিত করেন এবং মাদ্‌রাসার বৃহত্তর খেদমতের জন্যে তাঁকে প্রস্তাব করেন। এভাবে ইসলামিয়া মাদ্‌রাসার সাথে তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আর এ সম্পর্ক রীতিমতো ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত থেকে নবাব বাড়ির মাহফিলের কয়েকদিন পরই ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা কমিটি মাওলানা আমিনুল ইসলাম সাহেবকে সেক্রেটারি নির্বাচন করেন এবং মাদ্‌রাসা পরিচালনার জন্য যাবতীয় দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করে মাদ্‌রাসাটিকে প্রাথমিক পর্যায় থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত উন্নীত করেন। তিনি অত্র মাদ্‌রাসায় পবিত্র কুরআনের তাফসীর পড়াতেন এবং দাওরায়ে হাদীসের ছাত্রদেরকে ইসলামের ইতিহাসের ওপর ধারাবাহিক আলোচনা করতেন। বস্তুত মাদ্‌রাসার শিক্ষকতার ক্ষেত্রে এটি ছিল তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা। মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রহ.) ইসলামিয়া মাদ্‌রাসার এগার বছরের জীবনে ১৯৫৯-১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে বহু বিখ্যাত ব্যক্তি ও ওলামায়ে কেরামকে ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য মাদ্‌রাসায় মেহমান হিসেবে আমন্ত্রণ করেন।[২৫২]

রাজনীতিতে মাওলানা আমিনুল ইসলাম (রহ.)-এর ভূমিকা : মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রহ.) বলেন রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে নেই, ফলে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী আইন জারির সুযোগ নেই, তাই ইসলাম প্রচার-প্রসারের জন্য কিছুই করার নেই? ক্ষমতাসীন শীর্ষস্থানীয় নেতা ও রাষ্ট্রের কর্মকর্তারা যাতে ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহে আঘাত না করে, মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না

---

[২৫২] প্রাগুক্ত,পৃ.২৯।

Dhaka University Institutional Repository

করে, সেজন্য তাদেরকে সতর্ক ও সাবধান করা যেতে পারে, সুপারমর্শ দেয়া যেতে পারে, প্রয়োজনে আন্দোলনও করা যেতে পারে। এ উদ্দেশ্যই রাষ্ট্র প্রধানদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। তিনি রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহিত পারিবারিক আইন ও জন্মনিয়ন্ত্রণ আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। সরকার কর্তৃক কুরআন শরীফ ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থকে একই কাতারে শামিল করার বিরোধিতা করেন। সন্ডক দ্বীপে মূর্তি স্থাপনে বাধা প্রদান করেন। এ ছাড়াও তিনি আরও মহৎ কাজ করেন। আর যা করতেন তা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করতেন। তাই এসব নিয়ে হৈ হুল্লা বা প্রচারণা পছন্দ করতেন না। একজন রাষ্ট্র প্রধান কর্তৃক মাওলানা আমিনুল ইসলাম (রহ.)-কে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য একাধিকবার প্রস্তাব করা সত্ত্বেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, যদি সরকারি দায়িত্ব গ্রহণ করি, তাহলে সকল অন্যায় আমাকে মেনে নিতে হবে, ভুল করলে শোধরাতে পারব না, নসীহত করা তো দূরের কথা ফরমাবরদারী করেই অবসর পাওয়া যাবে না। তাই আমি নিজেকে এমন দুরবস্থায় ফেলতে চাই না ইত্যাদি।

তিনি আরও বলেন, দেখুন, সরকার যাকাত বোর্ড গঠন করার সময় আমাকে ডাকলো। আমি বললাম, আল্লাহ্ পাক যাকাতের পূর্বে নামাযের নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং প্রথমে নামায বোর্ড গঠন করুন পরে যাকাত বোর্ড গঠন করা যাবে। তারা জানতে চাইল, নামায বোর্ডের কাজ কী হবে? আমি বললাম, সকল মুসলমানকে নামায আদায় করতে বাধ্য করা, বিশেষভাবে সরকারি কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণকে নামায আদায় করতে বাধ্য করা। আমার পরামর্শ তাদের মনপূত হয়নি, কিন্তু আমি দ্বীনের দাওয়াত দিতে কার্পণ্য করিনি। যাকাত বোর্ড গঠিত হলো অর্থের জন্য। আল্লাহ্র হুকুম পালনের জন্য নয়। তখন তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, আসলে গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থাটাই একটা ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ। তাদের ধারণা ইসলামের অনুশাসন মেনে চলা প্রত্যেকের নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে সমাজ ও রাষ্ট্রের কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি তা নয়। নিঃসন্দেহে কাল কেয়ামতের কঠিন দিবসে সকলেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[২৫৩]

দেশের বিভিন্ন স্থানে ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে অবদান : প্রত্যেক মানুষ সত্য প্রচার করতে পারে। নিজের বাকশক্তি ও লেখনী শক্তির মাধ্যমে। মাওলানা আমিনুল ইসলাম দু'টি শক্তিকেই আরবী ও ইসলামের প্রচার-প্রসারে ব্যয় করেছেন। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয় দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে। পঁয়তাল্লিশ বছর যাবৎ তিনি আরবী ও ইসলামের প্রচার-প্রসারে দ্বীন ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন, অন্যদিকে তিনি বহু গ্রন্থও রচনা করেন। মুসলিম জনসাধারণকে দ্বীন ইসলামের শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন এবং শরীয়ত মোতাবেক জীবন-যাপন করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করার জন্যে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি প্রথমত দ্বীনী মাদ্‌রাসাসমূহের বার্ষিক মাহ্‌ফিল, দ্বিতীয়ত সমবেত প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনের মাধ্যমে, তৃতীয়ত রবিউল আউয়াল, শবে বরাত, শবে কাদরসহ বিশেষ দিনগুলোতে অনুষ্ঠিত মাহফিলের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসার করেন।[২৫৪] তিনি ঢাকার বিভিন্ন মসজিদে কুরআনের তাফসীরের মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষার প্রচার-প্রসার করেন। ঢাকাস্থ আবদুল হাদী লেন মহল্লার মসজিদের মধ্যে এবং চৌধুরী বাজার মসজিদে সাপ্তাহিক তাফসির মাহফিল করেন।[২৫৫]

মাওলানা আমিনুল ইসলাম (রহ) এর বয়ানের কতিপয় বৈশিষ্ট্য : (১) তিনি কোন বিশেষ শ্রেণির লোকদের জন্যে বয়ান করেন নি বরং তাঁর বয়ানে ওলামায়ে কেরাম, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোক

---

[২৫৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

[২৫৪] মাহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম জীবন ও সাধন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

[২৫৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, শ্রমজীবী মানুষসহ সকলেই উপকৃত হয়, এজন্য অনেকেই দূর-দূরান্ত থেকে তাঁর বয়ান শোনার জন্য সমবেত হতো। (২) তিনি তাঁর বয়ানে প্রাসঙ্গিক একের পর এক আয়াতের উদ্ধৃতি দিতেন এবং সে আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতেন। (৩) তাঁর প্রতিটি বয়ানেই নতুন নতুন তথ্য পাওয়া যেতো। অনেক শ্রোতা মন্তব্য করেন, তাঁর প্রতিটি বয়ান শুনলেই মনে হয়, একথাগুলো নতুন শুনছি।[২৫৬]

ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে অবদান : মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রহ.) তিনি যেভাবে নিজের জীবনকে দেশ-বিদেশে ইসলামী জলসা, রেডিও টিভিতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং ইসলামের মৌলিক বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যয় করেন, তেমনিভাবে ইমাম ও খতীব হিসেবেও জীবনের এক উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় করেন। তিনি ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার চুড়িহাট্টা জামে মসজিদে খতীবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত সুনামের সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি ঐতিহাসিক লালবাগ শাহী মসজিদের ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করেন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত। ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসারে নিজেকে সবসময় নিয়োজিত রাখেন।

মাসিক আল-বালাগ পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসার : মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম সম্পাদিত ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর থেকে মাসিক আল-বালাগ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মাসিক আল-বালাগ পত্রিকাটি ব্যাপকভাবে মানুষের নিকট সমাদৃত হতে থাকে। এর মাধ্যমে তিনি আল্লাহর বাণী এবং রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদর্শ পৌঁছে দেয়াকেই কর্তব্য মনে করেন। অত্র পত্রিকার মাধ্যমে মাওলানা আমিনুল ইসলাম রচিত "তফসীরে নূরুল কুরআন" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি প্রকাশনার মাধ্যমে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যা যুগযুগ ধরে মানুষের মাঝে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবে।[২৫৭]

বিভিন্ন সেবা সংস্থার সাথে সম্পৃক্ততা-

১। মাওলানা আমিনুল ইসলাম সাহেব চৌদ্দ বছর পর্যন্ত ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের বোর্ড অব গভর্নরের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২। তিনি জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটি এবং জাতীয় যাকাত বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

৩। ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর একাডেমিক কাউন্সিল, সিলেকশন কমিটি, তাফসিরে তাবারির সম্পাদনা পরিষদ, বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ বঙ্গানুবাদ কার্যক্রমের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন।

৪। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৫। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফার্সী বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগ কমিটির একজন সদস্য ছিলেন।

৬। আল-নাহিয়ান ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিনি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থের তালিকা : ১। পবিত্র কুরআনের দর্পণে মানব জীবন, ২। এনায়েতুল কুরআন, ৩। যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা, ৪। মহান

---

[২৫৬] প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৩।

[২৫৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রনায়ক হযরত রাসূল করীম (সা.), ৫। দুরূদ শরীফের ফজিলত ও মাহাত্ম, ৬। দালায়েলুল খায়রাত, ৭।, স্বপ্ন জগতে প্রিয়নবী (সা.), ৮। হযরত গাউসুল আযম (রহ.) অমর বাণী, ৯। আউলিয়ায়ে কেরামের জীবন ধারা, ১০। ইমাম মাহদীর আগমনের পূর্বে ও পরে, ১১। ইমাম বুখারী (রহ.), ১২। হাজীদের সাথী, ১৩। জীবন ও কুরআন, ১৪। বিশ্ব সভ্যতায় পবিত্র কুরআনের অবদান, ১৫। বিশ্ব সভ্যতায় মহানবী (সা.), ১৬। যুগ সমস্যার সমাধানে পবিত্র কুরআন, ১৭। পবিত্র কুরআনের মর্মকথা, ১৮। মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মহানবী (দা.), ১৯। তাফসীরে নূরুল কুরআন (১-৩০ খন্ড), ২০। নূরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (১ম ও দ্বিতীয় খণ্ড), ২১। দুই ঈদের নামায, ২২। হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.), ২৩। হাদীস শরীফের আলো, ২৪। সাহাবা-চরিত্র , ২৫। মুসলমানের কর্তব্য, ২৬। ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা, ২৭। আদর্শ ও বাস্তবায়ন, ২৮। পবিত্র কুরআনের আলোকে চন্দ্রে অবতরণ, ২৯। আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের অবদান।, ৩০। ইমাম হোসাইন (রহ.)[২৫৮]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সীরাত গ্রন্থ রচনা : বাংলা ভাষায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনী বিষয়ক গ্রন্থ রচনার তথা সীরাত বিষয়ক গ্রন্থ রচনার সূচনা হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাসূল বিজয় শীর্ষক পুথি রচনার মধ্য দিয়ে। মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রহ.) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিস্তারিত সীরাত গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে বিশেষ অবদান রাখেন। তাঁর রচিত বেশ কয়েকখানি সীরাত গ্রন্থও রয়েছে, যার মধ্যে মহান রাষ্ট্রনায়ক রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম গ্রন্থখানি আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও লাভ করেছে।

আউলিয়ায়ে কেরামের জীবন ধারা নামক গ্রন্থ রচনা : মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রহ.) "আউলিয়ায়ে কেরামের জীবন ধারা" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, বর্তমানে যুগে পীর-আউলিয়া সম্পর্কে কিছুটা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। ফলে সত্যিকার আউলিয়ায়ে কেরামের সঠিক পরিচয় পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। কেননা যুগের আবর্তন বিবর্তন ও পরিবর্তনের কারণে অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে। তাই সত্যিকার আউলিয়ায়ে কেরামের সঠিক পরিচয় লাভের জন্যে তাঁদের জীবন ধারা জনসম্মুখে পেশ করা একান্ত জরুরি এবং সময়ের দাবি মনে করে "আউলিয়ায়ে কেরামের জীবনধারা" শীর্ষক গ্রন্থটি রচনা করেন।[২৫৯]

তাফসীরে নুরুল কুরআন রচনার মাধ্যমে বিশেষ অবদান : মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রহ.)-এর রচিত বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআনের পূর্ণাঙ্গ তাফসীর ত্রিশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই তাফসীর গ্রন্থে প্রায় চার সহস্রাধিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ১১,১০২ পৃষ্ঠায় রচিত, এই তাফসীর গ্রন্থটি সর্বজন স্বীকৃত, অত্র গ্রন্থে তাফসীরকারগণের প্রদত্ত ব্যাখ্যা ও উদ্ধৃতিসহ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে তাফসীরে নূরুল কুরআনে বিশেষভাবে বর্তমান যুগ-জিজ্ঞাসার প্রতি দৃষ্টি রেখে সে সব প্রশ্নের সঠিক সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। যা সাধারণ পাঠকের মনে জাগ্রত হতে পারে। তাফসীরে নূরুল কুরআন পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সার্বজনীন নীতিমালা অনুযায়ী রচিত। সলফে সালেহীনের সম্পূর্ণ নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে। অত্যন্ত সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত এই গ্রন্থে কুরআনে করীমের এক আয়াতের তাফসীর অন্য আয়াতের দ্বারাও করা হয়েছে, কোথাও হাদীস শরীফ দ্বারা তাফসীর করা হয়েছে, আবার কোথাও সাহাবায়ে কেরামের উক্তি দ্বারা আলোচিত প্রত্যেকটি বিষয়ের রেফারেন্স যথাস্থানে সংযোজিত হয়েছে। বিগত চৌদ্দশ' বছর যাবৎ কুরআনের তাফসীরের ব্যাপারে যে যা অবদান রেখেছেন, তা তাফসীরে নূরুল কুরআনে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা

---

[২৫৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

[২৫৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে।[২৬০] আরবী, ফার্সী, উর্দু ভাষায় বিভিন্ন সময়ে লিখিত মূল্যবান তাফসীর গ্রন্থসমূহের বিস্ময়কর এবং তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য-সম্ভার তাফসীরে নূরুল কুরআনে স্থান পেয়েছে। "তাফসীরে নূরুল কুরআন" রচনার পটভূমি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাওলানা আমিনুল ইসলাম (রহ.) নূরুল কুরআনের ৩০তম খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছেন, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এই পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ স্বরূপ বহু তাফসীর গ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে কোন মৌলিক, প্রামাণ্য এবং বিস্তারিত তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়নি, যার ফলে আমি অনেক চিন্তা গবেষণা করে এবং সময়ের দাবি অনুযায়ী কুরআনের তাফসীর লেখার ব্যাপারে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করি এবং তা বাস্তবায়ন করতে চেষ্টা করি।[২৬১]

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রহ.)-এর বিভিন্ন পুরস্কার ও স্বীকৃতি লাভ : মাওলানা আমিনুল ইসলাম (রহ.) তিনি তাঁর রচনার জন্যে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক পুরস্কার লাভ করেন। ইসলামের সেবায় নিবেদিত তেরজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদকে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ১২ রবিউল আউয়াল ১৪১৩ হি. উপলক্ষে আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মিশরের প্রেসিডেন্ট স্বর্ণপদক প্রদান করেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ইরানের রাজধানী তেহরানে অনুষ্ঠিত মাসব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে তাঁর তাফসীরে নূরুল কুরআন গ্রন্থখানি প্রদর্শিত হয়। বাংলা ভাষার তাফসীর গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ হুফ্‌ফাজুল কুরআন ফাউন্ডেশন থেকে তাঁকে ক্রেস্ট প্রদান করেন।

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রহ.) সম্পর্কে বিশিষ্ট আলেমদের মতামত-

১। বিশিষ্ট লেখক মাওলানা মহিউদ্দিন খান বলেন, মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রহ.) ছিলেন একজন প্রখ্যাত আলেম, গবেষক ও লেখক। তাঁর প্রসিদ্ধ লেখনি তাফসীরে নূরুল কুরআন বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআনের মৌলিক ও প্রামাণ্য তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে স্বাক্ষর রাখে। তিনি বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআনে চর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরে তাফসীরে নূরুল কুরআনকে বাংলাভাষী মুসলমানদের জন্যে এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে মর্যাদার আসন দখল করে। তিনি ছিলেন একজন উঁচু মাপের মুফাসসির ও ওয়ায়েজিন। তাছাড়া তিনি ইসলামের মৌলিক বিষয়ের ওপর বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন।[২৬২]

২। মুফতী আবদুর রহমান সাহেব, মুহতামিম, বসুন্ধরা মাদ্‌রাসা, তিনি বলেন, মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রহ.) ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ একজন মুফাসসির ও মুবাল্লিগ। তিনি তাফসীরে নূরুল কুরআন রচনা করে পবিত্র কুরআনের শব্দ, অর্থ এবং ব্যাখ্যার হেজাফতের ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাই তিনি হিযবুল্লাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তাফসীরের ক্ষেত্রে যে সার্বজনীন নীতিমালা রয়েছে, মাওলানা আমিনুল ইসলাম (রহ.) তার তাফসীর গ্রন্থে সে সঙ্গতি রেখে যুগোপযোগী করে তা রচনা করেছেন। দীর্ঘ সাধনা ব্যতীত কোনো ফল অর্জিত হয় না। তাঁর অক্লান্ত সাধনার ফলশ্রুতিতে তাফসীরে নূরুল কুরআন রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এমনিভাবে তিনি বিভিন্ন

২৬০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।
২৬১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।
২৬২ সাক্ষাতকার : তারিখ - ১৫ এপ্রিল ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

তাফসীর মাহফিল, লেখনী, রেডিও ও টেলিভিশনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপনের মধ্যে ইসলামের প্রচার-প্রসারে অবদান রাখেন।[২৬৩]

৩। মাওলানা মাহমুদুল হাসান বিন মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রহ.) তিনি বলেন, আমার পিতা ছিলেন, দেশবরেণ্য আলেম, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, মুবাল্লিগ, ও মুফাসসির। জ্ঞান ও মনীষার নির্যাস যে গ্রন্থের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিকশিত হয়েছে, তা হলো 'তাফসীরে নূরুল কুরআন'। পূর্ণাঙ্গ তাফসীর হিসেবে বাংলা ভাষায় রচিত তাফসীর তা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, তার সকল বৈশিষ্ট্য 'তাফসীরে নূরুল কুরআন'-কে সৌকর্যমণ্ডিত করে তুলেছে। তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। বিভিন্ন মাদ্‌রাসায় শিক্ষাদানসহ তাফসির মাহফিল, রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার প্রসারে অবদান রাখেন।[২৬৪]

---

[২৬৩] সাক্ষাতকার : তারিখ - ১৮ এপ্রিল ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ।
[২৬৪] সাক্ষাতকার : তারিখ - ২৫ এপ্রিল ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-১.৭ : মাওলানা শাহ্ মুহিব্বুর রহমান (রহ.) (১৯০৫-১৯৯৯ খ্রি.)

মাওলানা শাহ্ মুহিব্বুর রহমান (রহ.) ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলার ফেন্নুয়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত দ্বীনদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ক্বারী ছমীর উদ্দীন ও মাতার নাম ফয়েযুন্নেছা। ৬ ভাই ৩ বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। শৈশব কাল হতে তিনি ছিলেন নির্জনতা প্রিয়। তিনি সবসময় ভাবগাম্ভীর্য হৃদয়ে একাকিত্বে থাকতে পছন্দ করতেন। মায়ের নিকট শিশু মুহিব্বুর রহমান পবিত্র কুরআনের প্রাথমিক সূরাসমূহের শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং বাড়ির সামনে অবস্থিত মাওলানা আফতার উদ্দীন (রহ.) কর্তৃক পরিচালিত মকতবে কায়দা, আমপারা, কুরআনুল কারীম, উর্দু কায়দা ও রাহেনাজাতের শিক্ষা অর্জন করেন।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে উত্তর হাওলা দীঘিরপাড় প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে প্রথম স্থান অধিকার করেন।অতঃপর তার পিতা তাঁকে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে লাকসাম উপজেলাধীন পশ্চিম গাঁও ফয়েযিয়া কওমী মাদ্রাসায় ভর্তি করেন। অত্র মাদ্রাসায় তিনি কয়েক বছর লেখাপড়া করেন। সেখানকার ওস্তাদগণ উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেন।[২৬৫]

তাই তিনি ইলমে দ্বীন অর্জনের অধিক আগ্রহ নিয়ে চৌদ্দগ্রামের বটগ্রাম হামীদিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। তখন মাওলানা আবদুল হামীদ (রহ.) অত্র মাদ্রাসাটি পরিচালনা করেন। অত্র মাদ্রাসার অধিকাংশ ওস্তাদই ছিলেন ফাযেলে দেওবন্দ। তাঁদের কেউ ছিলেন মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) (১২৪৪-১৩২২ খ্রিস্টাব্দ)-এর শিষ্য।[২৬৬] আবার কেউ ছিলেন মাওলানা আশরাফ আলী থানুভী (রহ.)-এর শিষ্য। মুহিব্বুর রহমান তাঁদের নিকট যাহেরী ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানসাধনায় মনোনিবেশ করেন। জামা'আতে পাঞ্জম পর্যন্ত তিনি অত্র মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। এখানে তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো- মাওলানা আবদুল হামীদ, মাওলানা আবদুল আলী সিলেটি, মাওলানা দলীলুর রহমান। অতঃপর তিনি ঢাকাস্থ আরমানিটোলার হাম্মাদিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে জামা'আতে উলা পর্যন্ত চার বছর পড়ালেখা করেন। প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে সফলতা অর্জন করেন। তখন হাম্মাদিয়া মাদ্রাসায় মুহতামিম ছিলেন ঢাকার বংশালে হাফেয মাওলানা আবদুর রাজ্জাক (রহ.)। এরপর ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ইলমে মা'কুলাত হাসিলের জন্য ভারতের রিয়াসতে রামপুর মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে মানতিক-ফালসফা ও উসূলে ফিকহের গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন। তবে এ মাদ্রাসায় বিদ'আতের কিছু ছোঁয়া থাকায় তিনি এখান থেকে ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে দাওরায়ে হাদীসে ভর্তি হন এবং উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ আলেমগণের নিকট হাদীসের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন। তিনি সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর নিকট বুখারী ও তিরমিযী শরীফ অধ্যয়ন করেন। আর মাওলানা আসগর হোসাইন (রহ.)-এর নিকট আবূ দাউদ শরীফ ও মুফতী শফী (রহ.) (১৩১৪-১৩৯৩হি.)[২৬৭]-এর এর নিকট

---

[২৬৫] হিফজুর রহমান, মাশায়েখে কুমিল্লা (কুমিল্লাঃ আল-জামিয়াতুল ইসলামীয়া দারুল উলূম বরুড়া, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ১৬৯।

[২৬৬] মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহ.), তিনি ১২৪৪হি. গাঙ্গুহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শাহ আব্দুল কদ্দুস ও মাতার নাম কারীমু ন্নেসা। তাঁর বংশধারা আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) এর সাথে সম্পৃক্ত। তিনি ভারত থেকে হিজরত করে মদিনার মসজদিদে নববীতে হাদীস পড়াতেন। তিনি ১৪ বছর পর্যন্ত হানাফী মাযাহাবের ফিকহের কিতাবগুলো পড়িয়েছেন। তিনি ১৩২২ হি. তে ইন্তেকালে করেন। (হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, আমরা যাদের উত্তরসূরি, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৯)।

[২৬৭] মাওলানা মুহাম্মাদ শফী (রহ.)। তিনি সাহারানপুর জেলায় দেওবন্দে ১৩১৪ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। দাদা তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মদ মুবীন। ছাত্র অবস্থায় ওস্তাদগণ হাদীসের যা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতেন তা হুবহু বর্ণনা করতে পারতেন।

Dhaka University Institutional Repository

মোয়াত্তা মালিক অধ্যয়ন করেন। দাওরায়ে হাদীস শেষ করে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাফসীর বিভাগে ভর্তি হন। মুফতী শফী (রহ.), মাওলানা ইব্রাহীম বিলয়ারী (রহ.), মাওলানা রাসূল খাঁন (রহ.)-এর নিকট ইলমে তাফসীরের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা গিয়াসুদ্দীন (রহ.)-এর কন্যা রাযিয়া খাতুনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। দারুল উলূম দেওবন্দে অধ্যয়নকালে তিনি শায়েখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান (রহ.)-এর মহাল্লার মসজিদে ইমামতী করতেন ও দাপ্তরিক ফতোয়ার দায়িত্ব পালন করেন। তার জ্ঞানের গভীরতার ফলে মসজিদের মুসল্লীরা তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতো।

মাওলানা সাইয়িদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর নিকট ইলমে তাসাওউফ হাসিলের জন্য মুহিব্বুর রহমান মৌখিক ও লিখিত দরখাস্ত পেশ করেন। তিনি তাঁকে ইস্তেখারা করার পরামর্শ দেন। ইস্তেখারার ফলাফল হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) কে জানানো হয়। তিনিও তাঁর সম্মতির অপেক্ষায় থাকেন। সাইয়িদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর অসংখ্য শিষ্য ছিল। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল উলামায়ে কিরাম। কিছুদিন পর মাদানী (রহ.) বাঁশকান্দি সফরে আসেন। অতঃপর ফজরের নামাযের পর শাহ্ মুহিব্বুর রহমানকে চার তরিকার ওপর খেলাফত প্রদান করেন। দেশে ফেরার সাথে সাথে এই খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফেনী , লাকসাম, নাঙ্গলকোট এলাকার শত শত আলেম-উলামা তাঁর কাছে বাই'আত হওয়া শুরু করেন।

মাওলানা শাহ্ মুহিব্বুর রহমান (রহ.) ২০ আগস্ট ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। দারুল উলূম বরুড়া মাদ্‌রাসার মুহতামিম মাওলানা মুফতী আবদুর ওয়াহহাব তাঁর জানাযার নামাযের ইমামতি করেন।[২৬৮]

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা শাহ্ মুহিব্বুর রহমান (রহ.) অবদান-

মাওলানা শাহ মুহিব্বুর রহমান (রহ.) ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করার পর ইলমে দ্বীনের খেদমতের জন্য অনেক আলিয়া ও কওমী মাদ্‌রাসা হতে প্রস্তাব আসে এবং অবশেষ তিনি বটগ্রাম হামিদিয়া মাদ্‌রাসায় দ্বীনী খেদমতে মুদাররিস হিসেবে যোগদান করেন এবং অত্র মাদ্‌রাসায় গুরুত্বপূর্ণ কিতাব পড়াতেন। আর ছাত্রদের ইল্‌ম ও আমলের উন্নতির জন্য বিশেষ নজর দেন। অত্র মাদ্‌রাসায় তিনি নয় মাস যাবৎ দ্বীনী তা'লীমসহ এলাকার সাধারণ মানুষের ইসলাহের বিশেষ দাওয়াত প্রদান করেন।

ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দে অধ্যয়নকালে মাওলানা আবদুল হালীম (রহ.) মুহিব্বুর রহমানকে তারাকান্দি মাদ্‌রাসায় ইলমে দ্বীনের খেদমতে জন্য প্রস্তাব করেন। কিন্তু বাড়ির নিকটে বটগ্রাম মাদ্‌রাসা হওয়ায় তিনি অত্র মাদ্‌রাসায় ইলমে দ্বীনের খেদমতে যোগদান করেন। কিন্তু অনিবার্য কারণবশত তিনি সেখান থেকে তারাকান্দি মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। তৎকালীন বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় তারাকান্দি আলিয়া মাদ্‌রাসার বেশ সুনাম ছিল। তিনি এখানে মুহাদ্দিসের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তোলেন এবং সবসময় মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর সাথে পত্র যোগে যোগাযোগ রাখেন। অল্প সময়ের মধ্যে একজন আদর্শ ও সফল মুহাদ্দিস হিসেবে তাঁর সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

তিনি থানভী (রহ.) থেকে খেলাফাত লাভ করেন। তিনি ১৩৯৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। (হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, আমরা যাদের উত্তরসূরি, প্রাগুক্ত, পৃ.১২২)।

[২৬৮] হিফজুর রহমান, মাশায়েখে কুমিল্লা, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ইলমে দ্বীন সংক্রান্ত প্রশ্নসমূহ অত্যন্ত সহজ সরলভাবে ছাত্রদের মাঝে উপস্থাপন করতেন। ছাত্র-শিক্ষক সকলেই কুরআন-হাদীস, নাহু-সরফ সংক্রান্ত কোন জটিল সমস্যায় পড়লে সমাধানের জন্য তাঁর শরণাপন্ন হতেন। বালাগাত, মানতিক ও ফিকহের কিতাবসমূহ তাঁর নিকট একেবারে পরিষ্কার ছিল। তাঁর হুসনে আখলাক ও মধুর ব্যবহারে ছাত্র-শিক্ষক, এলাকার আলেম উলামা ও সাধারণ লোকজন সকলেই মুগ্ধ ছিলেন।[২৬৯]

কিশোরগঞ্জ তারাকান্দি মাদ্রাসায় ওস্তাদ থাকাকালীন তিনি হর্ষি যানীপাড়া গ্রামে মোগল বাদশাহ আরওঙ্গজেবের আমলে নির্মিত এক ঐতিহাসিক শাহী মসজিদের খতীব পদে নিয়োগ লাভ করেন। এই মসজিদে তিনি প্রতি শুক্রবার ওয়াজ-নসীহত করতেন। তাওহীদ, রিসালাত ও পরকালের ভয়াবহ পরিণতির কথা তথা ইসলামের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে মানুষের মাঝে ওয়াজ-নসীহত করতেন। পূর্বে এই মসজিদকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু কুসংস্কার ও বিদ'আত প্রচলিত ছিল। তিনি এগুলোর বিরুদ্ধে মানুষদেরকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দেন। তাঁর ওয়াজ-নসীহতে বহু মানুষ তাঁর নিকট বাই'আত হন। তিনি নিজেকে অত্যন্ত নগণ্য মনে করতেন এবং অপারগতা প্রকাশ করতেন। অনেক আলেমও তাঁর নিকট বাই'আত গ্রহণ করেন। তারাকান্দি থাকাকালীন শাহ্ মুহিব্বুর রহমান (রহ.) শাহী জামে মসজিদে ই'তিকাফ করতেন। তাঁর সঙ্গে আরও অনেক মুসল্লী ই'তিকাফ করতেন। শায়েখুল ইসলাম সাইয়িদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর অনেক শাগরিদ তার নিকট সবক নেন। কিশোরকঞ্জ থাকাকালীন মাওলানা শাহ্ মুহিব্বুর রহমান হাকীমুল উম্মতের খলীফা মাওলানা আতহার আলী (রহ.), মাদানী (রহ.)-এর খলীফা আমীনুল হক মাহমূদী (রহ.), পাঁচবাগী (রহ.), তারাকান্দির মাওলানা আবদুল হালীম (রহ.)-এর সঙ্গে মাঝে মধ্যে সাক্ষাৎ করতেন। তাদের সাথে শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় করতেন। মাওলানা মুহিব্বুর রহমান (রহ.) তারাকান্দি মাদ্রাসায় ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত থেকে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রচার-প্রসারে অবদান রাখেন।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা শাহ মহিব্বুর রহমান (রহ.) দক্ষিণ বঙ্গের খুলনা জেলার মোড়েলগঞ্জ[২৭০] এলাকার আমতলী সিনিয়র মাদ্রাসার সুপার পদে যোগদান করেন। অত্র মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হলেন মাওলানা আবদুল লতীফ (রহ.), যিনি দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস পাস করেন এবং তিনি ফুরফুরা সিলসিলার পীর ছিলেন। তাঁর ছোট ছেলে মাওলানা আবু বকর ছিল ঐ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মাদ্রাসায় একটি হিফয বিভাগ চালু রয়েছে। সেখানে একটি ঐতিহ্যবাহী মসজিদও রয়েছে। মাদ্রাসার সাথে একটি সরকারি প্রাইমারি স্কুল ও একটি বাজার রয়েছে। মনোহরগঞ্জ উপজেলার ভলুপাড়ার গ্রামের মাওলানা আবদুল ওয়াদূদ (রহ.) উক্ত মাদারসায় পূর্ব থেকেই অধ্যাপনার দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর মাধ্যমেই মাওলানা মুহিব্বুর রহমানের এই মাদ্রাসায় যোগদান করেন। প্রথমত মাদ্রাসায় পড়ালেখার অবস্থা অত্যন্ত জরাজীর্ণ ছিল। মাওলানা মুহিব্বুর রহমান যোগদান করার পর তিনি শিক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কার করেন। ওস্তাদগণ একজন বিজ্ঞ আলেম ও বুযুর্গ পরিচাল পেয়ে নতুন উদ্যমে শিক্ষাদান শুরু করেন। অত্র এলাকার বিদ'আত ও কুসংস্কারের প্রচলন ছিল। মাওলানা মুহিব্বুর রহমান (রহ.) ওয়াজ-নসীহত ও বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তা দূরীভূত করেন। মাওলানা মুহিব্বুর রহমান ও তাঁর সহচরদের চেষ্টায় ছাত্রদের

---

[২৬৯] প্রাগুপ্ত, পৃ. ৪৯।

[২৭০] মোড়লগঞ্জ বর্তমান বাগেরহাট জেলার একটি উপজেলা। উপজেলাটি ১৪টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। পার্শ্ববর্তী উপজেলার নাম স্বরণখোলা। অত্র উপজেলাটি ৪টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। আমতোলী ইউনিয়টি উপজেলা শহর থেকে ১০-১২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

Dhaka University Institutional Repository

বোর্ড পরীক্ষার ফলাফলা খুবই প্রশংসীত হয়। এভাবে তিনি মাদ্‌রাসায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।[২৭১]

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ফেনী আলিয়া মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিসের একটি পদ খালি হলে উক্ত মাদ্‌রাসার প্রধান শায়েখুল হাদীস মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন (রহ.)-এর অনুরোধে মাওলানা মুহিব্বুর রহমান (রহ.)-কে শায়েখুল হাদীস হিসেবে অত্র মাদ্‌রাসা কমিটি নিয়োগদান করেন। তাঁর মতো একজন বিদগ্ধ আলেমকে শায়েখুল হাদীস হিসেবে পেয়ে তাঁরা অত্যন্ত খুশি হন। সে সময় ফেনী আলিয়া মাদ্‌রাসা আহলে ইল্‌ম এবং বুযুর্গানে দীনের খানকায় পরিণত হয়েছিল। মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার মাওলানা ওবাইদুল হক (রহ.)[২৭২]। অত্র মাদ্‌রাসায় বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী (রহ.), ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.), সুফী সদরুদ্দীন (রহ.), আরেফ বিল্লাল প্রফেসর নুর মুহাম্মদ আজমী (রহ.), কতুবুল আলম মাওলানা আযীযুল হক (রহ.), খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দীক আহমাদ (রহ.), মাওলানা শামসুর হক ফরিদপুরী (রহ.) মাওলানা শাহ সুলতান আহমদ নানুপরী (রহ.) প্রমূখ বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল। ফেনী আলিয়া মাদ্‌রাসা তৎকালীন পূর্ব বাংলার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এখানে বুখারী শরীফের দারস দিতেন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন (রহ)। মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপাল সাহেব ও অন্যান্য আসাতিযায়ে কেরাম তাঁর ইল্‌ম ও আমল আখলাকে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বুযুর্গ সাহেব বলে সম্বোধন করতেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে গোটা ভারত জুড়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন চলছিল। মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ এর পক্ষ থেকে ফেনীসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য ইসলামী মাহফিল ও গণসংযোগ করতেন। সুযোগ পেলেই তিনি তাঁর সফর সঙ্গী হতেন এবং সাধ্যমতো দ্বীন প্রচারে সহযোগিতা করতেন।

পাক-ভারত বিভাগের পর কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা ঢাকায় স্থানান্তর হলে তার নাম দেওয়া হয় ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসা। তার শাখা-প্রশাখা হিসেবে বাংলাদেশে হাজার হাজার মাদ্‌রাসা গড়ে ওঠে। এই মাদ্‌রাসাগুলোর ওস্তাদ এবং মাদ্‌রাসার যাবতীয় দাবি দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে 'জমিয়তুল মুদারিসীন' নামে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে। বড় বড় মাদ্‌রাসাগুলো ছিল এর সদস্য। এতে ফেনী আলিয়া মাদ্‌রাসার অবদান ছিলো শীর্ষে। সে সময় ফেনী আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা উবায়দুল হক (রহ.) ছিলেন জমিয়তুল মুদাররিসীনের সেক্রেটারি জেনারেল। কিন্তু মহিব্বুর রহমান (রহ.) যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতেন। কিন্তু এক পর্যায়ে তিনি বৃহত্তর নোয়াখালীর জমিয়তুল মুদাররিসীনের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হন এবং সে দায়িত্বের সুচারুরূপে পালন করেন।[২৭৩]

কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার উত্তর হাওলা ইউনিয়ন পরিষদ বরল্লা মৌজার ছমীরুদ্দীন মুনশির হাটে একটি ঐতিহ্যবাহী ঈদগাহ ছিল। পশ্চিম গাঁওয়ের প্রজা দরদী জমিদার নওয়াব ফয়যুন্নেসা সাহেবানীর সুযোগ্য কন্যা বদরুন্নেছা চৌধুরানী এই ঈদগাহ প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তর হাওলা, ফেনুয়া, বরল্লা, ফাটুনীপাড়া, ইন্দ্রী, উলুপাড়া, ঠেংগারবাম, তরনীখণ্ড গ্রামের মুসলমানগণ অত্র ঈদের নামায আদায় করতেন। এই ঐতিহ্যবাহী ঈদগাহের ইমাম ছিলেন প্রখ্যাত আলেম মাওলানা গিয়াস উদ্দিন (রহ.)। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে ঈদগাহ পরিচালনা কমিটির সম্মতিক্রমে তাঁর

---

[২৭১] প্রাগুপ্ত, পৃ.৫১।

[২৭২] মাওলানা উবায়দুল হক ইসলামাবাদী (রহ.) ছিলেন এই মাদ্‌রাসার স্বনামধন্য প্রিন্সিপাল। তিনি নিযামে ইসলাম পার্টি থেকে পাকিস্তান আমলে ফেনীতে নির্বাচনও করেছিলেন।

[২৭৩] হিফজুর রহমান, মাশায়েখে কুমিল্লা, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

জামাতা মাওলানা মুহিব্বুর রহমান (রহ.)-কে উক্ত ঈদগাহের ইমাম নিযুক্ত করেন। স্থানীয় মুসল্লীগণ এবং এলাকার উলামায়ে কেরাম এতে অত্যন্ত আনন্দিত হন। তাঁর বয়ান শোনার জন্য হাজার হাজার লোক বহুদূর হতে এই ঈদগাহে ঈদের নামাযে শরীক হতেন তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে ইসলামের প্রচারে-প্রসারের আরও ব্যাপকভাবে প্রসারতা লাভ করে। অত্র ঈদগাহের খতীব পদ ছাড়াও ফেনুয়া হুসাইনিয়া মাদ্‌রাসা, মুন্সির হাট হুসাইনিয়া মাদ্‌রাসা এবং কাশীপুর ইসলামিয়া মাদ্‌রাসার পৃষ্ঠপোষক ও মজলিসে শুরার সম্মানিত সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

আরবী ও ইসলাম শিক্ষার আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত করার নিমিত্তে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন (রহ.) মুন্সিরহাট হুসাইনিয়া মাদ্‌রাসা নামে একটি দ্বীনী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। অত্র মাদ্‌রাসায় মাওলানা আবদুল মান্নান সাহেব (রহ.) অন্যতম একজন মুরব্বী ও ওস্তাদ ছিলেন। এই মাদ্‌রাসা মুহতামিম ছিলেন মাওলানা শাহ দেলাওয়ার হোসাইন (রহ.)-এর বড় ছেলে মাওলানা আছেম বিল্লাহ (রহ.)। মাওলানা শাহ মুহিব্বুর রহমান (রহ.) ফেনী আলিয়া মাদ্‌রাসা হতে অবসর গ্রহণ করার পর অত্র মাদ্‌রাসার মুহতামিম হিসেবে যোগদান করেন এবং পূর্ব হতেই তিনি অত্র মাদ্‌রাসার মজলিসে শুরার সদস্য ছিলেন। তিনি নিজ বাড়িতে মসজিদ সংস্কার করে খতিবের দায়িত্ব পালন করেন। প্রতি বছরই মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় বার্ষিক মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এই মসজিদকে কেন্দ্র করে আশপাশের গ্রামের মধ্যে ইসলামের ব্যাপক প্রচার-প্রসার লাভ করে।[২৭৪]

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে এশিয়া মহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দারুল উলূম দেওবন্দের শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বিরাট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সে সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল একশত বছরের মধ্যে যারা অত্র প্রতিষ্ঠান হতে পাস করেছিলেন তাঁদেরকে পাগড়ী প্রদান করা। তাই উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য সকল ছাত্রকে চিঠি পাঠানো হয়। তিনি পত্র পেয়ে দেওবন্দের শত বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করেন। এই শত বার্ষিকী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ, ভারত পাকিস্তান, ইরান, আফগানিস্তান, সৌদী আরব, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, মরক্কো, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বিশ্বের অসংখ্যা দেশ হতে আলেম-ওলামা উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে শেষে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে এসে তিনি আরও ব্যাপকভাবে ইসলামের প্রচার-প্রসারে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

মাওলানা শাহ্ মুহিব্বুর রহমান (রহ.) বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু উত্তরসূরি তৈরি করেন। যাঁদেরকে তিনি আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় পরিপূর্ণ জ্ঞানদানের মাধ্যমে যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলেন। যারা ইসলামের পরিপূর্ণ শিক্ষা নিয়ে সমাজের বিভিন্ন অঙ্গনে ইসলামের প্রচার-প্রসারে ব্যাপক অবদান রাখেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন -

মাওলানা আবদুল আযীয (রহ.) মুহতামিম বটগ্রাম হামীদিয়া মাদ্‌রাসা,
মাওলানা উবায়দুল্লাহ (রহ.) বালিমড়ীর হুযুর,
মাওলানা আনোয়ার উল্লাহ মুহাতামিম নারায়ণকরা মাদ্‌রাসা,
ড. ইনামুর হক সাবেক উপাচার্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া,
মাওলানা আবদুল মান্নান সাহেব, মুহতামিম মুন্সির হাট হুসাইনিয়া মাদ্‌রাসা, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা,
মাওলানা আবদুল হান্নান প্রিন্সিপাল নোয়াখালী ইসলামীয়া মাদ্‌রাসা,
মাওলানা আইউব আলী আজমী সাহেব, সাবেক উপাধ্যক্ষ গহিরা আলিয়া মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম,
মাওলানা ইরাদাতুল্লাহ, সাবেক মুহাদ্দিস গাজীর মুড়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, কুমিল্লা,
মাওলানা আব্দুস সাত্তার, খতীব ডি, এল মসজিদ, ঢাকা,

[২৭৪] আল্লামা শাহ মুহিব্বুর রহমান (রহ.), স্মারক গ্রন্থ, (আঞ্জুমানে মাদানীয়া মুহিব্বিয়া, বাংলাদেশ, ২০১১খ্রি.), পৃ. ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা ক্বারী বশীর উল্লাহ্ সুবার বাজার, পরশুরাম ফেনী,
মাওলানা ক্বারী মুনাওয়ার নাঙ্গল কোট, কুমিল্লা,
মাওলানা মুজীবুর রহমান সাবেক প্রিন্সিপাল শাহপুর ফাযেল মাদ্‌রাসা, মনোহরগঞ্জ,
মাওলানা হাবীবুর রহমান উত্তর হাওলা, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা,
মাওলানা কবীর আহমাদ (রহ.) ফেনী,
মাওলানা রবীউল হক কাকরাইল, ঢাকা।

এ ছাড়াও তাঁর অসংখ্যা শাগরিদ বাংলাদেশের বিভিন্ন উচ্চ পদে আসীন থেকে বিভিন্ন অবদান রাখেন।[২৭৫]

বিদ'আত, কুসংস্কার ও ভণ্ড পীরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সংস্কারমূলক ভূমিকা : আমাদের দেশে বিদ'আত ও কুসংস্কার অনেক বেশি। তুরীকতের নাম দিয়ে শরীয়ত বর্জন করে বিভিন্ন শরীয়ত বিরোধী কার্যলাপে তারা লিপ্ত হয়। বিভিন্ন পীর আউলীয়া, গাউস নামে ভণ্ড পীরদের কার্যকলাপ আমাদের দেশে চলছে। এদের দাবি হল তুরীকতই আসল। শরীয়তের কোন প্রয়োজন নেই। এদের অনেকেই নামায পড়েনা, রোযা রাখেনা। রাতে যিকিরের হালকা শুরু হয়। পুরুষ-মহিলা একসঙ্গে নেচে গেয়ে মাতোয়ারা হয়ে যিকির করে। যেগুলো শিরক এবং কুফরে পরিপূর্ণ। মাওলানা মুহিব্বুর রহমান (রহ.) এগুলোর বিরুদ্ধে সবসময় কঠিন ভূমিকা পালন করেন এবং সকল মুসলমানদেরকে এ সকল কুসংস্কার থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতেন।

খিলা রেল স্টেশনের পার্শ্ববর্তী বান্দুয়াইন গ্রাম। মুফতী আবদুর রহমান (রহ.) এ গ্রামেরই অধিবাসী। এ গ্রামের পূর্ব-দক্ষিণ পার্শে একটি খালি মাঠ। এখানে গরু-ছাগল-জীব-জন্তুর চারণভূমি ছিল। জায়গাটি মূলত সরকারি জায়গা। এই জায়গার মাঝখানো আগেকার যুগ থেকে একটি বিরাট বটগাছ ছিল। এক পর্যায়ে এখানে শিরক, বিদ'আত শুরু হয়। বিভিন্ন লোকজন বিভিন্ন রকমের মান্নত-নযর করতো। এখানে টাকা দিয়ে যেতো এবং তার গোড়ায় মাটি ফেলতো। এভাবে মাটি ফেলতে ফেলতে এক পর্যায় জায়গাটি টিলার মতো উঁচু হয়ে যায়।

মূর্খ মানুষরা এখানে এসে গাছটিকে সিজদাও করতো। এই অবস্থা লক্ষ্য করে মুফতী আব্দুর রহমান ও মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন (রহ.), মাওলানা মুহিব্বুর রহমান (রহ.)-সহ অন্যন্যা উলামায়ে কেরাম এবং কাশিপুর ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা ও চিলুয়া মাদ্‌রাসাসহ আশেপাশের মাদ্‌রাসার ওস্তাদ ছাত্র ও এলাকার প্রকৃত দ্বীনদার লোকদেরকে সাথে নিয়ে কোদাল কুড়াল দিয়ে গাছটি কেটে ফেলে এবং উঁচু মাটিগুলো কেটে সমান করে দেয়।

মাওলানা শাহ্ মুহিব্বুর রহমান (রহ.) ছাত্র-জীবন থেকেই কুসংস্কার ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে খুবই কঠোর ছিলেন। উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য ভারতের রামপুর মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন কিন্তু সেখানে অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও সেখানে কিছু কুসংস্কার ও বিদ'আত থাকার কারণে তিনি সে মাদ্‌রাসা ত্যাগ করেন। হরষী বাণীপাড়া শাহী মসজিদের খতীব থাকা অবস্থায় তিনি এলাকার মুসল্লীদের নিয়ে সামাজিকভাবে রুসূমাত, বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর আন্দোলনের অভূত সাড়ায় এলাকার মানুষ অতি অল্প সময়ে পুরো এলাকা বিদ'আত মুক্ত হয়। খুলনার আমতলী, ফেনী নোয়াখালী, কুমিল্লা এবং স্বীয় এলাকায় বিদ'আত ও কুসংস্কারের অপকারিতা সম্পর্কে মানুষকে বিশেষভাবে অবহিত করেন এবং সঠিক ইসলামের প্রতি সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন।[২৭৬]

---

[২৭৫] হিফজুর রহমান, মাশায়েখে কুমিল্লা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।
[২৭৬] প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

লাকসাম ও মনোহরগঞ্জ এলাকায় বেশ ক'টি কওমী মাদ্রাসা রয়েছে। সেগুলোতে প্রতি বছর রীতিমতো বার্ষিক মাহফিল অনুষ্ঠিত হত। অনেক মহল্লার মসজিদেও মাহফিল হত। সেসব মাহফিলের মধ্যমণি ছিলেন তিনি। উত্তর হাওলা, ফেনুয়া, সাতেশ্বর, উলুপাড়া, বরল্লা, নাথেপেটুয়া, কাশীপুর প্রভৃতি মাহফিলগুলোতে তিনি বাতেল ফেরকার বিরুদ্ধে কঠিন অবস্থান গ্রহণ করেন। আর ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ সফর করেন তাঁর জীবনে এটিই ছিল শেষ সফর। তিনি মুফতী মুহাম্মাদ আলী, শায়েখুল হাদীস মাওলানা আবদুল আলীম আল হোসাইনী, মকবুল কোচিং সেন্টারের মাস্টার আতীকুর মাওলানা আযীম উদ্দীন হর্ষি, বানিপাড়ার রফিক সাহেব সার্বক্ষণিক তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন। তিনি দীর্ঘ ৪৫ বছর হর্ষি বানিপাড়া শাহী মসজিদে খতিব ও মু'তাকিফ ছিলেন। এলাকার আলেম-উলামা ও সাধারণ দ্বীনদার মানুষ তাঁকে এলাকার প্রতি রহমত মনে করে থাকতেন। তিনি সেসব মাহফিলকে ব্যাপকভাবে ইসলামের প্রচার-প্রসারে কাজে লাগান।

ইসতেস্কার নামায শেষে দু'আর পর তাৎক্ষণিক রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ : মনোহরগঞ্জ উপজেলার উত্তর হাওলা গ্রামের ক্বারী শফীকুর রহমান বলেন, একবার এলাকায় অত্যন্ত ভয়াবহ খরা দেখা দেয়। যার ফলে মাঠের ধান জ্বলে যাওয়ার উপক্রম হয়। উত্তর হাওলা, ফেনুয়া শিকচাইল, তাহিরপুর ও দাড়াচো গ্রামের লোকেরা ইস্তিস্কার নামাযের ব্যবস্থা করলো, তখন বড়খিল নামক মাঠে ইসতেস্কার নামায অনুষ্ঠিত হলো। এতে অনেক বড় বড় আলেম ওলামা উপস্থিত হলেন। তিনি ওলামায়ে কেরামের অনুরোধে ইস্তিস্কার নামাযের ইমামতি করেন এবং নামায শেষে তাঁকে দু'আ করলেন, মুনাজাত শেষ না হতেই আকাশে মেঘে ছেয়ে গেল। অল্প সময়ের মধ্যে বজ্রসহ বৃষ্টি শুরু হল। আর যারা নামায পড়তে গিয়েছিল সকলে বৃষ্টিতে ভিজে ফিরল।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম, সাংবাদিক ও সাহিত্যক, মাসিক মদীনার সম্পাদক মাওলানা মুহীউদ্দীন খানের পরিবারের সঙ্গে মাওলানা শাহ্ মুহিব্বুর রহমান (রহ.) বিশেষভাবে সম্পর্ক ছিল। মহিউদ্দিন খানের নানা আসগর খান সাহেব অসিয়ত করেন যে, শাহ্ মুহিব্বুর রহমান যেন তাঁর জানাযায় নামায পড়ান। আত্মীয়-স্বজন সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়েন। কারণ, তাঁকে বহু দূর থেকে নিয়ে আসা বড় কঠিন ব্যাপার ছিল। যাতায়াতের জন্য প্রচুর সময়ের প্রয়োজন। এমন সময় বাড়ির সামনে মাওলানা মুহিব্বুর রহমান উপস্থিত। সকলেই অবাক! কিন্তু কিছুক্ষণ পর আসগর সাহেব ইন্তেকাল করলেন। নিজ হাতে তাঁকে গোসল দিয়ে কাফন পরালেন এবং জানাযায় ইমামতি করলেন। এই ঘটনায় সকলেই বিস্মিত হলেন।

মাওলানা শাহ্ মুহিব্বুর রহমান (রহ.) কর্তৃক সৌদির আলেমকে সনদ প্রদান : মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব যখন সৌদি আরবে শায়েখ আবুল ফাত্তাহ (রহ.)-এর নিকট ছিলেন তখন শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আ'লুর রশীদ এবং শায়েখ আহমদ আল মক্কী তাঁরা মাওলানা আবদুল মালেককে বলেন, বাংলাদেশের শীর্ষ কোন দেওবন্দের হাদীস বিশারদ থেকে তাঁদেরকে হাদীসের ইজাযত নিয়ে দেওয়ার জন্য, মাওলানা মুহিব্বুর রহমান (রহ.)-এর কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করার পর তিনি তাদেরকে হাদীসের ইজাযত প্রদান করেন এবং নিজ হাতে ইজাযত নামায় দস্তখত করেন।

মাওলানা শাহ্ মুহিব্বুর রহমান (রহ.) ছিলেন কুরআন-হাদীসের জ্ঞানের অধিকারী। বাই'আত ও খেলাফতের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। যতদিন মাওলানা শাহ্ দেলাওয়ার হোসাইন (রহ.) জীবিত ছিলেন, কেউ বাই'আত হতে আসলে তিনি তাঁর নিকট পাঠিয়ে দিতেন। তিনি অনেক যাচাই বাছাই করে মাত্র দুই ব্যক্তিকে খেলাফত প্রদান করেন তাঁরা হলেন:

- মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ আলী গফরগাঁও, মোমেনশাহী। প্রধান মুফতী, হয়বত নগর আলিয়া মাদ্রাসা, কিশোরগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

- আলহাজ্ব অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ মুনাওয়ার হোসাইন, সাবেক অধ্যক্ষ, নিমসার জুনাব আলী কলেজ, কুমিল্লা।[২৭৭]

মাওলানা শাহ্ মুহিব্বুর রহমান (রহ.)-এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বাণী-

১। বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসের ওপর অটল থাকবে। শিরক হতে বেঁচে থাকবে।

২। সর্বদা সুন্নাতের ওপর অটল থাকবে।

৩। বিদ'আতে কোনো হিদায়াত নেই। কোন প্রকার বিদ'আতী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হবে না। কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতি থেকে দূরে থাকবে।

৪। কোনো বাতিল ফিরকা বা দলের অনুসারী হবে না।

৫। পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সঙ্গে আদায় করবে।

৬। দ্বীনী মাদ্‌রাসাগুলোকে আপন মাদ্‌রাসা বলে জানবে যথাসম্ভব এসব মাদ্‌রাসায় আর্থিক ও শারীরিকভাবে সহযোগিতা করবে।

৯। ছেলেমেয়েদেরকে দ্বীনী শিক্ষা দিবে।

১০। দাওয়াতে তাবলীগে যথাসম্ভব সময় ও মাল দিয়ে সহযোগিতা করবে।

১১। ঘরে শরয়ী পর্দার ব্যবস্থা করবে। গান-বাদ্য হতে বেঁচে থাকবে।

১২। বোন ও ফুফুদের হক আদায় করবে।

১৩। আল্লাহর সামনে নিজেকে তুচ্ছ ও অপরাধী মনে করবে।

মাওলানা শাহ্ মুহিব্বুর রহমান (রহ.)-এর নামে কয়েকটি দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন-

১। **মুহিব্বিয়া ইসলাহী মাদ্‌রাসাঃ** মাওলানা মুহিব্বুর রহমান (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর তার নামে প্রতিষ্ঠিত হয় মুহিব্বিয়া ইসলাহী মাদ্‌রাসা। এই দ্বীনী প্রতিষ্ঠানটি ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে বৃহত্তম মোমেনশাহী অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার ১নং জাঙ্গালিয়া ইউনিয়নের চরটেকি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মাদ্‌রাসার জন্য জমি দান করেন, জনাব আবুল কালাম, জনাব সেলিম এবং জনাব খোকন সাহেব।

২। **খানকায়ে মুহিব্বিয়া মাদানীয়া ও মুহিব্বিয়া মাদ্‌রাসাঃ** কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার হাফানিয়া মদনী নগরে এটি অবস্থিত। খানকায়ে মুহিব্বিয়া মাদানীয়া ও মুহিব্বিয়া মাদ্‌রাসাটি ২০১০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জনাব লুৎফুর রহমান অত্র মাদ্‌রাসার জন্য জমি দান করেন।

৩। **মুহিব্বিয়া ইসলাহী মারকাযঃ** এই দ্বীনী প্রতিষ্ঠানটি ২০১০ খ্রিস্টাব্দে কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলার পশ্চিম পোড়াবাড়িয়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের জন্য জমি দান করেন জনাব খোরশেদ সাহেবের মাতা।

৪। **মুহিব্বিয়া মাদানীয়া আজিজিয়া মাদ্‌রাসাঃ** এই প্রতিষ্ঠানটি ২০১১ খ্রিস্টাব্দে মোমেনশাহী জেলার গফরগাঁও উপজেলার পাঁচবাগ ইউনিয়নের টোকা গ্রামে তাঁর নামে প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি জমি দান করলেন মাস্টার আবদুল মতীন সাহেব। তিনি এ গ্রামেরই বাসিন্দা।

৫। **মুহিব্বিয়া কেন্দ্রীয় ইসলামী পাঠগারঃ** এই দ্বীনী শিক্ষা কেন্দ্রটি ২০১১ খ্রিস্টাব্দে মোমেনশাহী জেলার গফরগাঁও উপজেলার পাঁচবাগ ইউনিয়নের লামকাইন গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। অত্র গ্রামের জনগণ তাঁর নামে উক্ত প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করেন।

---

[২৭৭] আল্লামা শাহ মুহিব্বুর রহমান, স্মারক গ্রন্থ, পৃ. ৮০।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া ও আরও অনেক গুলো প্রতিষ্ঠান রয়েছেন তাহলেঃ

মুহিব্বুয়া রিচার্স সেন্টার, মুহিব্বিয়া একাডেমী, মাদানী রিচার্স সেন্টার, মুহিব্বিয়া দারুল মুতালা'আ, মুহিব্বিয়া পাঠাগার, ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, মুহিব্বিয়া দুস্থ মানবতা সেবাকেন্দ্র।[২৭৮]

মাওলানা শাহ্ মুহিব্বুর রহমান (রহ.) সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত-

১। শায়েখুল হাসিদ মাওলানা নুর হোসাইন কাসেমী[২৭৯] তিনি বলেন, মাওলানা মুহিব্বুর রহমান (রহ.) ছিলেন ব্যক্তি জীবনে অত্যন্ত অমায়িক, বিনয়ী। সাদাসিধে জীবন-যাপন ছিলো তাঁর খুব প্রিয়। আধ্যাত্মিক সাধনায় ছিলেন একজন খুব উঁচুমাপের সাধক ও মুত্তাবিউস সুন্নাহ। তাঁর নিজ নামেরও প্রতিফলন ঘটে তাঁর বাস্তব জীবনে। পারিবারিক জীবনে তিনি ছিলেন একজন আদর্শবান বিচক্ষণ অভিভাবক। তাঁর গবেষণা ছিল অনেক বেশি। আরবী ও ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক মহান কারিগর। তাঁর ঐকান্তিক ও নিরলস প্রচেষ্টার ফলে ছাত্রদের মাঝে ব্যাপকভাবে ইল্‌মী ও আমলী উন্নতি সাধিত হয়। তিনি বিভিন্ন মাদ্‌রাসার মাধ্যমে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রচার-প্রসারে সফলতার স্বাক্ষর রাখেন। তিনি একান্ত নিষ্ঠা ও বিচক্ষণতার সাথে শায়েখুল হাদীস ও প্রিন্সিপালের দায়িত্বও পালন করেছেন।[২৮০]

২। মাওলানা নুরুল ইসলাম, শায়েখুল হাদীস দারুল উলূম আল-হুসাইনিয়া ওলামা বাজার, ফেনী, তিনি বলেন, মাওলানা শাহ্ মুহিব্বুর রহমান (রহ.) ছিলেন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন ও সুন্নাতে রাসূলের (সা.) একনিষ্ঠ অনুসারী। তাঁর ইলমের ভাণ্ডার থেকে অনেকেই ইলেম অর্জন করে ধন্য হয়েছেন এবং নিজেদের জীবনকে সুখময় জীবন হিসেবে গঠন করে নিয়েছেন। তিনি ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে খুলনা জেলার মোড়লগঞ্জ এলাকার আমতলী মাদ্‌রাসা অধ্যক্ষ পদে যোগ দান করেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় মাদ্‌রাসার ছাত্রদের আরবী ও ইসলামী শিক্ষার উন্নতি সাধিত হওয়ার সাথে সাথে এলাকার বিভিন্ন ধরনের বিদ'আত কুসংস্কার দূরীভূত হয়। তিনি নিষ্ঠার সাথে এ মাদ্‌রাসার দায়িত্ব পালনের পর ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ফেনী আলিয়া মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। তখনকার যুগে ফেনী ছিল আহলে ইল্‌ম ও বুযুর্গদের মিলনকেন্দ্র। তাঁর আচার-আচরণ, উঠা-বসা, কথা-বার্তা দেখে সকলেই মুগ্ধ হন। তিনি কুমিল্লার মাশারিখদের মধ্যে বলামধ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর অবদান কুমিল্লা, মোমেনশাহী ও ফেনীবাসীর নিকট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২৮১]

৩। মাওলানা হিফজুর রহমান বিন শাহ মুহিব্বুর রহমান, প্রধান মুফতী জামেয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাতমসজিদ, ঢাকা, তিনি বলেন, আমার বাবা সূদীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইলমে হাদীসের তথা বুখারী শরীফের দারস প্রদান করেন। তিনি হাদীসের ইখতিলাফী মাসাআলা বা অন্য যে কোন তাকরীর দলীল সহকারে অত্যন্ত গোছালো এবং সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করতেন। দেশ-বিদেশে তাঁর অসংখ্য শাগরিদ আরবী ও ইসলামী শিক্ষার বহুবিধ খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি শায়েখুল ইসলাম মাদানী (রহ.)-এর শাগরিদ ছিলেন। আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে হাদীস, তাফসীর ফিকহ, উসূলে ফিকহ, আদব, নাহু বিষয়ের ওপর দক্ষতার সাথে শিক্ষা

---

[২৭৮] প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩১৫।

[২৭৯] শায়েখুল হাদিস মাওলানা নুর হোসাইন কাসেমী, প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল ও শায়েখুল হাদীস জামিয়া মাদানিয়া, বারিধারা, ঢাকা, সহ-সভাপতি, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম।

[২৮০] সাক্ষাতকার : ১০ জানুয়ারি, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে।

[২৮১] সাক্ষাতকার : ১০ জানুয়ারি, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রদান করেন। তাঁর মধ্যে দ্বীনী চেতনা পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। তিনি বুযুর্গ হিসেবে সকলের কাছে সমভাবে স্বীকৃত ছিল। তিনি অন্যদেরকেও সুন্নাতের আলোকে জীবন গড়ে তোলার জন্য সচেষ্টা ছিলেন।[২৮২]

৪। মাওলানা জুনায়েদ বাবু নগরী, চট্টগ্রাম, তিনি বলেন, প্রত্যেক যুগে দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরীর আগমন ঘটে। যারা ইলমে যাহেরীর পাশাপাশি ইলমে বাতেনীর অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। নবীগণের উত্তরসূরি হিসেবে পথহারা মানুষের সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে সহযোগিতা করেন। তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে পাঠ্যজীবন সমাপ্ত করার পর বাংলাদেশের কয়েকটি মাদ্‌রাসায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষার খেদমতের আঞ্জাম দেন। তন্মধ্যে ফেনী আলিয়া মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে দীর্ঘকাল ইলমে হাদীসের খেদমত করেন। তিনি ছিলেন নীরব সাদাসিধা জীবনের অধিকারী, জাতির পথপ্রদর্শক, বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সঠিক পদপ্রদর্শন করে হাজার হাজার ছাত্র এবং মুরিদ ও শিষ্যদেরকে রেখে আপন মাবূদের সান্নিধ্যে চলে যান।[২৮৩]

---

[২৮২] সাক্ষাতকার : ১৫ জানুয়ারি, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে।
[২৮৩] সাক্ষাতকার : ২৭ জানুয়ারি, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-১.৮ : মাওলানা শাহ্ সুফী আজীম উদ্দীন আহমদ (রহ.) (১৮৯৪-১৯৭৪ খ্রি.)

যুগশ্রেষ্ঠ মুরশিদে কামিল, হেদায়েতের রাহবার মাওলানা আজীম উদ্দিন আহমদ (রহ.) কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত দেবীদ্বার উপজেলার পদ্মকুট গ্রামে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী নিজামুদ্দীন আহমদ ও মাতার নাম মোসাম্মাৎ জরীনা বেগম। মাওলানা আজীম উদ্দিন শৈশবেই পিতা-মাতাকে হারান। এই অনাথ ইয়াতীম শিশুটির লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁর চাচা ছৈনুদ্দীন আহমদ। কিন্তু কিছু দিন পর চাচাও ইহধাম ত্যাগ করলে নিজ এলাকার আলা উদ্দিন নামক এক হৃদয়বান ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন।

অল্প কিছু দিন পর নোয়াখালীর বিশিষ্ট আলেম ইসলাম প্রচারক মাওলানা আহমদ উল্লাহ সাহেব কুমিল্লায় ইসলাম প্রচার করতে আসেন। তিনি এ অনাথ বালককে দেখে দয়াবশত নিজের সান্নিধ্যে নিয়ে স্থানীয় মাস্টার আবদুর রহমান সাহেবের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি পঞ্চম শ্রেণি পাস করেন এবং প্রাইমারি পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। তীক্ষ্ণ মেধাশক্তি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অধিকারী আজীম উদ্দিনকে নিয়ে তখন সমাজের অনেকেই নানা প্রকার চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। তাঁদের অধিকাংশের অভিমত ছিল যে, তাঁকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলাই শ্রেয়। সহপাঠী ছাত্ররাও তাঁর অপূর্ব মেধাশক্তির প্রশংসা করত এবং এই বালকের দ্বারা ভবিষ্যতে দেশ ও জাতির এক বিরাট উপকার সাধিত হবে, এটা মনে মনে ধারণা করেন। মাওলানা আহমদ উল্লাহ সাহেব দেবীদ্বার উপজেলার শাকতলা গ্রামের অধুনা-লুপ্ত ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষক ছিলেন, তিনি আরবী ও ফার্সী ভাষার ওপর বিশেষ ব্যুৎপত্তি রাখতেন। সে সুবাদে তিনি বালক আজীম উদ্দিনকে কুরআন শিক্ষার সাথে সাথে উর্দু, আরবী এবং ফার্সী ভাষার প্রাথমিক কিতাবগুলো শিক্ষা দান করেন। অসাধারণ মেধাশক্তির অধিকারী আজীম উদ্দিন অতি অল্প সময়েই আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় পুরোপুরি দক্ষতা অর্জন করে নেন। বিশেষত আরবী ব্যাকরণের পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

তাঁর প্রিয় ওস্তাদ মাওলানা আহমদ উল্লাহ সাহেবের পরামর্শক্রমে উচ্চশিক্ষা লাভের নিমিত্তে গ্রাম ছেড়ে ঢাকা শহরের তৎকালীন প্রসিদ্ধ দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্র 'হাম্মাদিয়া মাদ্‌রাসায়' ভর্তি হন। তথায় আরবী, উর্দু ও ফার্সী ভাষাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা দীক্ষাও গ্রহণ করেন। হাম্মাদিয়া মাদ্‌রাসায় সুযোগ্য শিক্ষকমণ্ডলীর নিকট তিনি দ্বীনী শিক্ষা ছাড়াও আদব-আখলাক চাল-চলনসহ বিশেষ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ছিলেন হাম্মাদিয়া মাদ্‌রাসার মেধাবী ছাত্র। ওস্তাদগণের নিকট তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহভাজন ও প্রিয়পাত্র। তৎকালে উপযুক্ত শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত হাম্মাদিয়া মাদ্‌রাসা ছিল বাংলাদেশের উন্নতমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম। বালক আজীম উদ্দিন সুযোগ্য শিক্ষকদের সহচর্য ও শিক্ষা-দীক্ষায় নিজেকে যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার অপূর্ব সুযোগ লাভ করেন। সেই সুযোগ তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে নিজেকে দ্বীনের দা'য়ী হিসেবে গড়ে তোলেন। এমনিভাবে তিনি হাম্মাদিয়া মাদ্‌রাসা হতে অত্যন্ত সুনামের সাথে ফাযেল পাশ করেন। মাদ্‌রাসাটির শ্রেণিগত শিক্ষার ওটাই ছিল শেষ ধাপ। পরবর্তীকালে তিনি মারেফাতী শিক্ষা শিক্ষা লাভ করেন।

শাহ্ আজীম উদ্দিনের কোমল ব্যবহার, দ্বীনী শিক্ষা, কৃতিত্ব ও উস্তাদের প্রতি অকুণ্ঠ ভক্তি-শ্রদ্ধা মাওলানা আহমদ উল্লাহ সাহেবকে এতেই মুগ্ধ করেছিল যে, তিনি তাঁর অন্যান্য ভাইদের অস্বীকৃতি সত্ত্বে স্বীয় কন্যা আসিয়া খাতুনকে আজীম উদ্দিন আহমদের সাথে বিয়ে দেন। মাওলানা শাহ্ সুফী

Dhaka University Institutional Repository

আজীম উদ্দীন আহমদ (রহ.)-এর তিন ছেলে ও চার মেয়ে ছিল। নিম্নে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হল-

১। মাওলানা মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা হতে মুমতাযুল মুহাদ্দিসীন ডিগ্রি লাভ করেন। শৈশব হতে তিনি ছিলেন মেধাবী ছাত্র। কুরআন-হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। এতদাঞ্চলে তিনিই একমাত্র কাজী তথা বিচারক উপাধিতে ভূষিত হন।

২। মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। তিনি ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসা হতে মুমতাযুল মুহাদ্দিসীন ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইসলামীক স্টাডিজ বিভাগে অনার্সে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং এম.এ পাশ করেন। তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মুহাম্মদ আইয়ুব খানের নিকট হতে স্বর্ণপদক লাভ করেন।[২৮৪]

৩. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল হালিম। তিনিও ছিলেন একজন সুযোগ্য আলিম, বিনয় ও নম্রতার প্রতীক। তিনি ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসা হতে হাদীস বিভাগে মেধা তালিকায় প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করে মুমতাযুল মুহাদ্দিসীন ডিগ্রি লাভ করেন।

মাওলানা শাহ্ সুফী আজীম উদ্দীন আহমদ (রহ.) ভাবলেন 'মনের অন্ধকার দূর করতে হলে, কলব পরিষ্কার করতে হলে নফ্‌সে আম্মারাকে চিরতরে নির্মূল করতে হবে এবং কামিল পীরের রূহানী ফায়েয লাভ করতে হবে। যিনি তাঁর কলব পরিষ্কার করতে সক্ষম এবং যাঁর হিদায়েতের আলো তাঁকে মনযিলে মাকসুদে পৌঁছাতে সদা-সচেতন, তাঁর নিকট নিজেকে সোপর্দ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তার হৃদয়ের মাঝে মনের গভীরে শোনিত ধারে অহরহ অনুরণিত হতে লাগল ফুরফুরা শরীফ। তাঁর স্বপ্নে দেখা সেই আলোর জগতে গমন করতে ইচ্ছা পোষণ করলেন ফুরফুরার দরবারে। মাওলানা আজীম উদ্দিন আহমদ (রহ.) কাল বিলম্ব না করে ফুরফুরা শরীফ রওয়ানা হলেন।[২৮৫] পরিশেষে এক সময় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ফুরফুরা শরীফ পৌঁছেন। তিনি শাহ সুফী, আবুবকর সিদ্দিকী (রহ.)-এর নিকট বাই'আত গ্রহণ করেন। তাঁরপর তিনি মনে প্রাণে একাগ্রচিত্তে মুরশিদ থেকে ইলমে মারেফাতের শিক্ষা গ্রহণ করেন।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলার খাস রহমত ও বরকতের ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চার তরীকায় পূর্ণ কামালিয়াত অর্জন করে খেলাফত লাভ করেন এবং ইলমে দ্বীনের প্রচারে খুলনা প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি খিলাফলপ্রাপ্ত হয়ে নিজেকে উৎসর্গ করে চিরতরে আমিত্বকে বিসর্জন দিলেন এবং আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মহব্বতের সাগরে ডুব দিতে লাগলেন। আল্লাহ্ তা'আলার ভালোবাসা ও রাসূলে করীম (সা.) এর মহব্বত তাঁর জীবনের সবকিছুতে প্রতিফলিত হতে লাগল। অতঃপর তিনি নিজেকে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলেন।

মাওলানা শাহ্ সুফী আজীম উদ্দীন আহমদ (রহ.) একাগ্র মনে যাহেরী ও বাতেনী উভয় প্রকার জ্ঞান বিতরণ করে ছিলেন। এক মুহূর্তের জন্যও অবসর ছিলেন না তিনি। এমন সময় তাঁর জীবনে হজ্জ আদায় করার সুযোগ আসল। ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেব যখন মক্কা শরীফে যাওয়ার নিয়ত করলেন, তখন আজিম উদ্দিনকে দেখা মাত্র তিনি বলে উঠলেন, "আমার সঙ্গে হজ্জে গেলে তোমার সুবিধা হবে। রোযার ঈদের পরদিন রওয়ানা হয়ে কলকাতা এসো।" আমিও তাই করলাম এবং

[২৮৪] আলহাজ্জ মাওলানা এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুন্সী, সীরাতে আজীম (র.), (কুমিল্লা : খানকাহ-ই-সিদ্দিকীয়া, ধামতী, ১৯৮৫খ্রি.), পৃ. ৩-৮।

[২৮৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

স্বীয় মুরশিদের সাথে হজ্জ আদায় করে ধামতী ফিরে আসলাম। অতঃপর ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়বার হজ্জ পালন করেন। আর এটাই ছিল তাঁর জীবনের শেষ হজ্জ আদায়।

এই পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। যখন পরিপূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়, তখন আল্লাহ্ পাকের বিধান মুতাবিক মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করে। মাওলানা শাহ্ সুফী আজীম উদ্দীন আহমদ (রহ.) ২৩শে শাবান ১৩৯৪ হিজরি মোতাবেক ২৫শে ভদ্র ১৯৮১ বাংলা, মে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে বুধবার সুবহে সাদিকের সময় ইন্তেকাল করেন।[২৮৬]

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা শাহ্ সুফী আজীম উদ্দীন আহমদ (রহ.)-এর অবদান-

মাওলানা মুহাম্মদ আজীম উদ্দিন (রহ.) হাম্মাদিয়া মাদ্রাসা শিক্ষা জীবন সমাপনের পর খুলনা জেলার অন্তর্গত মোড়েলগঞ্জ উপজেলাধীন সুতালিড়ি গ্রামের খুরশীদ মুনশী নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকটে থেকে সেখানকার মক্তবে আরবী ও ইসলামী শিক্ষাদান করতে লাগলেন। জীবনের প্রথমভাগে আশ্রয়হীন, অসহায় ও অনাদরের অন্ধকারে কিছুকাল থাকার ফলে তাঁর মনে এই অনুভূতি জাগ্রত হল যে, একটি অজ্ঞ ও নিরুপায় শিশুর মাঝেই ঘুমিয়ে থাকে ভবিষ্যতের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা আর অজ্ঞ মানুষের কারণে কালক্রমে গড়ে ওঠে একটি অজ্ঞ, অসভ্য ও বর্বর সমাজ, যেখানে থাকে না আল্লাহ ও রাসূলের পরিচয়, যেখানে পাওয়া যায় না কুরআন ও হাদীসের সুষ্ঠু তা'লীম, সেখানে প্রতিভাত হয় না প্রকৃত মানবতার রূপরেখা, যেখানে প্রবাহিত হয় না শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার নির্মল সমীরণ, যেখানে চলে অরাজকতা, ব্যভিচার, হত্যা লুন্ঠন ও পাপাচার। যে পরিবার, সমাজ ও অঞ্চল এহেন অন্ধকারে নিমজ্জিত, তার ওপর নেমে আসে আল্লাহ্ পাকের আযাব ও গযব, ব্যাহত হয় জানমালের নিরাপত্তা, ব্যাহত হয় শান্তি ও শৃঙ্খলা। এর কারণ খুঁজলে দেখা যাবে সেই অজ্ঞতাই এর জন্য দায়ী। অতএব এই কারণেই মাওলানা আজীম উদ্দিন আহমদ (রহ.) ঢাকা শহরের চাকচিক্যময় জীবনযাত্রা ও জৌলুস পরিত্যাগ করে এবং বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের এক পল্লীতে অবস্থান করে তাঁরই মতো শত শত অজ্ঞ, ইয়াতীম, অসহায় শিশুদের মধ্যে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার জ্ঞানের মশাল জ্বালাতে ব্রতী হলেন। তাঁর নির্মল চিত্তে সর্বদাই এই ভাবনা আন্দোলিত হত যে, কেমন করে অজ্ঞতার বেড়াজাল ছিন্ন করা যায়, কীভাবে সত্যিকার জ্ঞানের দ্বারপ্রান্তে বিশ্ব মানবতাকে পৌঁছানো যায়, কী ব্যবস্থার দ্বারা পথহারা মানুষকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায়। কীভাবে মানুষকে পবিত্র ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় দেওয়া যায়, কেমন করে ইহকালের লোভ, মোহ ও রিপুকে দমন করে পরকালের মূল্যবান পাথেয় সংগ্রহ করা যায়।

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে মাওলানা আজীম উদ্দিন আহমদ (রহ.) খুলনার খুরশীদ মুন্সী সাহেবের বাড়িতে অবস্থান কালে একদা শর্ষিনার পীর সাহেব মাওলানা নেছারউদ্দিন আহমেদ সদলবলে খুরশীদ মুনশী সাহেবের বাড়িতে আগমন করেন। সুন্দরবন অঞ্চলে ইসলামের বাণী প্রচার করাই ছিল তাঁর এই সফরের একমাত্র কারণ। আত্মিক সম্পর্কের দিক দিয়ে মাওলানা আজীম উদ্দিন ও শর্ষিনার পীর সাহেব পরস্পর পীর ভাই ছিলেন। তাঁরা একে অন্যের অন্তরের পরিচয় খুঁজে খুঁজে বের করে মহাভ্রাতৃত্বের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের দিকে অগ্রসর হলেন। শর্ষিনার পীর সাহেব মাওলানা আজীম উদ্দিন সাহেবের পরিচয় লাভ করে তাঁহাকে কয়েকটি 'ইল্মে নাহু' এবং 'ইল্মে সরফ' সম্পর্কিত প্রশ্ন করলেন। তিনি অতি সুন্দরভাবে সেই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করলেন। শর্ষিনার পীর সাহেব খুরশীদ মুন্সীকে লক্ষ্য করে বললেন, "বাবা খুরশীদ! তুমি এই অমূল্য রত্ন দিয়ে কি করবে? এই রত্নটি আমাকে নিয়ে যেতে দাও এবং আমার প্রয়োজন পূরণে যত্নবান হও।' এর পর শর্ষিনা চলে

---

[২৮৬] মাওলানা আশরাফ উদ্দিন আহমদ, স্মরনিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮ ও সীরাতে আজীম (রহ.) প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

আসলেন এবং দক্ষতার সাথে মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে আরবী ও ইসলামের প্রচার-প্রসার করতে লাগলেন। আরবী ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। তিনি প্রতিটি সমস্যার মুকাবিলায় সমাধান হিসেবে আরবী কবিতার চরণ উপস্থাপিত করতে পারতেন। এইভাবে তিনি দীর্ঘ চার বছর শর্ষিনা মাদ্‌রাসায় দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেন। মহান আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় শর্ষিনা অবস্থান তার জন্য অনুপযোগী করা হয়ে গেল। তিনি স্বাস্থ্যগত কারণে শর্ষিনা থাকতে পারলেন না। তথায় প্রায়ই তিনি জ্বরে ভুগতে লাগলেন। ফলে তিনি সেই স্থান থেকে বিদায় গ্রহণ করে আল্লাহ পাকের রিযামন্দি হাসিলের জন্য নতুন পথের দিকে পা বাড়ালেন।

মাওলানা শাহ্ সুফী আজীম উদ্দীন আহমদ (রহ.) শর্ষিনা হতে বিদায় নিয়ে স্বীয় শ্বশুরালয় নোয়াখালীতে চলে গেলেন। সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করার পর স্বীয় পথিকৃৎ শ্বশুর সাথে পরবর্তী কার্যক্রম নিয়ে পরামর্শ করেন। শ্বশুর পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করার পূর্বে ফুরফুরা গমন করে মুরশিদের নিকট হতে পরামর্শ গ্রহণ করতে উপদেশ দিলেন। কাজেই তিনি ফুরফুরা গমন করেন এবং মুরশিদের নিকট পরবর্তী সময়ে তিনি কী করবেন, সে বিষয়ে পরামর্শ চাইলেন।[২৮৭] মুরশিদ তখন তাঁকে ধামতী গিয়ে একটি মাদ্‌রাসা স্থাপন করে ইলমে যাহেরী ও ইলমে বাতেনী উভয় প্রকার ইলমের দারস দানে নির্দেশ প্রদান করেন। উপদেশ গ্রহণপূর্বক প্রশান্ত চিত্তে শ্বশুরালয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং স্বীয় শ্বশুরের সাথে মুরশিদ ইজাযত সম্পর্কে পরামর্শ করে ধামতী চলে আসতে মনস্থ করলেন। মাওলানা আহমদ উল্লাহ সাহেবও তাকে সহায়তা করতে সম্মত হলেন এবং মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন দিক ও সম্ভাবনা জামাতার সামনে তুলে ধরেন। এভাবেই তাঁর জীবনের এক নতুন পটভূমি রচিত হল।[২৮৮]

মাওলানা শাহ্ সুফী আজীম উদ্দিন (রহ.) শ্বশুরালয় হতে যাত্রা করে ধামতী গ্রামের শরীফ সাহেবের বাড়িতে আসেন। তিনি এই বাড়িতে এক সময়ে জায়গীর থাকতেন। তারপর উক্ত বাড়ির নিকটে অবস্থিত মসজিদের পশ্চিম দিকে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে একটি মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। তিনি এবং তাঁর শ্বশুর উভয়েই উক্ত মক্তবে শিক্ষকতার মাধ্যমে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসার শুরু করেন পর্যায়ক্রমে মক্তবের ছাত্র সংখ্যা অতিদ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগলো। ধামতী এলাকাটি ছিল একটি অনুন্নত ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত এলাকা। একদিকে ধর্মীয় শিক্ষার অপ্রতুলতা, অপরদিকে বিত্তবান অমুসলিম জমিদারদের শোষণ ও নিষ্পেষণে নিরীহ জনসাধারণ ছিল জর্জরিত। বেশরা ভণ্ড ফকিরদের দৌরাত্ম্য ছিল তখনকার দিন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। দ্বীন ও ঈমানের আলো খুবই ক্ষীণ নিষ্প্রভ ছিল। এহেন অখ্যাত এলাকায় আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতে তিনি অতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে মাদ্‌রাসার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারে কাজ পরিচালনা করেন। মাদ্‌রাসার সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তিনি এই সময় অবস্থান করেন। ক্রমে ক্রমে উক্ত মক্তবের পরিসর বৃহত্তর হয়ে উঠলে কিভাবে এর উন্নতি করা যায়, তজ্জন্য শর্ষিনার পীর সাহেবকে দাওয়াত করা হল। শর্ষিনার পীর সাহেব যথাসময়ে তাশরীফ আনলেন। তখন অবিভক্ত ভারতব্যাপী তীব্র অসহযোগ আন্দোলন চলছিল। দেশের আপামর জনসাধারণ ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের নামে জীবনের সকল স্তরে ইংরেজদের বিরোধিতা করার কাজে উঠে পড়ে লাগলো। দেশের এহেন রাজনৈতিক অসন্তোষের দরুন মাহফিলের লোক সমাগম ও সাহায্য আশানুরূপ হল না। শর্ষিনার পীর সাহেব ধামতী মাদ্‌রাসার উন্নতির জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে খাস মুনাজাত করেন। আল্লাহ্ তা'আলার অজস্র রহমত ও বরকতে উত্তরোত্তর মাদ্‌রাসার উন্নতি হতে লাগল এবং অত্র মাদ্‌রাসাটি পর্যায়ক্রমে কামিল শ্রেণিতে উন্নতি

---

[২৮৭] প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৭।

[২৮৮] স্মারক গ্রন্থ, ধামতী মাদরাসা, (কুমিল্লাঃ ধামতী মাদরাসা, ১৯৮৬খ্রি.), পৃ. ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

লাভ করলো। ফলে মাদ্রাসাটির মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবস্থান দখল করে আছে।

অমুসলিম জমিদারের কারসাজি : শয়তান মানুষের দুশমন। দ্বীন ও ঈমানের প্রসার সে সহ্য করতে পারে না। ধর্মীয় কাজে বাধা দেওয়াই শয়তানের প্রধান কাজ। মাদ্রাসায় প্রসারকল্পে মাওলানা শাহ্ সুফী আজীম উদ্দীন আহমদ (রহ.) তৎকালীন মাদ্রাসার পশ্চিম পার্শ্বে কিছু জায়গা ছমরউদ্দিন, নজমউদ্দিন নামক দুই ব্যক্তির নিকট হতে ক্রয় করে। নতুন করে মাদ্রাসা নির্মাণের কাজ সমাধা করেন। নতুন ঘর তৈরি হওয়ার পর সাবেক মক্তবকে স্থানান্তর করে নিয়ে আসেন। এরপর জমি বিক্রেতাগণ অমুসলিম জমিদারের অসৎ পরামর্শে তাঁরা জমির রেজিস্ট্রি কবলা দিতে অস্বীকার করে। তাঁরা অমুসলিম জমিদারের পরামর্শ অনুযায়ী মোকদ্দিম পেশ করেন, মাওলানা আজিম উদ্দিন সাহেব আদালতের এজলাসে দাঁড়িয়ে সত্য ঘটনা খুলে বলেন। মহামান্য আদালত স্থানীয় কতিপয় বিশিষ্ট লোক হতে সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। মামলায় শত্রু পক্ষ হার মানতে বাধ্য হল। এভাবে সত্যের জয় হল এবং মিথ্যা অপসারিত হল। তারপর তিনি বাড়িতে এসে মাদ্রাসাটিকে নতুনভাবে গড়ে তোলেন এবং ওল্ড স্কিম নিয়মে শিক্ষা দেওয়ার কাজ আরম্ভ করেন। বাংলাদেশের অন্যতম ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধামতী ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্রাসাটি ফুরফুরা শরীফের বিশিষ্ট খাদিম ও খলিফা ওলীয়ে কামিল মাওলানা শাহ্ সুফী আজীম উদ্দিন আহমদ সাহেব কর্তৃক ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর উক্ত মাদ্রাসা ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে আলিম পর্যায়ে, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ফাযেল পর্যায়ে এবং ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে কামিল পর্যায়ে উন্নীত হয়। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন মাদ্রাসায় শিক্ষাদানসহ যাবতীয় কাজকর্ম নিজেই পরিচালনা করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর ছোট সাহেবজাদা গদ্দিশীন পীর ও মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা আবদুল হালিম সাহেব পরিচালক হিসেবে খানকায়ে সিদ্দিকীয়া ও মাদ্রাসা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তদীয় সুযোগ্য ছোট সাহেবজাদা গদ্দিশীন পীর ও মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা আবদুল হালিম সাহেব খানকায়ে সিদ্দিকীয়া ও মাদ্রাসা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর পরিচালনাধীনে অত্র মাদ্রাসায় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অভিজ্ঞ মুহাদ্দিসীন ও মুদাররিসীনগণ মাদ্রাসায় ইলমে দ্বীন শিক্ষাদানের মানোন্নয়নের কাজে নিয়োজিত আছেন। সকলের ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নের ফলে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসার সারাদেশে ধামতী আলিয়া মাদ্রাসাটি বিশেষ সুখ্যাতি অর্জনে সমর্থ হয়েছে। এতে মাদ্রাসায় কামিল ক্লাসের ছাত্র ও মুহাদ্দিসীনগণের জন্য লিল্লাহ বোর্ডিং ও ফ্রি হোস্টেলের সুব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া মাদ্রাসার বিশাল কুতুবখানাটি 'কুতুবখানায়ে সিদ্দিকীয়া' নামে খ্যাত। এখানে বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য কিতাবের অপূর্ব সম্ভারে সমৃদ্ধ। অত্র এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের সুবিধার্থে কিতাবাদি ও বই-পুস্তক সহজে সংগ্রহের জন্য 'সিদ্দিকীয়া লাইব্রেরি নামে একটি লাইব্রেরি আছে। সর্বোপরি আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসার এবং ইলমে মারেফাত শিক্ষার, কেন্দ্র হিসেবে ধামতী মাদ্রাসার ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। খানকায়ে সিদ্দিকীয়াতে প্রতি চান্দ্রমাসের ১২ তারিখ তা'লীমের মাহ্ফিল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।[২৮৯]

সারাবাংলা ও আসামে ফুরফুরা শরীফের পীর আবু বকর সিদ্দীক (রহ.) (১৮৪৬-১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে)[২৯০] সাহেবের ধামতী আগমনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। দূর-দূরান্ত হতে দলে দলে লোক ধামতীর দিকে ছুটে আসতে লাগল। যেন সহস্র স্রোতস্বিনী বিশাল জলধির দিকে তীব্রবেগে মহামিলনের আকাঙ্ক্ষায়

---

[২৮৯] প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৬।

[২৯০] ড. আ.ফ.ম.আলী হায়দার, শিক্ষা বিস্তার ও সংস্কারে ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিক (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.১১।

Dhaka University Institutional Repository

অগ্রসর হতে লাগল। মুরশিদ নির্দিষ্ট সময়ে ধামতী তাশরীফ আনলেন, তখন চতুর্দিকে লোকে লোকারণ্য। তখন তিনি মঞ্চে আরওহণ করে এই কথাটি তিনবার উচ্চারণ করলেন, "ধামতী টাউন হয়ে গেল, ধামতী টাউন হয়ে গেল, ধামতী টাউন হয়ে গেল।" বাস্তবিকই আজ ধামতী গ্রামটি দালান-কোঠা, শিক্ষা দীক্ষা, সরকারি অফিস ও হাসপাতাল ইত্যাদি সমন্বয়ে শহরের রূপ ধারণ করেছে। সেদিন সমবেত জনসমুদ্র তাঁর মুখ নিঃসৃত মধুর বাণী শ্রবণ করে সত্য পথের সন্ধান পেয়েছিল। বহু পথভ্রষ্ট ও অন্ধকারে নিমজ্জিত ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়েতের আলো লাভ করে ধন্য হয়েছিল। তিনি পায়ে হেঁটে মাদ্‌রাসার যে সীমারেখা চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন, বর্তমান ধামতী মাদ্‌রাসা উক্ত রেখাচিত্রকে বক্ষে ধারণ করে আল্লাহ্ পাকের অফুরন্ত কুদরতের অতন্দ্র প্রহরীস্বরূপ দণ্ডয়মান রয়েছে। সেখানে ইসলামী শিক্ষা লাভের মাধ্যমে শত শত মানুষ হেদায়ত প্রাপ্ত হচ্ছে। অতঃপর তিনি স্বীয় মুরশিদের স্মৃতি রক্ষার্থে সকল তরীকতপন্থী মুরিদানের সবক-মশক, যিকির-আযকার এবং তা'লীম-তাওয়াজ্জুহের জন্য খান্‌কায়ে সিদ্দিকীয়া প্রতিষ্ঠা করেন।[২৯১]

কিতাব রচনা : মাওলানা শাহ্ সুফী আজীম উদ্দীন আহমদ (রহ.) আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে শত ব্যস্ততার ভেতর দিয়েও 'মারেফাতের মূলতত্ত্ব' নামক একটি মূল্যবান কিতাব প্রণয়ন করেন। উক্ত কিতাবে তিনি চার তরীকার মাকামগুলোর বিশ্লেষণ ছাড়াও মারেফাতের মূল উৎসকে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তিনি স্বভাবতই কম কথা বলতেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কথা তাঁর মুখে শোনা যেতে না। অনুরূপভাবে মারেফাতের মূলতত্ত্ব নামক কিতাবখানাও দীর্ঘসূত্র বর্ণনার আবর্ত হতে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন। অল্প কথায় মূলতত্ত্বকে তিনি যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা মারেফাতের সাগরে বিচরণকারীদের জন্য আলোর মশালস্বরূপ চিরকাল ভাস্বর হয়ে থাকবে। তিনি উল্লেখ করেছেন-"কিতাব পড়ে ইলমে মারেফাত হাসিল করা যায় না; বরং প্রয়োজন খাঁটি রূহানী শক্তির ছোঁয়া ও স্পর্শ।" পানির সংস্পর্শে যেমন শীতলতা লাভ করা যায়, আগুনের সংস্পর্শে যেমন তাপ পাওয়া যায়, তেমনি খাঁটি রূহানী শক্তিসম্পন্ন পবিত্র আত্মা সংবলিত পীরের নিকট হতেও মূল মারেফাত লাভ করা যায়। মারেফাতের মূল বিচরণ ক্ষেত্র হল রূপ পরিগ্রহ করা। তা হবে বাস্তবতার নিরিখে উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট।

'মারেফাতের মূলতত্ত্ব' নামক গ্রন্থ থেকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় উল্লেখ করা হল :

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যঃ আমি জ্বিন ও মানবজাতিকে অন্য কোন উদ্দেশ্য সৃষ্টি করিনি। শুধু এজন্য সৃষ্টি করেছি যে, তাঁরা আমার ই'বাদত করবে। অর্থাৎ ই'বাদত দ্বারা আমার সাথে পরিচয় লাভ করে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে।

ই'বাদাতের ধারাঃ কুরআন-হাদীস অনুযায়ী ই'বাদতের তিনটি ধারা আছে। যথা- (১) ইসলাম, (২) ঈমান, (৩) এহ্সান।

ইসলাম কি? কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত ইত্যাদি আহ্কাম আদায় করা। একে কামালাতে জাহেরী ও শরীয়াত বলে।

ঈমান কি? আল্লাহ তায়া'লা ও তাঁর ফেরেশতা, কিতাব ও রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস, হাশরের দিনে নাজাত পাওয়া না পাওয়া ইত্যাদি যা আল্লাহ তা'য়ালার ধার্য তাকদীর অনুযায়ী হবে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এটাও কামালাতে জাহেরীর অন্তর্ভুক্ত।

---

[২৯১] আলহাজ্জ মাওলানা এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুন্সী, সীরাতে আজীম (র.), প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

এহ্সান কি? রাসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'য়ালার ইবাদত এরূপ আদায় কর যেন তাঁকে অন্তরের চক্ষু দ্বারা দেখছে। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও তোমার অন্তরে এমন চক্ষু ফুটে নাই যে, তুমি তাঁকে দেখতে পাও। তবে ধারণা কর যে তিনি তোমাকে নিশ্চয়ই দেখছেন। একে "কামালাতে বাতেনী মারেফাত, মহব্বত ও বেলায়াত বলে। কামালাতে জাহেরী দেহস্বরূপ আর কামালাতে বাতেনী আত্মাস্বরূপ। দেহ ছাড়া আত্মার স্থান নাই, আর আত্ম ছাড়া দেহের কোনো মূল্য নাই।

শরীয়াত, ত্বরীকাত, হাকীকাত, ও মা'রেফাতঃ শরীয়াত ও মা'রেফত ভিন্ন ভিন্ন জিনিস নয় বরং এক। যথা- কুরআন ও হাদীস, আদেশ-নিষেধ পালনপূর্বক ফরয, ওয়াজেব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব আদায় করতঃ হারাম, মাকরুহ ইত্যাদি যাবতীয় কাজগুলো পরিত্যাগ করে ই'বাদাত করা একে "শরীয়াত" বলে। তদুপরি হিংসা, নিন্দা, তাকাব্বরী, অংহকার ও গৌরব ইত্যাদি পরিত্যাগ করতঃ অতি বিনীত, নম্র ও কাতরভাবে ই'বাদত করা, একে "ত্বরীকাত বলে।

এতদ্ব্যতীত মোরাকাবা দ্বারা মোকাশাফা, মোশাহাদা, মোয়া'য়ানা ও এখলাস অর্জন করতঃ বেলায়াতের দরজাতে পৌঁছে ই'বাদাত করা, একেই "হাকীকাত" বলে।

এরপর আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হাসেল করতঃ তাঁর নৈকট্য লাভ করা, একেই "মা'রেফাত" বলে। আর এই মা'রেফাত লাভ করাই মানুষের দুনিয়াতে আসার মুখ্য উদ্দেশ্য। যদি মানুষ এই উদ্দেশ্য সফল করতে না পারে এবং মা'বুদের মা'রেফাত হতে বঞ্চিত থেকে যায় তবে মৃত্যুর পর সে কার নিকট স্থান পাবে?

বেলায়াতের দরজা লাভ করবার উপায়: বেলায়াতের দরজা লাভ করতে হলে প্রথমে দশ মাকামের মোরাকাবা করতঃ আ'লমে আমরের জ্যোতিষ্মান লতিফাগুলোকে আ'লমে খাল্কের অন্ধকার হতে মুক্ত করে নিতে হবে। কারণ আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষকে দশটি জিনিস দ্বারা তৈরি করেছেন। সুফীগণ এগুলোকে লতিফা বলে থাকেন। আ'লমে আমরের পাঁচটি; যথা- কাল্ব, রুহ, সির, খফী ও আখ্ফা। এদের মূল আরশে মোয়াল্লার ওপরে (লা-মাকানে)। বেহেশ্তের অসীম নেয়ামাত ও দোজখের কঠিন আজাবের উপভোগকারী এরাই। অনন্ত সুখ ও চিরস্থায়ী আজাবের ব্যবস্থা এদের জন্যই করা হয়েছে। অপর পাঁচটি আ'লমে খাল্কের, যথা- নাফ্ছা আতশ, বাদ্, আব্ ও খাক্ এদের মূল আরশে মোয়াল্লার নিচে। যখন লা-মকানী লতিফাগুলো আল্লাহ্র নামের মোরাকাবা করতে করতে চৈতন্য হবে তখন শরীরের আতশ্, বাদ, আব্ খাক্ ও নাফস সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ আল্লাহ্ করতে থাকবে এমনকি বাহ্যিক আগুন, পানি, বাতাস, ও মাটি হতেও আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকর মা'লুম হতে লাগবে।[২৯২]

মোরাকাবা : কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ও বিভিন্ন হাদীসে মোরাকাবার কথা উল্লেখিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, এক ঘন্টাকাল যিকির ষাট বছরের ই'বাদাত হতে উত্তম। আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টিসমূহে তাঁর কুদরাতের নিদর্শনগুলো গভীরভাবে উপলব্ধি করে তাঁর পরিচয় লাভ করাই মোরকাবার উদ্দেশ্য। মোরাকাবার ফলস্বরূপ তিনটি জিনিস হাসেল হয়ে থাকে। ই'লম, হা'ল ও আ'মল। মোরাকাবার পর ই'লমে মা'রেফাত হাসেল হয় এবং মা'রেফাতের পর হা'ল লাভ হয় তৎপর আ'মল প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ মোরাকাবা করতে করতে মা'রেফাত লাভ হয়ে থাকে এবং এর নূর কালবে প্রকাশিত হওয়ার দরুন কালবের অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয় এবং ই'বাদাতের আগ্রহ জন্মে। একেই হা'ল বলে। তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো কালবের আনুগত্য স্বীকার করে ই'বাদাত লিপ্ত হয়।

---

[২৯২] আলহাজ্জ, হযরত মাওলানা শাহ্ ছুফী আজীমুদ্দিন আহমদ, মারেফাতের মূলতত্ত্ব, (কুমিল্লা : খানকাহ-ই-সিদ্দিকীয়া, ধামতী, ১৯৮৫খ্রি.), পৃ. ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

একেই আ'মল বলে এবং ই'বাদাত করা মোরাকাবার ফলেই সম্ভব হবে। অতএব, সমস্ত নেকীর মূল হচ্ছে মোরাকাবা।

মোকাশাফা, মোশাহাদা ও মোয়া'য়ানা: অতঃপর রুহানী আ'লমের সঙ্গে জিসমানী আ'লম একযোগ হয়ে যাবে। আস্তে আস্তে এদের (লা-মাকানী লতিফাগুলোর) অন্ধকারের পর্দা ছুটে যেতে আরম্ভ করবে। অস্থায়ী সংসার ছেড়ে গিয়ে কোথায় থাকবে এই চিন্তায় লিপ্ত হবে, একেই "মাকাশাফা ও ই'লমুল ইয়াকিন বলে। বান্দা যখন এই হা'লাতে উপস্থিত হয় তখন তাঁর নাফ্সে আম্মারা নাফ্সে লাওয়ামায় পরিণত হয়ে যায়। আ'লমে আমরের লতিফাগুলো ক্ষণস্থায়ী সংসারে যে আ'লমে খাল্কের আতশ, বাদ, আব্ ও খাকের ফাঁদে আবদ্ধ হয়েছে সেই ফাঁদ হতে ছুটে গিয়ে এরা স্ব স্ব মূলের দিকে ধাবিত হতে থাকবে। দুনিয়াতে আসার পূর্বে যেই দেশে (আরশের ওপরে) ছিল সেই দেশের জন্য পাগল হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালার জালালী ও জামালী সিফাতগুলো প্রকাশ পেতে থাকবে। একে "মোশাহাদা ও আ'ইনুল ইয়াকিন" বলে। তখন নাফ্সে লাওয়ামা নাফ্ছে নাফ্সে মুতমাইন্নায় পরিণত হবে। আর তাঁর জন্যই আল্লাহ্ পাক বেহেশ্তখানা তৈরি করে রেখেছেন।[২৯৩]

কামালাতের দরজা: বেলায়াতের পর কামালাতের মোরাকাবা। কামালাতের তিন দরজা। কামালাতে নবুয়্যাত, কামালাতে রেসালাত ও কামালাতে উলুল-আ'জম, কেননা তাজাল্লীয়ে জাতিরও তিন শ্রেণি আছে। প্রথম নবীগণের কামালাতের হিসেবে, দ্বিতীয় রাসূলগণের। কামালাতের হিসেবে, তৃতীয় উলুল-আ'জমের কামালাত হিসেবে। তাঁদের ওপর আজাল্লীয়ে ধারাবাহিকভাবে পতিত হত। এই মোরাকাবায় এ'ল্মে হিদায়াত এরূপ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হবে যে, তাতে কোনো প্রকার ভ্রম আসবে না। পূর্ণ শরীয়াত আমল করার ক্ষমতা লাভ হবে, বিন্দুমাত্রও ত্রুটি থাকবে না। এই মকামে এক বিন্দু পরিমাণ পথ অতিক্রম করা বেলায়াতে ছোগরা, কোবরা ও উলইঁয়া হতে উত্তম। কামালাত ও রেসালাত এই মোরাকাবায় শরীয়াত বিস্তার ও প্রচার করার রুহানী ক্ষমতা জন্মে এবং ধর্মদ্রোহীদের মোকাবেলা করার শক্তি ও সামর্থ্য লাভ হবে। কামালাতে উলুল-আ'জম- উলুল আ'জম ছয়জন পয়গম্বর ছিলেন। তাঁরা ধার্মিকদের অবস্থা সংশোধন করতে ও কাফের ধ্বংস করতে সর্বদা লিপ্ত থাকতেন। যাতে আহ'দায়ীতের সাথে তাঁর যেরূপ মহব্বাত ছিল, সেরূপ মহব্বত এই মাকামে হাসেল হবে। এই মাকামের উন্নতি কেবলমাত্র খোদাওন্দে কারিমের অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করে। ছয়জন পয়গাম্বর যারা উক্ত মাকাম হাসীল করেন। উক্ত পয়গম্বর হলেন- আদম (আ.), ইব্রাহীম (আ.), নূহ (আ.), মুসা (আ.), ঈসা (আ.), মোহাম্মদ মোস্তাফা (সা.)।

হাকীকত: তারপর কতগুলো হাকীকাত অর্থাৎ নিগূঢ় ও মূলতত্ত্বের মোরাকাবা

হাকীকত কাইয়্যুমিয়ত : এই মোরাকাবাতে গাউছ, কুতুবগণের দরজা লাভ হবে। প্রতি চার হাজার আওলিয়াগণের ভেতরে এক একজন কুতুব থাকেন। তাঁদের দু'য়াতে আল্লাহ্ তায়া'লা এক রাজ্য হিদায়াতের মাধ্যমে রক্ষা করেন।

হাকীকাতে ঈসাবী : এই মোরাকাবাতে হজরত ঈসা (আ.)-এর মতো সংসার বিরাগী হওয়ার ভাব অন্তরে জন্মাবে এবং পরকালের চিন্তায় মগ্ন থাকবে।

হাকীকতে ইব্রাহীমী : এই মোরাকাবায় ইব্রাহীম (আ.) এর ন্যায় এরূপ মহব্বতের দরজায় পৌছাবে যেই মহব্বতের দরুন আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর জন্য অগ্নিকুণ্ডকে ফুল বাগানে পরিণত করেন।

[২৯৩] প্রাগুপ্ত, পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

হাকীকাতে মুসাবী : এই মোরাকাবায় মুসা (আ.) এর ন্যায় এইরূপ মুহাব্বাত লাভ হবে, যেই মোরাকাবায় জোশে তিনি আল্লাহুর হুকুমে পদব্রজে নীলনদ পার হয়ে গিয়েছেন।

হাকীকাতে আহমদী : "আহার্দ"ও "আহ্মদ" এতদুভয়ের মধ্যে একটি মীম্ অক্ষয়ের প্রভেদ মাত্র। এই মীম্টি গোলামীর কমরবন্দস্বরূপ। এই পাঁচটি মোরাকাবাকে "হা' কায়েকে আম্বিয়া" বলে। দায়েরায়ে হাকীকাতে মোহাম্মদী ও হাকীকাতে আহ্মদীর মোরাকাবা করতে করতে যখন অন্ধকার দূরীভূত হয়ে নূরের আ'লমে উপনীত হবে, তখন দায়েরায়ে হুব্বে ছরফা লাভ হবে। এই দায়েরাদ্বয়ের মোরাকাবায় নূরের পর্দা অতিক্রম হতে থাকবে। তারপর জাতে আহা'দীয়াতের মোরাকাবা। এর নাম দায়েরায়ে লাতায়া'ইউন। এই দায়েরার মোরাকাবার শেষ ও সীমা নাই। অসীম সাগর।

হাকীকাতে কা'বা : এই মোরাকাবা জাহেরী পাথরের ঘর হিসেবে নয়। এর জ্যোতি বায়তুল মা'মুর, আরশে মোয়াল্লা ও লা-মাকানের সঙ্গে সংযুক্ত। এটা সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালার খাছ রহমতের ঘর। যেমন, টিন নির্মিত হারিকেন, অগ্নি সংযোগ আলোক দ্বারা সমস্ত ঘরকে আলোকিত করে রাখে। তদ্রূপ পাথরের নির্মিত কা'বা গৃহ আল্লাহ্ তা'য়ালার রহমতের জ্যোতি সংযোগে সমগ্র পৃথিবীকে জ্যোতিস্মান করে রেখেছে। সেই জ্যোতি দর্শনেই আবরাহা বাদশার হাতী ফিরে গিয়েছিল। সেই রহমতের আকর্ষণেই সমগ্র জগতের মানুষের মন ঐদিকে আকৃষ্ট হয়ে রয়েছে। হাকীকাতে কা'বার মোরাকাবায় উহার নিগূঢ় তত্ত্বগুলো মা'লুম হলে আল্লাহ্ তা'য়ালার সাথে মহব্বত পেতে থাকে।

হাকীকাতে কুরআন : এই মোরাকাবায় জাতে আল্লাহ্পাক হতে কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছে, এরূপ ভাব একদল তরীকাতপন্থীর অন্তরে বলবৎ হয় এবং কুরআন পাঠ করার সময় এরূপ ভাব উদিত হয় যেন সে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'য়ালার সঙ্গে কালাম করছে। কুরআনের প্রত্যেকটি হরফ এক একটি সমুদ্রতুল্য মা'লুম হয়।

হাকীকাতে সালাত : এই মোরাকাবায় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে হাজির হয়েছে। সালাতের সেজদাতে এরূপ মহব্বাতের জোশ আসবে যেন তাঁর অন্তর বলতে থাকবে, "হে আল্লাহ্ তোমাকে ছেজ্দা করছি; মাফ না করলে মাথা উঠাব না।"

হাকীকাতে সাওম : এই মোরাকাবায় রোজা আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর বদ্লা প্রদান করব। এই মজমুন্ দৃঢ়ভাবে অন্তরে ধারণা করে আল্লাহ তা'য়ালার দীদার লাভের আশায় মত্ত হয়ে উদরকে খানাপিনা হতে; হাত, পা, চক্ষ, কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে যাবতীয় গুণাহের কার্য হতে বিরত রেখে অন্তরকে পার্থিব চিন্তা হতে ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার ধেয়ানে নিযুক্ত রেখে সিদ্দিক ও নবীগণের রোজার ন্যায় রোজা আদায় করতে সক্ষম হবে। এই চারটি মোরাকাবাকে "হাকায়েকে ইলাহিয়া" বলে।[২৯৪]

দায়েরায়ে মা'বুদিয়তে ছরফার মোরাকাবা : আল্লাহ, তা'য়ালা জ্বিন, ইন্সান, পশু-পক্ষী, হায়ওয়ান-জানোয়ার, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী ও বৃক্ষ-লতা এক কথায় সমস্ত মাখলুকাতকে পয়দা করে তাঁদের ওপর তাঁর উপাসনা করতে আদেশ দিয়েছেন। যদি তিনি তা না করতেন, তথাপিও তিনি মা'বুদ ছিলেন। আবার কেয়ামতের পর যখন কিছুই থাকবে না তখন ও তিনি মা'বুদ থাকবেন।[২৯৫]

---

[২৯৪] প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩২-৩৩।
[২৯৫] প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা শাহ্ সুফী আজীম উদ্দীন (রহ.) সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত-

১. ধামতী আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ শায়খুল হাদীস শাহ্ সুফী মাওলানা সফিউল্লাহ মুছাপুরী সাহেব তিনি বলেন, আধ্যাত্মিক গগনের দীপ্তিমান নক্ষত্র, মুরশিদে বরহক্ক, বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধামতী আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা, আলহাজ্জ শাহ্ সুফী মাওলানা আজীম উদ্দিন আহমদ (রহ.)-এর সান্নিধ্য লাভ করে অনেক পথহারা মানুষ পথের সন্ধান পেয়েছে। এহেন নির্মল নিষ্কলুষ মহামানবের নযীর অতি বিরল। তাঁর কোমল অন্তর প্রদেশ জনগণ ও ভক্তদের প্রতি স্নেহে ভরপুর ছিল। তিনি ছিলেন খাদেমে খালক-এর উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। ইলমে মারেফাতে নকশেবন্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া ত্বরীকার গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) এর সুন্নাতের অনুসরণ ও সঠিক প্রাণবন্ত ব্যাখ্যা তাঁর জীবন অনুসন্ধানে পাওয়া যায়। আল্লাহ্‌র প্রেমে ও আখিরাতের চিন্তায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতেন এবং আল্লাহর দরবারে সেজদায় মশগুল থাকতেন।[২৯৬]

২. **ধামতী ইসলামীয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল টুমচরী সাহেব বলেন,** আমি বিগত ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ২৮শে ফেব্রুয়ারি সর্বপ্রথম ধামতীর মাটিতে পদার্পণ করি এবং পীর সাহেবর সান্নিধ্য লাভ করি। বাংলাদেশের বহু পরিচিত পীর সাহেবের খিদমতে হাযির হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে এবং অনেকেরই আখলাক, বুযর্গী, চালচলন, আচরণ ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছে, কিন্তু রাসূলে করীম (সা.) ও সাহাবায়ে কিরামের জীবন-চরিতের সাথে ধামতীর পীর সাহেব (রহ.) জীবন-চরিতের যে সাদৃশ্য দেখেছি এর তুলনা বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যায় না এবং তিনি ইসলামের প্রচারে নিজের জীবনের পুরো সময়টা অতিবাহিত করেন। আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে নিজ হাতে প্রতিষ্ঠিত ধামতী আলিয়া মাদ্‌রাসার সার্বিক উন্নতির জন্য তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। পার্থিব উন্নতির কোন বাসনাই তাঁর জীবনে প্রতিফলিত হয়নি। কেননা আমি পীর সাহেবের বাড়িতে সপরিবারে কয়েক বছর ছিলাম, তাই পীর সাহেবের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণরূপে অবহিত। বর্তমানে বাংলাদেশে এমন পীরের সংখ্যা খুবই কম, যাদের বাহ্যিক আচরণ ও পারিবারিক অবস্থার মধ্যে পুরাপুরি মিল আছে। প্রকাশ্য ইসলামী জিন্দেগীর নমুনা থাকলেও অন্দর মহল এর ব্যতিক্রম অনেক কিছুই বহুলাংশে ধরা পড়ে। কিন্তু ধামতীর পীর সাহেবের ভেতর ও বাইরের মধ্যে সামান্যতম তারতম্য আমি খুঁজে পাইনি।[২৯৭]

৩. **ধামতী ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রাক্তন মুহাদ্দিস আলহাজ্জ মাওলানা এ.কে.এম হাশেম সাহেব বলেন,** ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ উনিশ বছর পীর সাহেবের খেদমতে ছিলাম। কিন্তু কোন দিন পীর সাহেব নবী করীম (সা.) এর একটি সুন্নাতও বর্জন করতে দেখিনি। বরং পরিপূর্ণ সুন্নাত মুতাবিক আমল করতেন এবং তাক্‌ওয়া ইখতিয়ার করতেন। তিনি মোরাকাবার অবস্থায় থাকতেন। অর্থাৎ নিঃশ্বাস ছাড়তে 'লা' ইলাহা' এবং গ্রহণ করিতে 'ইল্লাল্লাহ' এর খেয়াল রাখা। প্রত্যেক চাঁদের ১২ তারিখে পীর সাহেব খান্‌কায় তালীমের মাহফিলের ব্যবস্থা করেন, এতে তিনি মাঝে মাঝে বলতেন, "ওহে মানুষ! আমি যখন কথা বলি, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বলি, আর যখন চুপ থাকি, তখন আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকি। তিনি আরও বলতেন, তোমরা দুনিয়ার মোহে পড়ে নিজেদের ইল্‌ম ও দ্বীনকে বিক্রি করে দিওনা।

---

[২৯৬] সাক্ষাতকার : তারিখ- ১০জানুয়ারি ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ।

[২৯৭] সাক্ষাতকার : তারিখ- ২০ জানুয়ারি ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

তোমরা দ্বীন দর্শন হিসেবে নয়, বরং জীবনে বাস্তবায়নের জন্য শিখবে। তবেই তোমাদের জীবনে সফলতা আসবে। তিনি স্বীয় মুরিদানকে গোলটুপি ও লম্বা নিসফে সাক' জামা ব্যবহার করার জন্য আদেশ করতেন। তিনি প্রত্যেক কথা পুনঃপুনঃ বলতেন। তিনি ফজরের নামায আদায়ের পর মুরাকাবা মুশাহাদা ও যিকিরে মশগুল থাকতেন ও মুসাব্বায়াতে 'আশারা পাঠ করতেন। পরে ইশরাক নামায আদায় করত জায়নামায ত্যাগ করতেন। বেলা দশটা হতে এগারটার মধ্যে চাশতের নামায আদায় করতেন। তিনি আসর নামাযের পর সূর্যাস্তের পূর্বেও মুসাব্বায়াতে আশারা পাঠ করতেন। তিনি মাগরিবের নামায আদায় করার পর আউয়্যাবিনের নামায পড়তেন। এরপর এশার নামায জামায়াতে আদায় করা পর্যন্ত নফলের নিয়্যাতে নামায আদায় করতেই থাকতেন।[২৯৮]

৪. **মাওলানা এম. এ মান্নান (রহ.) প্রাক্তন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি এবং সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ জমিয়াতুল মুদাররিসীন তিনি ধামতী আলিয়া মাদ্‌রাসা (১৯৬৩-৬৪ খ্রিস্টাব্দে) পরিদর্শনের কালে বলেন,** আমি বিগত ১৯৬৩-৬৪ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা মন্ত্রী আলহাজ্জ মফিজ উদ্দিন সাহেবের সাথে কুমিল্লা জেলার ধামতী মাদ্‌রাসায় শিক্ষা বিভাগের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি হিসেবে যাই। উক্ত মাদ্‌রাসার বানী পীরে কামিল আলহাজ্জ মাওলানা শাহ্ আজীম উদ্দীন সাহেব মাদ্‌রাসা সংলগ্ন তাঁর খানকায় আমাকে ডেকে মাথায় হাত দিয়ে বলেন, "বাবা আমি এই মাদ্‌রাসাকে কামিল মাদ্‌রাসা হিসেবে দেখতে চাই। আপনার সক্রিয় সাহায্য চাই।" তিনি যখন আমার মাথায় হাত দিয়েছেন আমার মনে হয়েছে যেন আমার শরীর অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা এবং শান্ত হয়ে গেল। এটা ছিল অস্বাভাবিক একটা অলৌকিক ব্যাপার। অতঃপর ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত ২/৪ বার তিনি আমাকে মাদ্‌রাসার ব্যাপারে পত্র দিয়েছেন। তিনি একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ওলীয়ে কামিল ছিলেন এটাই আমার বিশ্বাস। তিনি ছিলেন আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার প্রসারক ও ধর্ম প্রচারক।[২৯৯]

---

[২৯৮] সাক্ষাতকার : তারিখ- ২৫ জানুয়ারি ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ।

[২৯৯] আলহাজ্জ মাওলানা এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুন্সী, সীরাতে আজীম (র.),প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-১.৯ : মাওলানা শাহ সুফী মোহাম্মদ হাতেম আলী সিদ্দিকী (রহ.) (১৮৮৫-১৯৭৬খ্রি.)

মাওলানা শাহ সুফী হাতেম আলী বাগদাদী (রহ.) নোয়াখালী ও কুমিল্লাঞ্চলে ফুরফুরা ত্বরীকার সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সদস্য ছিলেন। নোয়াখালী ও দক্ষিণ কুমিল্লায় বিংশ শতকের গোড়ার দিকে শরীয়ত ও ত্বরীকতের ইল্ম প্রসারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর জন্মস্থান ছিল বাগদাদে। তিনি পিতার সাথে বাল্যকালে বঙ্গদেশে আগমন করেন সে হিসেবে তাঁকে বাগদাদী বলা হয়।[৩০০] পরবর্তীতে তিনি কুমিল্লার গোবিন্দপুর বর্তমানে দারুল আমানে খানকাহ ও বসতি স্থাপন করেন। তিনি সিদ্দীকে আকবর আবু বকর (রা.)-এর বংশধর বলে তাঁকে সিদ্দীকীও বলা হয়।[৩০১]

তিনি ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক বাগদাদ নগরীর আমিন মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম সুফী আবদুল্লাহ আমিন ও মাতার নাম রহীমা বেগম। মাত্র ছয় মাস বয়সে স্নেহময়ী মাতার ইন্তেকাল হওয়ায় তিনি পিতৃস্নেহে লালিত-পালিত হন। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে মাত্র আট বছর বয়সে পিতার সঙ্গে বাংলাদেশে আগমন করেন।[৩০২] প্রথমে পিতার সঙ্গে বাংলাদেশের বরিশাল জেলায় উপনীত হন। উপকূলীয় গ্রাম আমতলায় তাঁর পিতা প্রথমত বাসস্থান নির্ধারণ করেন। এ গ্রামের মক্তবে তাঁর পিতা তাঁকে ভর্তি করেন। সে মক্তবে নোয়াখালী জেলার মুসলিম মিয়া নামের একজন মুন্সী পাঠদান করতেন। তাঁর কাছে বালক হাতেম আলীর প্রাথমিক শিক্ষার হাতে খড়ি হয়। মুন্সী সাহেব জৌনপুরের মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলিফা ছিলেন। হাতেম আলী (রহ.)-এর পিতা ছেলের ভবিষ্যৎ শিক্ষার কথা চিন্তা করে তাঁকে মুন্সী সাহেবের হাতে তুলে দেন।[৩০৩]

পরবর্তীতে বালক হাতেম আলী মুন্সী মুসলিম মিয়ার সাথে বরিশাল হতে নোয়াখালীর বর্তমান ফেনী জেলা সোনাগাজীতে চলে আসেন। সেখানে আসার পর মুন্সী সাহেবের গ্রামের পার্শ্ববর্তী চরচান্দিনা মাদ্রাসায় তাঁকে ভর্তি করানো হয়। এখানে কয়েক বছর শিক্ষা গ্রহণ করে তিনি চট্টগ্রামের নিজামপুরের নিকটবর্তী কাটা মোবারকখানা গ্রাম নিবাসী মাওলানা আক্রাম আলী কর্তৃক নিজ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় ভর্তি হন।[৩০৪] ইত্যবসরে তিনি খবর পান যে, তাঁর পিতা বাংলাদেশ ত্যাগ করেছেন। কিন্তু ছেলের পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটবে বলে তিনি ছেলেকে বলে যাননি। পিতার প্রস্থানের খবর শুনে হাতেম আলী (রহ.) পাগলপারা হয়ে পিতার সন্ধানে ছুটে যান। পিতার সন্ধান করতে করতে তিনি হিন্দুস্থানের দেওবন্দ গিয়ে হাযির হলেন। তখন তাঁর বয়স ১৭ বছর। কিন্তু সেখানে পিতার সন্ধান না পাওয়ায় তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসার শিক্ষা কার্যক্রমে মুগ্ধ হয়ে দেওবন্দ মাদ্রাসায় ভর্তি হন। দেওবন্দে তিনি উপমহাদেশের বিখ্যাত আলেমে দ্বীন, মুজাহিদে আযম ও অলিয়ে কামিল, শায়েখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (রহ.)-এর শিষ্যত্ব লাভ করেন।[৩০৫] পরবর্তীতে তিনি দেওবন্দ হতে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করে কলিকাতা কলেজ স্ট্রিটে অবস্থিত রমজানীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। কলিকাতায় থাকা অবস্থায় তিনি মোজাদ্দেদে জামানের সম্পর্কে অবগত হয়ে আধ্যাত্মিকতার দীক্ষা নেয়ার জন্য ফুরফুরার উদ্দেশ্যে আগমন করেন। ফুরফুরা গিয়ে তিনি মোজাদ্দিদে জামানের হাতে বায়'আত গ্রহণ করে ইলমে মারিফাত শিক্ষা গ্রহণ করেন। এখানেই তার জীবনের সোনালী সোপান

---

৩০০ মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস, কুমিল্লা জেলায় ইসলাম প্রচার, (ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৯৮৭খ্রি.), পৃ.-২৯১।
৩০১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭।
৩০২ (কু.জে.ই.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫; মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।
৩০৩ বর্তমানে ঢাকা চকবাজার শাহী মসজিদের পাশে তাঁর মাযার অবস্থিত।
৩০৪ ড. মো. আবু ছালেহ পাটোয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১।
৩০৫ (কু.জে.ই.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

খুলে যায়। কারণ শরীয়ত ও ত্বরীকত উভয় ইল্‌ম তিনি এখানে শিক্ষার সুযোগ পান। কলিকাতার রমজানীয়া মাদ্‌রাসা হতে কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার সিলেবাস অনুযায়ী তিনি কৃতিত্বের সাথে জামাতে উলা পাস করেন। এ সময় বাংলাদেশে তার পিতার ভক্ত মুরীদদের সাথেও তিনি যোগাযোগ গড়ে তোলেন। তাঁর পিতার শিষ্যদের সহযোগিতায় তিনি ইলমে শরীয়তে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ভারতের রাজধানী দিল্লী চলে যান। দিল্লীর আমিনিয়া মাদ্‌রাসা হতে দাওরা হাদীস সমাপ্ত করে পৃথকভাবে কুতুবে সিত্তার ওপর গভীর জ্ঞানার্জন করেন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে কর্মজীবনের শুরুতেই তিনি পবিত্র হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমন করেন। হজ্জ পালন শেষে তিনি নোয়াখালী জেলার তাঁর পূর্ব আশ্রয়স্থল চরদরবেশ গ্রামে ফিরে আসেন এবং নিজেকে পুরোপুরিভাবে ইসলামের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। এ গ্রামে তিনি একটি বাস্তুভিটা ক্রয় করে বসতি স্থাপন করেন। এ গ্রামের বিখ্যাত ব্যক্তি হাফেয ক্বারী মৌলভী হামীদুল্লাহ সাহেবের প্রথমা কন্যা মোসাম্মৎ আম্বিয়া খাতুনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু কিছু দিন পর নিঃসন্তান অবস্থায় এ পুণ্যবতী মহিলা ইন্তেকাল করেন। এ সময় চরদরবেশ গ্রামসহ সমগ্র নোয়াখালী অঞ্চলে তাঁর সুনাম সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এলাকার মানুষ তাঁকে "দরবেশ মাওলানা" বলে ডাকত। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার হজ্জ সম্পাদন করেন। অতঃপর নোয়াখালী জেলার সদর উপজেলার শ্রীনন্দী গ্রামের মাওলানা শাহ সুফী কামাল সাহেবের[৩০৬] কন্যা মোসাম্মাৎ জোবায়দা খাতুনকে বিবাহ করেন। তখন থেকে তিনি শরীয়ত ও ত্বরীকতের শিক্ষা প্রসারে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। স্বীয় পীর হতে চার ত্বরীকার শিক্ষা গ্রহণ করে খেলাফত লাভ করেন এবং 'আনজুমানে ওয়ায়েজীন' এর সদস্য নির্বাচিত হন।[৩০৭] এরপর বাংলা আসামের বিভিন্ন স্থানে দ্বীন প্রচারে ব্রত হন। তিনি ফুরফুরার পীর সাহেবের সাথে তৃতীয়বার হজ্জ পালন করেন। অতঃপর ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে চতুর্থ ও ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে পঞ্চম ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ষষ্ঠ, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে সপ্তম এবং ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে ৮ম হজ্জ সম্পাদন করেন।[৩০৮]

দাম্পত্য জীবনে তিনি এক ছেলে ও দু'কন্যা সন্তানের জনক। তাঁর একমাত্র ছেলে মাওলানা আবূ বকর সিদ্দিকী তাঁর প্রতিষ্ঠিত কুমিল্লা দারুল আমান দরবার শরীফের বর্তমান গদ্দিনিশীন পীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। শাহ সুফী হাতেম আলী বাগদাদী (রহ.) ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ৪ এপ্রিল কুমিল্লা শহরে ইন্তেকাল করেন। দারুল আমানের মসজিদ সংলগ্ন তাঁকে সমাহিত করা হয়।[৩০৯]

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা শাহ সুফী মোহাম্মদ হাতেম আলী বাগদাদী (রহ.)-এর অবদান-

শাহ সুফী হাতেম আলী বাগদাদী (রহ.) কোন্নগর মাদ্‌রাসা-মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষকতার মাধ্যমে ইলমে দ্বীনের প্রচার প্রসার শুরু করেন। এরপর পাক-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পীর, মোজাদ্দেদে জামান, মাওলানা শাহ সূফী আবু বকর ছিদ্দিকী ফুরফুরাবী (রহ.) নির্দেশনায় পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলায় ধারসা ইসলামীয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করে হেড মৌলভী পদে নিযুক্ত হয়ে আপন পীরের মাদ্‌রাসায় শিক্ষা প্রদানে নিজেকে নিযুক্ত করেন।[৩১০] অন্যদিকে আপন পীরের খেদমতে নিজেকে আত্মনিয়োগের সুযোগও লাভ করেন। ঐ সময় ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেবের নির্দেশ মতে তিনি আঞ্জুমানে

---

[৩০৬] মাওলানা কামাল সাহেব ও ফুরফুরার পীর সাহেবের একজন বিশিষ্ট মুরিদ ও খলিফা ছিলেন। (মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী, বাগদাদের জ্যোতিষ্ক, (কুমিল্লাঃ দারুল আমান, ২০০৮খ্রি.), পৃ. ২২)।

[৩০৭] হুগলী জেলায় অবস্থিত ফুরফুরা হুজুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি মাদ্‌রাসা। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

[৩০৮] প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৪।

[৩০৯] ড. মো. আবু ছালেহ পাটোয়ারী, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩৩৫।

[৩১০] মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী, বাগদাদের জ্যোতিষ্ক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়ায়েজীনের একজন প্রচারকরূপে বিভিন্ন স্থানে দ্বীন প্রচারে ব্রত হন। বাংলা, আসামে বহু মক্তব-মাদ্রাসা স্থাপন, শালিসী বিচার মীমাংসার বোর্ড গঠন, হাফিজীয়া ফোরকানীয়া মাদ্রাসা স্থাপন, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন সংবাদপত্র প্রচারসহ শত শত অমুসলমানকে মুসলমান করেন। সামাজিক দ্বন্দ্ব-কলহ মীমাংসা ও মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তিসহ অসংখ্য জন হিতকর কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন এবং এ সকল বিষয়ে মানুষকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন। ভ্রমণকালে ইসলামের উন্নতিকল্পে ও প্রচার কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি পীর-মুরিদী কাজেও যথেষ্ট সুনাম সুখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে বার্মার রাজধানী রেঙ্গুন, মৌলমেন, বেটীন, হেজাদা, মন্তবান, পেগু প্রভৃতি স্থানে ধর্ম প্রচার ও তা'লিমী কাজে কয়েক মাস প্রবিভ্রমণ করেন।

ইসলামী প্রচার-প্রসারে তিনি যেমন বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হন; তা'লীম প্রদানেও তিনি এক অভিনব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এসব বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে ফুরফুরা শরীফের মোজাদ্দেদে জামান তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন এবং বলতেন, "হাতেম সাহেব কাশফ শক্তি বিশিষ্ট আউলিয়াদের মধ্যে অন্যতম"।[৩১১] এছাড়াও ইসলামের প্রচার-প্রসারে আরও বহু অবদান রয়েছে, যার বিস্তৃতি আজো ছড়িয়ে আছে। যেমন-

- হিন্দুদের বিখ্যাত তীর্থস্থান 'তারকেশ্বর' লাইনে বন্দীপুর সোলেমান হাজীর বাড়িতে তিনি এক বিরাট পাকা মসজিদ স্থাপন করেন এবং তথায় একটি ফোরকানীয়া হাফেজীয়া মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে সাধারণ মানুষ যেন জামাতের সাথে নিয়মিত নামায আদায় করতে পারে তার সুব্যবস্থা করেন।
- ফুৎরং উত্তর পাড়ায় বাবু মোল্লা হাজীর সহযোগিতায় একটি পাকা মসজিদ স্থাপন করেন এবং ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব বর্ণনার জন্য একটি তা'লিমী সেন্টার স্থাপন করেন।
- বাগমারা উপজেলার পাইকপাড়া গ্রামে তিনি শাহ মক্কী ও শাহ খাকীর দুর্গ প্রাঙ্গণে একটি মক্তব ও খানকা স্থাপন করেন এবং সাধারণ মানুষকে অত্র প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে তোলেন।
- পূর্ব বাংলার খুলনা জেলার বাগেরহাট উপজেলার সোনাতুনীয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং অত্র মাদ্রাসার দীর্ঘ ষাট হাত লম্বা পাকা বিল্ডিংটি তাঁরই অক্ষয় কীর্তি।
- খুলনা জেলার গোবিন্দপুর মাদ্রাসাটি স্থাপন করেন এবং মাদ্রাসার জন্য একটি পাকা বিল্ডিং তৈরি করেন। তৎসংলগ্ন পাকা মসজিদটি তাঁরই প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত।
- ইসলামাবাদ সিনিয়ার মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং মাদ্রাসার জন্য একটি পাকা বিল্ডিং নির্মাণ করেন। মাদ্রাসা সংলগ্ন একটি তা'লিমী খানকা স্থাপন করেন।
- খুলনার ফকির হাট উপজেলার বারপাড়া হাজী ঈসামুদ্দীন গাজী সাহেবের বাড়িতে তিনি একটি তা'লিমী সেন্টার স্থাপন করেন এবং দ্বীনী-শিক্ষার প্রচারের লক্ষ্যে একটি সিনিয়ার মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠা করেন।
- বাগেরহাট মহকুমার ষাটগম্বুজ মসজিদের তিনিই আবিষ্কারক ও প্রথম সংস্কারক এবং ইসলামী শিক্ষা প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে তৎসংলগ্ন একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।
- বরিশাল জেলার নাজিরপুর উপজেলার হুগলা গ্রামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

---

[৩১১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

- ফরিদপুর জেলার যাঘর উপজেলাধীন বাঁশবাড়িয়া গ্রামে হাজী ইসমাইল আলীর সহযোগিতায় তিনি ঐ অঞ্চলে কয়েকটি দ্বীনী মাদ্‌রাসা ও মক্তব স্থাপন করেন। যার ফলে সাধারণ মুসলমান ইলমে নববীর শিক্ষা অর্জন করতে সক্ষমতা লাভ করে।[৩১২]

ইলমে জাহেরীর জন্য যেমন মাদ্‌রাসা মক্তব আবশ্যক। তেমনিভাবে ইলমে বাতেনীর জন্যও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আবশ্যক। কারণ উভয় প্রকার শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে বাস্তবজীবন পরিপূর্ণ হওয়া যায় না। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি বহু তা'লিমী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। নিম্নে কয়েকটি তা'লিমী প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা হলো-

- ঢাকা রাজধানীর অন্তর্গত মীরপুরে অবস্থিত হাজী আবদুল আজিজ সাহেব বাড়িতে একটি তা'লিমী সেন্টার স্থাপন করেন।
- চট্টগ্রাম টাইগারপাশ আম বাগান মসজিদ সংলগ্ন একটি তা'লিমী সেন্টার স্থাপন করেন।
- সিলেট জেলার গোবিন্দপুর উপজেলায় ও সুনামগঞ্জ উপজেলায় কুরআন শিক্ষার জন্য একটি তা'লিমী সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন।
- নোয়াখালী জেলার বক্তার মুন্সীর হাট এবং বসিকপুরে তা'লিমী সেন্টার স্থাপন করেন।
- রাজশাহী মোশরপুর গ্রামে তা'লিমী সেন্টার স্থাপন করেন।
- কুমিল্লা জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার সুহীলপুর গ্রামে খানকায়ে ছিদ্দিকীয়া ও সিনিয়ার মাদ্‌রাসাটির নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এ স্থাপনাটি ছিল বন-জঙ্গলে ঘেরা। তাঁর প্রচেষ্টার বদৌলতে সেখানে ইসলামী নব জাগরণের সৃষ্টি হয়। অতঃপর তাঁর প্রচেষ্টায় সেখানে শরীয়ত ও তরিকতের আলো জ্বলে উঠে। তাই তিনি এখানে একটি বিরাট তা'লিমী খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পীর সাহেবের নামে অত্র মাদ্‌রাসাটির নামকরণ করেন 'আবু বকর ছিদ্দীকীয়া সিনিয়ার মাদ্‌রাসা'। অত্র মাদ্‌রাসাটি কুমিল্লা জেলার শ্রেষ্ঠতম মাদ্‌রাসাগুলোর অন্যতম।
- কুমিল্লা শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে গোবিন্দপুরে (গোফরানপুর) তিনি একটি তা'লিমী খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নাম অনুসারে 'দারুল আমান খানকায়ে ছিদ্দিকীয়া'। বর্তমানে এখানে প্রত্যেক সোমবারে বড় আকারে হালকায়ে জিকিরের মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।[৩১৩]

মাওলানা শাহ সুফী হাতেম আলী সিদ্দিকী (রহ.)-এর উল্লেখযোগ্য খলিফাসমূহ-

বাংলাদেশে মাওলানা শাহ সুফী হাতেম আলী সিদ্দিকী (রহ.) অসংখ্য খলিফা রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলেন-

১) আলহাজ্জ মৌলভী সৈয়দ আহাম্মদ চৌধুরী, অবসর প্রাপ্ত বিভাগীয় কমিশনার ঢাকা।
২) আলহাজ্জ মৌলভী শাহ সুফী নূর মোহাম্মদ খাদেম, খানকায়ে ছিদ্দিকীয়া, রাজশাহী।
৩) আলহাজ্জ মাওলানা শাহ সুফী মোহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দিকী ইবনে মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী ছিদ্দিকী আল বাগদাদী (রহ.)।
৪) আলহাজ্জ মাওলানা শাহ সুফী ডাঃ ওবায়দুল্লাহ হাবীবুর রহমান, ফোর্ট চাঁদপুর, যশোহর।
৫) আলহাজ্ব মৌলভী শাহ সুফী ছৈয়দ আহমদ চৌধুরী, প্রাক্তন বিভগীয় কমিশনার, ঢাকা।
৬) আলহাজ্জ মাওলানা শাহ সুফী মোহাম্মদ এছহাক, সাদরা, কুমিল্লা।
৭) আলহাজ্জ মৌলভী শাহ সুফী মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, ঝাউতলা, কুমিল্লা।

---

[৩১২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯-৬৭।
[৩১৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬২।

Dhaka University Institutional Repository

৮) মাওলানা শাহ সুফী মোহাম্মদ আবদুল বারী, ফুলগ্রাম, কুমিল্লা।
৯) মৌলভী শাহ সুফী আবদুল বারী, ফাইনেন্স ডাইরেক্টর ওয়াপদা, আহম্মদবাগ, ঢাকা।
১০) আলহাজ্জ মাওলানা শাহ সুফী কাজী সুলতান আহমদ, গোবিন্দপুর, কুমিল্লা।
১১) শাহ সুফী আবদুল আজিজ ওরফে আইজউদ্দীন দরবেশ, গোবিন্দপুর, খুলনা।
১২) আলহাজ্জ মাওলানা শাহ সুফী মোখলেছুর রহমান, ফেণী, নোয়াখালী।
১৩) মাওলানা শাহ সুফী আবু তাহের নুরুল্লাহ, কালাপাগলা বাজার, ময়মনসিংহ।
১৪) মাওলানা শাহ সুফী আজিজুল হক, পরশুরাম, নোয়াখালী। প্রমূখ।[৩১৪]

ইসলামের প্রচার-প্রসারে দেশ বিদেশে সফর: ইসলাম প্রচার প্রসারে বাল্যকাল হতে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর জীবনী পর্যালোচনা করলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, "তাঁর গোটা জীবনটাই ছিল ভ্রমণ-জীবন।" বাগদাদ থেকে বাংলাদেশে আসার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, ছাত্রজীবনের ভ্রমণ কাহিনী এবং জীবনে আটবার হজ্জের ভ্রমণ কাহিনী উল্লেখযোগ্য। তিনি শরীয়ত ও তুরিকত শিক্ষার ঝাণ্ডা নিয়ে দেশ বিদেশ সফর করেন এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারে নিজের পুরো জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি ছিলেন একজন সফল দায়ী ইলাল্লাহ। দ্বীনের দাওয়াতে তিনি ব্যাপক সফলতা লাভ করেন।[৩১৫]

রাজনীতিতে অংশগ্রহণ: মাওলানা শাহ সুফী হাতেম আলী বাগদাদী (রহ.) ইসলামী রাজনীতিতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। স্বীয় মুর্শিদের অনুকরণে মুসলমানদের দুঃখ দুর্দশায় শরীক হয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়ান। ফুরফুরা সংগঠনের সাথে জড়িত থেকে পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। অবিভক্ত ভারত বিভক্ত হলে তিনি চট্টগ্রাম বিভাগের জমিয়তে ওলামা ইসলামের প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত হন। এরপর পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের "চীফ অর্গানাইজার" পদে অভিষিক্ত হন। এর কিছু দিন পর পূর্ব পাকিস্তানের লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের ওলামায়ে ইসলাম শাখার উপদেষ্ঠা হিসেবে মুসলিম লীগের নমিনী নির্বাচনের ব্যাপারে জনাব নাজিম উদ্দিন সাহেবের সাথে সারাদেশ ঘুরে বেড়ান। তিনি পূর্ব-বাংলার জমিয়তে হিজবুল্লাহর একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যও ছিলেন। ত্রিপুরার বর্তমান বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার জমিয়তে ওলামার প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[৩১৬]

মাওলানা শাহ সুফী হাতেম আলী বাগদাদী (রহ.) কিছু উপদেশ-

- আমার আওলাদ, খলীফা ও মুরিদ আপনারা সকলেই আমার পীর মোজাদ্দেদে জামান ফুরফুরাবী (রহ.) মছলক অনুসারে চলবেন।
- মুরিদগণ, সাধারণত দুইটি কাজের মাধ্যমে কামেল হয়। একটি হল তাঁর নেক আমল অপরটি হল তাঁর আদব। আপনারা এই দুটি কাজের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন।
- এই তুরীকার উদ্দেশ্য হলো শরীয়তের ওপর পুরোপুরি আমল করা। কাজেই শরীয়তের প্রতিটি কাজ অর্থাৎ ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাবের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমল করতে হবে।
- আপনারা ঈমান, ইসলাম ও আকীদাসমূহ বিশুদ্ধ রাখবেন। নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত পরিপূর্ণভাবে আদায় করবেন।

---

[৩১৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮-১০০।
[৩১৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।
[৩১৬] ড. আবু ছালেহ পাটোয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

- পায়খানা-প্রস্রাবে ঢিলা কুলুখ ব্যবহার করতেন এবং অজু গোসল করে পরিপূর্ণভাবে পবিত্র অর্জন করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করবেন এবং জুম্মার নামাজে সুন্নাতের পাবন্দি করবেন।
- নিজের স্ত্রী, কন্যা ও অন্যান্যদেরকে শরীয়ত মোতাবেক পূর্ণ পর্দায় রাখবেন। বোরকা ব্যতীত ঘর থেকে বাহির হতে দেবেন না।
- হালাল পদ্ধতিতে কামায় করবেন। সুদ, ঘুষ ও হারাম ব্যবসা ত্যাগ করবেন। যারা সুদ ও ঘোষ খায় তাদের দাওয়াত খাবেন না। এমনকি তাদের দানের অর্থও গ্রহণ করবেন না।
- দাঁড়ি কাটবেন না, মোচ ছোট করবেন। পাতলা কাপড় ও খাটো জামা পরিধান করবেন না। গোল টুপি ও পাগড়ী ব্যবহার করতে চেষ্টা করবেন।
- যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তর হতে লোভ লালসা, কৃপণতা, হারাম, হিংসা, পরনিন্দা, ক্রোধ, অহংকার, আত্মগরিমা প্রভৃতি দূরীভূত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বেলায়েত ও কামালীয়াত অর্জন সম্ভব নয়।
- ছেলের কিংবা মেয়ের বিবাহে যৌতুকের টাকা নিবেন এবং দিবেন না। কাউকে ধোঁকা দিয়ে কোন কিছু কামায় করবেন না, বিবাহ উৎসবে নাচ, গান, বাদ্য ও মাইক বাজানো হারাম এগুলো থেকে বিরত থাকবেন। কেননা এগুলো অমুসলমানদের কাজ।
- মিলাদ, কিয়াম, মুনাজাত ও ইখতিলাফী মাসয়ালা নিয়ে ঝগড়া করবেন না।[৩১৭]

মাওলানা শাহ সুফী মোহাম্মদ হাতেম আলী সিদ্দিকী (রহ.) সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত-

মাওলানা শাহ সুফী মোহাম্মদ হাতেম আলী সিদ্দিকী (রহ.) তিনি ছিলেন বিংশ শতাব্দীর একজন উল্লেখযোগ্য সমাজ সংস্কারক। তিনি ইসলামের প্রচার-প্রসারে বাংলায়, ভারত ও বার্মায় বিশেষ অবদান রাখেন। তাঁর সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া গিয়াছে- নিম্নে কয়েক জন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার পেশ করা হল-

১। কুমিল্লা জিলার কচুয়া উপজেলার আবদুল আজিজ সাহেব বলেন, এক সময় আমি মাওলানা শাহ সুফী হাতেম আলী (রহ.)-এর সঙ্গে ভারতের "হেরহান্দ" হতে "বরশ" অভিমুখে রওয়ানা হলাম। 'বরশ' নামক স্থানে দুইজন পয়গাম্বরের মাযার রয়েছে। আমরা তাঁদের মাযার জিয়ারত করার পর বরশে যাওয়ার জন্য দু'টো ঘোড়ার গাড়ি আনা হল। একটি ঘোড়ার গাড়ি ছিল দুর্বল, অপরটি ছিল সবল, আমিসহ চারজন সবল ঘোড়ার গাড়িতে উঠলাম। কিন্তু পরক্ষণেই আমাদেরকে সবল ঘোড়ার গাড়ি হতে নামিয়ে দুর্বল গাড়িতে উঠালো। কিন্তু লজ্জিত ও দুঃখিত মনে হুজুরকে ঘটনাটি খুলে বললাম। তিনি বললেন, "কোন চিন্তা করোনা, খোদার বলই আসল বল।" একথা বলে তিনি দুর্বল ঘোড়ার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। উভয় গাড়ি একই সময় প্রতিযোগিতামূলকভাবে চলল। কিন্তু সবল ঘোড়ার গাড়িটি ধীরে ধীরে পেছনে পড়ে গেল। অনেক আগেই আমাদের গাড়ি গন্তব্য স্থানে গিয়ে পৌঁছল। তিনি ছিলেন যুগ শ্রেষ্ঠ আলেম ও সামজ সেবক ও খোদা ভীরু। তাঁর হাতে ভারত, বাংলা, বার্মাসহ অসংখ্য মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে তিনি বহু দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন এবং সমাজ সংস্কারে বিভিন্ন কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন।[৩১৮]

---

[৩১৭] মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী, বাগদাদের জ্যোতিষ্ক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

[৩১৮] সাক্ষাৎকার : ১৫ অক্টোবর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে।

Dhaka University Institutional Repository

২। মাওলানা শাহ সুফী আবু বকর সিদ্দিকী ইবনে মাওলানা হাতেম আলী বাগদাদী (রহ.) তিনি বলেন, আমার পিতা ছিলেন একজন যুগ শ্রেষ্ঠ আলেম, বুজুর্গ ও সমাজ সংস্কারক। মৃত্যু পূর্ব পর্যন্ত তিনি নিজেকে ইসলামের প্রচার-প্রসারে আত্ম নিয়োগ করেন। তিনি জীবনের সকল পর্যায়ে রাসূল (সা.) সুন্নাতের অনুসরণ করে চলতেন এবং সুন্নাত মোতাবেক চলার জন্য সকলকে জোর নির্দেশ দিতেন। কাউকে সুন্নাত বিরোধী কাজ করতে দেখলে তা কঠোরভাবে প্রতিরোধ করতেন। ইসলামের পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকায় কোনো বিদ'আত, শিরক, কুফর তাঁর নিকটে আসতে পারেনি। ইসলামের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে তিনি বহু দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন এবং বহু দেশ ভ্রমণ করেন। তাঁর হাতে বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি সমাজ থেকে বিভিন্ন অপসংস্কৃতি দূর করার ক্ষেত্রে এবং সঠিত ইসলামের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ ক্ষেত্রে সফল ভূমিকা পালন করেন।[৩১৯]

[৩১৯] সাক্ষাৎকার : ১৮ অক্টোবর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-১.১০ : শায়েখুল হাদীস মাওলানা তাফাজ্জল হোসাইন (রহ.) (১৯০৫-১৯৯৫ খ্রি.)

শায়েখুল হাদীস মাওলানা তাফাজ্জল হোসাইন (রহ.) ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার কালাসাদারদিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী আলীমুদ্দিন। তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি নিজ গ্রাম সংলগ্ন চরগোয়ালী নামক প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত শেষ করেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে পিতার ইন্তেকালের পর বড় ভাই আবদুল হামিদ তাঁর লেখাপড়ার প্রতি অদম্য স্পৃহা ও গভীর আগ্রহ দেখে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা জেলার সিঙ্গাভত্তা গ্রামের প্রসিদ্ধ আলিম মাওলানা জয়নুল আবেদীনের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাঁর নিকট উর্দু, ফার্সী ও আরবী সাহিত্যের ওপর গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। এরপর ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকার নওয়াব বাড়ির প্রসিদ্ধ ইসলামীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে জামাতে চাহারম থেকে পাঞ্জম পর্যন্ত খুব মনোযোগ সহাকারে পড়ালেখা করেন। জামাতে চাহারম ও পাঞ্জম উভয় শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং দু'বছর মুন্সী আয়নুদ্দীন রৌপ্য পদক অর্জন করেন। অতঃপর ইসলামী উচ্চশিক্ষার অর্জনের উদ্দেশ্যে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত সাহারানপুর জেলার দারুল উলূম দেওবন্দ ভর্তি হন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে দাওরায়ে হাদীস পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়ে দাওরায়ে হাদীসের সনদ লাভ করেন। তিনি ছিলেন খুবই মেধাবী। শায়েখুল ইসলাম মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) হাদীস পঠন ও পাঠনের জন্য তাঁকে বিশেষ সনদ প্রদান করেন। দেওবন্দে অবস্থান কালে তিনি শায়খুল ইসলাম মাদানী (রহ.) নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন এবং ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র হজ্জ সম্পাদন করেন।

শায়েখুল হাদীস মাওলানা তাফাজ্জল হোসাইন (রহ.) বার্ধক্যজনিত কারণে ঢাকার লালবাগ উপজেলার অন্তর্গত হাজারিবাগ পার্ক সংলগ্ন নিজ বাসভবনে ১০ মে ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।[৩২০]

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা তাফাজ্জল হোসাইন (রহ.)-এর অবদান : মাওলামা তাফাজ্জল হোসাইন (রহ.) স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার নওয়াব বাড়ির ইসলামীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এখানে প্রায় চার বছর যাবৎ ইলমে দ্বীনের খেদমত করেন। এরপর ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে নরসিংদী জেলার রায়পুর উপজেলার চরভদ্ধি মাদ্রাসায় সুপারিনটেন্ডেন্ট হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে তিনি প্রায় আড়াই বছর অত্যন্ত সুনামের সাথে শিক্ষাদানসহ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে নরসিংদী জেলায় শিবপুর উপজেলার কুমরাদী আলিয়া মাদ্রাসার হেড মাওলানার পদে যোগদান করে শিক্ষা উন্নয়নে ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করেন। উক্ত মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা সে সময় মাদ্রাসা বোর্ডের কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগুলোতে মেধা তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করতো। অবশেষে তিনি ঢাকার চকবাজারস্থ হুসাইনিয়া আশরাফুল উলুম বড় কাটরা মাদ্রাসায় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে শায়েখুল হাদীসের পদ অলংকৃত করে বুখারী শরীফের দারস প্রদান করেন। অত্র মাদ্রাসায় বহু দূর-দূরান্ত থেকে অনেক মেধাবী ছাত্র তাঁর নিকট বুখারীসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ পড়তে আসত। তাঁর হাদীস পড়ানোর পদ্ধতি ছিল খুবই চমৎকার। তিনি হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এমনভাবে করতেন, যাতে করে ক্লাসের সকল ছাত্র সহজেই আয়ত্ত করতে

---

[৩২০] মো. আবদুল কাদের, শিক্ষা বিস্তারে কুমিল্লা জেলার মুসলিম মনীষীদের অবদান। এম ফিল থিসিস, (কুষ্টিয়া: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ১৫০, অপ্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

সক্ষম হতো। হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে কুরআনের আয়াত যা অন্য হাদীসের উদ্ধৃতির এমনভাবে বর্ণনা করতেন যার ফলে ক্লাসের সকল ছাত্র তাঁর তাকরীর সহজেই বুঝে ফেলত। তিনি যে কোনো হাদীসের ব্যাখ্যা বা মাসায়েল কুরআন হাদীসের উদ্ধৃতির মাধ্যমে খুব সুন্দরভাবে অতি সহজে উপস্থাপন করতে পারতেন। তিনি সে সময় বড় বড় আলেমদের সাথে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করতেন। এভাবেই তিনি আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। অত্র মাদ্রাসায় তিনি ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় বত্রিশ বছর যাবৎ শায়খুল হাদীস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সমাজ সংস্কারে তাঁর অবদান : মাওলানা তাফাজ্জল হোসাইন (রহ.) ধর্ম বিরোধী কোনো কাজ দেখলেই তিনি দৃঢ়ভাবে এর প্রতিবাদ করতেন। ছোট-বড় সরকারি উপযুক্ত কর্মকর্তা; আলেম, ইমাম আপামর যে কেউ কোনো ভুল করলেই তিনি সাথে সাথে এর প্রতিবাদ করতেন। তিনি ছিলেন অতিথিপরায়ণ। বান্দার হক ও অধিকারের ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই কঠোর। গ্রন্থ সংগ্রহ ছিল তাঁর শখের কাজ। প্রতিদিন শেষরাতে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। শায়েখুল হাদীস মাওলানা তাফাজ্জল হোসাইন (রহ.) বর্তমান সামাজের উপযোগী ও বাস্তব সম্মত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সুদক্ষ মুহাদ্দিস, লেখক ও ধর্মপরায়ণ হিসেবে সকলের নিকট পরিচিত লাভ করেন।

ইসলামের মৌলিক বিষয়ের ওপর গ্রন্থ রচনা: মাওলানা তাফাজ্জল হোসাইন (রহ.) দ্বীনী শিক্ষা প্রদানের সাথে সাথে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গ্রন্থ রচনা করেন এবং কুরআন-হাদীস, তাফসীরসহ নাহু-ছরফের অনেকগুলো গ্রন্থের সম্পাদনা করেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ ও লেখনী গ্রন্থগুলো আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। নিম্নে তাঁর লিখিত ও সম্পাদিত কয়েকটি গ্রন্থ উল্লেখ করা হলো-

- হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন।
- হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) মু'জিয়া ও দার্শনিক তাৎপর্য। এটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মু'জিয়া সম্বলিত প্রমাণভিত্তিক বৃহৎ গ্রন্থ।
- শবে কদর ও শবে বরাত। এটি শবেকদর ও শবেবরাতের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যবহুল পুস্তক।
- সৃষ্টি নহে প্রীতি বন্ধন। এটি খিদমতে খালক সম্পর্কিত একটি মূল্যবান গ্রন্থ।

তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থসমূহ: তাফসীরে আশরাফী। তিনি ঢাকা এমদাদিয়া লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত বয়ানুল কুরআনের অনুবাদ, তাফসীরে আশরাফীর সম্পাদনা করেন। তাফসীরে আশরাফী সম্পাদনার মাধ্যমে তিনি সকল আলিম-উলামা, পীর-মাশায়েখ ও সাধারণ শিক্ষিত মানুষের মাঝে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন।

- কুরআন মাজীদের অনুবাদ। তিনি এমদাদিয়া লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত কুরআন মাজীদের বাংলা অনুবাদের সম্পাদনা করেন।
- সৌভাগ্যের পরশমনি। ইমাম গাজালী (রহ.)-এর কিমিয়ায়ে সা'আদাত গ্রন্থটি মৌলভী আব্দুল খালেক কর্তৃক অনূদিত সৌভাগ্যের পরশমনি গ্রন্থটির সম্পাদনা করেন।
- পরিবার নহে কারাগার। মৌলভী মুজাফ্ফর আহমদ কর্তৃক লিখিত পারিবারিক দ্বন্দ্ব সমাধানমূলক বইটি সম্পাদনা করেন।[৩২১]

---

[৩২১] শায়েখুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, ড. এ. এইচ এম মুজতবা হোছাইন (সম্পাদিত) হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, (ঢাকা : ইসলামীক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট বাংলাদেশ, ১৯৯৮খ্রি.), পৃ. ১১-১৩।

Dhaka University Institutional Repository

শায়েখুল হাদীস মাওলানা তাফাজ্জল হোসাইন (রহ.) সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীদের মতামত-

১. মাওলানা আব্দুল হাই, শায়েখুল হাদীস জামিয়া আরাবিয়া লালবাগ, ঢাকা। তিনি বলেন, শায়েখুল হাদীস মাওলানা তাফাজ্জল হোসাইন (রহ.) ছিলেন এক জন প্রসিদ্ধ আলেম, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক। তিনি আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে সমাজের মানুষকে বাস্তবমুখী ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে জোর প্রচেষ্টা চালান। তাছাড়া ইসলামের মৌলিক বিষয়ের ওপর বহু রচনা করেন এবং বয়ানুল কুরআনের বাংলা অনুবাদ করেন। বহু সাহিত্যিক ও গবেষক ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর নিকট আলোচনা করত। তিনি বন্দেগীর ক্ষেত্রেও ছিলেন কঠোর সাধক। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন এবং মানুষের মাঝে কুরআন-হাদীসের আর্দশ তুলে ধরে হেদায়েতের পথ পরিচালনার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করতেন।[৩২২]

২. মাওলানা আবদুর রব, মুহাদ্দেস, জামিয়া আরাবিয়া লালবাগ, ঢাকা। তিনি বলেন, মাওলানা তাফাজ্জল হোসাইন (রহ.) ছিলেন একজন বিশিষ্ট আলেম ও ইসলামের প্রচার-প্রসারক । তিনি হকের প্রতি খুবই কঠোর ছিলেন এবং রাসূল (সা.) সুন্নাতের প্রতি খুবই একনিষ্ঠ ছিলেন। দীর্ঘদিন ইলমে দ্বীনের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। লেখনীর জগতে তাঁর বিশাল অবদান রয়েছে। তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাফসীরে আশরাফী নামক তাফসীর গ্রন্থটি তিনিই সম্পাদন করেন। দীর্ঘ ৩২ বছর যাবৎ তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শায়েখুল হাদীস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জীবনে কখনো কাউকে শরীয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে দেখলে তা প্রতিহত করার জন্য জোড়ালো প্রচেষ্টা চালাতেন। তাঁর ইল্মী জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে অনেকেই ইলেম অর্জন করে নিজেদের জীবনকে সুখময় জীবন হিসেবে গঠন করে নিয়েছেন। তিনি বৃহত্তম কুমিল্লার আলেমদের মধ্যে স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন।[৩২৩]

৩. মাওলানা আবদুর রহিম, মুহাদ্দেস, জামিয়া আরাবিয়া লালবাগ,ঢাকা। তিনি বলেন, মাওলানা তাফাজ্জল হোসাইন (রহ.) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দেস, লেখক, গবেষক ও সমাজ সংস্কারক। তিনি দ্বীনী তা'লীমের প্রচার- প্রসারে ও যোগ্য আলেম তৈরির লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার ফলে বহু ছাত্রের ইল্মী ও আমলী উন্নতি সাধিত হয়েছে। তিনি অত্যন্ত সফলতা ও একান্ত নিষ্ঠার সাথে হাদীস অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর মাঝে দ্বীনের চেতনা পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সকলকে সুন্নাতে রাসূল (সা.)-এর আলোকে গড়ে তোলার জন্য আজীবন সচেষ্ট ছিলেন। ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত হেদায়েতে নববীর ওরাছাতের দায়িত্ব পালন করেন।[৩২৪]

---

[৩২২] সাক্ষাৎকার : ১১ জানুয়ারি, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে।
[৩২৩] সাক্ষাৎকার : ১৮ এপ্রিল, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে।
[৩২৪] সাক্ষাৎকার : ২১ আগস্ট, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে।

Dhaka University Institutional Repository

১.১১. মাওলানা আবুল কাশেম রহ. (১৯৫২-২০১৪খ্রি.)

মাওলানা মো. আবুল কাশেম (রহ.) ১৯৫২খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আড়াইবাড়ি গ্রামে তাঁর নানার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা আব্দুল রউফ ও মাতার নাম মোসাম্মৎ ফিরোজা বেগম। পিতা মাওলানা আব্দুল রউফ ছিলেন বানিয়াপাড়ার পীর সাহেব ও যুগশ্রেষ্ঠ ওলীয়ে কামেল। তিনি ছিলেন স্নেহময় পিতা-মাতার একমাত্র ছেলে। তিনি সবার কাছে পরম আদর ও যত্ন সহকারে লালিত পালিত হন। জন্মের পর তাঁকে নানার বাড়ি থেকে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার বানিয়াবাপাড়া গ্রামে অত্যন্ত আনন্দময় উৎসবে নিয়ে আসেন।

তিনি পিতা-মাতার কাছেই প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা করেন। এরপর "বানিয়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়" থেকেই পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সাথে পাশ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর সিঙ্গুলা ইসলামীয়া ফাযেল মাদ্‌রাসায় দাখিল ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। সেখানে তিন বছর পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। এরপর কুমিল্লা জেলার দেবীদ্বার উপজেলায় অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী ধামতী ইসলামীয়া কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি দাখিল, আলিম, ফাযেল ও কামিল হাদীস বিভাগ অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করেন। এরপর অত্র মাদ্‌রাসায় তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও আদব বিভাগের ওপর উচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেন। জ্ঞানের পরিধি আরও ব্যাপকভাবে বিস্তৃতির জন্য আলাদাভাবে বালাগাত, মানতিক, বাংলা, অংক ও ইংরেজি বিষয়ের ওপর বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি হাদীস শাস্ত্রের ওপর পৃথকভাবে গবেষণা করে হাদীস শাস্ত্রের ওপর বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন।[৩২৫]

মাওলানা আবুল কাশেম (রহ.) আড়াইবাড়ির মাওলানা গোলাম জিলানী (রহ.)-এর ছোট মেয়ে মোসাম্মৎ আয়েশা খাতুনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর ঔরশে পাঁচ ছেলে ও দুই মেয়েসহ সাত জন জন্মগ্রহণ করে। তারা হলেন (১) মোসাম্মৎ মানসুরা আক্তার (২) মোসাম্মৎ মারুফা আক্তার (৩) মাওলানা আবু বকর ছিদ্দিক, গদ্দীনশীল পীর সাহেব (৪) মাওলানা মো. ওমর ফারুক (৫) মো. ওসমান গনী (৬) মোহাম্মদ আলী (৭) মো. মুজাহিদ। প্রত্যেকেই দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজেদেরকে ইসলামের সাথে পরিপূর্ণভাবে সম্পর্ক রাখেন।

মাওলানা আবুল কাশেম (রহ.) বহু আলেম-উলামা ও পীর-মাশায়েখের সোহবত লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে নিকটে অবস্থান করেন ফুরফুরা শরীফের বিশিষ্ট খলিফা, ধামতীর পীর সাহেব মাওলানা আজিম উদ্দিন (রহ.)। ধামতী ইসলামীয়া কামিল মাদ্‌রাসার শিক্ষা জীবনে তিনি দীর্ঘ সময় তাঁর খানকার সামনে অবস্থান করেন এবং তাঁর নিকট বাই'আত গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ও ছিলেন একজন হক্কানী পীর। জন্মের পর থেকে তিনি তাঁর পিতা কর্তৃক শরীয়তের বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেন এবং তাঁর থেকে ইল্মী ও আমলি জ্ঞান অর্জন করেন।

মাওলানা আবুল কাশেম (রহ.) খেলাফত লাভের মাধ্যমে আমল, আখলাক ও ইখলাসের উন্নতি লাভ করে এবং ইলমে মারেফত হাসিল করেন। মাওলানা আবুল কাশেম (রহ.)-কে তাঁর পিতা ও পীর মাওলানা আব্দুর রউফ (রহ.) শেষ জীবনে অসুস্থ অবস্থায় খেলাফত ও ইজাজত প্রদান করেন।

মাওলানা আবুল কাশেম (রহ.) তিনি ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই জুলাই ইহধাম ত্যাগ করেন। মসজিদ সংলগ্ন পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[৩২৬]

---

[৩২৫] স্মারক গ্রন্থ, ধামতী মাদরাসা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।
[৩২৬] স্মারক গ্রন্থ, পীরে কামেল মাও. আবুল কাসেম (রহ.) জীবন ও কর্ম, ২০১৪খ্রি., পৃ. ২।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা আবুল কাশেম (রহ.)-এর অবদান-

মাওলানা আবুল কাশেম (রহ.) দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষা দানে ও ইসলামের প্রচার-প্রসারে সারাজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তিনি দ্বীনী শিক্ষা প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে মক্তব, হেফজ বিভাগ, ইবতেদায়ী, দাখিল, আলিম ও ফাযেল মাদ্‌রাসাসহ বহু দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন করেন। প্রতিটি মাদ্‌রাসাতে তিনি অত্যন্ত যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক নিজ তত্ত্বাবধানে নিয়োগ দান করেন। যাতে করে ছাত্রদের আমল, আখলাক পরিপূর্ণ সুন্নাত অনুযায়ী হয়, সে ব্যাপারে পূর্ণ সজাগ দৃষ্টি রাখেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসাসমূহে অধ্যক্ষ ও শিক্ষক মহোদয়কে কখনো ছাত্রদের আমল আখলাকের ব্যাপারে অসতর্ক অবস্থায় দেখলে তিনি সাথে সাথে তাদেরকে মাদ্‌রাসা থেকে বের করে দেন। তিনি সারা জীবন ইল্‌ম, আমল ও আখলাকের উন্নতির ব্যাপারে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে আজীবন সচেষ্ট ছিলেন।

ঘানিয়াপাড়া মাদ্‌রাসায় প্রথম দিকে ইলমে মারেফত শিক্ষার সাথে সাথে মসজিদ ভিত্তিক কুরআন শিক্ষা চালু ছিল। পরবর্তীতে মাওলানা আবুল কাশেম (রহ.) তত্ত্বাবধানে কুরআন শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। তিনি প্রথমে কুরআন শিক্ষার জন্য মক্তব চালু করেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে হিফজুল কুরআন বিভাগ চালু করেন। বর্তমানে প্রায় আশিজন ছাত্র হিফজ বিভাগে পড়ালেখা করে। এতে চারজন শিক্ষক রয়েছে। তিনি মানুষের নিকট সঠিক দ্বীনী শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া লক্ষ্যে এবং সৎ ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার ব্যাপারে আজীবন চেষ্টা করে যান। কিভাবে সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে সঠিক পথে নিয়ে আসা যায় সেই চিন্তা-চেতনায় তাঁকে সর্বদা তাড়া করতো। সেই তাড়নায় তিনি দ্বীনীয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠায় পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এতে তিনি চল্লিশ শতাংশ জমি দান করেন এবং সেখানে একটি দ্বীনী মারকাজ তৈরি করেন। যাতে করে ছাত্ররা ইল্‌ম, আমল, আদব, আখলাক এবং সুন্নাতে নববীয় মারকাজ হিসেবে শিক্ষা লাভ করতে পারে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর মহব্বত ছাড়া কেউ শরীয়তে ওপর পূর্ণভাবে আমল করতে পারেনা যায় অন্তরে যতটুকু আল্লাহ ও রাসূলের মহব্বত আছে সে সেই পরিমাণ আমল করতে সক্ষম হয়। তাই এই মহব্বত অর্জনের জন্য শুধু বাহ্যিক শিক্ষাই যথেষ্ট নয়। তাই তিনি প্রত্যেক মানুষকে তরীকার তা'লীম দেওয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানে মাসিক যিকির ও তা'লীমের মজলিসের ব্যবস্থা করেন, এর ফলে সাধারণ মানুষ দ্বীনী মাসয়ালা-মাসায়েল ও ইসলামে প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হয়। এই জন্য বিভিন্ন যোগ্য লোক তৈরি করে তাদের মাধ্যমে তা'লীম দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।[৩২৭]

ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত প্রদান: মাওলানা আবুল কাশেম (রহ.)-কে বিভিন্ন মাহফিলের সভাপতি বা প্রধান অতিথি হিসেবে নেওয়া হতো। বিশেষ করে তিনি আখেরী মুনাজাত প্রদান করতেন। তিনি ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে সাধারণত যেই কথাগুলো বলতেন, তা হলো-

আল্লাহকে পাওয়া একটা জান্নাতী কপাল, তুমি যদি আল্লাহর হতে পারো, আর আল্লাহ যদি তোমার হয়ে যায়। তাহলে সবই তোমার হয়ে যাবে। তুমি আল্লাহর হও, আল্লাহ তোমার হয়ে যাবে। তিনি বিশেষভাবে ফরজ নামাজের প্রতি ও সুন্নাতে রাসূল (সা.)-এর প্রতি গুরুত্বপ্রদান করেন। তাঁর ওয়াজের মধ্যে রাসূল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের ভালোবাসা এবং আউলিয়াদের জীবনী মানুষদের মাঝে আলোচনা করতেন। যাতে মানুষ তাঁদের মতো পথ চলে। তিনি কবর পূজা, মাযার পূজা, খ্রিস্টান মিশনারি ও অনৈসলামীক এনজিও এবং কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন করেন।[৩২৮]

---

[৩২৭] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৬ই জুলাই ২০১৪।

[৩২৮] গবেষকের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উক্ত তথ্য সংগ্রহ, মাও. আবু বক্কর সিদ্দীক বিন আবুল কাশেম (রহ.) হতে প্রাপ্ত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আবুল কাশেম (রহ.) ছিলেন ইসলামের জন্য নিবেদিত। সারাটা জীবন ইসলামী দাওয়াতী কাজে ব্যয় করেন। এজন্য তিনি ব্যাপক কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে মাদ্‌রাসা-মক্তব প্রতিষ্ঠা, খানকা প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন মাহফিলের আয়োজন, ওয়াজ-নসীহত, তা'লীমের ব্যবস্থা, সামাজিক বিচার-আচার, সংস্কারমূলক কাজ, মাযার পূজারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ, বাতিল পন্থী ও খ্রিস্টান মিশনারিদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ আন্দোলন এবং পরোক্ষ রাজনীতিতে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানসহ দ্বীনী কাজে আপোষহীন বিপ্লবী মুজাহিদের ভূমিকা পালন করেন। তিনি অসুস্থতা বা শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রতিটি ওয়াজ মাহফিলে এবং বিভিন্ন ইসলামীক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি প্রতিটি মাহফিলে বলতেন, আপনারা আমাকে যেখানে যে সময় আপনাদের খেদমতে আহবান করেছেন এবং করবেন আমি আপনাদের ডাকে সাড়া দিয়েছি এবং দিব ইনশাআল্লাহ। তিনি সুদ ও ঘুষখোরদের দাওয়াত কবুল করতেন না। তিনি সমাজে বে-নামাজীদের বিচারের ব্যবস্থা করেন। তাঁর বিভিন্নস্থানে সফরের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যাতে প্রতিটি মানুষ হেদায়েতের পথে ফিরে আসে।[৩২৯]

স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলনে অংশগ্রহণ: পাকিস্থানের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণকারী ব্রিটিশ সরকারের সৃষ্টি ও দালাল খতমে নবুয়্যাত অস্বীকারকারী, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দুশমন গোলাম আহমদ কাদিয়ানির অনুসারী আহমদিয়া জামাতকে অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে সারা বাংলায় স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি প্রদান, মিছিল-মিটিং এবং ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণকে সতর্ক করে জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে আন্দোলন গড়ে তোলেন।

বাংলাদেশে যখন ফতোয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়, তখন তিনি আলেম-উলামা ও তৌহিদী জনতাকে নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। সেই সময় তাঁকে গ্রেফতারও করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। ফিলিস্তিনিদের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে তিনি সারাজীবন মুক্তির কথা বলেন। এভাবে তিনি বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।[৩৩০]

মাওলানা আবুল কাশেম (রহ.) সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত-

১। মাওলানা মাহমুদুর রহমান, পীর সাহেব সোনাকান্দা। তিনি বলেন, মাওলানা আবুল কাশেম (রহ.) তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া দ্বীনী কার্যক্রমকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যান। প্রতিষ্ঠা করেন অনেক মাদ্‌রাসা, মক্তব, মসজিদ ও তা'লিমী খানকাসহ এবং দেশময় তাবলিগী সফর। সমাজে ওয়াজ নসীহত ও দ্বীনী শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ধর্মীয় চেতনা ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করেন। সমাজে ইসলামের আলো প্রজ্জ্বলিত করার জন্য আজীবন চেষ্টা চালিয়ে যান। তাঁর সকল কর্মকাণ্ডে ইসলামের প্রচার-প্রসার অব্যাহত ছিল। তিনি কবর পূজা, মাযার পূজা, সমাজে অনৈসলামীক কর্মকাণ্ড ও খ্রিস্টান মিশনারিদের বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন করেন। তিনি প্রত্যেক মানুষকে রাসূল (সা.) সুন্নাতের ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করতেন। সমাজে বেনামাজীদের বিচারের ব্যবস্থা করেন। তিনি আজীবন ইসলামের প্রচার-প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।[৩৩১]

---

৩২৯ দৈনিক ইনকিলাব, ১৬ই জুলাই ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে।

৩৩০ স্মারক গ্রন্থ, পীরে কামেল মাও. আবুল কাসেম (রহ.) জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-২৬।

৩৩১ গবেষক ১০.০৫.২০১৬ তারিখে সাক্ষাৎকার সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

২। মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক বিন আবুল কাশেম (রহ.) তিনি বলেন, আমার পিতা ছিলেন একজন হক্কানী আলেম এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারক। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন অনেক মাদ্রাসা, মসজিদ ও ইসলামী তা'লীমী সেন্টার। যার মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। তাঁর ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে অনেক মানুষ ইসলামের সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়। তিনি স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্কারমূলক আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন। বিশেষভাবে সকল মানুষকে ফরয নামাজ এবং রাসূল (সা.) সুন্নাতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি সবসময় বিজ্ঞ আলেম উলামা, পীর-মাশায়েখদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং শরীয়তের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পরামর্শ করতেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ইসলামের প্রচার-প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[৩৩২]

---

[৩৩২] গবেষক ২২.০৫.২০১৬ তারিখে সাক্ষাৎকার সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-১.১২ : আল্লামা শাহ্ সুফী মাওলানা মোহাম্মদ অলি উল্লাহ (রহ.) (১৯০৫-২০০৬খ্রি.)

বিংশ শতাব্দীর সূচনা ও ব্রিটিশ শাসনের শেষের দিকে তখন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুসলিমদের দাপটে এবং বিভিন্ন কুসংস্কারের ফলে মুসলিম সমাজের অবস্থা চরম নাজুকতায় নেমে আসে। কুমিল্লা জেলার মৌকারা ও তাঁর আশ-পাশ এলাকার ধর্মীয় এবং সামাজিক অবস্থার সেই ঘোর অমানিশার চরম দুর্দিনে ইসলামের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসেবে মৌকারার পীর সাহেব আল্লামা শাহ মোহাম্মদ ওলীউল্লাহ (রহ.) অবদান অন্যতম। তিনি ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলার মৌকারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মৌলভী আবদুল হামিদ ও মাতার নাম মোসাম্মৎ জোহরা খাতুন বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে নম্রতা, ভদ্রতা ও গাম্ভীর্যতার ভাব পরিলক্ষিত হয়। ছাত্রজীবনের অধিকাংশ সময় তিনি লেখা পড়ায় নিজেকে ব্যস্ত রাখেন এবং পারিবারিক পরিচালনায় কঠোর পরিশ্রম করেন। তাঁর হাতের লেখা ছিল অত্যন্ত সুন্দর। তিনি লেখাপড়ার পাশাপাশি কঠোর ইবাদত ও রিয়াজতের মধ্যে সময় ব্যয় করেন। মাঝে মধ্যে তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করার পর গভীর রাত্রি বেলায় বাড়ির অদূরে মসজিদে মোরাকাবা অবস্থায় পাওয়া যেত। আবার কখনো কখনো তৎকালীন সময়ে মৌকরার জঙ্গলে সারারাত্রি মোরাকাবার হালে কাটিয়ে দিতেন। ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন খুবই মেধাবী, প্রতিটি জামাতেই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। লেখাপড়ার পাশাপাশি পিতা-মাতার খেদমতে ও নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন এবং পারিবারিক বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করেন। এমনকি তিনি মাঝে মাঝে সকাল বেলায় হাল চাষ করে তারপর মাদ্‌রাসায় যেতেন।[৩৩৩]

মাওলানা অলি উল্লাহ (রহ.) বিদ্যার্জনের গভীর প্রত্যয় নিয়ে কৈশোর বয়সে ঢালুয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে তিনি জামাতে নাহুম পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর জামাতে শশম থেকে জামাতে উলা পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন গাজীমুড়া আলিয়া মাদ্‌রাসায়। তৎকালীন সময় গাজীর মুড়া আলিয়া ছিল কুমিল্লা জেলার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তিনি ছিলেন কঠোর অধ্যবসায়ী। বিদ্যার্জনের জন্যে কঠোর পরিশ্রম করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মুয়াদ্দাব ও কোমল চরিত্রের অধিকারী। তাঁর ব্যবহারে ছিল পরিপূর্ণ মাধুর্যতা। তাই তিনি অল্প দিনের মধ্যে শিক্ষকদের স্নেহাষ্পদে পরিণত হন। তিনি পড়ালেখা অবস্থায় বাই'আত গ্রহণ করেন এবং স্বীয় পীরের সান্নিধ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাই তিনি মাদ্‌রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ পর্যায় কামিল শ্রেণিতে অধ্যয়নের জন্য ছারছীনা মাদ্‌রাসায় চলে আসেন। কামেল পড়ার উদ্দেশ্যে ছারছীনা আসার পর তদীয় পীর মাওলানা শাহসুফী নেছারুদ্দীন আহমদ (রহ.) তাঁকে একবছর ছারছীনায় অবস্থান করতে বলেন। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইলমে জাহেরী শিক্ষার সাথে ইলমে বাতেনী শিক্ষা লাভ করা। সেদিন হতে তিনি স্বীয় পীরের খিদমতে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। পূর্ণ একবছর যাবৎ ইলমে জাহেরী অর্জনের সাথে ইলমে বাতেনী ও অর্জন করে নিজের আত্মিক উন্নতি লাভ করতে ব্যাপক সক্ষমতা লাভ করেন।

মাওলানা মুহাম্মদ অলি উল্লাহ (রহ.) বাল্যকাল থেকেই ইবাদত ও সাধনায় অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি যুগ শ্রেষ্ঠ ওলীর সোহবতে থাকায় সুযোগ লাভ করেন। তিনি ত্বরিকতের শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে যথানিয়মে আদায় করেন। পীরের নির্দেশকে পরিপূর্ণভাবে পালন করার জন্যে তিনি আজীবন সচেষ্ট ছিলেন।

---

[৩৩৩] অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম, স্মারক গ্রন্থ, বেদনার অন্তরালে, (শাহ্ হোসাইন রিসার্চ একাডেমী, দারুস সুন্নাহ ওয়ালীয়া কমপ্লেক্স মৌকরা, ২০০৭খ্রি.), পৃ. ৬১।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ছারছীনার মাওলানা শাহ সুফী নেছারুদ্দীন (রহ.) থেকে চার তরীকার বায়'আত গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ছারছিনার পীর সাহেব হতে খেলাফত লাভ করেন। মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আলি উল্লাহ (রহ.) ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র হজ্জ সম্পাদন করেন।

মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আলি উল্লাহ (রহ.) দু'টি বিবাহ করেন। প্রথম স্ত্রী তাঁর জীবদ্দশাতেই ইন্তেকাল করেন। প্রথম স্ত্রীর ঔরসে দুই পুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের নাম হলো- মাওলানা মহিউদ্দীন হামিদী ও মাওলানা মাঈনুদ্দীন। পুত্রদ্বয় তাঁর জীবদ্দশাতেই ইন্তেকাল করেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর ঔরসে তিনপুত্র ও চার কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তাঁদের নাম হলো মাওলানা বাহাউদ্দীন, মাওলানা নেছার উদ্দীন আলি উল্লাহ ও হাফেজ নিজামুদ্দীন। মাওলানা মুহাম্মদ আলি উল্লাহ (রহ.) ১লা মার্চ ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।[৩৩৪]

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে আল্লামা শাহ সুফী আলি উল্লাহ (রহ.)-এর অবদান-

মাওলানা মুহাম্মদ আলি উল্লাহ (রহ.) বৃহত্তম কুমিল্লাসহ বাংলার মুসলিম সমাজের ঈমান, আক্বীদা, আমল ইত্যাদি বিষয় ইসলামীক ভাবধারায় উন্নতির লক্ষ্যে বাংলার বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক সংস্কার করেন।

তিনি ইসলামী আদর্শ বিস্তারে স্বীয় জীবনকে উৎসর্গ করে যাবতীয় বাধা বিপত্তি, ত্যাগ-তিতিক্ষা, দুনিয়াবী ভোগ-বিলাস উপেক্ষা করে ইসলামী তাহযীব-তামদ্দুন বিস্তারে মুসলিম সমাজে বহু পরিবর্তন আনেন। তিনি কুমিল্লা, নোয়াখালী, চাঁদপুর ও চট্টগ্রামসহ উত্তর-পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজকে ইসলামের উষার আলোয় উদ্ভাসিত করেন।

তিনি নিজ বাড়ির আঙ্গিনায় বিশাল ইসলামীক কমপ্লেক্স স্থাপনসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অনেক মাদ্‌রাসা, মসজিদ, ইয়াতিমখানা, হিফজখানা ও তা'লীমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। জীবন সায়াহ্নে শুরু করেছিলেন ইসলামী আদর্শ শিক্ষার রেনেসাঁ-দ্বীনীয়া মাদ্‌রাসা বিপ্লব। আর বিভিন্ন স্থানে তাবলীগী সফর এবং ইসলামী মাহফিলের মাধ্যমে দ্বীনের প্রচার-প্রসার। কায়েম করেন ইসলামী সংগঠন, সালফে সালেহীনের অনুসৃত নীতিমালা অনুসরণ করে নির্দলীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন যুগোপযোগী কর্মপন্থার মাধ্যমে "আমর বিল মারুফ নাহী আনিল মুনকার" এই নীতি অনুশীলন করে সমাজে সুন্নাতে নববী প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে আজীবন সংগ্রাম চালিয়ে যান।

শাহ মোহাম্মদ আলি উল্লাহ (রহ.) আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে নিজ বাড়ির সামনে গড়ে তোলেন প্রথমত দারুস সুন্নাহ কমপ্লেক্স। অত্র কমপ্লেক্সে রয়েছে, দারুস সুন্নাহ ফাযেল মাদ্‌রাসা, হিফজ ও নূরানী বিভাগ এবং এতিম খানা। যা বর্তমানে দীর্ঘ কয়েক যুগের লালন হয়ে ওঠেছে মনমাতানো সুরম্য বিদ্যানিকেতনের সমষ্টি নৌকরা দারুচ্ছুন্নাহ ওয়ালীয়া কমপ্লেক্স। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে উপমহাদেশ বিভাগের ঐতিহাসিক সনে তা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যুগ-সন্ধিক্ষণের এ সুবর্ণ সময়ের মতো এ প্রতিষ্ঠান গোটা বাংলাদেশ বিশেষত বৃহত্তর কুমিল্লা, নোয়াখালী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট জেলায় অজস্র আলিম-ওলামা, হাফিজ-ক্বারী তৈরির মাধ্যমে অসাধারণ সাফল্যের নজির রেখে চলেছে। তাছাড়া সমাজ সংস্কার ও গণ মানুষের প্রত্যাহিক জীবন ধারায় অত্র প্রতিষ্ঠান সিপাহ্‌ সালার ভূমিকা পালন করে চলেছে।[৩৩৫]

---

[৩৩৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

[৩৩৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-২১।

Dhaka University Institutional Repository

অত্র কমপ্লেক্স পরিচালিত প্রতিষ্ঠান সমূহ হলো:

- দারুচ্ছুন্নাহ নেছারিয়া ফাযেল মাদ্‌রাসা।
- দারুচ্ছুন্নাহ ছালেহিয়া ওয়ালীয়া দ্বীনীয়া মাদ্‌রাসা।
- দারুচ্ছুন্নাহ ওয়ালীয়া হাফিজিয়া মাদ্‌রাসা।
- দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াতিমখানা।
- খানকায়ে নেছারিয়া ওয়ালীয়া।
- মুহিব্বিয়া তা'লীমী সেন্টার। অত্র প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি বয়স্ক মানুষের জন্য একটি দ্বীনী শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেন।
- ছালেহিয়া ইল্‌মুল কুরআন প্রশিক্ষণকেন্দ্র। অত্র প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের ওপর বিশেষ ট্রেনিং দেওয়া হয়। যার মাধ্যমে অতি সহজে কুরআন শিক্ষা লাভ করতে পারে।

ছাত্রদের আমল আখলাক সঠিকভাবে গড়ে তোলার লক্ষে ছাত্রাবাস ও লিল্লাহ বোডিং প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বীনী শিক্ষার্থীদেরকে বাইরের বিষাক্ত পরিবেশের ছোয়া থেকে মুক্ত রেখে ইসলামী পরিবেশে লালন করা অত্যাবশ্যক। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তিনি ছাত্রাবাস ও লিল্লাহ বোর্ডিং প্রতিষ্ঠা করেন। যা বর্তমানে প্রায় ৪৫০ জন ছাত্র এ মনোমুগ্ধকার পরিবেশে পড়ালেখা করছে।

আল কুরআন হলো মুসলমানদের একমাত্র সংবিধান। কুরআনের নূর সমাজের বুকে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন হিফজ বিভাগ, পরবর্তীতে এর নামকরণ করা হয় দারুচ্ছুন্নাহ ওয়ালীয়া হাফিজিয়া মাদ্‌রাসা। ভক্তবৃন্দের জোর প্রস্তাবের মুখে বাধ্য হয়েই নিজের নামে এ অমর কীর্তির নামকরণ করেন। বর্তমানে প্রায় ৭৫ জন ছাত্র হিফজ বিভাগে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা লাভ করছেন। ব্যাপকভাবে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে শুরু করেন "দ্বীনীয়া মাদ্‌রাসা" নামে ইসলামী আদর্শ পুনর্জাগরণের যুগোপযোগী আন্দোলন। এ রেনেসাঁ আন্দোলনের সাথে একাত্মতা পোষণ করেন শাহ সুফী অলি উল্লাহ (রহ.)। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে দ্বীনীয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। যা দারুচ্ছুন্নাহ ছালেহিয়া ওয়ালীয়া দ্বীনীয়া মাদ্‌রাসা নামে প্রসিদ্ধ। অত্র মাদ্‌রাসার ছাত্রদের ইল্‌মী ও আমলী সুখ্যাতির প্রসারতা অত্র এলাকায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার লাভ করেছে।

পুস্তক প্রণয়ন: তৎকালীন সমাজের লোকজন ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে অজ্ঞ ছিল। তাই মাওলানা অলি উল্লাহ (রহ.) ধর্মীয় বিষয়াদি উপস্থাপনের লক্ষ্যে পুস্তক প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং তিনটি পুস্তক প্রকাশও করেন। এগুলো হলো- (১) যিকিরুল্লাহর ফযিলত (২) কালিমাতুল্লাহর হাক্বীকত (৩) যবানের হিফাযত।

মাওলানা অলি উল্লাহ (রহ.) সারা জীবন বৃহত্তর কুমিল্লা জিলাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাবলীগী সফর করেন এবং তদীয় অঞ্চলে সাপ্তাহিক ও মাসিক জলসা প্রতিষ্ঠা করেন। কুমিল্লা জিলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে আগত মুসলমানগণ এ জলসায় যোগদান করেন। জলসায় যিকর আজকারসহ বিভিন্ন অজীফা, মোরাকাবা-মোশাহাদা ও শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ের তা'লীম দেওয়া হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাসিক তা'লীমী জলসার সংখ্যা প্রায় ৪০ এর অধিক।[৩৩৬]

[৩৩৬] এস.এম আজিজুল হক আনসারী, বাংলাদেশের পীর-আউলিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪-১৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

মৌকারায় পীর সাহেব (রহ.) ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে সীমাহীন কষ্টভোগ করেন। প্রাথমিক জীবনে তিনি দিনের বেলায় মাঠে হাল-চাষ করতেন; আর রাতে তা'লীমের কাজ করতেন। ১৫/২০ মাইল দূরে হেঁটে গিয়ে তা'লীমী জলসা শেষে আবার রাতেই পায়ে হেঁটে বাড়ি আসতেন। এভাবে তিনি বিভিন্ন স্থানে তাবলীগের ব্যাপক খেদমত প্রদান করেন।

তিনি কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন বটে। কিন্তু শরীয়তের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। শরীয়তের ব্যাপারে তিনি কাউকে ছাড় দিতেন না। শরীয়তের খেলাপ কোন কাজ করতে দেখলে তা কখনও বরদাশত করতেন না। অনুরূপভাবে অনৈসলামীক কাজের ব্যাপারে তিনি ছিলেন নির্ভিক মুজাহিদ। একবার মৌকারার পার্শ্ববর্তী হাসানপুরে অনুষ্ঠিত শীতকালীন এক বিশাল মেলা তিনি তাঁর ছাত্র-শিক্ষক নিয়ে ভেঙ্গে দেন এবং সকলকে খুব সুন্দর করে মেলার অপকারিতা সম্পর্কে বুঝিয়ে সঠিক ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন।

সাংগঠনিক কর্ম তৎপরতা : শাহ মোহাম্মদ আলি উল্লাহ (রহ.) বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিল ও আলোচনা সভায় হিযবুল্লাহ নামক সংগঠনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। সংগঠন সম্পর্কিত মৌলিক ধারণাগুলো অতি সহজে মানুষের মাঝে উপস্থাপন করতেন। সর্বত্র জমইয়াতে হিযবুল্লাহ ও ছাত্র হিযবুল্লাহর কার্যক্রমকে জোরদার করার তাকীদ দিতেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন- ছাত্র জীবনে আমি হিজবুল্লাহ করতাম। হিযবুল্লাহর মাঝে অনেক কিছুই শেখার রয়েছে। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই অত্র অঞ্চলে হিযবুল্লাহর ব্যাপক প্রচার-প্রসার লাভ করছে। সাংগঠনিক কর্ম-দক্ষতার কারণেই তিনি বাংলাদেশ জমইয়াতে হিযবুল্লাহর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর ও কুমিল্লা জেলার আমীরের দায়িত্ব পালন করেন।[৩৩৭]

জীবন সায়াহ্নে তাঁর কতিপয় মূল্যাবান উপদেশ নিম্নে উল্লেখ করা হল

১) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে পড়তে হবে। নামাজে পাগড়ী ব্যবহার করতে হবে।

২) সুন্নাতি তরিকা অনুসারে যাবতীয় আমল করতে হবে। যিকির আজকার, মোরাকাবা-মোশাহাদা কোন সময় তা বাদ দেওয়া যাবেনা। ২০০২ খ্রিস্টাব্দে মাসিক কুড়ি মুকুলের এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন 'আজ ৬৫ বছর হল একদিন ও সকাল সন্ধ্যায় যিকির থেকে বিমুখ হয়নি। শত ব্যস্ততার মধ্যেও নিয়মিত যিকির করে যাচ্ছি।

৩) যিকরে ক্বলব সাফ হয়, তাই বেশি বেশি আল্লাহ তা'য়ালার যিকির করতে হবে।

৪) তরিকা মানুষকে অকর্মণ্য করেনা, তাই পরিপূর্ণভাবে তরিকা অনুসরণ করতে হবে।

৫) কলব হল জমিন আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু হল তারই ফসল। অতএব কালিমার যিকির বেশি বেশি করতে হবে।

৬) তাসাউফ মুমীনকে অলস করেনা। বরং আমাদের মাঝে মর্দে মুজাহিদের মতো চেতনা নিয়ে আসে।

৭) আলেম সমাজের সাথে বেশি বেশি সম্পর্ক করতে হবে এবং তাঁদেরকে পরিপূর্ণভাবে ভালোবাসতে হবে।

৮) ইসলামের প্রচার প্রসারে যতটুকু সম্পদ ব্যয় করা সম্ভব প্রয়োজন মতো খরচ করতে হবে।[৩৩৮]

---

[৩৩৭] অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম, স্মারক গ্রন্থ, বেদনার অন্তরালে, প্রাগুক্ত, ৬৫-৬৭।

[৩৩৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৭২।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা শাহ সুফী মাওলানা মোহাম্মদ অলি উল্লাহ (রহ.) সম্পর্কে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গুণীজনের অভিমত-

১। মাওলানা মোহাম্মদ নেছার উদ্দিন বিন অলি উল্লাহ, বর্তমান গদ্দীনশীন পীর, মৌকরা দরবার শরীফ। তিনি বলেন, যারা বাংলায় বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামী আদর্শ বিস্তারে নিরলস নিঃস্বার্থে খেদমত করে ইতিহাসের পাতায় চিরঅম্লান ও চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে আমার পিতা অন্যতম। উত্তর-পূব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার মানব সমাজে হেদায়েতের আলো এবং পবিত্র কুরআন-হাদীসের মর্মবাণী মানুষের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে শাহ অলি উল্লাহ (রহ.)-এর অবদান সর্বজন স্বীকৃত। তিনি লাখো মানুষের মাঝে মৌকারার পীর সাহেব হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বিশাল সমুদ্র থেকে মাত্র এক পেয়ালা পানি নিয়ে যেরূপ সমুদ্রকে পরিমাপ করা অসম্ভব, তদ্রূপ ইসলামের প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে আমার পিতার বিশাল তাজদীদী জীবন উপস্থাপন অসম্ভব। আমার বিশ্বাস আমার পিতার নিরলস নিঃস্বার্থ খেদমত কেয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। ইনশাআল্লাহ।[৩৩৯]

২। মাওলানা শাহ মোহাম্মদ মোহিবুল্লাহ পীর সাহেব, ছারছীনা। তিনি বলেন, পাক ভারত উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত আলেম ছারছীনার পীর মাওলানা শাহ সুফী নেছারুদ্দীন আহমদ (রহ.)-এর ছিলছিলার প্রচার-প্রসারে যেসব মনীষীগণ নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের মধ্যে মৌকরার মাওলানা শাহ সুফী অলি উল্লাহ (রহ.) ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন ফানা ফিশ শায়েখ। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তিনি আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতে অনুসৃত নীতিমালা অনুসরণ করেন। তাঁর আমল-আখলাক, লেবাস-পোশাক, তা'লীম-তরবিয়াতের ক্ষেত্রে সুন্নাতের পরিপূর্ণ নমুনা পাওয়া যেত। দ্বীনের প্রচার প্রসারে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন অনেকগুলো দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সকল প্রতিষ্ঠানে ইসলাহে কওম ও ইসলাহে নফসের ব্যাপারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।[৩৪০]

৩। শাহ আবু নছর নেছারউদ্দিন, পীর সাহেব ছারছীনা। তিনি বলেন, যারা ইসলামী আদর্শ বিস্তারে স্বীয় জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। যাবতীয় বাধা বিপত্তি, ত্যাগ-তিতিক্ষা, দুনিয়াবী ভোগ-বিলাস উপেক্ষা করে ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন বিস্তারে মুসলিম সমাজে নিবেদিত প্রাণ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছেন। তাঁরা ইতিহাসের পাতায় আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন শাহ সুফী অলি উল্লাহ (রহ.)। তিনি কুমিল্লা, নোয়াখালী, চাঁদপুর, চট্টগ্রামসহ উত্তর-পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজে ইসলামের উজ্বার আলোয় উদ্ভাসিত করেন। তাঁর আলোক বর্তিকায় প্রজ্বলিত হয়েছিল বাংলার এক অজানা-অচেনা নিভৃত পল্লী মৌকরাতে। যার নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকবে।[৩৪১]

---

[৩৩৯] গবেষক ১২.০৭.২০১৬ তারিখে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার অনুযায়ী লিখিত।
[৩৪০] গবেষক ৩০.০৭.২০১৬ তারিখে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার অনুযায়ী লিখিত।
[৩৪১] গবেষক ১৫.০৮.২০১৬ তারিখে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার অনুযায়ী লিখিত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-১.১৩ : অধ্যাপক মাওলানা আবু নাঈম মোহাম্মদ ইব্রাহীম (রহ.) ১৯২৭-১৯৮৬ খ্রি.

অধ্যাপক মাওলানা আবু নাঈম মোহাম্মদ ইব্রাহীম (রহ.) ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলার ফেনুয়া গ্রামের ঐতিহ্যবাহী মোল্লা বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব মৌলভী মোহাম্মদ ফজলুল করিম মোল্লা, তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরহেজগার ব্যক্তি। জনাব ইব্রাহীম সাহেব ছিলেন দুই ভাই, পাঁচ বোনের মধ্যে চতুর্থ এবং ভাইদের মধ্যে বড়। ছোট বেলায়ই তিনি মাকে হারান। এতে, নানা প্রতিকূলতা এবং প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে তার শৈশব অতিবাহিত হয়। তাঁর শৈশব কেটেছে প্রত্যন্ত গ্রামে। তিনি ফেনুয়া হোসাইনিয়া ফোরকানিয়া মাদরাসা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। তাঁর চাচাতো ভাই মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন (রহ.) ছিলেন সেই মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা। সে সময় মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন (রহ.) চাঁদপুর ওসমানিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করতেন। তিনি জনাব ইব্রাহীমকে ওসমানিয়া মাদরাসায় ভর্তি করান। সেখানে কিছু দিন লেখাপড়া করার পর তৎকালীন বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঐতিহ্যবাহী নোয়াখালী ইসলামিয়া আলীয়া মাদরাসায় ইলমে দ্বীন হাসিলের উদ্দেশ্যে ভর্তি হন। নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদরাসাটি তখন হাজারো উলামায়ে কেরামের মারকাজ হিসেবে পরিচিত ছিল। নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে তিনি অত্র মাদরাসা থেকে আলিম কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় সারাদেশে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ওস্তাদগণ তাঁর অধিক মেধা ও পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ দেখে তাঁর প্রতি বিশেষভাবে নজর দেন। তিনি ওস্তাদগণের বিশেষ তত্ত্বাবধানে থেকে অত্র মাদরাসা থেকে আলিম, ফাযেল এবং কামিল হাদীস বিভাগে অত্যন্ত সুনামের সাথে উত্তীর্ণ হন। মাদরাসায় অধ্যয়ন শেষ করে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকার কাপ্তান বাজারস্থ নবাবপুর সরকারি হাই স্কুলের ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। মাওলানা ইব্রাহীম (রহ.) স্বপ্ন দেখতেন সমাজের খেদমত করতে হলে মাদরাসার শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা অর্জন একান্ত প্রয়োজন। তাই শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি এস.এস.সি, এইচ.এস.সি এবং বি.এ (অনার্স) ডিগ্রি লাভ করেন। ইসলামী জ্ঞানের অদম্য পিপাসা নিবারণের উদ্দেশ্যে তিনি প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরগণও তাঁর ইসলামীজ্ঞানের গভীরতা দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হন। ১৯৬০ সালে তিনি এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে সর্বাধিক নম্বর পেয়ে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল ও রেকর্ড পরিমান নম্বর পাওয়ায় তাঁর অসাধারণ সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে পাকিস্তানের করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর গবেষণা করার জন্য স্কলারশিপ এবং স্বর্ণপদক প্রদানের জন্য মনোনীত করা হয়। কিন্তু, সরকারী চাকরিরত অবস্থায় বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে জটিলতা তৈরি হওয়ায় তিনি সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। তিনি স্বর্ণ পদকের পরিবর্তে আরবী ও ইসলামী বিষয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান কিতাব প্রদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান। তার পরিপ্রেক্ষিতে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে বহু দুর্লভ গ্রন্থ উপহার হিসেবে প্রদান করে। এরপর তিনি পুনরায় আরবী বিভাগে ভর্তি হয়ে ডাবল এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। এ সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজ পরিবারের সাথে খিলগাঁও থানার তিলপা পাড়াস্থ নিজ বাসায় থাকতেন।

তিনি মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন-এর আধ্যাত্মিকতায় অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়ে তাঁর হাতে বাইআত হন। মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন (রহ.) ছিলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.)-এর খলিফা। পরবর্তীতে, মাওলানা ইব্রাহীম (রহ.) ও

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আসআদ মাদানী (রহ.)-এর হাতে বাইয়াত হন। মাওলানা আসআদ মাদানী (রহ.) ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা সফরে এলে মাওলানা ইব্রাহীম (রহ.) তাঁকে নিজের বাসায় দাওয়াত করেন এবং রুহানী দোয়া নেয়ার চেষ্টা করেন।

মাওলানা ইব্রাহীমকে লাঙ্গলকোট উপজেলার পাটোয়ার কাজী বাড়িতে জনাব কাজী ইয়াকুব আলীর কন্যা মোসা. সালমা বেগমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করান। মোসা. সালমা বেগম ছিলেন মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন (রহ.)-এর সম্পর্কিত শ্যালিকা। তাঁর ঔরসে ছয় ছেলে, দুই মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই দ্বীনী শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষাও লাভ করেন। মেয়েরা হলেন (১) মোসা. রওশন আরা বেগম, স্বামী-অধ্যাপক মাওলানা মোহাম্মাদ আবুল কালাম। তিনি বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ঢাকা কলেজ থেকে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেছেন। (২) মোসা. দিল-আরা বেগম, স্বামী-মাওলানা আবু জাফর মোল্লা, ঢাকা মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন। ছেলেরা হলেন (১) নোমান মোল্লা, তিনি ইসলামপুরে ব্যবসা করেন। (২) আবুল হাসান, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেছেন। বর্তমানে ন্যাশনাল ব্যাংকের সিনিয়র এসিস্ট্যান্ট ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে কর্মরত আছেন। (৩) আলহাজ মাওলানা ওসমান, তিনি ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে খিলগাঁও মাখাজানুল উলুম মাদরাসায় দ্বীনী খেদমত করছেন। (৪) হাফেজ মাওলানা জামাল উদ্দীন, তিনি দীর্ঘদিন ঢাকাস্থ সৌদী দুতাবাসে চাকরি করেছেন। (৫) ডাঃ সুফিয়ান সাওরী, সরকারী ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. পাশ করেছেন। বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরাতে সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত আছেন। (৬) মাওলানা শাব্বীর আহমেদ, তিনি বর্তমানে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের প্রিন্সিপাল অফিসার হিসেবে কর্মরত আছেন।

মাওলানা ইব্রাহীম (রহ.) ঢাকা নবাবপুর সরকারি হাইস্কুলের ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে চাকরির সুবাদে ঢাকায় আসেন। পরবর্তীতে তিনি খিলগাঁও তিলপাপাড়ায় বাড়ি নির্মাণ করে সেখানে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বসবাস করেন।

মাওলানা ইব্রাহীম (রহ.) ১৯৮০ সালে পবিত্র হজ্জ সম্পাদন করেন এবং পবিত্র মদিনা মুনাওয়ারা সফর করেন। মদিনা থেকে তিনি বিভিন্ন মূল্যবান কিতাবাদি সংগ্রহ করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্বরত অবস্থায় তিনি হৃদরোগ ও স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হন। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মার্চ রাতের শেষ ভাগে সুবহে সাদিকের সময় তিনি নিজ বাসায় ইন্তেকাল করেন। খিলগাঁও তিলপাপাড়া জামে মসজিদে তাঁর জানাযার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার নামাজের ইমামতি করেন তাঁর চতুর্থ ছেলে হাফেজ মাওলানা জামাল উদ্দীন। জানাযা শেষে আত্মীয়-স্বজন তাঁর নিজ গ্রামের বাড়িতে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করার জন্য নিয়ে যেতে চাইলে এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসুল্লীগণের শ্রদ্ধাজনিত ভালোবাসা থাকায় তাঁদের জোরালো আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁকে অত্র মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানে দাফন করা হয়। এই মসজিদেই তিনি নিয়মিতভাবে জামাতে নামাজ আদায় করতেন, ইতেকাফ করতেন এবং পবিত্র কুরআনের তাফসীর পেশ করতেন।[৩৪২]

---

৩৪২ মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, (অধ্যাপক মাওলানা আবু নাঈম মো. ইব্রাহীম (রহ.)-এর জীবন ও কর্ম, ২০১৭ খ্রি.) পৃ. ১-১৫ (অপ্রকাশিত)

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে অধ্যাপক মাওলানা আবু নাঈম মো. ইব্রাহীম (রহ.)-এর অবদান-

অধ্যাপক মাওলানা আবু নাঈম মো. ইব্রাহীম (রহ.) ১৯৫৪ সালেঢাকা নবাবপুর সরকারি হাই স্কুলে সহকারি শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬৮' সালেসরকারি ঢাকা কলেজের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। অতঃপর সরকারি কবি নজরুল কলেজে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সেখানে দীর্ঘদিন যাবৎ আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে অত্যন্ত দক্ষতা ও সুখ্যাতির সহিত অধ্যাপনা করেন। পাশাপাশি, শ্যামবাজারে অবস্থিত শহীদ শামসুল হক ছাত্রাবাসের সুপারের দায়িত্বও পালন করেন। এ সময় তিনি ঢাকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া ইমদাদিয়া আরাবিয়া, ফরিদাবাদে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। সেখানকার উস্তাতগণ তাঁর ইসলামী জ্ঞানের গভীরতা দেখে খুবই মুগ্ধ হন। তিনি তাঁর সন্তানদেরকে ইলমে দ্বীন শিক্ষার জন্য অত্র মাদরাসায় ভর্তি করেন। কলেজ হোস্টেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে তিনি ছাত্রদের আধ্যাত্মিক অভিভাবক হিসেবে পরিণত হন। হোস্টেলের আবাসিক ছাত্ররা তাঁকে পিতার মতো শ্রদ্ধা করতো। প্রায় তিন বছর দায়িত্ব পালনের পর যখন তিনি বিদায় গ্রহণ করেন, তখন বিদায় অনুষ্ঠানে এক হৃদয় বিদারক অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এরপর তিনি টাঙ্গাইল কাগমারী কলেজে ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে যোগদান করেন।

মাওলানা ইব্রাহীম (রহ.) ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে উচ্চমাধ্যমিক এবং বি.এ. ক্লাসের পাঠ্যসূচি হিসেবে ইসলামিয়াত বই রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের প্রকাশক ছিল বাংলাবাজারের 'কোরান মহল'। তাঁর বই শিক্ষার্থীদের নিকট সমাদৃত হওয়ায় তিনি বই লেখার প্রতি আরো অধিক আগ্রহী হন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিভাগের একটি বই অনুবাদের কাজও শুরু করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সমাপ্ত করতে পারেননি। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রেষণে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মাদরাসার শিক্ষা বোর্ডে তিনি অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। দূর-দূরান্ত থেকে আগত মাদরাসা শিক্ষক ও অধ্যক্ষগণকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করতেন। এমন কি অফিস সময়ের পরেও প্রয়োজনে নিজ বাসায় এনে তাঁদের সমস্যাগুলোর সমাধানের চেষ্টা করতেন। পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনের জন্য তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন মাদরাসায় যেতেন এবং সকল প্রকার অনিয়ম, নকল এবং অনৈতিকতার বিরুদ্ধে আপোষহীন ভূমিকা পালন করতেন। বোর্ডের সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তা-কর্মচারিদের মতে, অধ্যাপক ইব্রাহীম ছিলেন মাদরাসা বোর্ডের ইতিহাসে সবচেয়ে সৎ ও নিষ্ঠাবান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক। বর্তমানে মাদরাসা বোর্ডে কর্মরত সহকারী পরিদর্শক জনাব শাহদাত হোসেন মিয়া বলেন, স্যারের মত সৎ এবং অমায়িক মানুষ আমরা মাদরাসা বোর্ডে আর পাইনি। তিনি তাঁর আয়ের প্রতিটি পয়সার হিসাব একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতেন এবং আমাদেরকে দেখাতেন। হালাল উৎস থেকে আয় নিশ্চিত করতে এমন স্বচ্ছতা অনুসরণ করা ছিল সত্যিই নজিরবিহীন। মাদরাসার অধ্যক্ষগণও অধ্যাপক ইব্রাহীমের ব্যবহার এবং কর্মদক্ষতায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় মাদরাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, স্বীকৃতি প্রদান ও শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। এমনিভাবে, তিনি মাদরাসা বোর্ডে সততা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং আন্তরিকতা সেবার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এছাড়াও মাওলানা ইব্রাহীম (রহ.) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বিশেষজ্ঞ শিক্ষক হিসাবে (খণ্ডকালীন) দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি অনার্স ও মাস্টার্সের শিক্ষার্থীদেরকে বুখারী শরীফ, তাফসীর ও আরবী সাহিত্য পড়াতেন। তিনি অসুস্থ্য থাকা অবস্থায়ও ছাত্ররা তাঁর বাসায় এসে তাফসির ও হাদীসের দরস

Dhaka University Institutional Repository

নিয়েছেন। তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ও অনুসারীদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন অধ্যক্ষ মাওলানা শহীদুল্লাহ পাটোয়ারী। তিনি বাসাবো সবুজবাগে মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর উস্তাদের মত আমৃত্যু মাদরাসায় ছাত্রদের ইলমে দ্বীন শিক্ষা দিয়ে গেছেন। এমনিভাবে, অধ্যাপক ইব্রাহীম ইসলামী জ্ঞান সাধনায় তিনি তাঁর পুরো জীবনকে অতিবাহিত করেন। দ্বীনী শিক্ষা কার্যক্রমে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখার অংশ হিসাবে তিনি দেশের অনেক কাওমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠায়ও অবদান রাখেন।

বাংলাদেশের অনেক প্রখ্যাত আলেম-ওলামা, বুজুর্গ ও শিক্ষাবিদের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। তাঁদের অন্যতম ছিলেন, মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর (রহ.), মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.), শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক (রহ.), খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক (রহ.), মাওলানা শামসুদ্দিন কাসেমী (রহ.), জ্ঞান তাপস ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ (রহ.), অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইসহাক (রহ.), দূর্বাটি আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ ও জমিয়তুল মুদাররেসীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাওলানা আব্দুল সালাম (রহ.), মাদারাসা-ই-আলীয়া'র অধ্যক্ষ মাওলানা ইয়াকুব শরীফ (রহ.), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মোতাফিজুর রহমান, শায়খুল হাদীস মাওলানা নূর হোসেন কাসেমী, প্রিন্সিপাল মাওলানা নুরুল ইসলাম প্রমূখ। এদের অনেকেই ছিলেন তাঁর সহপাঠী, বন্ধু এবং সহকর্মী। মাওলানা ইব্রাহীম (রহ.) যখনই সময় পেতেন তখনই তাঁদের সাথে কুরআন-হাদীস ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনায় মগ্ন হয়ে সারাদিন কাটিয়ে দিতেন। এমন ঘটনা তাঁর জীবনে বহুবার হয়েছে। আলেম উলামাদের সাথে রাত জেগে ইলমী বাহাসে নিমগ্ন থাকা ছিল তাঁর অন্যতম নেশা।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের দাওয়াত সাধারণ মুসলমানদের কাছে পৌঁছে দিতে মাওলানা ইব্রাহীম (রহ.) বিভিন্ন মসজিদে কুরআনের দারস প্রদান করতেন। খিলগাঁও এলাকায় বসবাসের সুবাদে, তিনি ঐ এলাকার স্থানীয় মসজিদে পবিত্র কুরআনের তাফসীর শুরু করেন। এছাড়াও বাসাবো জামে মসজিদ, গোড়ান জামে মসজিদ, ঝিলপাড় জামে মসজিদ, খিলগাঁও প্রভাতীবাগ জামে মসজিদ ও মীরপুর মধ্য পাইকপাড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে পবিত্র কুরআনের তাফসির পেশ করেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও বিভিন্ন মাদরাসার বার্ষিক মাহফিলে, শবে কদরে, ঈদুল ফিতরে ও ঈদুল আযহার বয়ান করতেন। এভাবেই অধ্যাপক মাওলনা আবু নাঈম মো. ইব্রাহীম (রহ.) জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত ইসলামের প্রচার-প্রসারে এবং ইলমে দ্বীনের খেদমতে নিজের জীবন অতিবাহিত করেছেন। পাশাপাশি, মাওলানা ইব্রাহীম (রহ.) দাওয়াতে তাবলীগের মেহনতের সাথেও সংযুক্ত ছিলেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি দাওয়াতী জামাত নিয়ে গেছেন। তিনি প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার কাকরাইল মসজিদে বাদ মাগরিবের বয়ানে শরীক হতে চেষ্টা করতেন।

উল্লেখ্য যে, মাওলানা ইব্রাহীম (রহ.)-এর জন্মস্থান কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলার ফেন্নুয়া মোল্লা বাড়িটি ছিল শিক্ষা-দীক্ষায় অনন্য। এই বাড়ি থেকে অনেকেই সামাজিক ও জাতীয় পর্যায়ে অনেক অবদান রেখেছেন। বাংলাদেশের সাবেক পুলিশের মহাপরিদর্শক বিশিষ্ট কবি ও লেখক জনাব আবুল খায়ের মো. মুসলেহউদ্দীন সাহেব ছিলেন তাঁর ভাতিজা। মুসলেহউদ্দীন সাহেবের বাবাও ছিলেন সরকারি কলেজের একজন অধ্যাপক। তাঁর এক চাচাতো ভাই ছিলেন তিন তিনবার স্বর্ণপদক প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ ফয়জুর রহমান। তিনি ঢাকার অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। এছাড়াও তাঁর আরেক চাচাতো ভাই

Dhaka University Institutional Repository

জনাব মোহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ ছিলেন ঢাকার সরকারী ল্যাবরেটরি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁরা সকলেই দাওয়াতে তাবলীগের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে দ্বীনের খেতমত করেছেন।[৩৪৩]

অধ্যাপক মাওলানা আবু নাঈম মোহাম্মদ ইব্রাহীম (রহ.) সম্পর্কে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণের মতামত-

১। অধ্যাপক মাওলানা আবুল কালাম, সাবেক রেজিস্ট্রার বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা। তিনি বলেন, মাওলানা ইব্রাহীম (রহ.) ছিলেন একজন উঁচু মাপের আলেম ও মুত্তাবিউস সুন্নাহ। শিক্ষার ময়দানে তিনি ছিলেন একজন বিদগ্ধ গবেষক ও সফল শিক্ষক এবং আরবী ও ইসলামী শিক্ষার একজন মহান কারিগর। তিনি উচ্চমাধ্যমিক ও বি.এ. ক্লাসের পাঠ্যসূচি হিসেবে ইসলামিয়াত বই রচনা করেন। পারিবারিক জীবনেও তিনি ছিলেন একজন আদর্শবান বিচক্ষণ অভিভাবক। তিনি সামাজিকভাবে ইসলামীক তাহজিব-তামাদ্দুন প্রতিষ্ঠায় ঢাকার বিভিন্ন মসজিদে পবিত্র কুরআনের তাফসির পেশ করেন। তিনি ছিলেন খুবই মেধাবী। কুরআন-হাদীসের ব্যাপক জ্ঞান থাকায় সাধারণ ও শিক্ষিত মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে সহজে সক্ষম হতেন। দ্বীনী শিক্ষা প্রদানসহ ইসলামের প্রচার-প্রসারে আপোষহীন বিপ্লবী মুজাহীদের ভূমিকা পালন করেন।[৩৪৪]

২। আবুল হাসান বিন আবু নাঈম মো. ইব্রাহীম (রহ.), বলেন, বাবা ছিলেন একজন অত্যন্ত উঁচু মানের আলেম এবং উন্নতমানের ইসলাম প্রচারক ও সংস্কারক। তিনি ছিলেন একজন আদর্শবান শিক্ষক। শিক্ষাদানে তাঁর কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিল না। দিন-রাতের মধ্যে যখনই কেউ দীক্ষার জন্য আসতো তিনি শত ব্যস্ততার মধ্যেও তাদের দীক্ষা দিতেন। শ্রেণিকক্ষের বাইরেও ছাত্রদের পাঠদান করাতেন। তিনি ছিলেন একজন পরোপকারী। কেউ যে কোনো ব্যাপারে তাঁর নিকট আসলে তিনি তাঁকে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। আর্থিক সহযোগিতা ছাড়াও বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মানুরাগী। সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও পবিত্র কুরআনের তাফসির, তাওয়াতে তাবলীগ, ওয়াজ-মাহফিল ও বিভিন্ন দ্বীনী কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। তিনি ছিলেন আপোষহীন। অন্যায় কাজে তিনি কখনো মাথানত করতেন না। নিজের সাময়িক ক্ষতি হবে জেনেও সাহসিকতার সাথে সেগুলো মোকাবেলা করতেন। সে সময়ের অসাধারণ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন সামগ্রিকতা ও ভারসাম্যের এমন সমাহার, যার নজির সে সময়ে পাওয়া কঠিন ছিল। খোদামুখিতা, আল্লাহর প্রেমে বিভোরতা, সুন্নতের পূর্ণ অনুসরণ, উচ্চ মনোবল, ঈমানী দূরদর্শিতা ইত্যাদি ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট। সর্বোপরি পেশা জীবন, পারিবারিক জীবন, সাংগঠনিক জীবন সবক্ষেত্রেই তিনি এক সফল মানুষ ছিলেন।[৩৪৫]

৩। মাওলানা ওসমান বিন আবু নাঈম মো. ইব্রাহীম (রহ.), তিনি বলেন, আমার বাবা ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন ও সুন্নাতে রাসূলের একনিষ্ঠ অনুসারী। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সমাজের প্রতিটি স্তরে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন করার জন্য আজীবন সচেষ্ট ছিলেন। তিনি মুসলমানদেরকে সঠিকভাবে ইসলামের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন মসজিদে সাপ্তাহে একদিন তাফসির পেশ

---

[৩৪৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-৩৫।

[৩৪৪] গবেষকের ০৮.০১.২০১৭ তারিখে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার অনুযায়ী লিখিত।

[৩৪৫] গবেষকের ২৫.০১.২০১৭ তারিখে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার অনুযায়ী লিখিত।

Dhaka University Institutional Repository

করতেন। যার ফলে সমাজের বিভিন্ন অনৈসলামিক কার্যকলাপ সংস্কারের ক্ষেত্রে ব্যাপক সফলতা লাভ করে। তাছাড়া তিনি সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সাধারণ মানুষদেরকে ইসলামী তাহজিব-তামাদ্দুনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে সমাজ সংস্কারে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেন। তাঁর মাঝে দ্বীনের চেতনা পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। তিনি ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের দায়িত্ব অত্যন্ত সুনামের সহিত পালন করেন।[৩৪৬]

৪। মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, সহকারী অধ্যাপক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। তিনি বলেন, জনাব অধ্যাপক আবু নাঈম মোহাম্মদ ইব্রাহীম (রহ.) ছিলেন আমার নানা। সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য মাদরাসা শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষার উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন আমার নিকট খুব গুরুত্বপূর্ণ। সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা লাভ করা, জীবনে সফল হওয়া, সমাজে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা পাওয়া এবং মুসলিম হিসাবে নিজের জীবন ও পরিবার পরিচালনার জন্য কতটা পরিশ্রম, ধৈর্য, সাহসিকতা ও দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিয়েছেন তা বোঝার জন্য অধ্যাপক ইব্রাহীমের মত ব্যক্তিদের জীবন ভালোভাবে উপলব্ধি করা আমাদের সকলের জন্যই গুরুত্ব বহন করে।

মাদরাসা শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেও সমাজ প্রতিষ্ঠায় জাতীয় পর্যায়ে অবদান রাখার ক্ষেত্রে তেমন কোনো মূল্য ছিল না। তাই, অধ্যাপক ইব্রাহীম (রহ.) মূলধারার সাধারণ শিক্ষায় নিজেকে সম্পৃক্ত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে অভাবনীয় সাফল্য দেখিয়ে দেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে স্বর্ণপদক লাভ করে তাঁর মেধার স্বীকৃতি আদায় করে নেন। কতটা ধৈর্য, আগ্রহ এবং চেষ্টা থাকলে গ্রামের একটা সাধারণ শিক্ষার্থী মাদরাসার শিক্ষা থেকে সাধারণ শিক্ষায় সর্বোচ্চ সফলতা লাভ করতে পারেন তা তাঁর জীবনী থেকে আমরা লক্ষ্য করতে পারি। তিনি দেশের বিভিন্ন কলেজে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। এছাড়াও তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে কুরআন-হাদীস ও আরবী সাহিত্য বিষয়ের অধ্যাপনা করেন এবং ঢাকার বহু মসজিদে সাধারণ মানুষদের মাঝে কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান বিতরণ করেন। বই লিখেন। দ্বীন ইসলামের খেদমতে নিজের সামর্থের সবটুকু বিলিয়ে দেন। তাঁর এ সকল অবদান ছিল সমাজ গঠনে অনুকরণীয়।

আমাদের দুই প্রজন্ম আগে জনাব অধ্যাপক ইব্রাহীম (রহ.)-এর মত আলেম সমাজ নিজেদের জীবন, পরিবার ও সমাজে তাঁদের অর্জিত ইসলামী জ্ঞানের প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য যে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, যে পরিমাণ সংগ্রাম, সাধনা, পরিশ্রম ও কুরবানী করেছেন বর্তমান প্রজন্মে প্রায় অনুপস্থিত। অধ্যাপক ইবরাহীম (রহ.)-এর জীবন-ইতিহাস আমাদেরকে সেই অনুপ্রেরণাই যোগায়।[৩৪৭]

---

[৩৪৬] গবেষকের ১০.০২.২০১৭ তারিখে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার অনুযায়ী লিখিত।

[৩৪৭] গবেষকের ১৮.০২.২০১৭ তারিখে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার অনুযায়ী লিখিত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-১.১৪ : প্রিন্সিপাল মাওলানা আবুলাইচ মো. সফিকুল আলম

প্রিন্সিপাল মাওলানা আবুলাইচ মো. সফিকুল আলম ছিলেন ইলমে দ্বীনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং যুগশ্রেষ্ঠ সমাজসেবক। তাঁর ইল্‌ম শুধুমাত্র পুঁথিগত নয় বরং সমাজের সকল স্তরের মানুষ তাঁর থেকে ব্যাপক উপকৃত হয়েছে। তিনি যেমন ছিলেন ইলমে দ্বীনের ধারক-বাহক তেমনিভাবে সমাজ সংস্কারেও ব্যাপক অবদান রাখেন। তিনি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত চিলুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব মৌলভী আব্দুর গফুর, ও মাতার নাম মোসাম্মৎ জরিনা বেগম। প্রাথমিক শিক্ষার হাতে খড়ি হয় পিতা মৌলভী আব্দুল গফুরের নিকট। এরপর তাঁর পিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিজ বাড়িতে অবস্থিত চিলুয়া ইসলামীয়া মাদরাসায় পীরে কামেল মাওলানা নুরুজ্জামান সাহেবের নিকট কুরআনে মাজিদের প্রাথমিক শিক্ষা, উর্দু, আরবী এবং ফার্সীসহ জামাতে নাহবমীর পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সহিত লেখাপড়া করেন। তিনি ছিলেন খুবই মেধাবী। যার কারণে ওস্তাদগণ তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং পড়ালেখার প্রতি বিশেষ নজর দিতেন। এছাড়াও তাঁর প্রাথমিক ওস্তাদ ছিলেন খরখরিয়া গ্রামের মাওলানা আবদুল আউয়াল (রহ.)। তিনিও তাঁর মেধার প্রতি লক্ষ্য করে তাঁকে পড়ালেখার প্রতি বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। চিলুয়া মাদরসায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে পরবর্তীতে বরুড়া দারুল উলূম মাদরাসায় হেদায়াতুন্নাহু জামাতে ভর্তি হন। সেখানে বিজ্ঞ আলেমদের নিকট হেদায়াতুন্নাহু এবং নাহু সরফের গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসহ অন্যান্য কিতাবসমূহ পড়ালেখা করেন। তখন অত্র মাদরাসায় উল্লেখযোগ্য ওস্তাদ ছিলেন মাওলানা ফুরবান আলী (রহ.), মাওলানা নোয়াব আলী (রহ.), মাওলানা ইয়াছিন (রহ.)। অতঃপর তিনি চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসায় কাফিয়া জামাতে ভর্তি হন। অত্র মাদরাসায় তিনি কাফিয়া জামাত থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি ফুনুনাত পর্যন্ত অত্যন্ত সুখ্যাত্তির সহিত পড়ালেখা করেন। তখন অত্র মাদরাসার মুহতামিম ছিলেন মাওলানা আবদুল ওয়াহাব (রহ.)। তিনি ফুনুনাতের কিতাবসমূহ পড়েছেন শায়েখুল হাদীস মাওলানা আবদুল কাইয়ূম (রহ.)-এর নিকট এবং আদবের কিতাবসমূহ পড়েছেন শায়খুল আদীব মাওলানা নজীর আহাম্মদ (রহ.)-এর নিকট। এছাড়াও অত্র মাদরাসা তাঁর উল্লেখযোগ্য ওস্তাদ ছিলেন মাওলানা আবুল হাসানাত। যিনি মেশকাত শরীফের উর্দু শরাহ তানজীমুল আশতাত লেখেছেন। আর তাফসীর পড়েছেন মাওলানা হাফেজ আহম্মদ (রহ.)-এর নিকট এবং বর্তমান মুহতামিম জনাব আল্লামা শফী সাহেবের নিকট মাইবুজী পড়েছেন। পরবর্তীতে তিনি আলিয়া নেছাবে চাঁদপুর জেলার শাহারাস্তী জেলায় অন্তর্গত ভুলদীঘি কামিল মাদরাসা থেকে আলিম পরীক্ষা অংশগ্রহণ করে অত্যন্ত সুনামের সহিত পাশ করেন। এরপর ফাযেল পাশ করেন কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত মনোহরগঞ্জ উপজেলার বিজরা নাজিরিয়া ফাযেল মাদরাসা থেকে। এরপর আলিয়া নেছাবের সর্বোচ্চ ডিগ্রি কামিল ফিকহের উপরে অধ্যয়ন করেন ঢাকা আলিয়া মাদরাসা থেকে এবং ডিপ্লোমা-ইন-উর্দূ আদীব এবং আদিবে কামিল ঢাকা আলিয়া মাদরাসা থেকে মেধাতালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করে বিশেষ ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর কামিল হাদীসের উপর বিশেষ ডিগ্রি অর্জন করেন চট্টগ্রাম পাসলাইশ ওয়াজদিয়া আলিয়া মাদরাসা থেকে। পরবর্তীতে শিক্ষকতা অবস্থায় কামিল আদিবের উপর সোনাকান্দা কামিল মাদরাসা থেকে পরীক্ষা দিয়ে লেটার মার্কস নিয়ে প্রথম বিভাগে

Dhaka University Institutional Repository

উত্তীর্ণ হন। অর্থাৎ তিনি আলিয়া নেছাবে কামিল ফিকহ, হাদীস আরবী আদব, উর্দূ আদবের উপর অত্যন্ত সুনামের সহিত সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি মাওলানা সাইয়েদ আসআদ মাদানী (রহ.)-এর নিকট বাইআত গ্রহণ করেন এবং উজানী পীর মাওলানা মোবারক করীম সাহেবও তাঁকে বিশেষভাবে বাইআত গ্রহণ করান। তাছাড়া ফেনুয়ার হযরত পীরে কামেল মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাহেবও তাঁর বিশেষ মুরুব্বি ছিলেন। তিনি ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র হজ্জ সম্পাদন করেন। তিনি মনোহরগঞ্জ উপজেলার উত্তর ফেনুয়া নিবাসী পীরে কামেল মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন (রহ.)-এর বড় ভাই মাওলানা আব্দুর রশিদ (রহ.)-এর তৃতীয় কন্যা মোসাম্মৎ মাকসুদা বেগমকে বিবাহ করেন। তাঁর ঔরসে এক ছেলে ও চার মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলের নাম মুহাম্মদ আমীমুল এহসান (ডাক নাম জসীম উদ্দিন) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পিএইচ.ডি গবেষণারত। খণ্ডকালীন প্রভাষক সাউর্থ ইষ্ট ইউনিভার্সিটি এবং আরবী প্রভাষক নয়াটোলা এ.ইউ.এন.মডেল কামিল মাদরাসা, ঢাকা। আর মেয়েরা হলেন (১) মোসা. নাজমা আক্তার, স্বামী-মাওলানা ইসমাইল হোসাইন, প্রিন্সিপাল নরহরিপুর ফাযেল মাদরাসা, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা। (২) মোসা. নাসরিন আক্তার, স্বামী-মাওলানা ফয়েজ উল্লাহ, সাবেক শিক্ষক জামিয়া আারাবিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা। (৩) মোসা. উম্মে কুলসুম, স্বামী-মুফতী মাওলানা ফরিদ আহম্মাদ, সাবেক মুহাদ্দেস, উজানী মাদরাসা, চাঁদপুর। (৪) মোসা. শিরিন আক্তার, স্বামী- মুফতী মাওলানা জাবের আহম্মাদ, মুহাদ্দেস, জামিয়া কারিমিয়া আরাবিয়া রামপুরা, ঢাকা।[৩৪৮]

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা সফিকুল আলম সাহেবের অবদান-

মাওলানা আবুলাইচ মো. সফিকুল আলম শিক্ষা জীবন শেষ করে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম ঢাকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এণ্ড কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেন। তিনি অত্র প্রতিষ্ঠানে উর্দূ, আরবী ও ইসলামীয়াত বিষয়ের বিভাগীয় প্রধান হিসাবে অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সহিত দায়িত্ব পালন করেন এবং অত্র প্রতিষ্ঠানে অবস্থিত জামে মসজিদের জুমার খতিবের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা যুদ্ধ আরম্ভ হলে তিনি পিতা-মাতার অনুরোধে গ্রামে বাড়িতে চলে আসেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি নিজ এলাকায় পার্শ্ববর্তী চিতোষী সুলতানিয়া সিনিয়র ফাযেল মাদরাসা আরবী প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন এবং দীর্ঘ ১৮ বৎসর পর্যন্ত উক্ত পদে অত্যন্ত দক্ষতার ও সুনামের সহিত ইলমে দ্বীনের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তিনি উক্ত মাদরাসায় বিশেষ করে তাফসীরে জালালাইন, হেদায়াহ, আরবী সাহিত্য, মেশকাত শরীফসহ উল্লেখযোগ্য কিতাবসমূহের অধ্যাপনায় দায়িত্ব পালন করেন। অত্র মাদরাসায় তার বহু যোগ্য ছাত্র বাংলাদেশের বিভিন্ন মাদরাসায় মুহাদ্দেস, আদিব, ফকিহ ও প্রিন্সিপালসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে কর্মরত আছেন। অত্র মাদরাসায় শিক্ষকতা কালীন সময় তিনি চট্টগ্রাম বিভাগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসাবে পরপর তিন বার প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব রফিকুল ইসলাম সাহেবের হাত থেকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের সনদ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ২০০৪

---

[৩৪৮] মুহাম্মদ আমীমুল এহসান, মো. হেলালুজ্জামান, (প্রিন্সিপাল মাওলানা আবুলাইচ মো. সফিকুল আলম জীবন ও কর্ম, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ১-১০ (অপ্রকাশিত)।

Dhaka University Institutional Repository

খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলার লালচাঁদপুরে আজহারিয়া ফাজেল মাদরাসায় প্রিন্সিপাল হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সহিত দ্বীনের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন এবং মাদরাসা সংলগ্ন এলাকায় সমাজিক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে সমাজ উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। তাছাড়া তৎকালীন বি.এন.পির এমপি জনাব কর্নেল (অব.) আনোয়ারুল আজীম ছিলেন তাঁর একান্ত ভক্ত। তিনি এমপি মহোদয়কে যখন যা বলতেন তা অতি উৎসাহিত ও আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকতেন। তিনি অত্র মাদরাসার অধ্যক্ষ থাকাকালীন মাদরাসার লেখাপড়ায় ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয় এবং পড়ালেখার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্ম পদ্ধতি অবলম্বনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। আর মাদরাসায় একটি নতুন বিল্ডিং নির্মাণ করে নতুন উদ্যমে পড়ালেখার পরিবেশ তৈরি করে এলাকার মানুষের মাঝে দ্বীনী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হন। যার কারণে এলাকার সাধারণ মানুষ বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নে এবং সমাজিক কর্মকাণ্ডে তাঁর নিকট পরামর্শ ও সহযোগিতার জন্য আসতো। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বের কারণে কোন মানুষ তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কখনো কোনো কথা বলতো না। যে কোনো বিষয়ে তাঁর সমাধানকেই সুষ্ঠু সমাধান বলে মনে করতো। এলাকার বড় বড় মামলা মোকাদ্দমা ও সামাজিক অপরাধ সমাধানের জন্য সকলেই তাঁর নিকট আসতো। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত তা সহজেই সমাধান করতে চেষ্টা করতেন। তাছাড়া তিনি স্বাধীনতার পর থেকে ২০১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলার ১ নং বাইশা গাঁও ইউনিয়ন এবং ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণ ঝলম ইউনিয়নের কাজীর দায়িত্ব অত্যন্ত সুনামের সহিত পালন করে এলাকার জনগণের খেদমত করেন। লাকসাম মনোহরগঞ্জের রাজনৈতিক নেতৃত্ববর্গ তাঁর সাথে এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সুপরামর্শ নিতেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন, জনাব নুরুল রহমান (সাবেক এম.পি), জনাব ডা. রফিকুল ইসলাম, (সাবেক এম.পি), জনাব ওমর আহাম্মদ (সাবেক এম.পি), জনাব এটি.এম আলমগীর হোসেন (সাবেক এম.পি) ও জনাব কর্নেল (অব.) আনোরুল আজীম (সাবেক এম.পি) মহোদয়সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও লাকসামের জনাব চাঁন মিয়া সাহেব ও তাঁর ছোট ভাই বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের জনপ্রিয় নেতা জনাব সুরুজ মিয়া এবং সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব সাইফুল ইসলাম হিরু সাহেবও এলাকার উন্নয়নে বিভিন্ন প্রোগ্রামে তাঁর বাড়িতে অবস্থান করতেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ মান্দার উচ্চ বিদ্যালয় ও বুরপূষ্ঠ উচ্চবিদ্যালয়ের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। উক্ত বিদ্যালয়সমূহের সভাপতি থাকাকালীন সময়ে বিদ্যালয়ের বড় বড় বিল্ডিংগুলো তখনই নির্মাণ হয়। তাছাড়া দাদঘর মাদরাসার দাখিল মাদরাসা পরিচলানা কমিটির সদস্য হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন এবং ঐতিহ্যবাহী চিলুয়া ইসলামীয়া দারুল উলূম মাদরাসার বহুদিন সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। চিলুয়া মাদরাসায় সেক্রেটারির দায়িত্ব পালনকালীন তখন মাদরাসার বিল্ডিংটি নির্মাণ করা হয়। মাদরাসার দীঘিটিও তখন খনন করা হয় এবং মাদরাসার মাঠটিও ভরাট করা হয়। তাছাড়া চিলুয়া ইসলামীয়া মাদরাসার বিভিন্ন উন্নয়নে তাঁর ব্যাপক অবদান রয়েছে। তিনি বহু বছর যাবৎ চিলুয়া মাদরাসার ঈদগাহের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দীর্ঘদিন বাংলাদেশ রেডিওতে শরীয়তের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ কুরআন-হাদীসের আলোকে ইসলামের প্রচার-প্রসারে সচেষ্ট ছিলেন। তখন তাঁর সাথে মাওলানা আমিনুল ইসলাম সাহেবও বহু প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। তিনি কিছু দিন সাবেক প্রেসিডেন্ট মেজর জিয়াউর রহমান সাহেবের আমলে লাকসাম-মনোহরগঞ্জ থানার বি.এন.পির সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেবের আমলে যাঁদের নেতৃত্বে লাকসাম নওয়াব ফয়জুন্নেছা ছালতাতলী খাল খনন করা হয় তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। পরবর্তী সময়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার

Dhaka University Institutional Repository

আমলেও যাঁদের নেতৃত্বে নদনা খাল সংস্কার করা হয় তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এলাকার কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে অত্র সংস্কার কাজগুলো চাষাবাদের ব্যবস্থার জন্য ব্যাপক অবদান রেখে আসছে। এছাড়াও সে সময় এম.পি. নুর রহমান সাহেবের সাথে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে এবং এলাকার রাস্তাঘাট উন্নয়ন কর্মকাণ্ডেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় লাকসাম-মনোহরগঞ্জ অঞ্চলে বহু প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।[৩৪৯]

মাওলানা আবুলাইচ মো. শফিকুল আলম সাহেবের দানশীলতাও ছিলো উল্লেখযোগ্য। তিনি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলার ১নং বাইশগাঁও ইউনিয়নের ইউনিয়ন কমপ্লেক্সটি নির্মাণের জন্য ৪৯ শতক জমি বিনামূল্যে দান করেন। যা বর্তমানে চিলুয়া গ্রাম সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত। এতে এলাকার সাধারণ জনগণ ব্যাপকভাবে উপকৃত হচ্ছে। আর মনোহরগঞ্জ উপজেলা হতে বুরপৃষ্ট বাজার হয়ে হাসনাবাদ বাজার পর্যন্ত রাস্তাটি সাবেক রাষ্ট্রপতি মেজর জিয়াউর রহমান সাহেবের আমলে তাঁর প্রচেষ্টার ফলে রাস্তাটি নির্মাণ করা হয়। এছাড়াও তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ চিলুয়া মাদরাসা মসজিদের খতীবের দায়িত্ব ও পালন করেন। এলাকার সর্বস্তরের মানুষ তাঁকে খুবই পছন্দ করতেন এবং আন্তরিকভাবে ভালোবাসতেন। এলাকার সাধারণ জনগণ সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁর থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং তিনিও তা সমাধানের চেষ্টা করতেন। এতে সাধারণ জনগণ বেশ উপকৃত হতো। মূলত এই সকল অবদান তাঁর যোগ্য নেতৃত্বের কারণেই হয়েছে। সামাজিক বিভিন্ন উন্নয়নে ও সংস্কারে তাঁর ভূমিকা বাস্তবিকভাবেই প্রশংসনীয়। এটা ছিলো মহান আল্লাহরই অনুগ্রহ। তিনি যাঁকে ইচ্ছা তাঁকে দান করেন। বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলেমগণের মধ্যে বিভিন্নভাবে সমাজ উন্নয়নে অবদানের জন্য যে কয়জন মনীষীকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করা যায়- প্রিন্সিপাল মাওলানা আবুলাইচ মো. শফিকুল আলম সাহেবকেও তাঁদেরই একজন হিসেবে পরিগণিত করা যায়।[৩৫০]

---

৩৪৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-৩০।

৩৫০ সাক্ষাতকারসূত্রে প্রাপ্ত তথ্য, তারিখ : ১৬.১২.২০১৬ খ্রি., মাওলানা ইসমাইল হোসাইন, প্রিন্সিপাল নরহরিপুর ফাযেল মাদরাসা, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-২ : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আলেমগণ

পরিচ্ছেদ-২.১ : ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.) (১৮৯৬-১৯৬৭ খ্রি.)

তিনি আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে যারা আজীবন সংগ্রাম করেছেন এবং প্রতিষ্ঠা করেছেন অনেক মাদ্‌রাসা, মক্তব ও মসজিদ। যাঁদের উদ্ভাবনীমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সমাজ সংস্কার, আরবী ও ইসলামী শিক্ষার যে উন্নতি সাধিত হয়েছে যা বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা কারিকুলামের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন[৩৫১] তাঁদের অন্যতম হলেন- ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.)।

তাঁর মূল নাম তাজুল ইসলাম। পিতার নাম মাওলানা আনোয়ার আলি ও মাতার নাম মুতিয়ারা বেগম। তিনি ১৩১৫ হিজরি মোতাবেক ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার ভুবন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

দশ বছর বয়সে প্রথমে তাঁকে নিজ গ্রাম ভুবন-এর পার্শ্ববর্তী এক স্কুলে ভর্তি করানো হয়। মাত্র নয় মাসে তিনি ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত সব বই আত্মস্থ করে ফেলেন। তাঁর এ বিস্ময়কর মেধার পরিচয় পেয়ে তাঁর পিতা তাঁকে মাদ্‌রাসায় ভর্তি করানোর সিদ্ধান্ত নেন। সে মোতাবেক তিনি তাঁকে ব্রাক্ষণবাড়িয়া জেলার উপকন্ঠে অবস্থিত শ্রীঘর মাদ্‌রাসায় ভর্তি করিয়ে দেন। এখানে কিছুকাল পড়াশোনা করার পর তিনি সিলেটের বর্তমান হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল কাসিমুল উলুম মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এ মাদ্‌রাসায় তিনি কয়েক বছর অধ্যয়ন করেন।[৩৫২] সে সময় এ মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন আল্লামা শাহ আবুল হাশিম (রহ.)।[৩৫৩]

বাহুবল মাদ্‌রাসা থেকে যথাসময়ে সুনামের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে মাওলানা সাহেব তদানীন্তন বাংলা-আসামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্‌রাসা আলিয়ায় সিলেটে ভর্তি হন। ১৩৩৭-৩৮ হিজরি মোতাবেক ১৯১৯-২০ খ্রিস্টাব্দে ফাযেল ফাইনাল পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন।[৩৫৪]

সে সময় সিলেট আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রধান মুহাদ্দিস ছিলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন দারুল উলূম দেওবন্দের প্রাক্তন মুফতী আল্লামা সহুল উসমানি ভাগলপুরি (রহ.)।

অধুনালুপ্ত দৈনিক নাজাত পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা কারী আব্দুস শহিদ (রহ.) ছিলেন সিলেটের একজন প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব। ফখরে বাঙ্গাল তাজুল ইসলামের পরে তিনি সিলেট আলিয়া মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি বলেন, "মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.)-এর পরীক্ষার খাতা একেবারে নির্ভুল ও বিশুদ্ধ হতো। তিনি চমৎকার শব্দমালা ব্যবহার করতেন। তাঁর উত্তরপত্রে ভুল-ভ্রান্তি এমনকি কাটাছেঁড়া পর্যন্ত থাকতো না। আমাদের উস্তাদেরা তাঁর [পরীক্ষার] খাতাগুলো সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন। তাঁরা আমাদেরকে তা প্রায়ই দেখাতেন। এগুলো দেখিয়ে সুন্দরভাবে লেখাপড়া করতে উদ্বুদ্ধ করতেন।"[৩৫৫]

---

[৩৫১] মুহাম্মদ উল্লাহ মজুমদার, "বাংলাদেশের শিক্ষা বিস্তারে কুমিল্লা জেলায় বিদ্যোৎসাহী সমাজ:১৯০৫-১৯৪৭" শীর্ষক পিএইচডি থিসিস (কুষ্টিয়া : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫ খ্রি.), অপ্রকাশিত, পৃ. ৪০।

[৩৫২] হাফিয মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, ফখরে বাঙ্গাল আল্লামা তাজুল ইসলাম ও সাথীবর্গ (ঢাকা: ই.ফা.বা., ২০০৪খ্রি.), পৃ. ১৬-১৭।

[৩৫৩] নাসীম আরাফাত, বাংলার হিরে-মতি-পান্না-২ (খিলগাঁও, ঢাকা: ২০০৪, আল-হুদা ইসলামীক ফাউন্ডেশন,) পৃ. ২২।

[৩৫৪] জুলফিকার আহমদ কিসমতী, বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ, (ঢাকা: ই.ফা. বা., ২০০৫খ্রি.),পৃ. ৩৫৯।

[৩৫৫] নাসীম আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৩৩৮ হিজরি মোতাবেক ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিশ্ববিখ্যাত দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন[৩৫৬]। এখানে তিনি মোট চার বছর পড়াশোনা করেন। দারুল উলুমে তিনি হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, আকাইদ ও আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। এখানে শিক্ষাজীবনে তাঁর বিস্ময়কর মেধাশক্তির বিকাশ ঘটেছিল। এখানে প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি সর্বোচ্চ নম্বর পেতেন। এ সময় তিনি সনদসহ অসংখ্য হাদীস ও ফিকহের বিখ্যাত গ্রন্থ আল-হিদায়া সম্পূর্ণ মুখস্থ করেন।[৩৫৭] দেওবন্দে তাঁর পৃষ্ঠাপোষক ও বিশেষ শিক্ষক ছিলেন তদানীন্তন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম যুগের ইমামখ্যাত আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) (১৮৭৫-১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ)[৩৫৮]। এছাড়াও তিনি শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানি (রহ.) (১৮৮৭-১৯৪৯ খ্রি.)[৩৫৯], মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহ.) (১৮৫১-১৯২১ খ্রি.)[৩৬০] আল্লামা ইব্রাহীম বলইয়াবি (রহ.) (১২৫৬-১৩৩৮ হি.)[৩৬১] সহ যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ওলামার কাছে জ্ঞান অর্জন করেন।[৩৬২]

---

৩৫৬ দারুল উলূম দেওবন্দ- ভারতের সাহারানপুর জেলার অন্তর্গত দেওবন্দ একটি উপজেলা পর্যায়ের শহরের নাম। বর্তমানে ভারতের ইউ. পি প্রদেশে অবস্থিত। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ভারত বর্ষের দিল্লীর মারাকাযী মাদ্‌রাসার পতন ও সর্বত্র ইংরেজ আধিপত্যের পর দারুল উলূম দেওবন্দ মাদারসার সূচনা হয়। দেওবন্দের দেওয়ান মহল্লায় কাছেম নানুতবী (রহ.)-এর শশুরালয় অবস্থিত। তাঁর কাঙ্খিত স্বপ্ন ইলম নববীকে বাস্তবায়নের জন্য হাজী আবিদ হোসাইনসহ স্থানীয় বুযুর্গগণকে তিনি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেন। নানুতবী (রহ.)-এর পরামর্শ অনুযারী ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে ৩০ শে মে, বুধবার ছাত্তা মসজিদের বারান্দায় একটি ডালিম গাছের নিচে মোল্লা মাহমুদ সাহেব তাঁর সর্বপ্রথম ছাত্র শায়েখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান (রহ.)-কে সামনে নিয়ে দারুল উলূমের সর্বপ্রথম সবক উদ্বোধন করেন। মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী (রহ.)-কে সর্বপ্রথম সদ্‌রুল মুদাররিস নিযুক্ত করা হয়। হাজি আবিদ হোসাইন প্রমুখের সক্রিয় সহযোগিতায় দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। হাজী আবিদ হোসাইন ছিলেন সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিন। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে মাদ্‌রাসাকে দেওবন্দে জামে মসজিদে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে নানুতবী (রহ.)-এর ইলহাম অনুযায়ী ছাত্তা মসজিদ সংলগ্ন একটি প্রশস্ত জায়গা খরিদ করা হয় এবং ঐ স্থানে বর্তমানের মূল মাদ্‌রাসা ভবন ভিত্তি স্থাপন করা হয়। ভিত্তি স্থাপন করেন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মাওলানা আহমদ আলী সাহরানপুরী (রহ.)। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা ইয়াকুব সাহেবের প্রস্তাব ক্রমে দেওবন্দ আরবী মাদ্‌রাসাকে 'দারুল উলূম দেওবন্দ' নামকরন করা হয়। বর্তমান দারুল উলূম দেওবন্দ-এর মুহতামীম হলেন, মাওলানা আবুল কাসেম নো'মানী (দা.) (মাওলানা মুশতাক আহমদ, তাহরীকে দেওবন্দ, (ঢাকা: শান্তিধারা প্রকাশনী, ১৯৯২খ্রি.), পৃ. ৯৯-১০১)।

৩৫৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১।

৩৫৮ আল্লামা সাইয়েদ আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (রহ.) - ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কাশমীরের সাইয়েদ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা মোহাম্মদ মোয়াজ্জম শাহ্। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন বাগদাদের অধিবাসী। পরবর্তীতে তিনি ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীরির থেকে দারুল উলূম দেওবন্দে আগমন করেন। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে হতে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত দারুল উলূমের শায়েখূল হাদীস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ৬০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। দেওবন্দের ঈদগাহের পার্শ্বেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। (তাহরীকে দেওবন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩-১৫৬)।

৩৫৯ আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.) - ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে বিজনৌরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ফযলুর রহমান উসমানী। তাঁর পিতা দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে একজন। বংশগত দিক থেকে তিনি ছিলেন উসমান (রা.)-এর বংশধর। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে দারুল উলূমের শিক্ষক হিসেবে মনোনীত হন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১৪ই আগষ্ট স্বাধীন পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা তিনিই সর্বপ্রথম উত্তোলন করেন এবং নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংবিধান রচনা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ভাওয়ালপুর আব্বাসিয়া ইউনির্ভাসিটির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। করাচীর মোহাম্মদ আলী রোড সন্নিকটে তাঁকে দাফন করা হয়। (তাহরীকে দেওবন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯-১৬২)।

৩৬০ আমীরুল মোজাহিদীন শায়েখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান (রহ.) - ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে দেওবন্দের উসমানী খান্দানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা জুলফিকার আলী। তাঁরা ছিলেন উসমান (রা.) এর বংশধর। তিনি ভারত স্বাধীনতার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করেছিলেন। তিনি ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে দারুল উলূমের সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে দস্তারে ফযীলত প্রদান করা হয়। তিনি ১৩৩৩ হিজরি সাল পর্যন্ত দেওবন্দ অবস্থান করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করেন। মাল্টা কারাগারে প্রায় তিন বছর পর্যন্ত কারাবরণ করেন। অতঃপর ১৯২০খ্রিস্টাব্দে ৮ জুন মুক্তি লাভ করেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে সভাপতি নির্বাচন পূর্বক জমিয়তে উলামা গঠন করেন। এ মহান ব্যক্তি ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ৮ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। (তাহরীকে দেওবন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪-১৫০)।

Dhaka University Institutional Repository

একবার আল্লামা তাজুল ইসলাম (রহ.) দারুল উলূম দেওবন্দের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন, দারুল উলুমের এক শিক্ষক পড়াশোনায় আমার একাগ্রতা ও তন্ময়তা দেখে অত্যন্ত বিস্ময়াভিভূত হয়ে একদিন তিনি আমাকে ডেকে বললেন: 'আয় তাজুল ইসলাম, সহি বাতাও, তুম ইনসান হো, ইয়া জিন? আমি তখন বিনয়ের সাথে বললাম: হযরত, খোদা কী কসম, ম্যায় জিন নেহী, ম্যায় ইনসান হোঁ।'[৩৬৩] দারুল উলূম দেওবন্দে শরীয়তের ইল্‌ম অর্জন সমাপ্ত করে তিনি হোসাইন আহমদ মাদানি (রহ.) (১৮৭৯-১৯৫৭খ্রি.)[৩৬৪] এর কাছে মারেফাতের ইল্‌ম অর্জনের দীক্ষা নেন। এ জন্য তিনি তাঁর কাছে যথারীতি বায়াত হন।

লেখাপড়া শেষে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে বিদায়ের প্রাক্কালে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) আক্ষেপ করে বলেন, 'তোমার পিতার জোরালো নির্দেশ না থাকলে আমি তোমাকে দেওবন্দেই রেখে দিতাম।' এরপর তিনি বলেন: 'হায়! আজ দারুল উলুমের ইলমের ভাণ্ডার তাজুল ইসলামের সাথে বাংলায় চলে যাচ্ছে।'[৩৬৫]

মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.) পাঁচ ভাই ও এক বোনের মধ্যে সবার বড় ছিলেন। তিনি উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ কিরাআত বিশেষজ্ঞ ও বাংলাদেশে ইল্‌মুল কিরাআতের প্রবর্তক উজানীর মাওলানা ক্বারী ইবরাহিম (রহ.) (১৮৬৩-১৯৪৩খ্রি.)[৩৬৬]-এর তৃতীয় কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। এ স্ত্রী থেকে তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। প্রথম সন্তান ফাতেমাকে বিয়ে দেন চাঁদপুর এলাকার মাওলানা মুদদাসসির (রহ.)-এর সঙ্গে। তাঁর বড় ছেলের নাম আব্দুল্লাহ (মৃত: ২০০৭খ্রি.)। তিনি মজ্জুব প্রকৃতির লোক ছিলেন। দ্বিতীয় ছেলের নাম হাফেজ হাবিবুল্লাহ। প্রথম স্ত্রীর ইন্তেকালের পর তিনি সরাইল উপজেলার দেওরা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। এ স্ত্রী থেকে

---

৩৬১ আল্লামা ইব্রাহীম বলিয়াভী (রহ.) - তিনি ১২৫৬ হি. মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দ-এর সদরুল মুদাররিসীন ও প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস। দারুল উলূম দেওবন্দ এর শিক্ষকগণের মাঝে তিনি ছিলেন অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। তাফসীর, হাদীস, আদব এর শিক্ষা দান পদ্ধতি ছিল খুবই চমৎকার। এ ছাড়াও তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ট যুক্তিবিদ। এ মহান মনীষী ১৩৩৮ হিজরির রমজান মাসে ইন্তেকাল করেন। (সাইয়েদ মাহবুব রিজভী, তারিখে দারুল উলূম দেওবন্দ, ১ম খণ্ড (উর্দু), (ভারত : দারুল উলূম দেওবন্দ, ১৯৯২খ্রি.), পৃ. ৩৯৪।)

৩৬২ দৈনিক আজাদ, ২১ ও ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩ বাংলা।

৩৬৩ নাসীম আরাফাত, বাংলার হিরে-মতি-পান্না-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

৩৬৪ শায়েখুল ইসলাম সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) - তিনি ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে শাওয়াল ফয়েজাবাদ জেলার টান্ডায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম- সাইয়েদ হাবীবুল্লাহ। তাঁর পিতা ও মাতা উভয় দিক থেকেই ইমাম হোসাইন (রা.) এর বংশধর ছিলেন। তিনি দীর্ঘ ১৮ বছর পর্যন্ত মসজিদে নববীর মধ্যে হাদীসের অধ্যাপনা ও তা'লীম প্রদান করেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ফলে মাল্টার কারাবরণ করতে হয়েছে এবং মুক্তির পর তিনি ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। অতঃপর দারুল উলূম দেওবন্দের ছদরুল মুদাররিসীন হিসেবে মনোনীত হন। শেষ জীবন পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করেন। শায়েখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর আজাদী আন্দোলনের আমীর নিযুক্ত হন। যুগশ্রেষ্ট এই মনীষী ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর ইন্তেকাল করেন। (তারীখে দেওবন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬-১৫৯)।

৩৬৫ নাসীম আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

৩৬৬ মাওলানা ক্বারী ইবরাহীম (রহ.) : তিনি নোয়াখালী জেলায় সুদারামপুর উপজেলার নলুয়া গ্রামে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম পানাহ মিয়া। তাঁর পিতা তৎকালীন জমিদার ছিলেন। ক্বারী ইবরাহীম (রহ.) মক্কার সওলাতিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে সুপ্রসিদ্ব ক্বারী বরকুমুস (রহ.)-এর নিকট ইল্‌ম ক্বিরাত এর সনদ প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি একই মাদ্‌রাসায় ইল্‌ম ক্বিরাতের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। দীর্ঘ ১০ বছর সেখানে শিক্ষকতা করেন। তিনি বাংলাদেশের ইল্‌ম ক্বিরাতের জনক ও যুগ প্রবর্তক আলেম ছিলেন। বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা রশিদ আহম্মদ গাঙ্গুহি (রহ.)-এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে চাঁদপুর জেলার উজানির বাড়িতে ইন্তেকাল করেন। (হিফজুর রহমান, নামায়েন্দে কুমিল্লা, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪)।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। প্রথম ছেলের নাম হাফেজ ইমদাদুল্লাহ, আর দ্বিতীয় ছেলের নাম হাফেজ ওয়ালি উল্লাহ। মেয়ের নাম নাসিমা খাতুন।[৩৬৭]

আলেমগণ শিক্ষা সমাপনান্তে নিজ দেশে ফিরে এসে দ্বীনী ইলমের খেদমত ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাকে নিজের দায়িত্ব বলে মনে করতেন। "১৯৫০ এর দশকে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী ও চিফ সেক্রেটারি এম এন খাঁন ফখরে বাঙ্গালকে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার সদরুল মুদাররিসিন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছিলেন।"[৩৬৮] এছাড়াও অনেক বড় বড় চাকরির প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু সেগুলো প্রত্যাখ্যান করে তিনি আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

১৩৪২ হিজরিতে দেওবন্দ থেকে ফিরে এসে তিনি প্রথমে ঢাকায় এবং পরে কুমিল্লাস্থ জামিয়া মিল্লিয়ায় (বর্তমান কাসিমুল উলুম মাদ্রাসা) শায়খুল হাদীস হিসেবে ইলমের খেদমত শুরু করেন। এই সময়ে তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় কিছু দিন ইলমে হাদীসের মুহাদ্দিস হিসেবে কাজ করেন।[৩৬৯]

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জামিয়া ইউনুসিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইউনুস (রহ.)-এর বিশেষ অনুরোধে তিনি ১৩৪৫ হিজরিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জামিয়া ইউনুসিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। ইন্তেকাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৪২ বছর তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন।[৩৭০]

লেখাপড়ায় অসামান্য কৃতিত্ব, সব ক্লাসে ও স্তরে প্রথম স্থান অর্জন ও চারিত্রিক মাধুর্যের কারণে দারুল উলূম দেওবন্দের ওস্তাদগণ তার গুণমুগ্ধ ছিলেন। দাওরায়ে হাদীসের ফাইনাল পরীক্ষায়ও তিনি সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁর প্রখর মেধা, বুদ্ধি, সাহসিকতা ও চারিত্রিক মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে ওস্তাদগণ তাঁকে 'ফখরে বাঙ্গাল' (বাংলার গর্ব) উপাধিতে ভূষিত করেন।[৩৭১]

মহান রাব্বুল আলামিনের ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৩রা এপ্রিল মোতাবেক ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে ২০ চৈত্র রোজ সোমবার ৭১ বছর বয়সে এ আদর্শ সমাজসেবক, শিক্ষানুরাগী, আরবী ও ইসলামী শিক্ষার একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৩৭২] তাঁর জানাজায় নামাজ পড়ান তাঁরই বন্ধু ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (রহ.)। জামিয়া ইউনুসিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন একটি খালি জায়গায় তাঁকে দাফন করা হয়।[৩৭৩]

তাঁর ইন্তেকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে প্রকাশিত মাসিক ভেলা পত্রিকায় বিশেষ সম্পাদকীয় নিবন্ধ ছাপা হয়েছিল।[৩৭৪]

আরবী ও ইসলাম শিক্ষা বিস্তারে **ফখরে বাঙ্গাল তাজুল ইসলাম (রহ.)** নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। সব সময় তিনি এ চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। এ সম্পর্কে তাঁর দিক-নির্দেশনা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। অন্তিমকালেও তিনি বলতেন[৩৭৫]

---

[৩৬৭] হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, আমরা যাদের উত্তরসূরি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২।

[৩৬৮] হাফিয মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, প্রাগুক্ত পৃ. ৪২, মাওলানা ফজলে ইলাহী, উজানির হযরত ক্বারী ইব্রাহীম ছাহেব (রহ.)-এর জীবনচরিত (ঢাকা: আল-ইব্রাহীম প্রকাশনী, ১৯৯৯খ্রি.) পৃ. ৬৫।

[৩৬৯] হাফিয মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, প্রাগুক্ত পৃ. ২৭-২৯।

[৩৭০] হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত পৃ. ২০২।

[৩৭১] হাফিয মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, প্রাগুক্ত পৃ. ১৬১।

[৩৭২] হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত পৃ. ২০৩।

[৩৭৩] নাসীম আরাফাত, বাংলার হিরে-মতি-পান্না-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১ ।

[৩৭৪] হাফিয মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, প্রাগুক্ত পৃ. ১৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

- প্রতিটি মাদ্‌রাসায় কুরআন শিক্ষার সার্বক্ষণিক ব্যবস্থা রাখতে হবে। (অর্থাৎ আবাসিক নিয়মে হেফজখানা চালু রাখার কথা তিনি গুরুত্ব দিয়ে বলতেন।) তিনি বলতেন কুরআন শিক্ষা হচ্ছে মাদ্‌রাসার রূহস্বরূপ।
- সর্বত্র আজ অভাবের কথা শোনা যাচ্ছে। যেখানেই যান শুনবেন অভাবের কথা আলোচিত হচ্ছে। মানুষে মানুষে সম্প্রীতি গড়ে তুলতে হবে। কেননা যেখানে ভাব নেই সেখানেই অভাব দেখা দেয়। এ জন্য মানুষের উচিত প্রথমে আল্লাহ পাকের সাথে পরে মানুষের সাথে ভাবের সৃষ্টি করা। যেখানে ভাব আছে সেখানে অভাব নেই।
- বেশি বেশি আল্লাহ পাকের কালাম তেলাওয়াত ও বেশি বেশি করে তওবা ইস্তেগফার করতে হবে।
- মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ফখরে বাঙ্গাল (রহ.) কে দেখতে গেলে তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন: جاء المحي عند الممات والشمس عند الغروب 'জীবনদাতা এলো মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে, যখন সূর্য অস্তমিত হচ্ছে।'

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে ফখরে বাঙ্গালের অবদান-

ফখরে বাঙ্গাল তাজুল ইসলাম (রহ.) আরবী শিক্ষা ও ইসলামী জ্ঞান বিকশিত করার জন্য তিনি মাদ্‌রাসায়, মসজিদ ও কুরআন হাদীসের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এসব মাদ্‌রাসা, মসজিদ ও কুরআন-হাদীসের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রসারে আজো ব্যাপক আকারে অবদান রেখে যাচ্ছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি মাদ্‌রাসা, মসজিদ ও কুরআন-হাদীসের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা প্রাসঙ্গিক মনে করছি।[৩৭৬]

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামিয়া ইউনুসিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইউনুস (রহ.)-এর বিশেষ অনুরোধে তিনি ১৯৪৫ হিজরিতে জামিয়া ইউনুসিয়া মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন। ইন্তেকাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৪২ বছর এই মাদ্‌রাসা পরিচালনাসহ বুখারী শরীফ ও মিসকাত শরীফ পড়াতেন। ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.) তিনি হাদীস পড়াতেন মসজিদের মিম্বারের পাশে বসেই। তাঁর হাদীস পড়ানোর পদ্ধতি ছিল অবিকল আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (রহ.) মতো। তিনি হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হাদীসের সনদের মান সম্পর্কে ইমামদের মন্তব্য ও হাদীসটি থেকে উদ্ভূত ফিকহের মাসয়ালা চার মাযহাবের আলোকে বর্ননা করতেন। তিনি সব সময় ক্লাসের দুর্বল ছাত্রগণ যেন বিষয়টি সহজে বুঝতে পারে সে আলোকে হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতেন। হাদীসের ব্যাখ্যায় তিনি প্রায় কুরআনের আয়াতের উদ্বৃতি দিয়ে থাকতেন। তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রতি সপ্তাহে একবার আরবী ও ইসলামী শিক্ষা আসর হতো। সে আসরে তিনি ছাত্রদের কে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করতেন যাতে করে প্রতিটি ছাত্র আরবী ও ইসলামী শিক্ষার গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। এমনি ভাবে তাঁর প্রতিটি প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করে ছিলেন, এর এক মাত্র উদ্দেশ্য ছিলো যোগ্য আলেম, ইসলামের প্রচার ও প্রসারক হিসেবে গড়ে তোলা। ইসলামী শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করেন। তিনি বিভিন্ন মাদ্‌রাসায় কুরআন-হাদীস তথা ইলমে দ্বীনের প্রচার প্রসার, বিদ'আতের উৎপাটন এবং ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের বাস্তবায়নই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য। তাঁর নিকট অনেক বড় বড় সাহিত্যিক ও সুখ্যাতি অর্জনকারী রসিকগণ

---

[৩৭৫] প্রাগুক্ত পৃ. ১৫৫।
[৩৭৬] হাফিজ মোহাম্মদ নুরুজামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর কাছে ভিড় জমাতেন। তাঁর কাছ থেকে গভীর জ্ঞান সাধন করে থাকতেন। প্রতিটি মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকদেরকে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করতেন এবং বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে কিভাবে একজন যোগ্য শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের সামনে উপস্থাপন করতে পারে তিনি তা আলেম সমাজকে শিক্ষক রূপে অত্যন্ত সুকৌশলে সুপাণ্ডিত্যের সাথে বর্ণনা করেন।[৩৭৭]

মসজিদে কুরআনে মাজিদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দান: ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.)-এর কণ্ঠ ছিল অত্যন্ত সুমধুর। অস্বাভাবিক সম্মোহন শক্তিতে ছিল পরিপূর্ণ, তাঁর ভুবন মোহিনী মর্মস্পর্শী উঁচু কণ্ঠের সেই তেলওয়াতের কথা কেউ কখনো ভুলতে পারে না। তিনি যখন নামাজে কুরআনের তেলওয়াত শুরু করেন সবাই তাঁর তেলওয়াতে বিমোহিত হয়ে থাকত। ফজরের নামাজে তিনি দীর্ঘ তেলওয়াত করতেন। তাঁর নিকট কুরআন মাজিদের বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য দূরদূরান্ত থেকে মাদ্রাসার মসজিদের সব বয়সের মুসল্লিগণ দলবদ্ধ হয়ে ছুটে আসত। আশে পাশের বহু গ্রাম থেকে বিশেষ করে ভাগপাড়া, সুহিলপুর, ভাদুঘর, উলচাপড়াসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে আলেম ওলামা হাফেজ ক্বারীসহ অনেক বৃদ্ধরা পর্যন্ত ফখরে বাঙ্গাল তাজুল ইসলামের নিকট পবিত্র কুরআন শিক্ষার প্রশিক্ষণ মজলিসে উপস্থিত হতো। ফজরের নামাজের পর তিনি সকলের উদ্দেশ্য নিজে কুরআন তেলওয়াতের মাধ্যমে কুরআনের প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন। তাঁর এই প্রশিক্ষণে পুরো মসজিদ ভরপুর হয়ে যেত। তাঁর কুরআন প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ছিল এমন যে, তিনি প্রথমে চার-পাঁচ রুকু তিলওয়াত করতেন। তার পর দুই জন দুই জন করে একসাথে পরস্পরের মধ্যে দলবদ্ধ করে একে অপরকে কুরআনে মাজিদের তেলওয়াত করে শুনাতেন। শেষ মুহূর্তে তাদের থেকে যতদূর সম্ভব শুনে নিতেন।[৩৭৮]

ঐতিহ্যবাহী মোমেনশাহী সোহাগী মাদ্রাসায় কুরআন-হাদীসের বিশেষ প্রশিক্ষণ দান করেন। অত্র মাদ্রাসাটি একটি প্রাচীনতম মাদ্রাসা। ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.) প্রতিবছর বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলের প্রধান আলোচক ছিলেন। সেই মাদ্রাসায় তিনি প্রতিবছর মাহফিলের পূর্বে এক সপ্তাহব্যাপী শুধু আলেম ওলামাগণকে নিয়ে তিনি কুরআন-হাদীস তথা ইলমে দ্বীনের প্রচার প্রসারের বিশেষ প্রশিক্ষণ করতেন। সে সময়ে মাদ্রাসার মোহতামিম ছিলেন মাওলানা হোসাইন আহমদ (রহ.)। মাদ্রাসায় মাহফিল যখন লোকে লোকারণ্য চারদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ শুধু ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.)-এর কুরআন হাদীসের তাৎপযপূর্ণ নসিহত শুনার জন্য আসতেন তখন তিনি সকল মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেন মাদ্রাসা হলো কুরআন-হাদীসের মারকায তথা ইলমে দ্বীন প্রচার ও প্রসারের প্রধান মাধ্যম। তাই আপনারা নিজেরাও মাদ্রাসায় কিছু কিছু সময় কাটাবেন এবং আপনাদের সন্তানদেরকেও ইলমের শিক্ষা ও আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উৎসর্গ করবেন। তাঁর মাহফিল দেখে মনে হতো সত্যিকার ইলমে দ্বীন হাসিলের মাহফিল।[৩৭৯]

নাছির নগর উপজেলায় সিংহনামক এই গ্রামটি অবস্থিত। তিনি এই গ্রামে কুরআন-হাদীসের বিশেষ প্রশিক্ষণ দান করেন। একদা এই গ্রামে ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.) সেই মাহফিলে দাওয়াত দেওয়া হলে শ্রোতারা বিমুগ্ধ হৃদয়ে তাঁর ওয়াজ শুনছিল, ঠিক তখন তাঁর ওয়াজের শেষ মুহূর্তে তিনি দুই হাত দোয়া করলেন। আল্লাহ তুমি এখানে একটি ইসলামী মারকায প্রতিষ্ঠা করে দাও। আল্লাহ তাঁর দোয়ার বদলৌতে পরবর্তী বছরে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় মুসুল্লিদের উদ্দ্যোগে মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে সেই মাদ্রাসাটি

---

[৩৭৭] স্মরণিকা, (ঢাকা: জামিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ, ১৯৯৪ খ্রি), পৃ.২৪।

[৩৭৮] নাসীম আরাফাত, বাংলার হিরে-মতি-পান্না-২, প্রাগুক্ত , পৃ. ৫৬।

[৩৭৯] নাসীম আরাফাত, বাংলার হিরে-মতি-পান্না-২, প্রাগুক্ত , পৃ.৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

নূরানী মুক্তব, হেফজখানা ও হেদায়েতুননাহু পর্যন্ত চালু রয়েছে। মাদ্‌রাসার প্রায় ছাত্র সংখ্যা ২০৮ জন।[৩৮০]

জামিয়া এমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ ঢাকায় মাদ্‌রাসায় বুখারী শরীফের প্রথম ও শেষ ছবক প্রদান। ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.) তিনি দীর্ঘদিন ফরিদাবাদ মাদ্‌রাসায় তিনি বুখারী শরীফের প্রথম ও শেষ ছবক দিতেন। মাঝে মাঝে তিনি যখন ঢাকায় আসতেন তখন ফরিদাবাদ মাদ্‌রাসায় বেশিরভাগ সময় অবস্থান করতেন তখন মিসকাত শরীফ পড়াতে ও বুখারী শরীফের বিশেষ ক্লাশ প্রদান করে থাকতেন। তিনি ছাত্রদেরকে মনোমুগ্ধকর করার জন্য তা করে থাকতেন। মাদ্‌রাসার সকল শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্ররা তাঁর ক্লাশ খুবই মনোযোগ সহকারে শুনতেন। হাদীসের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় প্রশ্নোত্তর ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.) থেকে খুব সুন্দর ভাবে সমাধা করে নিতেন। তিনি মাঝে মাঝে শিক্ষকদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরও সজাগ করে তুলতেন। তাঁর আগমনের কথা শুনলে আশে পাশের আলিম ওলামা ও মসজিদের ইমামগণ তাঁর নিকট এসে বিভিন্ন মাসয়ালাসহ অনেক প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করতেন।[৩৮১]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী সাহিত্যের আসরে ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.) প্রসঙ্গক্রমে একবার মাওলানা আব্দুল খালেক পীরগুরি এর কাছে ব্যক্ত করেন। অত:পর সেই মজলিসের সকল আরবী ভাষাবিদ আরবী সাহিত্যের ওপর বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করেন এবং তিনি খুব সুন্দরভাবে তাদের সকল আলোচনা পর্যালোচনা বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর খুব সুন্দরভাবে সমাধান করেন। তাঁর আলোচনা ও উপস্থাপনায় ঐ মজলিসের সকলেই অত্যন্ত মুগ্ধ হন।[৩৮২]

জামিয়া আরাবিয়া, ওমেদ নগর, হবিগঞ্জ জেলার ওমেদ নগরে মাদ্‌রাসাটি অবস্থিত ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.) ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন, তার ছাত্র মাওলানা আজিজুল হক মাদ্‌রাসার সর্বপ্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন। অত্র মাদ্‌রাসার একটি হেফজ বিভাগও চালু রয়েছে, মাদ্‌রাসাটি দুইটি পাকা বিল্ডিং ও একটি পাকা মসজিদ রয়েছে। বর্তমানে তার মাদ্‌রাসার ছাত্র সংখ্যা প্রায় ১৮০ জন। মাদ্‌রাসায় প্রতি বছর দুই মাসব্যাপী বয়স্ক মানুষদের জন্য তা'লিমুল কুরআনের বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে এবং প্রতি বছর মাদ্‌রাসার এলাকার মুসলমানদের জন্য এক বিশাল মাহ্‌ফিলের ব্যবস্থা রয়েছে। যেখানে বিভিন্ন বড় বড় আলেম ওলামাগন কুরআন-হাদীস তথা ইসলামে দ্বীনের প্রচার-প্রসার করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম কুরআন-হাদীস তথা ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের বাস্তবায়নই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য।[৩৮৩]

ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ-

দারুল উলূম ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা, হরষপুর, হবিগঞ্জ : হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার অন্তর্গত এক নং ধর্মঘর ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হরষপুর রেলস্টেশনের পশ্চিম দিকে মাদ্‌রাসাটি অবস্থিত। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে ফখরে বাঙ্গাল তাজুল ইসলাম (রহ.) স্থানীয় এক মাহফিলে আগমন করেন। মাহফিল শেষে তিনি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করার আগ্রহ প্রকাশ করলে সেখানকার আলেম ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে চারটি বড় বিল্ডিং ও একটি বিশাল পাকা জামে মসজিদে মাদ্‌রাসাটির শিক্ষা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এখানে প্রাথমিক স্তর থেকে মিশকাত

---

৩৮০ হাফিয মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, প্রাগুক্ত পৃ. ১১৮।
৩৮১ স্মরণিকা, (ঢাকা: জামিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ, ১৯৯৪ খ্রি) পৃ.৪৮।
৩৮২ হাফিয মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, প্রাগুক্ত পৃ. ১১৮।
৩৮৩ প্রাগুক্ত পৃ. ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

জামাত (জামাতে উলা) পর্যন্ত শিক্ষা দেয়া হয়। এ মাদারাসাটির অধীনে একটি উন্নতমানের হিফজ বিভাগও পরিচালিত হয়ে আসছে। আজ প্রায় ৬৫ বছর যাবৎ প্রতি শিক্ষাবর্ষ শেষে গড়ে বিশজন ছাত্র দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশে বিদেশে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বেরিয়ে যাচ্ছেন। মাদ্‌রাসাটির বর্তমান মুহতামিম সাহেবের নাম মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াহইয়া।

আনোয়ারুল উলুম মাদ্‌রাসা, ভুবন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া : এ মাদ্‌রাসাটি ফখরে বাঙ্গাল (রহ.)-এর জন্মস্থান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলায় ভুবন গ্রামে অবস্থিত। ফখরে বাঙ্গাল (রহ.)-এর বিশেষ তত্ত্বাবধানে ১৯৫৬ সনে মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্‌রাসাটি প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর (জালালাইন জামাত) পর্যন্ত পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে এর ছাত্রসংখ্যা ২৫০ জন। বর্তমান পরিচালকের নাম মাওলানা শামসুদ্দীন।

তাজুল উলুম আল ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা, মালিহাতা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া: এ মাদ্‌রাসাটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মলিহাতা নামক গ্রামে অবস্থিত। ফখরে বাঙ্গাল (রহ.)-এর নির্দেশে ও এলাকাবাসীর অক্লান্ত পরিশ্রমে মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্‌রাসাটি প্রাথমিক স্তর থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে এর ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৫০০ জন। বর্তমান পরিচালকের নাম মাওলানা মোহাম্মদ আলী। এ মাদ্‌রাসার প্রথম প্রিন্সিপাল ছিলেন ফখরে বাঙ্গাল (রহ.)-এর হাতেগড়া ছাত্র মাওলানা আব্দুল আলী (রহ.)।

ফখরে বাঙ্গাল তাজুল উলুম হাফেজিয়া মাদ্‌রাসা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া : এ মাদ্‌রাসাটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। বর্তমানে মাদ্‌রাসাটিতে মক্তব ও হেফজ বিভাগ রয়েছে। ফখরে বাঙ্গাল (রহ.)-এর বিশেষ তত্ত্বাবধানে মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে এর ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১৫০ জন। শিক্ষক ও স্টাফ ৬ জন। বর্তমানে ফখরে বাঙ্গাল (রহ.)-এর দ্বিতীয় পুত্র হাফেজ ওয়ালি উল্লাহ এর পরিচালনায় দায়িত্ব পালন করছেন।

মিফতাহুল উলুম মাদ্‌রাসা, চান্দপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া : এ মাদ্‌রাসাটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার চান্দপুর নামক গ্রামে অবস্থিত। বর্তমানে মাদ্‌রাসাটিতে মক্তব, হেফজ বিভাগ ও কিতাব বিভাগ রয়েছে। ফখরে বাঙ্গাল (রহ.)-এর সহযোগিতা ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে ১৯৬২ সনে মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এর ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১৫০ জন। শিক্ষক ও স্টাফ ৬ জন। বর্তমানে ফখরে বাঙ্গাল (রহ.)-এর দ্বিতীয় পুত্র হাফেজ ওয়ালি উল্লাহ এর পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছেন।

এছাড়াও বর্তমান হবিগঞ্জ জেলায় ওমেদনগর, মনতলা ও খরকিতেও তিনি বেশ কয়েকটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শহরের কেন্দ্রস্থলে আনন্দ নগরে "আনন্দ নগর জামে মসজিদ" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে তার ছাত্র মাওলানা আব্দুল মালেক আমাদেরকে জানিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, প্রতিদিন আসরের নামাজের পরে তিনি এ মসজিদে এলাকাবাসীকে তাফসির করে শোনাতেন। বর্তমানে ফখরে বাঙ্গাল (রহ.)-এর জামাতা মাওলানা আশিকে এলাহি এ মসজিদের খতিবের দায়িত্ব পালন করছেন। আনন্দ নগর জামে মসজিদে বর্তমানে একটি নূরানী মুক্তব ও হেফজ বিভাগ রয়েছে। তা ছয়জন শিক্ষকের মাধ্যমে পরিচালিত ছাত্র সংখ্যা প্রায় দুই শতাধিক, প্রতি বছর সে হেফজ বিভাগ থেকে ১০ -১৫ জন করে কুরআনের হাফেজ হচ্ছেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত মৌলভিপাড়ায় কাদিয়ানিদের মসজিদের অদূরে তিনি মসজিদে তাকওয়া নামে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ মসজিদটিকে কেন্দ্র করে তিনি কাদিয়ানি বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। তাকওয়া নামক মসজিদে একটি হেফজ বিভাগ

Dhaka University Institutional Repository

চালু রয়েছে সেখানে প্রায় আশি জন ছাত্র চার জন শিক্ষকের মাধ্যমে তা পরিচালিত হচ্ছে। প্রতি বছর ১০-১২ জন ছাত্র কুরআনের হাফেজ হচ্ছে।[৩৮৪]

অধ্যাপনার পাশাপাশি অনেক মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তাঁর হাতে গড়া কয়েকজন খ্যাতিমান আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির নাম, তাঁদের পূর্বের ও বর্তমান কর্মক্ষেত্র উল্লেখ করা হলো। যাঁরা বিভিন্ন অঙ্গনে এবং জাতীয় জীবনে বিরাট অবদান রেখেছেন।

- ড. মাওলানা আব্দুল হক- চেয়ারম্যান, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
- মাওলানা আব্দুল বারী- খ্যাতনামা তার্কিক ও আরবী সাহিত্যে সুপণ্ডিত, প্রতিষ্ঠাতা সদরুল মুদাররিসিন, তালশহর আলিয়া মাদ্রাসা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
- হযরত মাওলানা নুরুল্লাহ (রহ.) -মুহাদ্দিস ও প্রধান মুফতী জামিয়া ইউনুসিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ।
- অধ্যাপক মাওলানা আব্দুর রকিব- চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ, মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড।
- মাওলানা আব্দুল মান্নান -শিক্ষক, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য, শেরে বাংলানগর সরকারি বয়েজ হাই স্কুল।
- মাওলানা কাজী ইউনুস -মুহাদ্দিস, বড়কাটারা মাদ্রাসা।
- মাওলানা হাবিবুর রহমান -মুফতী, জামিয়া ইমদাদিয়া, কিশোরগঞ্জ।
- মাওলানা আবদুন নূর (রহ.) -শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক, জামিয়া ইউনুসিয়া, বি-বাড়িয়া
- মাওলানা আশরাফ আলী -প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপ্যাল, কুতুবের চক মাদ্রাসা, সিলেট।
- মাওলানা হাফেজ আজিজুল ইসলাম- হেকিমি শাস্ত্রের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক এবং ঢাকাস্থ তিব্বিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল।

উপরোল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও তিনি আরও হাজার হাজার নামকরা আলেম ওলামা ও বিখ্যাত মুবাল্লিগ তৈরি করেছেন।

আরবী কবিতায় তাঁর দখল : ফখরে বাঙ্গাল তাজুল ইসলাম (রহ.) ছাত্র জীবনে যখন জাহেলি যুগের বিশিষ্ট আরবী কবি ইমরুল কায়সের 'সাব'আ মু'আল্লাকা' পড়েছেন তখন তিনি ইসলামী ভাবধারার মিশ্রণ ঘটিয়ে এর সমমানের অনেক কবিতা রচনা করেছিলেন। ইন্তেকালের কিছুকাল পূর্বে ঢাকার ফরিদাবাদ মাদ্রাসায় ওলামায়ে কেরামের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.)[৩৮৫] (১৮৯৫-১৯৬৯খ্রি.), মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমি (রহ.)[৩৮৬] (১৯০০-১৯৭২খ্রি.),

---

[৩৮৪] হাফিয মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

[৩৮৫] মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.) বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়া উপজেলার গওহর ডাঙ্গা গ্রামে ১৯৯৫খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী আবদুল্লাহ এবং মাতার নাম আমিনা। তাঁর পিতা আজাদী আন্দোলনের একজন কর্মী ছিলেন। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে দাওরায়ে হাদীস পাশ করে বি. বাড়িয়া জামিয়া ইউনুছিয়ার সদরুল মুদাররিস হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ঢাকা বড় কাটারায় হোসাইনিয়া আশরাফুল উলূম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক সিমলা কনফারেন্সে প্রদত্ত জিহাদী ভাষণে কায়দে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ খুশী হয়ে তাঁকে সদর বা আমাদের হৃদয় বা নেতা উপাধি দেন। তৎকালীন বাংলাদেশের মুসলিম লীগের সভাপতি করার প্রস্তাব দেওয়া হলে তাতে তিনি সম্মত হননি। তিনি ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। (জুলফিকার আলী কিসমতি, বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর-মাশায়েখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫-১৮৪)।

[৩৮৬] মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী (রহ.) ১২ই ডিসেম্বর ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে নোওয়াখালীর ফেনী জেলার অন্তর্গত নেয়াজপুর গ্রামে শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম- আলী আজম ও মাতার নাম- বেগম রহীমুন্নেছা। ভারতের আজমগড়ের ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান দারুল মুসান্নেফীন আজমগড়-এর ভাবাদর্শে তিনি উদ্বুদ্ধ ছিলেন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা বজলুর রহমান দয়াপুরী (রহ.)[৩৮৭] (১৯০৮-১৯৭৮খ্রি.), মাওলানা সফিউল্লাহ (রহ.)[৩৮৮] (১৮৮৫-১৯৭৭খ্রি.), মাওলানা তাফাজ্জল হোসেন (রহ.)[৩৮৯] (১৯০৫-১৯৯৫খ্রি.) এবং তরুণ ছাত্র আব্দুল খালেক পীরপুরী।[৩৯০] ফখরে বাঙ্গাল কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে বিতর্কে যেসব কবিতা যৌবনকালে রচনা করেছিলেন সেসব কবিতা তিনি সে বৈঠকে আবৃত্তি করে শোনান। উপস্থিত সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো তা শোনেন এবং এগুলোকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবিতা হিসেবে এর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

"ফখরে বাঙ্গাল তাজুল ইসলাম (রহ.) প্রসঙ্গক্রমে একবার [উপরোল্লিখিত] আব্দুল খালেক [পীরপুরীর] কাছে ব্যক্ত করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার আরবী সাহিত্যের আসর অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অনেক আরবী ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক সমবেত হন। সে মজলিসে তিনিও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি স্বরচিত আরবী কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। সেখানে তার কবিতা খুব প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়।"[৩৯১]

আরবী কবিতার মাধ্যমে কাদিয়ানিদের চ্যালেঞ্জের জবাব : আল্লামা সায়্যেদ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.)-এর নির্দেশে কাদিয়ানিদের চ্যালেঞ্জের জবাবে মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.) দেওবন্দের বিতর্কস্থলে যান। এরপর খুব অল্প সময়ের মধ্যে ৭০টি আরবী শ্লোক বিশিষ্ট একটি আরবী কবিতা রচনা করে তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন। পাশাপাশি মির্জা গোলাম আহমদের রচিত কবিতাগুলোর

চট্টগ্রামে দারুল উলূম মাদাসা থেকে তাঁর শিক্ষাজীবন শেষ করেন। তিনি ছিলেন বিদ'আত ও কুসংস্কারের ঘোর বিরোধী। তিনি ছিলেন প্রতিশ্রুতিশীল লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, গবেষক। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তাঁর পর স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ফেনী আলিয়া মাদ্রাসায় (১৯২৮-১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে) শিক্ষকতা করেন। তিনি ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ১৬ই আগষ্ট দিবাগত রাতে ইন্তেকাল করেন। (জুলফিকার আলী কিসমতি, বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর-মাশায়েখ, প্রাগুক্ত, ২৩-৭৮)।

৩৮৭ মাওলানা বজরুল রহমান দয়াপুরী (রহ.) - তিনি ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলাধীন দয়াপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সি তৈয়্যেব আলী। তিনি ফখরে বাঙাল মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.) এবং হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা ফরিদাবাদ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম ছিলেন এবং বাংলাদেশের বড় বড় মাদ্রাসাসমূহের মজলিসে সূরার সদস্য ছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর নিজ গ্রাম দয়াপুরে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করনে। (হিফজুর রহমান, মাশায়েখে কুমিল্লা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮১)।

৩৮৮ মাওলানা সফীউল্লাহ (রহ.) ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে চাঁদপুর সদর উপজেলার শহরতলী বাজারের দক্ষিণে মমিনপুর গ্রামের শাহ্ বংশের সরদার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী মোবারক উল্লাহ ও মাতার নাম হাসনা বানু। তিনি ছিলেন পিতা মাতার জ্যৈষ্ঠ পুত্র। কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় সর্বোচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন । অতঃপর তিনি শায়েখুল ইসলাম মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ঢাকায় ফরিদাবাদ মাদ্রাসায় শিক্ষকতার পাশাপাশি সারওজা মসজিদের ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। (হিফজুর রহমান, মাশায়েখে কুমিল্লা, ২য় খণ্ড, পৃ.১০৭)।

৩৮৯ মাওলানা তাফাজ্জল হোসাইন (রহ.) কুমিল্লা জেলায় দাউদকান্দি উপজেলার কালামাঝারদিয়া গ্রামের ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী আলীমুদ্দিন। তিনি ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে দাওরা হাদীস পাশ করে সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি ঢাকা চকবাজার আশরাফুল উলূম বড়কাটারা মাদ্রাসায় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে শায়েখুল হাদীস হিসেবে যোগদান করেন এবং ''তাফসীরে আশরাফী" গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। তিনি ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ মে ইন্তেকাল করেন। (শায়েখুল হাদীস মাওলানা মোঃ তাফাজ্জল হোসাইন, ড. এ এইচ. ম মুজতবা হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১৩)।

৩৯০ মাওলানা আব্দুল খালেক পীরপুরী ছিলেন অসাধারণ মেধার অধিকারী। তিনি ছিলেন তরুণ সাংবাদিক, সাহিত্যিক, গবেষক ও যুক্তিবিদ্যায় অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি। আরবী ব্যাকরণে ছিলেন খুবই পারদর্শী। তিনি ঢাকা ফরিদাবাদ মাদ্রাসায় দীর্ঘদিন যাবৎ মুহাদ্দিস ও সদরুল মুদাররিসীন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন বড় বড় মাদ্রাসার মজলিশে শুরার সদস্য ছিলেন। (সাক্ষাতকার মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস, বর্তমান মুহতামিম-ফরিদাবাদ মাদ্রাসা, ঢাকা)।

৩৯১ হাফিজ মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮-১৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

অসংখ্য বৈয়াকরণিক ভুল ধরিয়ে দেন।[৩৯২] নিম্নে ফখরে বাঙ্গাল তাজুল ইসলাম (রহঃ)এর সেসব কবিতার কিছু অংশ উল্লেখ করা হলো।

إنا أنزلناه قريبا من القاديان * و ما أدرا ك ما القاديان؟

التي تنزل فيها ذراري الشيطان * هي منبع الشرور والشيطان

و مطرق طوارق الحديثان * ومخزن المردة من الإنس و الجان

فما تنفعهم النذر * و لا آيات القرآن

بإسم الإله علي الذات ذات المكارم * والصلاة على النبي خاتم المظالم

نبي من جاءت كهيئتي به كما * أتت إلا تامة من حمر البهائم

مسيلمة فنجاب نبي و هو كاذب * وأتى بقصيدة بالدراهم[393]

১। আমি তাকে অবতীর্ণ করেছি কাদীয়ানি নামক গ্রামের নিকটে। আর তুমি কি জান কাদীয়ানি কি?

২। তা হলো যেখানে অবতীর্ণ হয় শয়তানের অনুচরগণ, যা অনিষ্ট ও শয়তানি কার্যক্রমের উৎস স্থল।

৩। উদ্ভট দাবি দাওয়া কথা বার্তার ফুলঝুরি, যা অবাধ্য জ্বীন ও ইনসানের কেন্দ্রবিন্দু।

৪। তাদের কোনো ভীত প্রদর্শনকারী এবং কোরআনের আয়াতসমূহ উপকার করতে পারেনি।

৫। মহান আল্লাহর নামে শুরু করলাম এবং দরুদ ও সালাম সকল অন্যায় অপরাধ মূলোৎপাটনকারী সর্বশেষ নবীর ওপর।

৬। আমার মতো সাধারণ মানুষ হয়ে নবুয়াতের দাবি করেছে অথচ সে একটি চতুষ্পদ জন্তু গাধা।

৭। পাঞ্জাবের নবী মুসায়লামা সে মিথ্যাবাদী । টাকার বিনিময়ে কবিতা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে।

আল্লামা হোসাইন আহমদ মাদানি (রহ.) কুমিল্লা শহরে আগমন উপলক্ষে স্বরচিত আরবী কবিতা পাঠ : ফখরে বাঙ্গাল তাজুল ইসলাম (রহ.) নিজে আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্যে ও অনুপম কাব্য-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমন বিস্ময়কর মেধা দান করেছিলেন যে, তিনি ছাত্রজীবনেই উঁচুমানের আরবী কবিতা অনায়াসে রচনা করে ফেলতেন। তিনি যখন 'দিওয়ানে আলি' পড়তেন তখন দিওয়ানে আলির সমপর্যায়ের কবিতা তিনি সহজেই মুখে মুখে রচনা করে শুনিয়ে দিতেন।

দারুল উলূম দেওবন্দে অধ্যয়নকালে (১৩৩৮-৪২ হিজরি) একবার তিনি আরবী কবিতার মাধ্যম কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে বহস করেন। এ বহসে তিনি ৭০ টি শ্লোক বিশিষ্ট আরবী কবিতা রচনা করে তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব প্রদান করেন। [৩৯৪]

---

[৩৯২] এইচএম জাবেদ হোসাইন, এক মনীষীর গল্প শোন, (ঢাকা: নাসিম বুক, বাংলাবাজার, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ১৮।

[৩৯৩] মুহাম্মদ নুসরাতুল্লাহ নূর, আলোর আধার, (ঢাকা: মডার্ন ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড আর্কিটেক্টস লিমিটেড, ২০১৩খ্রি.), পৃ. ১৩৯।

[৩৯৪] হাফিয মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর বিশিষ্ট ওস্তাদ আল্লামা হোসাইন আহমদ মাদানি (রহ.) কুমিল্লা শহরে আগমন উপলক্ষে তিনি আল কাসিদাতুত তারহীবিয়্যাহ ওয়াল করিজাতুত তানজীমিয়্যাহ নামক একটি স্বরচিত আরবী কবিতা পাঠ করে শোনান।

তার এই কাসিদাটি কুমিল্লা দায়োগাবাড়ির আযিযুর রহমানের সৌজন্যে স্থানীয় নাজুরি ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয়। এই কাসিদা থেকে কয়েকটি শ্লোক এখানে তুলে ধরা হলো।

(القصيدة الترحيبية و القريظة التنظيمية)

حبت لما فيه ناحت كوافله — عند الصباح نسيم الصبح بهتانا

فأضحكت زهره و سرت عنادله — و تشعت عن زوايا الحزن أحزانا

فالقلب منتظر والعين طامعة — الي مجئ حبيب الله مولانا

كأني صرت عيناني رويته — لا بل تحول كل الجسم إنسانا

قد كنت من شائمي الالطاف منتظرا — حتي أفضت وليا منك أوليا

بل كنت في الهجر كالحيتان في رمل — لقد سقيت سقا الله حيتانا

ما كان جرمك غير الحق من ارم — قد مر الله كفارا و نصران

احييت من صوتك الدنيا شراشرها — هندا فسندا فبنجالا فأفغانا

'ভোরের বায়ু মেলে দিল তার অধীর পাখা,
গায়িকা যেমন ছড়িয়ে দেয় তার আঁচলখানা।
হাসিল উষার কুল খুশি হলো ভোরের বুল বুল,
মুছে দিল হৃদয়কোণের যত সব আকুলি-ব্যাকুলি,
হৃদয় অপেক্ষমাণ, নয়ন উদগ্রীব, তারা চেয়ে আছে,
মাওলানা সাহেব তথা আল্লাহর বন্ধুর আগমন পানে।
দর্শনে তার ধরিয়াছে মুকুলের শোভা,
না, না লভিয়েছে মুকুল মানুষ বকুলের আভা,
ছিলাম করুণা-পিপাসু, উৎকণ্ঠ, অধীর,
যবে ছিলে না তুমি গুরু আর শিরোমণি মোর
ছিলাম বিরহবিধূর মৎস্যের বালু-কণিকায়
নিবারিলে তুমি মৎস্যের পিপাসা
মিটাবেন খোদা পিপাসা তোমায়

রাজনৈতিক অঙ্গনে ভূমিকা : ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.) বৃহত্তর পরিসরে সমাজসেবা ও ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠাসহ আরবী ও ইসলাম শিক্ষা বিস্তারের প্রেরণা নিয়ে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। তিনি জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের একজন নিঃস্বার্থ কর্মী ও নেতা ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্মলগ্ন থেকে তিনি শায়েখুল ইসলাম আল্লামা শাব্বির আহমদ ওসমানি

Dhaka University Institutional Repository

(রহ.)-এর পরামর্শে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামে যোগদান করে পাকিস্তান আন্দোলনে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। পূর্ব পাকিস্তানে সর্বপ্রথম তিনি ও মাওলানা আতাহার আলি (রহ.) বিরোধী দল হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নিযামে ইসলাম পার্টি গঠন করেন। তৎকালীন স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে তিনি ওলামায়ে কেরামকে নিয়ে তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁদের এই আন্দোলনের ফলে পাক গণপরিষদে (constituent Assembly of Pakistan) ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ১২ই মার্চ সর্বসম্মতিক্রমে আদর্শ প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ প্রস্তাবে পাকিস্তানকে মহান আল্লাহর তরফ হতে একটি পবিত্র আমানত, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং পাকিস্তানে পরিপূর্ণ ইসলামী শাসন কায়েমের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।[৩৯৫] ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে নির্বাচনে তিনি বিপুল অবদান রাখেন। এই নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে নিযামে ইসলাম পার্টি ৩৬টি আসন লাভ করে। আল্লামা তাজুল ইসলাম (রহ.) পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নিযামে ইসলাম পার্টি এবং পরে নিখিল পাকিস্তান নিযামে ইসলাম দলের সহ-সভাপতি পদে আসীন ছিলেন। সিলেট রেফারেন্ডামেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ইসলামী রাজনীতি করলেও তিনি কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেননি।[৩৯৬]

সমাজ সংস্কার ও সমাজসেবায় ফখরে বাঙ্গাল (রহ.)-এর ভূমিকা : বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন। সমাজে প্রচলিত মিলাদ-কিয়াম ও মারেফাতের নামে ভণ্ড ফকিরদের নানাবিধ বিরূপ প্রচারণা এবং বিভিন্ন মাযার পূজা ও ভণ্ড ফকির দরবেশদের অনৈসলামীক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিলেন। দীর্ঘদিন কুরআন ও হাদীসের দারস, মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা, ওয়াজ-মাহফিল, জুমায় খুৎবাহ প্রদানসহ ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন কু-সংস্কার দূরীকরণে সর্বাত্তোক প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর থেকে পতিতালয় উচ্ছেদ ও পতিতাদের পুনর্বাসন তার এক উল্লেখযোগ্য কীর্তি। তাঁর পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের পূর্বাঞ্চলে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে একটি খাল খনন করা হয়েছিল। যা এন্ডারসন খাল নামে পরিচিত। এ খালের মাধ্যমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর জলাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়।[৩৯৭]

দারুল উলূম দেওবন্দে অধ্যয়নকালে মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.) তার্কিক আলেম হিসেবে উপমহাদেশ জুড়ে খ্যাতি অর্জন করেন। দেওবন্দের ওস্তাদগণ তাঁকে কাদিয়ানি ও রাফেজিদের সাথে বিতর্ক অনুষ্ঠানের জন্য মাঝে মধ্যে ভারতের নানাস্থানে পাঠাতেন।[৩৯৮]

সিংহপুরুষ আল্লামা তাজুল ইসলাম (রহ.) কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে এবং প্রামাণ্য দলিল প্রমাণের আলোকে কাদিয়ানিদেরকে পরাস্ত করতেন। একবার মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির একদল অনুসারী তাদের ভণ্ড নবীর পক্ষে বহস করার জন্য পাঞ্জাব থেকে দেওবন্দে আসেন। মাওলানা তাজুল ইসলাম তখন মিশকাত জামাতের (জামাতে উলা-র) ছাত্র ছিলেন। কাদিয়ানি পক্ষের লোকজন গোলাম আহমদের রচিত একটি কাব্যগ্রন্থকে অবলম্বন করে বিতর্ক করছিল। তারা দাবি ও চ্যালেঞ্জ করছিল যে তাদের নবী সত্য নবী এবং কাব্যগ্রন্থখানি তাদের নবীর প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহীগ্রন্থ। তারা আরও বলেছিল যে, এ গ্রন্থখানি ওহী না হলে তিনি এ উচ্চমানের কবিতা রচনা করলেন কিভাবে? তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে সমমানের কবিতার মাধ্যমে এর মোকাবিলা করো।

---

[৩৯৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

[৩৯৬] ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, (ঢাকা: ই.ফা.বা., ২০০৯খ্রি.), পৃ. ৬৮।

[৩৯৭] প্রাগুক্ত, পৃ.৭৯।

[৩৯৮] প্রাগুক্ত, পৃ.২২।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের এ চ্যালেঞ্জের জবাবে আনোয়ার শাহ কাশ্মীরীর নির্দেশে মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.) বিতর্কস্থলে যান। এরপর খুব অল্প সময়ের মধ্যে ৭০টি আরবী শ্লোক বিশিষ্ট একটি আরবী কবিতা রচনা করে তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন।

পাশাপাশি মির্জা গোলাম আহমদের রচিত কবিতাগুলোর অসংখ্য বৈয়াকরণিক ভুল ধরিয়ে দেন।[৩৯৯] পরবর্তীতেও ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে অনুষ্ঠিত এক বাহাসে ফখরে বাঙ্গাল (রহ.)-এর অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণের সামনে টিকতে না পেরে পাঞ্জাব থেকে আগত কাদিয়ানি মৌলভিরা সভায় তাদের কিতাবপত্র রেখে পালিয়ে যায়। এমন ঘটনা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বহুবার ঘটেছে।[৪০০] এভাবে কাদিয়ানি বিরোধী অভিযানের ফলে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তওবা করে অগণিত লোক আবার ইসলামের ছায়াতলে ফিরে আসে।[৪০১]

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর নেতৃত্বে আর্য সমাজী নামে হিন্দুদের একটি দল মুসলমানদের রাসূল ও কুরআনের বিরুদ্ধে অহেতুক নানা প্রশ্ন উত্থাপন করলো। তারা মুসলমানদেরকে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য ব্যাপকভাবে তাদের কার্যক্রম শুরু করলো। অনেক অজ্ঞ মুসলমান তাদের প্রচারণার ফলে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করল। মুসলিম ওলামায়ে কিরাম আর্যসমাজীদের বিরুদ্ধে অনেক বিতর্ক করলেন। দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসিম নানুতুবী (রহ.) তাদের বিরুদ্ধে অনেক বিতর্কে অবতীর্ণ হন।

তিনি এ প্রসঙ্গে কিবলানুমা ও হুজ্জাতুল ইসলাম নামক দুটি অমর গ্রন্থ রচনা করেন। ওলামায়ে কেরামের তৎপরতার কারণে এ ফেতনা কিছুদিন নীরব থাকলেও ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে তা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ফখরে বাঙ্গাল তাজুল ইসলাম (রহ.) তখন দারুল উলূম দেওবন্দের ছাত্র। রাজপুতানা বা ভাগলপুর রাজ্যের এক মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে শুদ্ধি আন্দোলনের ফলে প্রায় ছয়শ মুসলমান ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে। সে এলাকার মুসলিম জমিদার এর বিরুদ্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য দারুল উলূম দেওবন্দে লোক পাঠান। দারুল উলূম থেকে মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.) কে সেখানে পাঠানো হয়। তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে আর্য পণ্ডিতদেরকে বিতর্কে পরাজিত করেন। আর্যদের পরাজিত হতে দেখে ধর্মান্তরিত ছয়শ আর্য ইসলাম ধর্মে ফিরে আসে।[৪০২]

ইসলামী অনুশাসন পালনে প্রজ্ঞা ও সাহসিকতা : একদা ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা প্রশাসক শহরের নিয়াজ পার্কে এক আনন্দ মেলা অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন মহকুমাব্যাপী প্রচার করেন। মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.) তখন এর বিরুদ্ধে পাল্টা বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। ঘটনাক্রমে একদিন এক অনুষ্ঠানে মহকুমা প্রশাসক ও তাজুল ইসলাম (রহ.) মিলিত হলেন। মহকুমা প্রশাসক কথা প্রসঙ্গে মাওলানা সাহেবকে বললেন, মাওলানা! আপনার তো অনেক সাহস! আপনি সরকারি আদেশের বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপন প্রচার করেছেন। মাওলানা সাহেব সাথে সাথে জবাব দিলেন, আপনার এতো স্পর্ধা যে, সকল সরকারের বড় সরকার আল্লাহ্ পাকের বিরুদ্ধে লিফলেট প্রকাশ করেছেন। প্রশাসক মহোদয় এ জবাব শুনে অবাক হয়ে যান।[৪০৩]

আর একটি ঘটনা। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে একবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এসেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি ফখরে বাঙ্গাল (রহ.) কে বললেন- 'মাওলানা

---

৩৯৯ এইচএম জাবেদ হোসাইন, এক মনীষীর গল্প শোন, (ঢাকা: নাসির বুক ডিপো, বাংলাবাজার, ২০১৩খ্রি.), পৃ. ১৮।

৪০০ হাফিয মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

৪০১ প্রাগুক্ত, পৃ.২৩।

৪০২ নাসীম আরাফাত, বাংলার হিরে-মতি-পান্না-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮।

৪০৩ হাফিয মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

সাহেব! আপনারা রাজনীতি করেন কেন? আলেম বুজুর্গ মানুষ মাদ্রাসা মসজিদে বসে বসে আল্লাহর নাম স্মরণ করবেন। আপনারা রাজনীতির কী বুঝেন?' এ ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যে ফখরে বাঙ্গাল (রহ.) বাঘের মতো গর্জে ওঠে বললেন- 'মিস্টার সোহরাওয়ার্দি! আপনাদের রাজনীতির দৈর্ঘ্য কত? এ প্রশ্ন শুনে সোহরাওয়ার্দি তো একেবারে হতবাক। উত্তরের অপেক্ষা না করে ফখরে বাঙ্গাল (রহ.) নিজেই জবাব দিলেন- আপনাদের রাজনীতির দৈর্ঘ্য মাত্র সাড়ে তিন হাত, আর আমাদের রাজনীতির দৈর্ঘ্য দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত বিস্তৃত।[৪০৪]

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ফখরে বাঙ্গাল (রহ.)-এর বলিষ্ঠ ভূমিকা : ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে মিসরে মাজহাব বিলুপ্ত করার ব্যাপারে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করা হয়। এতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে একমাত্র ফখরে বাঙ্গাল (রহ.) প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধি করাচির মাওলানা ইউসুফ বিন্নোরি (রহ.) বলেন, "মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.) সম্মেলনে এক অনন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আমরা পাকিস্তানি ও ভারতীয় প্রতিনিধিরা সেখানে নতুন কোনো বক্তব্য পেশ করিনি। আমরা সম্মেলনে ফখরে বাঙ্গাল (রহ.)-এর বক্তব্যের সমর্থনেই জোরালো বক্তৃতা দিয়েছিলাম মাত্র।"[৪০৫]

সেই সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল: المسايرة مع الزمان অর্থাৎ 'যুগের সাথে তাল মিলিয়ে ইসলামকে পেশ করা।' ফখরে বাঙ্গাল (রহ.) এ আলোচ্যসূচির বিরোধিতা করে বলেন:

نحن المسايرون مع القرآن

و بنبي آخر الزمان

اما المسايرون مع الزمان فهم الشيطان.

ফখরে বাঙ্গাল তাজুল ইসলাম (রহ.) ছিলেন এ দেশের বিংশ শতাব্দীর এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তার নিরলস প্রচেষ্টার ফলে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে নতুন রূপ ধারণ করে। তিনি ছিলেন বাতিলের জন্য হুমকি স্বরূপ। কাদিয়ানি, আর্যপণ্ডিত, পতিতাবৃত্তি, কবর পূজারী ও বিদ'আতিদের বিরুদ্ধে অনড় ও এক আপোষহীন বীর সৈনিক। কুরআন-হাদীসের বাণী সম্বলিত উপদেশ, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য, অসাধারণ যুক্তি সম্পন্ন আলোচনার ও আধ্যাত্মিকতার ফলে অসংখ্য মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে। বিশেষ করে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার প্রসারে তাঁর অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। যার ফলে তিনি আজও আমাদের সকলের মাঝে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন এবং থাকবেন।

ফখরে বাঙ্গাল তাজুল ইসলাম (রহ.) সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার-

ফখরে বাঙ্গাল তাজুল ইসলাম (রহ.) ছিলেন বিংশ শতকের ক্ষণজন্মা এক মহাপুরুষ। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার চার বছর আগেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তাই তাঁর কোনো সহকর্মী বা সহপাঠী বর্তমানে জীবিত নেই। অনেক অনুসন্ধান করে তাঁর দুইজন ছাত্রের খোঁজ পাওয়া গেছে। তাঁর ঔরশজাত সন্তানদের মধ্য থেকে একজনের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তাঁর একমাত্র কন্যার স্বামী মাওলানা আশিক এলাহী, শায়েখুল হাদীস জামেয়া ইউনুসিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, তিনি বর্তমানে জীবিত আছেন। তাঁর সাথে দেখা করেও ফখরে বাঙ্গাল সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। সাক্ষাৎকারগুলো

[৪০৪] প্রাগুক্ত, পৃ.৬৫ ও ১০০।
[৪০৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

২০ থেকে ২৫ এপ্রিল ২০১৪ তারিখের মধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে সেসব তথ্য সন্নিবেশিত করা হলো।

১. **মাওলানা আব্দুল মালেক** -মুহাদ্দিস, জামিয়া ইউনুসিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বয়স ৭৮ বছর। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামিয়া ইউনুসিয়াতে ফখরে বাঙ্গাল (রহ.)-এর কাছে বুখারী শরীফ পড়েছেন। ফখরে বাঙ্গাল (রহ.) সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন: ফখরে বাঙ্গালের মতো সাদাসিধা প্রকৃতির মানুষ আমি আর দেখিনি। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে ফখরে বাঙ্গাল (রহ.) মিসরের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যাওয়ার জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে রওয়ানা হয়েছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলস্টেশনে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছেন। ট্রেন আসতে দেরি হওয়ায় তিনি স্টেশনেই একটি রুমাল বিছিয়ে বসে পড়েন। তিনি বললে চেয়ার বা ওয়েটিং রুমের ভালো ব্যবস্থা করা কঠিন ছিল না। ফখরে বাঙ্গাল (রহ.)-এর হাদীস পড়ানোর পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ফখরে বাঙ্গাল (রহ.)-এর হাদীস পড়ানোর পদ্ধতি ছিল অবিকল আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.)-এর মতো। তিনি প্রতিটি হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, হাদীসটির সনদের মান সম্পর্কে ইমামদের মন্তব্য ও হাদীসটি থেকে উদ্ভূত ফিক্‌হের মাসয়ালা চার মাজহাবের আলোকে বর্ণনা করতেন।[৪০৬]

২. **মাওলানা মুনিরুজ্জামান সিরাজী** -প্রিন্সিপাল, ভাদুঘর ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বয়স ৭৫ বছর। ১৯৫৫-৫৬ শিক্ষাবর্ষে তিনি ফখরে বাঙ্গাল **(রহ.)-এর** কাছে মেশকাত শরিফ পড়েছেন। ফখরে বাঙ্গাল **(রহ.)-এর** আচার-আচরণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ফখরে বাঙ্গাল **(রহ.)-এর** জীবনযাপন ছিল সাহাবায়ে কেরামের মতো সাধারণ। এতো বড় মাপের মানুষ হয়েও তিনি ছোটোখাটো চায়ের স্টলে বসে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতেন। তাদের সুখ দুখ ভাগ করে নিতেন। তিনি এতো প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন যে, তাঁর কথায় বড় বড় ব্যক্তিরাও লা-জওয়াব হয়ে যেতেন।[৪০৭]

৩. **হাফেজ ওয়ালিউল্লাহ্ বিন ফখরে বাঙ্গাল তাজুল ইসলাম (রহ.)** -পরিচালক , ফখরে বাঙ্গাল তাজুল উলুম হাফেজিয়া মাদ্‌রাসা। বয়স ৬৩ বছর। পিতার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, আমার বাবা ছিলেন নিরহংকার, দুনিয়াবিরাগী, প্রচারবিমুখ ও সাদাসিধা মানুষ। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে মিসরের আন্তর্জাতিক সম্মেলন শেষে তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব যান। তাঁর সাথে আরও অনেক ওলামায়ে কেরাম ছিলেন। বাদশাহ ফয়সাল এ আলেমদেরকে তাঁর প্রাসাদে বিশেষভাবে দাওয়াত দেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গী ওলামায়ে কেরাম সবাই দাওয়াতে গেলেও তিনি বাইতুল্লাহ শরীফে ইবাদতে মশগুল থাকেন। বাদশাহ্ ফয়সালের দাওয়াতে গেলে কমপক্ষে সে সময়টুকু বাইতুল্লাহর ফজিলতপূর্ণ ইবাদত থেকে বঞ্চিত হতে হবে এ কথা চিন্তা করে তিনি দাওয়াতে যাননি। তিনি আরও বলেন, ফখরে বাঙ্গাল **(রহ.)-এর** ইন্তেকালের পরে জামিয়া ইউনুসিয়া মাদ্‌রাসার সামনের রাস্তাটি তাঁর নামে নামকরণ করা হয়। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজের একটি ছাত্রাবাসের নামও তাঁর নামে নামকরণ করা হয়।[৪০৮]

---

[৪০৬] সাক্ষাতকার : ২১ এপ্রিল ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে।

[৪০৭] সাক্ষাতকার : ২১ এপ্রিল ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে।

[৪০৮] সাক্ষাতকার : ২৪ এপ্রিল ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-২.২ : মাওলানা মুফতী নূরুল্লাহ (রহ.) (১৯৩০-২০১০ খ্রি.)

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, যা ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি দান করে। এ জীবন বিধানকে দুনিয়ার বুকে কিয়ামত পর্যন্ত চালু রাখার জন্য সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর তিরোধানের ও উত্তম তিন যুগের পর থেকে যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে কিছু সংখ্যক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। যারা ইসলামের ধারক-বাহক এবং রাসূলের প্রতিনিধি হয়ে অর্পিত দায়িত্ব নিরলসভাবে পালন করেছেন ও করে যাচ্ছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত করতে থাকবেন। তাঁদেরই একজন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, শায়েখুল হাদীস, মুনাজিরে আযম আল্লামা মুফতী নুরুল্লাহ (রহ.)। তিনি অধুনা নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার অন্তর্গত মধ্যনগর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মুন্সী মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ (রহ.), দাদার নাম আবদুল মাজিদ (রহ.)। যদিও তাঁর জন্ম নরসিংদী জেলায় কিন্তু তাঁর পুরো জীবনটাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অতিবাহিত করেন।

প্রাথমিকভাবে মধ্যনগর গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন এবং পঞ্চম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর গড়াতুলী স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। তিনি অষ্টম শ্রেণিতে ও বোর্ড পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। ইলমে দ্বীন শিক্ষা অর্জনের সবচেয়ে বেশি অবদান ছিল তাঁর মাতা, দাদী ও আমীনপুরের মৌলভী ইদ্রিস সাহেবের। মৌলভী ইদ্রিস সাহেব তাঁকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা অর্জনের জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামিয়া ইসলামীয়া ইউনুসিয়ায় নিয়ে যান। তিনি সেখানে মাওলানা ফায়েজ উদ্দীন সাহেবের নিকট প্রাইভেটভাবে ইয়াজদাহম ও দাহম অর্থাৎ চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির সকল কিতাবাদি পড়ে নেন। অতঃপর জামিয়া ইউনুসিয়াতে জামাতে মিজান থেকে জামাতে চাহারম পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সাথে পড়ালেখা করেন।[৪০৯]

১৩৬৫ হিজরি পর্যন্ত জামিয়া ইউনুসিয়ায় জামাতে চাহারম পর্যন্ত পড়ালেখা শেষ করে ফখরে বাঙ্গাল আল্লামা তাজুল ইসলাম (রহ.)-এর অনুমতি নিয়ে ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দে গমন করেন এবং একাধারে পাঁচ বছর পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সাথে পড়াশোনা করে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ১৩৭৪ হিজরিতে দাওরায়ে হাদীসের সর্বোচ্চ সনদ লাভ করেন শিক্ষা জীবন সমাপন করেন।

মুফতী নূরুল্লাহ (রহ.) জামিয়া ইউনুসিয়া ও দারুল উলূম দেওবন্দে যাঁদের ছায়াতলে থেকে ইলমে দ্বীন হাসিল করেছেন তাঁরা হলেন - ফখরে বাঙ্গাল আল্লামা তাজুল ইসলাম (রহ.), নাসিরনগর; আল্লামা মুফতী ছফিউল্লাহ চাঁদপুরী (রহ.); রঈসুল মুফাসসিরীন আল্লামা সিরাজুল ইসলাম বড় হুযুর (রহ.); মুফতীয়ে আযম আল্লামা মুফতী রিয়াযতুল্লাহ (রহ.); শায়েখুল ইসলাম আল্লামা সৈয়দ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.); শায়েখুল আদব আল্লাম এজাজ আলী (রহ.); ইমামুল মাকুলাত ওয়াল মানকুলাত আল্লামা ইব্রাহীম বলিয়াভী (রহ.); আল্লামা আসগার হোসাইন (রহ.); আল্লামা গোলাম রাসূল খান (রহ.); আল্লামা ইদ্রিস কান্দুলভী (রহ.); আল্লামা ফখরুদ্দিন (রহ.) ও আল্লামা মেরাজুল হক (রহ.) প্রমুখ।[৪১০]

মুফতী নূরুল্লাহ (রহ.) ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা নবীনগর উপজেলার আশ্রাফপুর গ্রামের মাওলানা আব্দুল হাকিম সাহেবের প্রথম কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর ঔরসে নয় ছেলে ও তিন মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেরা হলো- (১) হাফেয মাওলানা কেফায়েতুল্লাহ। তিনি বর্তমানে নরসিংদী

---

৪০৯ এইচ.এম. জাবেদ হোসাইন, ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার উলামা-মাশায়েখের কর্মময় জীবন, (ব্রাহ্মণবাড়িয়া : আফাযির প্রকাশনী, ২০১৩খ্রি.), পৃ. ৫৭।

৪১০ প্রাগুপ্ত, পৃ. ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

জেলার রায়পুরা উপজেলার অন্তর্গত পান্থশালা মাদানী কমপ্লেক্স মাদ্রাসা মসজিদের সার্বিক তত্ত্বাবধনা ও পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। (২) হাফেয মাওলানা হেমায়েতুল্লাহ তিনি বর্তমানে আলহাজ্জ আমেনা বেগম ইসলামপুর মাদ্রাসার মুহাদ্দিস হিসেবে নিয়োজিত আছেন। (৩) হাফেয মাওলানা এনায়েতুল্লাহ তিনি বর্তমানে ঢাকা মালিবাগ মাদ্রাসার মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। (৪) মাওলানা বেলায়েতুল্লাহ সাহেব বর্তমানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্রাসার মুহতামিম ও শায়েখুল হাদীস এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা জামে মসজিদের খতীব হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। (৫) মাওলানা ছিবগাতুল্লাহ বর্তমানে ঢাকা বনানী টিএনটি কলোনী জামে মসজিদের খতীব এবং ঢাকা মহাখালী টিএনটি কওমী মাদ্রাসার মুহাদ্দিস হিসেবে নিয়োজিত আছেন। (৬) মাওলানা হেদায়তুল্লাহ বর্তমানে বায়তুল আরকাম, ঢাকা, জিঞ্জিরা মাদ্রাসার মুহাদ্দিস হিসেবে নিয়োজিত আছেন। (৭) হাফেয মাওলানা হুজ্জাতুল্লাহ বর্তমানে কাতারে অবস্থিত হাফেজী মাদ্রাসার শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত আছেন। (৮) হাফেয নুসরাত উল্লাহ, মালিবাগ মাদ্রাসা হতে দাওরায়ে হাদীস পাশ করেন। (৯) হাফেয আযমত উল্লাহ, বর্তমানে মাদ্রাসায় জালালাইন শরীফের ছাত্র হিসেবে অধ্যয়নরত আছেন। মেয়েরা তিন জন হলেন। (১) মাছুমা (২) মারহুমা (৩) মাগফুরা[৪১১] মুফতী নূরুল্লাহ (রহ.) আধ্যাত্মিক দীক্ষা ও ইলমে মারেফতের উন্নতি লাভের জন্য স্বীয় ওস্তাদ আল্লামা সৈয়দ আসআদ আল-মাদানী (রহ.) থেকে খেলাফত লাভ করেন।[৪১২]

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা মুফতী নুরুল্লাহ (রহ.) স্বপ্নে দেখলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ঈদগাহ মাঠে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম উপস্থিত। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জেলা ঈদগাহ মাঠে মিম্বরে বসা। তিনি বলেন, মুফতী রিয়াযতুল্লাহ (রহ.)-এর অপেক্ষা করেছি, তিনি আসার পর দোয়া হবে। এই স্বপ্নের কথা বড় হুযুর (রহ.)-কে বলার পর বুঝতে পারলেন যে, রিয়াযতুল্লাহ শূন্য পদে স্থলাভিক্ত হবেন। মুফতী নূরুল্লাহ (রহ.) পরবর্তী সময়ে প্রধান মুফতী হিসেবে ফাতোয়া দানের গুরু দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

মাওলানা মুফতী নূরুল্লাহ (রহ.) জীবনের সর্বশেষ পবিত্র হজ্জ শেষ করার পর দেশে ফিরে এসে ভীষণ অসুস্থ হয়ে যান। দিন দিন এই অসুস্থতা বাড়তেই থাকে। অবশেষে ২২ জানুয়ারি ২০১০ খ্রিস্টাব্দে রজনীর ইতি টেনে প্রভাতের সূচনালগ্নে ইন্তেকাল করেন। তাঁর জানাযার নামাযে দেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামসহ হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমান উপস্থিত হন। তাঁর জানাযার নামাযের ইমামতি করেন তাঁর বড় ছেলে হাফেয মাওলানা কেফায়েতুল্লাহ, তাঁকে ফখরে বাঙ্গাল আল্লামা তাজুল ইসলাম (রহ.)-এর কবরের পাশে দাফন করা হয়।[৪১৩]

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা মুফতী নূরুল্লাহ (রহ.)-এর অবদান-

মাদানী মনজিল দেওবন্দ শহরের একটি সম্ভ্রান্ত বাসভবন। দারুল উলূম দেওবন্দের শায়খুল হাদীস ও সদরুল মোদাররিসীন শায়খুল ইসলাম মাওলানা সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর বাড়িটি হলো মাদানী মনজিল। এখানে মাদানী মসজিদ অবস্থিত। মুফতী নূরুল্লাহ (রহ.) দীর্ঘ সময় ধরে এই মাদানী মসজিদের ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব পালন করেন। এ মসজিদে মাদানী (রহ.)-এর সাক্ষাতে আগত শিষ্যগণ শত শত আলেম-উলামা-কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা নামায পড়তে

৪১১ জামিয়া ইউনুসিয়ায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ইতিহাস ঐতিহ্য ও অবদান, (ব্রাহ্মণবাড়িয়া: জামিয়া ইসলামীয়া ইউনুসিয়া, ২০০৯খ্রি.), পৃ. ১৪০।

৪১২ জামিয়া ইউনুসিয়ায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ইতিহাস ঐতিহ্য ও অবদান, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৪১।

৪১৩ এইচ.এম. জাভেদ হোসাইন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উলামা-মাশায়েখের কর্মময় জীবন, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

আসেন। মাদানী (রহ.) এ মসজিদে ইমাম হিসেবে তাঁর প্রিয় শিষ্য মুফতী নুরুল্লাহ সাহেবকে নির্বাচন করেন। এ হিসেবে মুফতী নূরুল্লাহ সাহেব শায়খুল ইসলাম মাদানী (রহ.)-এর দীর্ঘদিনের ইমাম হওয়ার দুর্লভ সম্মান লাভ করেন। মসজিদে মাদানী (রহ.) মুকতাদী আর মুফতী নূরুল্লাহ তাঁর ইমাম হলেও বাস্তবজীবন ছিল সম্পূর্ণ উল্টা। শায়খুল ইসলাম মাদানী (রহ.) ছিলেন মুফতী নূরুল্লাহ সাহেবের ইল্ম ও রূহানী শিক্ষক। আর মুফতী নূরুল্লাহ (রহ.) ছিলেন পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণকারী।[৪১৪]

মাদানী মঞ্জিলটি মেহমানদারির জন্য প্রসিদ্ধ। মাওলানা মুফতী নুরুল্লাহ (রহ.) কোনো এক সেমিনারে বলেন, 'মাই নে ইস খান্দান কূ কাভী একীলা খা-তে হুয়ে নাহী দে-খা। আমি এই খান্দানকে কখনো একা খেতে দেখিনি।

শায়খুল ইসলাম মাদানী (রহ.) ছিলেন অনেক বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। মুফতী নূরুল্লাহ এই হিমালয় ব্যক্তিত্বের ছায়ায় থাকতেন। সেই মহান ব্যক্তিত্বের স্পর্শ নিতেন। তাঁর খিদমতে নিজেকে বিলিয়ে দিতেন। কিতাবের টেবিলে বড় বড় কিতাবের পাঠদান, রাজনৈতিক মঞ্চে জাতি ও দেশের হক প্রতিষ্ঠায় বক্তব্য প্রদান, মুসলমানদের ইসলাহে জায়গায় জায়গায় সফর, ওয়াজে অংশ নেয়া ও বাই'আত করাসহ এছাড়াও বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতেন। শায়খুল ইসলাম মাদানী (রহ.) এতে কর্মব্যস্ততার মধ্যে থাকায় মুফতী নূরুল্লাহ (রহ.) তাঁর শাগরেদদের পাঠানো বিভিন্ন মাসয়ালা-মাসায়েলের উত্তরও তৈরি করে দিতেন। মুফতী নূরুল্লাহ (রহ.) এ সকল বিষয়ে লিখে উপস্থাপন করলে শায়খুল ইসলাম মাদানী (রহ.) তাতে নিজের স্বাক্ষর করে দিতেন।[৪১৫]

১৩৭৯ হিজরিতে মাদানী (রহ.) তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘ প্রায় সাত বছর পর স্বদেশে ফিরে আসেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামিয়া ইউনুসিয়ায় শিক্ষকগণ ও বিশেষত ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.) এবং মাওলানা সফিউল্লাহ চাঁদপুরী (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই মনীষীবৃন্দ মুফতী নূরুল্লাহ (রহ.)-কে মুহাদ্দিস হিসেবে জামিয়া ইউনুসিয়ায় নিয়োগদান করেন। মুফতী সাহেব আপন শিক্ষকদের সাথে খেদমত করার সুবর্ণ সুযোগকে পরম সৌভাগ্য ভেবে জামিয়া ইউনুসিয়াকে কর্মস্থল হিসেবে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নেন। তিনি অত্র মাদ্রাসায় হাদীসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পাঠদান করেন।[৪১৬]

একই সাথে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় জামে মসজিদের ইমাম ও খতীব হিসেবে ফখরে বাঙ্গাল (রহ.) তাঁকে দায়িত্ব অর্পণ করেন। জামিয়া ইউনুসিয়াতে মুহাদ্দিস হিসেবে গুরু দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আমানতদারীর সাথে সুদীর্ঘ ৫৩টি বছর পর্যন্ত পালন করেন এবং বাতিল বিরোধী সকল আন্দোলনে তিনি ছিলেন বীর মুজাহিদ ও মুনাজিরে আযম। তিনি মাদ্রাসার সভাপতি আলহাজ্জ সৈয়দ আহমদ নাবালক মিয়া সাহেবকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতেন। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে ফখরে বাঙ্গাল আল্লামা তাজুল ইসলাম (রহ.) ইন্তেকালের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ছদর ও মুহতামিম হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।[৪১৭]

ভুবন নাসিরনগর উপজেলার একটি গ্রাম। এ গ্রামেই ফখরে বাঙ্গাল আল্লামা তাজুল ইসলাম (রহ.)-এর জন্ম। ফখরে বাঙ্গাল (রহ.) তাঁর নিজ গ্রাম ভুবনে দ্বীনের আলো ছড়াতে, হিদায়াতের পথ দেখাতে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। নাম তার 'আনওয়ারুল উলূম

---

৪১৪ মুহাম্মদ নুসরাতুল্লাহ নূর, আলোর আধার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৬৬।

৪১৫ প্রাগুপ্ত, পৃ. ৬৩।

৪১৬ এইচ.এম. জাভেদ হোসাইন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উলামা-মাশায়েখের কর্মময় জীবন, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৬০।

৪১৭ প্রাগুপ্ত, পৃ. ৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্‌রাসা'। মুফতী সাহেব (রহ.) কে এই প্রতিষ্ঠানে দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষাদানের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি অধ্যাপনার পূর্বে নিয়মিতভাবে কিতাব মুতালাআ ও পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণের পর ছাত্রদেরকে পড়াতেন। আর এলাকার সাধারণ মানুষকে দ্বীনী শিক্ষা প্রদানসহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দিকনির্দেশনাসহ আধ্যাত্মিক মুজাহাদায় দীর্ঘ সময় ব্যয় করতেন। প্রায় সময় তিনি নির্জনে গিয়ে যিকির, মোরাকাবা ও অন্যান্য ইবাদাতে মশগুল থাকতেন। এভাবে অধ্যাপনা, উপাসনা ও তাদরিসের মাধ্যমে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার প্রসার ও ইবাদতে সময় ব্যয় হত।[৪১৮]

মুফতী নূরুল্লাহ (রহ.) পারিবারিক ও আপন ওস্তাদদের পরামর্শের পর জামিয়া ইমদাদিয়ায় খেদমতে জড়িত হবার সিদ্ধান্ত নেন এবং সেখানে চলে যান। যোগ দেন এ দেশের বিখ্যাত দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রচার-প্রসারে। তিনি আবার ফিরে যান হাদীসের দারস ও অধ্যাপনার জগতে। জামিয়া ইমদাদিয়ার প্রিন্সিপাল সাহেব বলেন, মাওলানা আপনার সাথী বন্ধুরা তো আমাকে বলেছেন যে, আপনি আরবী সাহিত্যে অপূর্ব ক্ষমতা ও দখল রাখেন। আপনার আরবী হাতের লেখাও নাকি খুব সুন্দর। যেন কলম থেকে মুক্তা ঝরে। তাই বলছিলাম, আমাদের মাদ্‌রাসায় অবদান ও খেদমত সম্পর্কে আরবীতে একটি গোছালো প্রবন্ধ আকারে তৈরি করতেন আমরা তা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কাজে তা ব্যবহার করতে পারব এবং এতে মাদ্‌রাসার সুনামও বৃদ্ধি পাবে। মুফতী সাহেব সে প্রবন্ধ লিখে প্রিন্সিপাল মাওলানা আতহার আলী (রহ.)-কে দেখালেন। জামিয়া ইমাদাদিয়ার দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য, বিস্তৃত সেবা কর্মকাণ্ড, জাতির একনিষ্ঠ সেবক উলামায়ে কেরাম তৈরিতে তাঁর অবদান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে লিখিত সে প্রবন্ধটির সূচনাটাই ছিল চোখে পড়ার মতো। সূচনাটা ছিল এরূপ, "অর্থ- সব প্রশংসা আল্লাহরই। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হউক নবীদের মধ্যে সবচেয়ে আতহার (পবিত্র) ও রাসূলদের মধ্যে সবচেয়ে আশরাফ (শ্রেষ্ঠ) নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর। প্রবন্ধের সূচনাতেই মুহতামিম সাহেব নিজের নাম 'আতহার' ও তাঁর পীর সাহেব মুজাদ্দিদে মিল্লাত হাকিমুল উম্মাত মাওলানা 'আশরাফ' আলী থানুভী (রহ.)-এর নাম দেখে অভিভূত হয়ে গেলেন। মুচকি মুচকি হেসে বলেন, "মাওলানা আপকে কলম তো বহুত জোরদার হে"। মাওলানা আপনার কলম তো ভারী শক্তিশালী। অত্র মাদ্‌রাসায় তিনি হাদীস ও তাফসিরের গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ অধ্যাপনা করেন।[৪১৯]

অতঃপর পুনরায় ফখরে বাঙ্গাল (রহ.) মুফতী নূরুল্লাহ (রহ.)-কে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা মসজিদের ইমাম ও খতীবের দায়িত্বের পাশাপাশি জামিয়া ইউনুসিয়ার মুহাদ্দিস হিসেবে নিয়োগ দান করেন। তিনি অত্র জামিয়ায় হাদীসের কিতাবের পাঠদানের পাশাপাশি নাহু, সারাফ, মানতেক, বালাগাত ও আরবী সাহিত্যের কিতাবও পড়াতেন। অত্র জামিয়ার প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মকানুনের আওতায় নিঃশর্তভাবে যোগদান করলেও মুফতী সাহেব শর্ত সাপেক্ষে জামে মসজিদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তা হল, দ্বীনী প্রয়োজনে হজ্জ, ওমরা ও অন্যান্য দ্বীনী কর্মকাণ্ড যে কোন সময় সফরে যাওয়ার অনুমতি থাকতে হবে।[৪২০]

সমাজসংস্কার ও বিভিন্ন বিদ'আতের বিরুদ্ধে ভূমিকা : মাওলানা মুফতী নূরুল্লাহ (রহ.) ফখরে বাঙ্গাল (রহ.) সাথে সার্বক্ষণিক বাহাস, মোনাজারা, মাহফিল, মজলিসসহ প্রতিটি গুরুপূর্ণ কাজে তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতেন। নিজেকে ফখরে বাঙ্গাল (রহ.)-এর খেদমতে সবসময় প্রস্তুত রাখতেন। বিশেষ করে বাহাস ও মোনাজারায় মুফতী সাহেব (রহ.) ছিলেন ফখরে বাঙ্গাল (রহ.)-এর ডান হাত।

---

৪১৮ মুহাম্মদ নুসরাতুল্লাহ নূর, আলোর আধার, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৭৭-৭৮।

৪১৯ প্রাগুপ্ত, পৃ. ৮১-৮২।

৪২০ জামিয়া ইউনুসিয়ায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ইতিহাস ঐতিহ্য ও অবদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি কুরআনের আয়াত, হাদীস ও ফিকহের উদ্ধৃতি এবং পূর্ববর্তী ইমামগণের ফতুয়াসহ কিতাব থেকে খুঁজে দ্রুত বের করে দিতেন এবং তা উপস্থাপন করার জন্য প্রস্তুত করে দিতেন। কখনো কখনো তার্কিক বিষয় ও উপাদানসমূহ আগেই রচনা করে নিতেন।

ফখরে বাঙ্গাল (রহ.)-এর সাথে মুফতী সাহেব (রহ.) কম করে হলেও বিশটির মতো বাহাস বা তর্কযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কোন কোন বাহাসে বাতিল ও ভণ্ড পক্ষ সহজেই হেরে যায়। কখনো আবার কয়েকদিন বা কয়েক অধিবেশনের পর তাদের হার নিশ্চিত হত। এটা সত্য যে, সত্য মত ও সঠিক মতাদর্শের অধিকারীদেরও তর্কে হেরে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। যদিও এর সংখ্যা খুবই নগণ্য। তবে আল্লাহর রহমতে ফখরে বাঙ্গাল (রহ.)-এর প্রতিপক্ষ বাতিলগোষ্ঠী প্রতিবারই তর্কযুদ্ধে চূড়ান্তভাবে হেরেছে কিংবা হার মেনেছে।[৪২১]

কিতাব রচনায় তাঁর অবদান : মাওলানা মুফতী নুরুল্লাহ (রহ.)-এর লিখিত অনেকগুলো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। তার মধ্যে দুইটি কিতাব ছাপা হয়েছিল। তাহল (১) মারকুমাতে হাফিজ যা আধ্যাত্মিক বিষয়ের ওপর গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা পাওয়া যায়। (২) মাশায়েখে চিশত্। এটি তার জীবনের শেষ দিকের লেখা। এছাড়াও অপ্রকাশিত কয়েকটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে। যথা- 'কাঁদায় হাসি' নামক একটি বই মাওলানা মুফতী নুরুল্লাহ (রহ.) হজ্বের সফরে লিখেছিলেন। দীর্ঘদিন হাদীসের গ্রন্থ আবু দাঊদ শরীফ পড়াতেন, তাই তিনি আবু দাউদ শরীফের একটি শরাহ বা ভাষ্যগ্রন্থ লিখেছিলেন। এছাড়া (১) 'ইকলীলুস সুআদা ফি যিকরি তাজিল উলামা' এটি ফখরে বাঙ্গাল (রহ.)-এর আরবী জীবনী গ্রন্থ। (২) শায়েখুল ইসলাম মাওলানা সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর একটি কিতাবের বাংলা অনুবাদ। (৩) 'শহরে মিজান মুনশাইব'। এটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে লিখিত আরবী সরফ শাস্ত্রের সহায়ক গ্রন্থ। (৪) 'আল মুআদালাহ ফিল মুবাদালাহ' গ্রন্থটি ওয়াকফের মাল সংক্রান্ত লিখিত একটি সুন্দর কিতাব। যেমন- কেউ মসজিদ মাদ্‌রাসা ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্পদ ওয়াক্ফ করে গেলে এই সম্পর্কে তিনি তার অভিজ্ঞতা ও গবেষণা লব্ধ বিভিন্ন মাসয়ালা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

মাওলানা মুফতী নূরুল্লাহ (রহ.)-এর একটি নমুনা ফতোয়া : মুফতী নূরুল্লাহ (রহ.)-এর একটি নুমান ফতোয়া এখানে উল্লেখ করা হল। প্রশ্নঃ ইসলামে কচ্ছপের বিধান কি? মুসলমানরা কি কচ্ছপ খেতে পারবে? কুরআন হাদীসের আলোকে এর সমাধান চাই।

জবাব ঃ কচ্ছপ আমাদের হানাফি মাজহাব মতে খাওয়া হারাম। কারণ ইহা 'খবিছ' প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহতা'আলা খবিছ প্রাণীকে হারাম করে বর্ণনা করেন- ويحرم عليكم الخبائث ।[৪২২] অবশ্য এক হাদীস আছে, لابأس فى اكل السلحفاة অর্থাৎ, কচ্ছপ আহারে সমস্যা নেই। উপরোল্লিখিত হাদীস মনছুখ। কারণ ইসলামের শুরুতে এইরূপ হারাম জিনিস হালাল ছিল। পরে হারাম হওয়ার আদেশ নাযেল হয়েছে।[৪২৩] সুতরাং কেহ যদি ইহাকে খাওয়া হালাল মনে করে অথবা হারাম জানিয়াই বিসমিল্লাহ্ বলিয়া খায় তবে তাহার তওবা করে তাজদিদে ঈমান ও তাজদিদে নেকাহ করা জরুরি। অর্থাৎ নতুনভাবে কালেমা পড়ে ঈমান আনয়ন করা এবং বিবাহিত স্ত্রী থাকলে তার সাথে নতুনভাবে

---

[৪২১] মাওলানা হিফজুর রহমান, আল্লামা শাহ মুহিব্বুর রহমান (রহ.) স্মারক গ্রন্থ, (আঞ্জুমানে মাদানীয়া মুহিব্বিয়া, বাংলাদেশ, ২০১১খ্রি.) পৃ. ২৭।

[৪২২] আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ : ১৫৭।

[৪২৩] আল বাহরুর রাইক, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৭২।

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহ করা জরুরি । সাথে সাথে এই অপকর্মের দরুন তাহাকে সামাজিকভাবে তা'যীর বা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া চাই।[৪২৪]

মাওলানা মুফতী নূরুল্লাহ (রহ.) স্বহস্তে লিখিত আরবী কবিতাসমূহ:

انشودة طربية

محامد ارباب الحمد لله وحده	وصلوة القائلين للنبى المبجل
مدارس اسلام تضائت شئونها	وفاق ضياء الشمس فى كل مترل
فاهلا وسهلا ارتوت بقد و حكم	حدائق مدارس العلوم ببنجل
فنهنيكم جامعة شيد اسها	بوطاهر قدجائنا بالتوكل
مدرسها نجم الهدى فى بلاغهم	لعلم وفقه ودين مكمل
الاسراج اسلام اضمائها خلعة	هو الشيخ استاذ العلوم ببنجل
فيافؤاد خلق طبتم ثم عشتم	بعيش رغيد ثم دين مكمل
نهنيكم بامرفاق بالفضل والعلى	فؤاد الناس من خطيب معول
تهنيكم بالورود والورود معجب	لخق كثير من مدبر و مقبل
على العين ممشا كم على الرأس مشيكم	وفى القلب مأ واكم رجاء المؤمل
سلام عليكم ورحمة ربكم	كسمك الختام من قلب مجذل
وروح وريحان زرضوان ربكم	لطلاب كلى شهير بننجل
فيارب تكريما وتشريفا وعودامباركا	لضيف كريم وخطيب معسل
فيأتيكم مزجاة اخوة يوسف (ع)	وما شغفى الا رجاء التقبل[425]

সৌদী আরবের সাবেক রাষ্ট্রদূত জনাব ফুয়াদ আল খতিব জামেয়া ইউনিসিয়ায় আগমন উপলক্ষে মুফতী নূরুল্লাহ (রহ.) কর্তৃক নিম্নের কাব্যটি মানপত্রে রচনা করেন

قبول دعوة العرس وتهنية الضيف الكريم

بقلم الاستاذ وفضيلة الشيخ المفتي ومولانا محمد نور الله رحمه الله

اذا ما نراى امرا يوفق سنة	نلبى بالشوق والشوق ازائد
فداع دعانى بالكتاب كانه	سرار اعراس ترى وتشاهد
دعاوا مقامثل الجنون ومابه	جنون ولكن حب نور تراود
فلما سمعت الصوت ناديت نحوه	بصوت كثير الفرح خلايكابد
فاظهرت شوقى ثم القيت مرطه	لدعوة عرس نازل تسهد
فقلت له اهلا وسهلا ومرحبا	رشدت الى اعلام علم تعاهد

---

৪২৪ প্রাগুপ্ত, পৃ. ১০৩।

৪২৫ মুহাম্মদ নুসরাতুল্লাহ নূর, আলোর আধার, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১১৭।

Dhaka University Institutional Repository

وقمت الى بيت ملئ دينا وحكمة	وذاك سراج اسلام لا يطفيه عائد
بماذا اهديك ابا الفتح حله	بنور جهان ام ببشرى تخلد
وفزت الى نور وفتح تعده	لجنة خلد تزهي وتوبد
بشرى لكم ابا الفتح بن منير	بعين شافيه في الجنان تعاهد[426]

মাদ্‌রাসা-মসজিদ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান

মধ্যনগর মাদ্‌রাসা-মসজিদ প্রতিষ্ঠা: আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিশ। আলেমগণ তাঁদের উত্তরাধিকারী বজায় রাখেন ইলমের ধারাবাহিকতার মাধ্যমে। সেই ধারাবাকিতা থেকে কিয়ামত পর্যন্ত কত সৌভাগ্যবান বান্দা তাঁদের পিপাসা নিবারণ করবে! মুফতী সাহেব (রহ.) আম্বিয়া (আ.) এর মীরাসকে জারি রাখতে সদা সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। নিজের গ্রাম মধ্যনগরে তিনি আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে একটি মাদারসা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভব করে নিজেদের জায়গায় প্রতিষ্ঠা করলেন একটি দ্বীনী মাদ্‌রাসা। অত্র মাদ্‌রাসায় কুরআন-হাদীসের বাণী শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্তমানে সেই মাদ্‌রাসায় একটি উন্নত মানের হিফজ বিভাগ চালু রয়েছে যা দুই জন হাফেজ দ্বারা পরিচালিত। আর কিতাব বিভাগে জামাতে শরহে বেকায়া পর্যন্ত চালু রয়েছে। ছাত্র সংখ্যা প্রায় ১৭৫ জন এবং শিক্ষক সংখ্যা ১০ জন। মাদ্‌রাসা সংলগ্ন একটি মসজিদও প্রতিষ্ঠা করেন যাতে এলাকার আম জনগণ এতে জামাতের সাথে নিয়মিত নামায আদায় করতে পারেন।

ভেলোয়ারচর মাদ্‌রাসা-মসজিদ প্রতিষ্ঠা: ভোলোয়ারচর গ্রামে মুফতী সাহেবের পরদাদার বাড়ি। এ গ্রামেও মুফতী সাহেবের ক্রয়কৃত জায়গা ছিল। মুফতী সাহেব সেখানে নিজের বাড়ি বানানোর প্রয়োজনের চেয়েও আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে একটি মাদ্‌রাসার অভাব বেশি অনুভব করে মাদ্‌রাসা তৈরির প্রতিষ্ঠাকেই অগ্রাধিকার দিলেন এবং নিজের জায়গাটুকু ওয়াক্‌ফ করে দিয়ে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। অত্র মাদ্‌রাসায় একটি হেফজ বিভাগও চালু করেন। নূরানী মক্তবের ছোট্ট শিশুরা কুরআন হাদীসের নূরে নূরানী হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে সেই নূর ছড়াতে থাকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। দূর থেকে বহু ছাত্র এখানে এসে এলমে নববী হাসিল করছে।

পান্থশালা মাদ্‌রাসা-মসজিদ স্থাপন: মুফতী সাহেবের জীবনের সর্বশেষ অবদান এ পান্থশালা মাদ্‌রাসা। সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল মারাত্মক অনুন্নত। এ অঞ্চলে তিনি একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। অত্র মাদ্‌রাসার তত্ত্বাবধায়কের জন্য দায়িত্ব অর্পণ করেন মাওলানা হাফেজ কেফায়েতুল্লাহ এর ওপর। তিনি অত্র মাদ্‌রাসার পরিচয় সংক্ষিপ্ত আকারে সুন্দরভাবে দিয়েছেন। তিনি বলেন, নরসিংদী জেলায় রায়পুর উপজেলার অন্তর্গত মুর্শিদাবাদ, ফকিরের চর (খেয়াঘাট) চরাঞ্চল এলাকাটি একটি অনুন্নত, অথচ এতদাঞ্চলের প্রায় ছয়টি ইউনিয়নের জনগণের এটিই ছিল চলাচলে একমাত্র পথ। ফলে প্রতিদিন, বিশেষ করে ঝড়-বৃষ্টির দিনে মানুষসহ অগণিত গবাদি পশুর আশ্রয়ের তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। এ বিষয়টি অনুধাবন করে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে মানব দরদী শায়েখুল হাদীস মাওলানা মুফতী নূরুল্লাহ (রহ.) "পান্থশালা" নামে একটি আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন করে সৃষ্টির সেবায় এগিয়ে আসেন। ১৭ইং নভেম্বর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে ভিত্তি স্থাপন করেন। এরপর আওলাদে রাসূলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি পুনঃস্থাপিত হয়। তাই এটা শুধু একটি আশ্রয় কেন্দ্র নয় বরং একটি আধুনিক মাদ্‌রাসা কমপ্লেক্স হিসেবে গড়ে তোলেন। যেখানে দ্বিতীয়া তরিকার

[৪২৬] মুহাম্মদ নুসরাতুল্লাহ নূর, আলোর আধার, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১১৭-১১৮।

Dhaka University Institutional Repository

খানকাহ, মসজিদ-মাদ্‌রাসা, উলামায়ে কিরামের তরবিয়াত সেন্টার ও বয়স্ক আশ্রমসহ স্কুল এবং চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে পৌঁছান।[৪২৭]

রাজনৈতিক ময়দানে ভূমিকা : জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের নেতা মাওলানা আব্দুল্লাহ দরখাস্তী (রহ.), মাওলানা গোলাম গাইছ হাযারুভী ও মাওলানা মুফতী মাহমুদ (রহ.)-এর মতো বিশ্ববরেণ্য বুযুর্গ নেতৃবৃন্দ ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তান অঞ্চলে জমিয়তকে চাঙ্গা করতে খুব জোরালোভাবে তৎপরতা চালান। এসময় মুফতী নূরুল্লাহ সাহেবের ব্যবস্থাপনায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে জমিয়তের ঐতিহাসিক সমাবেশ হয়। এসময় তিনি বহু বাধা ও সমস্যা উপেক্ষা করে জমিয়তের নেতৃবৃন্দের আমন্ত্রণ ও সভা বাস্তবায়নে জোরালো ভূমিকা পালন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায়ই সে সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে জমিয়ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে আর ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের খালপাড়ের 'আমেনা মঞ্জিল' ছিল অত্র সংগঠনের দফতর। তবে জমিয়ত উলামায় এসব কর্মকাণ্ডে মুফতী নূরুল্লাহ (রহ.) সদস্যপদ বা কোনো ধরনের দায়িত্বে সম্পৃক্ত ছিলেন কিনা তা নিশ্চিত বলা যাচ্ছে না। সেকালের সেই সভা উপলক্ষে প্রায় তিন'শ বিশ্ববরেণ্য যুযুর্গ নেতা আলেমকে মুফতী সাহেব পারিবারিকভাবে আপ্যায়ন করেন। এর কিছুদিন পরই স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিয়তের নেতৃবৃন্দদেরকে নিয়ে বহু সমাবেশ করেছিলেন।[৪২৮]

মাওলানা আতহার আলী (রহ.)-এর সাথে কিছু স্মৃতিচারণ : একদা মাওলানা আতহার আলী (রহ.) মুফতী নূরুল্লাহ সাহেবের দারসে উপস্থিত হন। তাঁর পাঠদান পদ্ধতি ও গতিধারা সরাসরি প্রত্যক্ষ করতে তিনি গভীর মনোযোগের সাথে হাদীসের ক্লাসে বসেন। মুফতী সাহেব তখন মজা করে বলেন, হযরত এমনিতে তো কিছু পড়াতে পারতাম, কিন্তু আপনার মতো এতো বড় আলেম পাশে বসা থাকলে তো মুখ বন্ধ হয়ে আসে। কিন্তু কি আর করা। ক্লাসে যেহেতু এসেই পড়লাম আর ছাত্র ভায়েরাও কিতাব খুলে বসে আছে তাই কিছুটা পড়িয়ে দিচ্ছি। এই বলে মুফতী সাহেব দীর্ঘক্ষণ পড়ালেন। বুঝিয়ে দিলেন ছাত্রদেরকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। ব্যাখ্যা করলেন সাবলীলভাবে। মাওলানা আতহার আলী (রহ.) চুপচাপ বসে রইলেন, মুফতী সাহেবের পাঠদান অবলোকন করলেন এবং খুবই মুগ্ধ হলেন। যেন তিনি তাঁর থেকে যেমনটি চেয়েছেন সেভাবেই পেয়েছেন।[৪২৯]

মাওলানা মুফতী নূরুল্লাহ (রহ.)-এর খলিফাগণ-

১। মাওলানা আব্দুল করিম সাহেব, সাহেবজাদা মাওলানা আব্দুল হক শায়খে গাজিনগরী (রহ.), সুনামগঞ্জ, সিলেট।

২। মাওলানা মুফতী মোবারকুল্লাহ সাহেব, মুহতামিম, জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুসিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

৩। হযরত মাওলানা মনিরুজ্জামান সিরাজী সাহেব, মুহতামিম, জামিয়া সিরাজিয়া দারুল উলূম ভাদুঘর মাদ্‌রাসা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

৪। মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেব, মুহাদ্দিস, জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুসিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

৫। মাওলানা শামছুর হক সাহেব, মুহাদ্দিস, জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুসিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

৬। মাওলানা ইব্রাহীম সাহেব, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, পাঁচগাঁও, হরষপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

৭। মাওলানা সলিমুল্লাহ সাহেব, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, পাঁচগাঁও, হরষপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।[৪৩০]

---

[৪২৭] মুহাম্মদ নুসরাতুল্লাহ নূর, আলোর আধার,প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৪৮-১৪৯।

[৪২৮] প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৩০-২৩১।

[৪২৯] প্রাগুপ্ত, পৃ. ৮২।

[৪৩০] জামিয়া ইউনুসিয়া ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার ইতিহাস ঐতিহ্য ও অবদান, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৪২।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুফতী নূরুল্লাহ (রহ.) আলিমদের প্রতি কিছু নসিহত

মাওলানা মুফতী নূরুল্লাহ (রহ.) হামদ ও রাসূল (সা.) এর প্রতি দুরূদ ও সালামের পর একবার সংক্ষিপ্তভাবে আলেম ওলামাদের প্রতি ১০টি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন,

- দ্বীনের তা'লিম দেওয়া দ্বীনেরই খেদমত। আর দ্বীনের খেদমত আল্লাহ তা'লার নেয়ামতসমূহের মাঝে এক বিরাট নেয়ামত। দ্বীনের হেফাজতে দ্বীনের কাজে লেগে থাকা জাগতিক নেয়ামত থেকে অনেক বেশি বড় নেয়ামত। সুতরাং এখলাছের সাথে তা'লিমী খেদমত সবচেয়ে বেশি ও বড় আমল।
- এখলাছ: এখলাছ ছাড়া আমল দোযখের ইন্ধন। ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে মাত্র পাঁচখানা হাদীস নির্বাচন করেছেন। তন্মধ্যে একখানা হল 'ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়্যা-ত'। সুতরাং আমাদের যাবতীয় আমল কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করা উচিত। আমরা চেষ্টা করি এবং এ দৌলত পাওয়ার জন্য একে অপরের জন্য রাব্বে কারিমের নিকট দোয়া করি।
- দোয়ার এহতেমাম: এই কাজের মধ্যে কামিয়াবি হাসিল করার জন্য আল্লাহর নিকট নিজের জন্য এবং তালেবে এলমের জন্য শেষ রাত্রে কান্নাকাটি করে চোখের পানি ছাড়া নেহায়েত জরুরি।
- তাকওয়া ও তাওক্কুল খুবই জরুরি। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ হাদীস ও তাফসির এর কিতাব এবং আকাবেরদের জীবনী থেকে হাসিল করে নিবে।
- নিজেকে 'মুস্তাগনী' মনে করা চাই। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন দরবারের আশা না রাখা চাই। বেশি বেশি টাকা পয়সার সুযোগ পেলে যেখানে জরুরত আছে ঐ স্থান ত্যাগ না করে থেকে খেদমত জারি রাখা চাই। জরুরত আল্লাহ তা'আলার নিকট হইতে লওয়ার অভ্যাস করা চাই। ফখরে বাঙ্গাল (রহ.) বার হাজার টাকার বেতন, বাড়ি-গাড়ি ফ্রি পাওয়া সত্ত্বেও এই জামিয়া ইউনুসিয়া ছাড়েন নাই।
- লেনদেন পরিষ্কার হওয়া চাই। 'হা ছিবু কাবলা আন তুহা ছাবু' অর্থাৎ অন্য কেউ তোমার কাছ থেকে হিসাব নেওয়ার আগেই তুমি তোমার হিসাব নিয়ে নিবে।
- উম্মতের খেদমতের গুণ থাকা চাই। আম মুসলমান এমনকি ছোটদেরও খেদমত করা চাই। এই সিফাত হাসেল করার জন্য বড় সুযোগ হল তাবলিগ জামাত। সুতরাং মাঝে মাঝে প্রচলিত তাবলিগ জামাতের সাথে কিছু সময় লাগান। ফখরে বাঙ্গাল (রহ.) বলতেন, রোদে ক্ষেত নষ্ট হয় না।
- ছাত্রদেরকে নসিহত করার সময়ও মাওশেনাছী জরুরি।
- নিজের রূহানী ইছলাহ জরুরি। অর্থাৎ কোন রূহানী মুরুব্বীর মাধ্যমে রূহানীর রোগগুলির থেকে শেফা হাসিল করা চাই।[৪৩১]

---

[৪৩১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১১২।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন মনীষীদের দৃষ্টিতে মাওলানা মুফতী নূরুল্লাহ (রহ.)-

১। ফখরে বাঙ্গাল আল্লামা তাজুল ইসলাম (রহ.) বলতেন, "মাওলানা নূরুল্লাহ একজন মুজাহিদ।" তাঁর পর্বতসম জ্ঞানের স্বীকৃতি দিয়ে একবার বলেছিলেন, মাওলানা নূরুল্লাহর ইলেমের ওপর আমার ভরসা আছে।

২। রঈসুল মুফাসসির আল্লামা সিরাজুল ইসলাম বড় হুজুর (রহ.) বলতেন, মুফতী সাহেবের মতো মানুষ এই যুগে নাই"। এবং আরও বলতেন "আমার মুফতী সাহেব, আমার কাজী সাহেব"। আরেকবার মুফতী সাহেবের অসুস্থতার সময় দোয়া করে বলছিলেন, আল্লাহ্ মুফতী সাহেব আমার কোমর। আমার কোমরটাকে তুমি খাড়া করে দাও।

৩। আল্লামা মুফতী ফজলুল হক আমিনী (রহ.) বলেন, "মুফতী নূরুল্লাহ সাহেব এই যুগের একজন শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। তাঁর জানাযায় বলেন, "তিনি কখনো বাতেলের সাথে আপোষ করেন নাই।[৪৩২]

৪। মাওলানা আশেক এলাহী ইব্রাহীমী, শায়খুল হাদীস, জামিয়া ইউনুসিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া, তিনি বলেন, আল্লামা মুফতী নূরল্লাহ (রহ.)-এর বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য ছিল নিজের বুযুর্গি ও কামালাতকে গোপন করে রাখা এবং জগতবাসীর সামনে নিজের সুখ্যাতি প্রচার বিমুখ হওয়া। তবুও আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিনয়, নম্রতা-ভদ্রতা, সহনশীলতা ও সাদেকী ইত্যাদি গুণাবলীর দ্বারা জগতবাসীর সামনে প্রসিদ্ধ ও মাশহুর করে দিয়েছেন। তাঁর জিন্দেগী-বন্দেগী, চলাফেরা, কথাবার্তা, উঠাবসা, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছেদ ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বিশ্বনবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর বাস্তব নমুনা পরিলক্ষিত হতো। অর্থাৎ সুন্নাতে নববী উজ্জ্বল নিদর্শন ছিলেন তিনি। এই মহান ব্যক্তিত্বের তাকওয়া অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। এ মহান গুণাবলীর প্রভাবেই অন্তরঙ্গ বন্ধু তো বটে শত্রুরা তাঁকে সমীহ করে চলতেন। তিনি যখন মেশকাত জামাতের ছাত্র তখন আরবীতে ফখরে বাঙ্গাল (রহ.)-এর জীবনী লিখে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফখরে বাঙ্গাল (রহ.)-এর সুযোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে তিনি সকল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, ব্যক্তি যিনিই হোন না কেন, সঠিক সময় হক কথাটি বলা, হক কাজ করা তাঁর একটি অনবদ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।[৪৩৩]

৫। মাওলানা আব্দুল মালেক উস্তাজুল উলামা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামিয়া ইউনুসিয়া, তিনি বলেন, মুফতী সাহেব (রহ.) ছিলেন, হার লাইনের মাহের। জ্ঞানের প্রত্যেক শাখার শিক্ষক তাঁর সাথে আর অন্যান্য সাধারণদের সাথে এটাই বড় পার্থক্য। তিনি বাংলাদেশের সর্বত্র মুফতী সাহেব নামে সর্বাধিক খ্যাতি ও পরিচিতি লাভ করেন এবং তিনি যুগশ্রেষ্ঠ মুনাজিরে আযম ছিলেন। আল্লামা মুফতী নূরুল্লাহ (রহ.) পাক ভারত উপমহাদেশের একজন শীর্ষস্থানীয় অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। মুসলিম জাতির পদপ্রদর্শক, আধ্যাত্মিক রাহবর, হাদীস ও তাফসির বিশারদ, ইখলাস ও নিষ্ঠা, দ্বীনের দরদ ও আন্তরিকতা নিয়ে সার্বক্ষণিক চিন্তা ও উম্মতের কল্যাণ কামনার পাশাপাশি উঁচু পর্যায়ের মুত্তাকী ও পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য, প্রকাশ্যে, গোপনে, আনন্দে সুখে-দুঃখে, সুস্থতায়-অসুস্থতায়, ভ্রমণে, বাসস্থানে, মোটকথা জীবনের প্রতিটি স্তরে মুফতী সাহেবের তাকওয়ার কোন তুলনা হয় না।[৪৩৪]

---

[৪৩২] প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩৬৭-৩৬৮।

[৪৩৩] সাক্ষাতকার : তারিখ - ১৫ মে ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ।

[৪৩৪] সাক্ষাতকার : তারিখ - ২৫ জুন ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

৬। মুফতী ইমদাদুল্লাহ সাহেব, মুহাদ্দেস জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া, লালবাগ, ঢাকা, তিনি বলেন, মাওলানা মুফতী নূরুল্লাহ (রহ.)-এর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক যিন্দেগী পর্যবেক্ষণ করেছেন, এমন যে কোন ব্যক্তিই মনে করেন বর্তমান যুগে মুফতী সাহেব আমাদের আকাবিরী দ্বীনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। ওলিকুল শিরোমণি, জ্ঞানতাপস, দ্বীনের নক্ষত্র খাঁটি নায়েবে নবী, নীতি-নিষ্ঠা সদ্ব্যবহার, ইখলাস, সততা ন্যায়পরায়ণতা, আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ নির্ভরতা, সেবা ও সাহসিকতা ইত্যাদি গুণাবলীর সমাহার তাঁকে সোনালী আভায় করেছে দ্বীপ্ত। তিনি সাহাবায়ে কেরামের যথার্থ উত্তরসূরি। তাঁর চাল-চলন, খাওয়া-দাওয়া, বিছানাপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ অত্যন্ত সুন্দর। জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুসিয়ার সান্নিধ্যচ্যুত হওয়া ভীষণ অস্বস্তিকর ব্যাপার হয়ে যেত। তিনি ছেলে- মেয়ে ও আত্মীয়তার মায়া ত্যাগ করে নিতান্ত অসুস্থতা সত্ত্বেও মাদ্‌রাসার মুহাব্বতে মাদ্‌রাসাতেই থাকতেন ও সময় দিতেন। জামিয়া ইউনুসিয়ার স্রোতধারা তাঁর দেহের প্রতি শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত। তাঁর মতো কর্মঠ যোগ্য আলেম ও শিক্ষক জাতির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।[৪৩৫]

---

৪৩৫ সাক্ষাতকার : তারিখ - ২০ আগস্ট ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-২.৩ : মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (রহ.) (১৮৮১-২০০৬ খ্রি.)

যুগশ্রেষ্ঠ মুফাসসিরে কুরআন শায়েখুল হাদীস আল্লামা মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (রহ.) ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার দশদোনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী মোহাম্মদ আবদুল মাজিদ ও মাতার নাম মোসাম্মৎ আমেনা বেগম। তিনি ছিলেন পিতা-মাতার একমাত্র পুত্র সন্তান। জন্মের কিছু দিন পর তাঁর মায়ের ইন্তেকাল হয়, এরপর সাত বছর বয়সে পিতাও ইন্তেকাল করেন। পিতা-মাতা উভয়ের ইন্তেকালের পর আপন দাদা-দাদীর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হয়।

দাদা মুন্সী কয়জুদ্দীন (রহ.)-এর নিকট পবিত্র কুরআনের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। কুরআন মাজীদের প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তাঁর দাদা তাঁকে বাড়ির পার্শ্ববর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন। সেখান থেকে তিনি চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। অতঃপর বাঁশগাড়ি গ্রামের মৌলভী ইয়াকুব সাহেবের নিকট প্রাথমিক আরবী, উর্দু ও ফার্সী শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর কানাইঘর গ্রামের মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। সেখানে মাওলানা ইদ্রীস সাহেবের তত্ত্বাবধানে থেকে পড়ালেখা করেন। তারপর তিনি বাহেরচর নিউ স্কীম মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে পঞ্চম শ্রেণি পাশ করেন। অতঃপর ঢাকা নবাব বাড়িতে অবস্থিত তৎকালীন পূর্ব বাংলার প্রসিদ্ধ মাদ্‌রাসা "ইসলামীয়া হাম্মাদিয়া মাদ্‌রাসায়" ভর্তি হয়ে চার বছর পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। অত্র মাদ্‌রাসায় তিনি জামায়াতে পাঞ্জম থেকে জামাতে উলা পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন খুবই মেধাবী। জামাতে পাঞ্জম সেন্টার পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণ পদক লাভ করেন।

উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য তিনি হিন্দুস্থানে রামপুর মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। রামপুর মাদ্‌রাসায় তাঁর মনঃপুত না হওয়ায় তিনি কিছু দিন পড়ালেখা পর ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় চলে যান এবং সেখানে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কুরআন-হাদীস, তাফসীর ও ফিকাহ বিষয়ের ওপর উচ্চশিক্ষা অর্জন করে দেশে ফিরে আসেন। আসার সময় ওস্তাদগণ বলেছিলেন, ইনশাআল্লাহ তুমছে দ্বীন কী খেদমত হোগা।[৪৩৬]

তিনি ঢাকা নবাব বাড়ি ইসলামীয়া হাম্মাদিয়া মাদ্‌রাসা থেকে পড়ালেখা শেষ করার পর চাচা শাফি উদ্দিন তাঁকে ছয়আনী গ্রামের জনাব মুন্সী জয়নুদ্দীনের প্রথম কন্যা মোসাম্মৎ সুফীয়া খাতুনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। প্রথম স্ত্রীর ইন্তেকালের পর সূর্য কান্দী নিবাসী শেখ মুহাম্মদ আবদুল হামীদের কন্যা মোসাম্মৎ মুরশিদা বেগমকে বিবাহ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর মুহাম্মদপুর রঙবাড়ি নিবাসী আবদুল ওয়াদুদের কন্যা মোসাম্মৎ আমিনা বেগমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। প্রথম স্ত্রী ব্যতীত অন্য স্ত্রীগণ থেকে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। তাঁর ঔরসে নয়জন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে পাঁচ জন ছেলে, চার জন মেয়ে। ছেলেরা হলেন:- মাওলানা মুনিরুজ্জামান সিরাজী, মাওলানা আবদুস সালাম, ক্বারী আবদুল হাই, মুহাম্মদ আবদুল ওয়াদুধ ও মুহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম। মেয়েরা হলেন:- মোসাম্মৎ ছালেহা খাতুন, মোসাম্মৎ আফিয়া খাতুন, মোসাম্মৎ আয়েশা বেগম ও মোসাম্মৎ নূর জাহান বেগম। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত।

মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (রহ.) দারুল উলূম দেওবন্দের শিক্ষা সমাপ্তির পরই মাওলানা সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি মাদানী (রহ.)-এর সুযোগ্য খলীফা ফেনুয়ার পীর মাওলানা দেলোওয়ার হোসাইন (রহ.) হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন

---

[৪৩৬] মাও. আনোয়ার বিন মুসলিম, হায়াতে সিরাজ, (বি-বাড়িয়া : আস সিরাজ প্রকাশনী, ২০০৭খ্রি.), পৃ. ৮-২৪।

Dhaka University Institutional Repository

এবং ইলমে মা'রিফাতের খেলাফত লাভ করেন। তিনি ছয় জন প্রসিদ্ধ আলেমকে খেলাফত প্রদান করেন।

মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (রহ.) জীবনে দুইবার হজ্জ পালন করেন। প্রথমে হজ্জ পালন করেন ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে। দ্বিতীয়ত হজ্জ পালন করেন ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে। তখন তাঁর সাথে জামিয়া ইউনুসিয়ার কয়েকজন ওস্তাদ ও অন্যান্য উলামায়ে কিরামসহ মোট ১৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কাফেলা ছিল।

রইসুল মুফাস্সির মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (রহ.) ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তাঁর নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন তাঁর সুযোগ্য সন্তান মাওলানা মুনীরুজ্জামান সিরাজী সাহেব। তাঁর জানাযায় প্রায় তিন লক্ষাধিক লোক অংশগ্রহণ করে। এটি ছিল স্মরণ কালের সর্ববৃহৎ জানাযা। জানাযা নামায শেষে তাঁকে ভাদুঘর মাদ্‌রাসার উত্তর পার্শ্বে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।[৪৩৭]

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (রহ.)-এর অবদান-

মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (রহ.) দেওবন্দ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামিয়া ইসলামীয়া ইউনুসিয়ার তৎকালীন সদর ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.) মাওলানা সিরাজুল ইসলামকে অত্র জামিয়ার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দানের প্রস্তাব পেশ করেন। উক্ত প্রস্তাবে তিনি সম্মত হয়ে অত্র মাদ্‌রাসায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। হিজরি ১৩৫০ সন থেকে ১৪২৭ সন পর্যন্ত একাধারে প্রায় সুদীর্ঘ ৭৭ বছর জামিয়া ইসলামীয়া ইউনুসিয়ায় ইলমে দ্বীনের খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। শিক্ষকতা জীবনে তিনি হাদীস, তাফসীর, আকাইদ, ফিকহ্, আদব, নাহ্, সরফ, মানতিক ও বালাগাতসহ ইসলামী জ্ঞান ভাণ্ডারের সকল বিষয়ের ওপর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পাঠদান করেন। শায়খুল হাদীস ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.) ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকালের পর থেকে শায়খুল হাদীস পদে সহীহ বুখারী শরীফের পাঠদান করেন। অতঃপর ভারপ্রাপ্ত মুহতামিম মুফতী রিয়াযত উল্লাহ (রহ.) ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকালের পর তিনি অত্র জামিয়ার মুহতামিমের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মুহতামিমের দায়িত্ব পালনকালে জামিয়া ইসলামীয়া ইউনুসিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তা'লীম-তারবিয়াত ও নির্মাণ কাজের প্রসারতায় ব্যাপক উন্নতি লাভ করে। পাশাপাশি ফখরে বাঙ্গাল তাজুল ইসলাম (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর থেকে তিনি সর্বসম্মতিক্রমে আজীবন জেলা ঈদগাহ ময়দানে ঈদের নামাযের ইমামতির দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন।

মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (রহ.) তাঁর সুদীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে অসংখ্য যোগ্য ছাত্র গড়ে তোলেন। যাঁরা দেশব্যাপী দ্বীনের বহুমুখী খিদমত করেছেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম উল্লেখ্য করা হলো-

(১) শায়খুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক (রহ.) সাবেক শায়খুল হাদীস জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ, ঢাকা। (২) মাওলানা আলী আকবর (রহ.) বিশিষ্ট মুরুব্বী বাংলাদেশ তাবলীগী জামাআত। (৩) মাওলানা আব্দুল বারী (রহ.) সদরুল মুদাররিসীন তালশহর মাদ্‌রাসা। (৪) মুফতী নূরুল্লাহ (রহ.) মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস জামিয়া ইসলামীয়া ইউনুসিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া। (৫) মাওলানা আবদুন নূর (রহ.) নাযিমে তা'লীমাত জামিয়া ইসলামীয়া ইউনুসিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া। (৬) মাওলানা আবদুল মতীন খান (রহ.) মুহাতামিম সৈয়দাবাদ সানী ইউনুসিয়া মাদ্‌রাসা। (৭) মাওলানা আবদুল ওয়াহহাব ভূঞা (রহ.) প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক নাদিয়াতুল কুরআন বাংলাদেশ। (৮) মাওলানা আবদুল হক গাজীনগরী (রহ.) প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম দারসাহপুর মাদ্‌রাসা সুনামগঞ্জ। (৯) মাওলানা

[৪৩৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

ফয়জুদ্দীন (রহ.) সাবেক মুহতামিম, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা। (১০) মাওলানা তাবারক আলী (রহ.) মুহতামিম, বাহুবল মাদ্‌রাসা, হবিগঞ্জ।

মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (রহ.) শিক্ষকতা জীবনের শুরু থেকে সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামিয়া ইউনুসিয়াতে পবিত্র কুরআনের তাফসীর আরম্ভ করেন। এই তাফসীর মাহফিলে ছাত্র, ভক্তবৃন্দ, জনসাধারণ ও ফখরে বাঙ্গাল (রহ.)-সহ অসংখ্য আলেম উলামা উপস্থিত থাকতেন। তাফসীর শেষে তিনি বিশেষ দোয়া পরিচালনা করতেন। পর্যায়ক্রমে এই তাফসীর মাহফিলের প্রভাব এলাকার মধ্যে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, সন্ধ্যার পর থেকে মানুষ সমাগত হতে থাকেন। মহিলা শ্রোতাদের বিশেষ অনুরোধে পৃথকভাবে তাফসীর শুনার ব্যবস্থা করেন। কয়েক বছরের মধ্যে এই তাফসীর মাহফিল বিরাট সমাবেশ রূপ ধারণ করে। মঞ্চ থেকে বক্তার আওয়াজ সমাবেশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছানো মুশকিল হয়ে পড়ে। সে সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কোন মাইকের ব্যবস্থা ছিল না। তাই তাফসীর কমিটি তড়িৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ঢাকা থেকে মাইক ক্রয় করে আনার ব্যবস্থা করেন। তখন থেকেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় বিভিন্ন স্থানে তাফসীর মাহফিল শুরু হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থানে তিনি পবিত্র কুরআনের তাফসীর মাহফিল করতেন। যেমন ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আট মাইল দূরে বড়াইল নামক গ্রামে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে উত্তর দিকে চার মাইল দূরে সুহিলপুর মাঠে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আট মাইল উত্তরে সরাইল উপজেলা সংলগ্ন উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর নিয়াজ মোহাম্মদ হাই স্কুল মাঠে, মালিহাতা, বুধল, পৌরতলা ও মুহাম্মদপুরসহ বিভিন্ন স্থানে পাঁচদিন, সাতদিন, পনরদিন ব্যাপী তাফসীর মাহফিল করেন। প্রত্যিটি তাফসীর মাহফিলের শেষের দিন মুনাজাতে শরীক হওয়ার জন্য হাজার হাজার দীনদার মুসলমান নর-নারী দূর দূরান্ত থেকে সমবেত হতো। তিনি তাফসীর মাহফিল বা ওয়াজে কখনো কোন ব্যক্তি বা দলকে কটাক্ষ করে কিছু বলা বা সমালোচনা করা থেকে বিরত ছিলেন বরং অত্যন্ত নম্রতা-ভদ্রতা এবং সম্মানের সাথে সম্বোধন করতেন। কেউ বিপথে থাকলে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে শুধরানোর চেষ্টা করতেন। ফলে তাঁর আলোচনায় কখনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়নি। সাধারণ ও শিক্ষিত মানুষ সকলেই তাঁর আলোচনায় প্রভাবিত হত। মাহফিলের শেষে দু'আয় শরীক হওয়ার জন্য মন্ত্রী, এমপি, চেয়ারম্যান, ডি.সি, এসপিসহ সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ আগমন করতেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বহু কাদিয়ানী ও অমুসলিম মুসলমান হয়েছে। তাঁর ইসলামি আলোচনায় প্রতিটি নারী পুরুষের হৃদয়ে ইসলামী জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর তাফসীর মাহফিলের ব্যাপক প্রসারতায় কারণে আলেম উলামাসহ সকলেই মুফাস্‌সির হুজুর বলে খেতাব করেন।

বাহাস ও মুনাযারার মাধ্যমে বাতিল বিরোধী সংগ্রামঃ জামিয়া ইউনুসিয়ার মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের সাথে বাহাস বা বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। কাদিয়ানীদের পক্ষেই বাহাস করার জন্য সুদূর লাহোর থেকে কাদিয়ানী আলেম আনা হতো। তারা ঘোষণা দিল বাহাস হবে আরবী ভাষায়। ফখরে বাঙ্গাল তাজুল ইসলাম (রহ.) তাহাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে দু'ভাষী হিসেবে আল্লামা সিরাজুল ইসলাম (রহ.) নাম ঘোষণা করলেন। জুহরের নামাযের পর থেকে পরের দিন জুহর পর্যন্ত বাহাস চলতে থাকে এবং বিশ্রামের জন্য বিরতি দেওয়া হয়। বিরতির সময় কাদিয়ানী মৌলভী বিশ্রামের নাম দিয়ে পালিয়ে যায়।[৪৩৮]

এমনিভাবে বিভিন্ন সময়ে কাদিয়ানী, বিদ'আতী ও অন্যান্য বাতিল পন্থিদের সঙ্গে বাহাস, মুনাযারা ও সংগ্রাম করেন। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে নাস্তিক মুরতাদ তছলিমার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে

---

[৪৩৮] এইচ.এম. জাভেদ হোসাইন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উলামা-মাশায়েখ, কর্মময় জীবন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

এনজিওদের সাথে বিশাল মোকাবেলা করেন। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে ভাদুঘর বি'দআতীদের সাথে সংগ্রাম করেন। কান্দিপাড়া কাদিয়ানী উপাসনালয় উৎখাত করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন। বর্তমানে এই মসজিদটি কাতাহ মসজিদ নামে পরিচিত। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে ফতোয়া বিরোধী রায় বাতিলের দাবিতে সংগ্রাম করলে ৬জন শহীদ হন। মোটকথা তাঁর গোটা জীবনটাই ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের খেদমতে নিবেদিত।

মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (রহ.) দ্বীন প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে ভাদুঘর মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সর্বপ্রথম সেখানে একটি হিফয বিভাগ চালু করে প্রধান ওস্তাদ হিসেবে নিয়োগ দেন তারই যোগ্য ছেলে হাফেয মাওলানা আবদুস সালামকে। পরবর্তীতে মাদ্‌রাসা সংলগ্ন একটি মসজিদ ও মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে অত্র মাদ্‌রাসাটি দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত যা জামিয়া সিরাজিয়া দারুল উলূম ভাদুঘর নামে পরিচিত। মাদ্‌রাসাটি তাঁর বাড়ির সামনে অবস্থিত। অত্র জামিয়া সিরাজিয়ার মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তারই যোগ্য সন্তান মুনীরুজ্জামান সিরাজী সাহেব। তাঁর ইল্‌মী যোগ্যতা, দক্ষতা ও সুষ্ঠু পরিচলানায় প্রতিষ্ঠানটি অত্র অঞ্চলে একটি ইল্‌মী ও আমলীর মারকায হিসেবে পরিচিতি লাভে সক্ষম হয়েছে। তিনি অত্র মাদ্‌রাসায় সকাল-বিকাল ইসলাহী মজলিস চালু করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় পূর্বাঞ্চলে বহু মাদ্‌রাসা ও দ্বীনী শিক্ষা মক্তব প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (রহ.) 'আততাকরীরুল ফাসীহ লি হাল্লি মিশকাতিল মাসাবীহ' নামে মিশকাত শরীফের দুই খণ্ডের একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেন। অত্র কিতাবটি হাদীসের ব্যাখ্যা হিসেবে খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করে। এছাড়াও তাঁর মাওয়ায়েজ সংকলন রয়েছে যা মাওলানা ইকবাল সিরাজী সাহেব সংকলন করেন, যার নাম 'মাওয়ায়েজে সিরাজী'। উল্লেখিত গ্রন্থটি পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে যেসকল বিষয়সমূহ আলোচনা করা হয়েছে তা হলো- ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব, ঈমানের গুরুত্ব, নামাযের গুরুত্ব, আত্মার পরিশুদ্ধি, মাতা-পিতার অধিকার, দুনিয়ার হাকীকত, তওবার গুরুত্ব। দ্বিতীয় খণ্ডে মানব অধিকার, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, সন্তানের অধিকার, পর্দা ও নারীর অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে শবে কদর শবে বরাত, সদকা ও যাকাত, ধর্ম ও সিয়াসাত, এখলাছ ও নিয়্যাত, হজ্জ ও যিয়ারত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে সুন্নাত ও বিদ'আত, ক্বেয়াম ও মিলাদ, তাবলীগ ও জিহাদ, রমাযান ও কুরবান, কেন এই ইনসান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম খণ্ডে মউত ও কবর, ক্বেয়ামত ও হাশর, জান্নাত ও জাহান্নাম মুমিনের দৈনন্দিন আমল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আর মালফূযাত ও অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক বয়ানের ওপর আরও দু'টি কিতাব সংকলন করেন। মাওলানা আনোয়ার হোসাইন এই গ্রন্থে দুটির নাম দেন 'মালফূযাতে সিরাজী' ও মাজালিসে সিরাজী'।

মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (রহ.) তিনি ২০০২ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসেবে 'জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশের' পক্ষ থেকে মাসিক মদীনার সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খাঁন সাহেবের স্বহস্তে স্বর্ণপদক লাভ করেন। [৪৩৯]

মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (রহ.) অসংখ্য মালফুজাত আলোচনা করেন, তার মধ্যে নিম্নে কয়েকটি মালফুজাত উল্লেখ করা হলো:-

- আমাদের একমাত্র পথ প্রদর্শক আল-কুরআন ও আল-হাদীস।

[৪৩৯] তিনটি ফুলের গল্প, এইচ. এম. জাবেদ হোসাইন, (নাদিয়া প্রকাশনী, ঢাকা: ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৪০-৮২।

Dhaka University Institutional Repository

- বিশ্ববাসীর ভিন্ন ভিন্ন প্রাণ, বিশ্ব জগতের একটি মাত্র প্রাণ, তার নাম হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।
- এলেমে দ্বীন একমাত্র পাওয়া যায় মাদ্রাসাসমূহে। সারা বিশ্বের বড় মহাবিদ্যালয়ে নয়।
- অন্ধ, বোবা, বধির, বোকা অর্থাৎ চক্ষুওয়ালা, কানওয়ালা, দিলওয়ালা হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ অন্ধ, বোবা, বধির, তার কারণ হলো যে কাজ চক্ষু দ্বারা করা দরকার সেই কাজ করেনা, কান দিয়ে যা শুনা দরকার তা শুনে না এবং মুখ দিয়ে যা বলা দরকার তা বলে না।
- ইসলামের আসল খুঁটি হচ্ছে মন, তন, ধন, অর্থাৎ মনের দ্বারা ইশারা হচ্ছে ঈমানের দিকে। তনের দ্বারা ইশারা হচ্ছে ইবাদতে বদনী যেমনঃ নামায, রোযা, হজ্জ এবং ধনের দ্বারা ইশারা হচ্ছে যাকাতের দিকে।
- আমাদের আসল বাড়ির রাস্তা হল ইসলাম। আর ইসলামের বাড়ি হচ্ছে জান্নাত। মানুষ রাস্তা ভুলে গেলে অথবা হারিয়ে গেলে যেমন বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছা অসম্ভব। তেমনিভাবে ইসলাম, ঈমান, তাকওয়া ছাড়া বেহেশতে যাওয়া অসম্ভব।
- ইসলাম, ঈমান, তাকওয়া এই তিন বিষয় হচ্ছে এমন- যেমন এক মায়ের তিন সন্তান। একটা ছাড়া আরেকটা অসম্পূর্ণ। ঈমান একটা গাছ, তার অনেক শাখা আছে, ঈমান হচ্ছে গাছের শিকড়, ইসলাম হচ্ছে গাছের মূল বডি, তাকওয়া ডালপালা। একটা মানুষের মাথা, পা, পেট এই তিনটি অঙ্গ যেমন গুরুত্বপূর্ণ এমনিভাবে ঈমান, ইসলাম, তাকওয়া সবগুলিই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
- মানুষ মানুষকে ধোঁকা দিতে পারে। কিন্তু আল্লাহকে কেহ ধোঁকা দিতে পারেনা। আল্লাহ জানে অন্তরের খবর, মানুষ তা জানেনা।
- মুসলমানদের দ্বীন ও দুনিয়ার ইজ্জত মহানবী (সা.) অনুকরণের মধ্যে নিহিত। এছাড়া সব পথ লাঞ্ছনার।
- দুধ ছাড়া যেমন দই আর মাখন পাওয়া যায় না, ঠিক তদ্রুপ ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া ইসলাম পাওয়া যায় না।
- মুখে স্বীকার করা, অন্তরে বিশ্বাস করা এবং মনে মনে তা বাস্তবায়ন করার নাম হলো ঈমান।
- আল্লাহ পরীক্ষক, দুনিয়ার সকল মানুষ পরীক্ষার্থী, প্রশ্ন হল করণীয় আর বর্জনীয়, অর্থাৎ হালাল এবং হারাম। দুই ফেরেশতা ম্যাজিস্ট্রেট।
- শান্তি আগুনে তালাশ করলে পাওয়া যায় না, শান্তি পাওয়া যায় ইসলামে।
- ইলমে দ্বীন দেনেওয়ালা আল্লাহ তা'আলা। বন্টনকারী নবীজী (সা.)। সাহেদার ওলামায়ে কেরামগণ।
- ঐক্যই শক্তি, শক্তিতেই ভক্তি, ভক্তিতেই মুক্তি, মুক্তিতেই আল্লাহর রেজামন্দি, রেজামন্দিতেই বেহেশত।
- আল্লাহ রহমত অসীম, বান্দার রহমত সসীম।

Dhaka University Institutional Repository

- ওস্তাদের খেদমত করলে ওস্তাদ হওয়া যায়। পিতা-মাতার খেদমত ভ্রমণ করা যায়। ওস্তাদ ও পিতা মাতার উপদেশ স্মরণ রাখলে ইজ্জত পাওয়া যায়।
- দুনিয়া পরীক্ষার হল, আম্বিয়ায় কেরামগণ হলো শিক্ষক, পড়া হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। প্রশ্ন হবে কবরে মার রাব্বুকা, অমা দ্বীনুকা, অমান হাজার রাজুলু।[৪৪০]

মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (রহ.) সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার-

মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (রহ.) ছিলেন আপোষহীন বিপ্লবী মুজাহিদ ও সমাজ সংস্কারক। তিনি ছিলেন আলেম সমাজ ও সাধারণ মানুষের অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি। তাঁকে সকলেই মুফাস্সির হুজুর বলে সম্বোধন করতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার মুহতামিমসহ আরও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যারা তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া গিয়েছে নিম্নে সেসব তথ্য উল্লেখ করা হল।

১। মাওলানা মনিরুজ্জামান বিন সিরাজুল ইসলাম (রহ.) তিনি বলেন, আমার পিতা ছিলেন একজন যুগশ্রেষ্ঠ মুফাসসির ও মুহাদ্দীস। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ বুখারী শরীফের দারস প্রদান করেন। তিনি কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলন, মুরতাদ তসলিমার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ফতোয়াবিরোধী রায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং সমাজে বিভিন্ন অনৈসলামীক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করেন। তিনি সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় পবিত্র কুরআনের তাফসীর মাহফিল চালু করেন। তাঁর তাফসীর মাহফিলে হাজারো দ্বীনদার মুসলমান নর-নারী দূর দূরান্ত থেকে সমবেত হতো। তাঁর মাধ্যমে বহু নাস্তিক মুরতাদ ও বিদ'আতী ইসলামের ছায়াতলে ফিরে আসে।[৪৪১]

২। মাওলানা সাজিদুর রহমান, মুহাদ্দিস জামিয়া ইউনুসিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। তিনি বলেন, মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (রহ.) ছিলেন একজন হক্কানী আলেম, বুযুর্গ ও শায়খুল হাদীস। তিনি দীর্ঘ ৬০ বছর যাবৎ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে তাফসীর মাহফিলের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের তাফসীর পেশ করেন। তিনি ভাদুঘর মাদ্রাসাসহ বহু মক্তব, মাদ্রাসা ও দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তিনি মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করেন। তাঁর পুরো জীবনটাই ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের খেদমতে নিবেদিত।[৪৪২]

৩। মাওলানা মুফতী মোবারক উল্লাহ, মুহাদ্দিস জামিয়া ইউনুসিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। তিনি বলেন, মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (রহ.) ছিলেন একজন আপোষহীন বিপ্লবী মুজাহিদ। তিনি মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ও ফকীহ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি কুরআন হাদীসের সর্বোচ্চ পর্যায়ের জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়ে আপোষহীন জেহাদী চেতনা সম্পন্ন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলাসহ পূর্বাঞ্চল ব্যাপী ইসলামের প্রচার-প্রসারে এক সিপাহসালার ভূমিকা পালন করেন। তিনি মানুষের কাছে আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন-বিধান ইসলামের সঠিক পরিচয় তুলে ধরে মানুষকে মুক্তি ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে সফল ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন দা'য়ী ইলাল্লাহ। তাঁর মতো ক্ষণজন্মাগণের আগমন পৃথিবীতে অনেক কম হয়ে থাকে।[৪৪৩]

---

৪৪০ মাও. আনোয়ার বিন মুসলিম, হায়াতে সিরাজ,, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-৩৪।

৪৪১ সাক্ষাৎকার : তারিখ ২০.০৫.২০১৫ খ্রিস্টাব্দে ।

৪৪২ সাক্ষাৎকার: তারিখ ২৯.০৫.২০১৫ খ্রিস্টাব্দে।

৪৪৩ সাক্ষাৎকার: তারিখ ২৫.০৬.২০১৫ খ্রিস্টাব্দে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-২.৪ : মাওলানা সিদ্দীকুর রহমান (রহ.) (১৮৮৯-২০০৩খ্রি.)

মাওলানা সিদ্দীকুর রহমান (রহ.) ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার পাঘাচং রেলস্টেশন সংলগ্ন ফুলবাড়িয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত দ্বীনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব মুনাওয়ার আলী ও মাতার নাম উম্মে জামীল। মাওলানা সিদ্দীকুর রহমান (রহ.)-এর মাতা ছিলেন একজন পরহেযগার ও বিদুষী মহিলা। তিনি তাঁর মায়ের নিকট প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি শুরু করেন এবং পবিত্র কুরআনের প্রাথমিক শিক্ষাও গ্রহণ করেন। এরপর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামিয়া ইউনুসিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। অত্র মাদ্রাসাটির প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তাঁর বড় ভাই মাওলানা সিরাজুল ইসলাম সাহেব। তিনি তাঁর কাছে ইলমে দ্বীনের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর মাছিহাতা গ্রামের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা মুছলেহ উদ্দীন সাহেবের সাথে ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম হাটহাজারী মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে সেখানে জামাতে জালালাইন পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সহিত পড়ালেখা করেন। হাটহাজারী মাদ্রাসায় পড়া অবস্থায় তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে মাওলানা মুছলেহ উদ্দীন সাহেব তাঁকে মাদ্রাসা থেকে বাড়িতে নিয়ে আসেন।[৪৪৪] কিন্তু মাওলানা সিদ্দীকুর রহমান (রহ.)-এর ছিল ইল্ম দ্বীনের প্রতি প্রবল আগ্রহ। তাই তাঁর মহিয়সী মা স্বীয় জমি বিক্রি করে সেই অর্থ দ্বারা তাঁকে বিখ্যাত দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্র ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দে প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি পাঁচ বছর পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সাথে পড়ালেখা করেন। লেখাপড়ার প্রতি অধিক আগ্রহ থাকায় শায়েখুল ইসলাম মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। দারুল উলূম দেওবন্দে থাকাকালীন সময় কিছু ওযীফা পান, সেগুলো তাঁর সহপাঠী বন্ধু ঢাকা ফরিদাবাদ মাদ্রাসার সাবেক মুহতামিম মাওলানা বজলুর রহমান (রহ.)-কে হাদিয়া হিসেবে প্রদান করেন।

দারুল উলূম দেওবন্দে পড়াকালীন তাঁর উল্লেখ্যযোগ ওস্তাদ ছিলেন, শায়েখুল ইসলাম মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.), শায়েখুল আদব মাওলানা ই'জায আলী (রহ.), সাইয়েদ মাওলানা মুর্তজা হাসান (রহ.), মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী (রহ.), মাওলানা ইলিয়াছ কান্দলবী (রহ.), মাওলানা জহুর আহমাদ (রহ.) ও মাওলানা শাহ আবদুল কাদের রায়পুরী (রহ.) প্রমূখ।

পড়ালেখা শেষ করে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি জামিয়া ইউনুসিয়ার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইউনুস (রহ.)-এর পছন্দমতো ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল আঁখিতারা গ্রামের এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর বিবাহ সম্পাদিত হয়। তাঁর সহধর্মিনীর নাম মোসাম্মৎ জামিলা খাতুন। তাঁর ঔরসে পাঁচ পুত্র দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর তৃতীয় পুত্র মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব একজন খ্যাতিমান আলেম ও বহু দ্বীনী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং বহু মাদ্রাসার মুরুব্বী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মাওলানা সিদ্দীকুর রহমান (রহ.)-এর বয়স যখন একশত বৎসরের উর্ধ্বে তখন তিনি পবিত্র হজ্জ পালন করেন। মাওলানা সিদ্দীকুর রহমান (রহ.) ২৭ জুমাদাস সানি ১৪২৪ হিজরি মোতাবেক ২৭ আগস্ট ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। ফুলবাড়িয়া ঈদগাহ ময়দানে তাঁর জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার নামাযের ইমামতি করেন তাঁর পুত্র মাওলানা ইয়াহ্ইয়া সাহেব। ফুলবাড়িয়া জামে মসজিদ সংলগ্ন পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[৪৪৫]

---

[৪৪৪] এইচ.এম. জাভেদ হোসাইন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উলামা-মাশায়েখের কর্মময় জীবন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫।

[৪৪৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫-১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা সিদ্দীকুর রহমান (রহ.)-এর অবদান-

মাওলানা সিদ্দীকুর রহমান (রহ.) দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে শিক্ষা সমাপ্তির পর যখন মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর নিকট দেশে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন মাদানী (রহ.) তাঁকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামিয়া ইউনুসিয়ায় ইলমে নববীর খিদমত করার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু তাঁর নির্দেশ ছিল মাদ্রাসা থেকে কোন ওযীফা গ্রহণ করবে না। তখন তিনি খুশী মনে তা মেনে নেন। অতঃপর দেশে প্রত্যাবর্তন করে মাদানী (রহ.)-এর নির্দেশ মতো মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ প্রায় পঁচাত্তর বছর যাবৎ জামিয়া ইউনুসিয়ায় ইলমে দ্বীনের খেদমতে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনের প্রথম পঁচিশ বৎসর যাবৎ মাদ্রাসা থেকে কোনো ওযীফা গ্রহণ করেননি। পরবর্তীতে ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.)-এর জোরালো নির্দেশক্রমে ওযীফা গ্রহণ করতে সম্মত হন। তাঁর দীর্ঘ শিক্ষকতার জীবনে দারস নিযামীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ অত্যন্ত সুনামের সাথে পাঠদান করেন। তিনি নিয়মিত দারস প্রদান করতেন। কঠিন অসুস্থতা ছাড়া কখনও দারসে অনুপস্থিত থাকেননি। প্রতিদিন পাঠদানের পূর্বে পাঠদান অংশটুকু ভালোভাবে গবেষণা করে তারপর পড়াতেন। অস্পষ্ট দারসদান তিনি খুবই অপছন্দ করতেন।

সুদীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে তাঁর অসংখ্য ছাত্র যারা আলেম হিসেবে তৈরি হয়েছে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শায়েখুল হাদীস মাওলানা আজীজুল হক (রহ.) প্রাক্তন চেয়ারম্যান ইসলামী ঐক্যজোট, মাওলানা আব্দুল হক শাইখ গাজীনগরী (রহ.), মাওলানা মুফতী নূরুল্লাহ সাহেব (রহ.) প্রাক্তন মুহতামিম জামিয়া ইউনুসিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মাওলানা ফয়জুদ্দীন (রহ.) প্রাক্তন মুহাদ্দিস ও মুহতামিম জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ ঢাকা ও মাওলানা মুফতী হাবিবুর রহমান ভৈরবী প্রমূখ।

ব্রিটিশবিরোধী আযাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ: মাওলানা সিদ্দীকুর রহমান (রহ.)-এর চরিত্রে তাঁর প্রসিদ্ধ ওস্তাদ মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর চরিত্র ও চিন্তা-চেতনার যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। তখন সে সময়টা ছিল ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল সময়। পুরো ভারতবর্ষে তখন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ছিল তুঙ্গে। মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) ছিলেন তাঁর এক অগ্রসেনানী। তাঁর বহু ছাত্র ও ভক্ত তাঁর সৈনিকরূপে সে আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। মাওলানা সিদ্দীকুর রহমানও সে আন্দোলনে বিপুল উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর কর্মতৎপরতায় খুশি হয়ে মাদানী (রহ.) তাঁকে সাতশত কর্মীর ও ভলান্টিয়ারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করেন। এভাবে পূর্ণ পাঁচ বছর পর্যন্ত তিনি মহান উস্তাদের নিকট বহু শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী দেশ ও জাতির সেবায় পরিপূর্ণভাবে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন।

সংস্কারমূলক অবদান : মাওলানা সিদ্দীকুর রহমান (রহ.) ছাত্র অবস্থায় মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর নেতৃত্বে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তেমনিভাবেই তিনি অন্যায় ও বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদী সিপাহসালার ভূমিকা পালন করেন। তাঁর বয়স যখন একশত তখন ফুলবাড়িয়ার দক্ষিণের গ্রাম গজারিয়াতে এক বিশাল যাত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং এর জন্য বিশাল প্যান্ডেলও তৈরি করা হয়। চারদিকে বিপুলভাবে যাত্রা অনুষ্ঠানের প্রচারণাও করা হয়। ফুলবাড়িয়ার হুযুর মাওলানা সিদ্দীকুর রহমান (রহ.)-এর নিকট সংবাদ পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গর্জে উঠলেন এবং ঘোষণা দিলেন অত্র এলাকায় ইসলামবিরোধী কোন কার্যকলাপ হতে দেয়া হবে না। প্রয়োজনে রক্ত দেব, শাহাদাত বরণ করব, তবু এই জঘন্য পাপ কাজ হতে দেওয়া হবে না। সুতরাং তিনি প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য পার্শ্ববর্তী গ্রাম- চান্দপুর, জসৎসার, ভাটপাড়া ও গজারিয়ার বিভিন্ন মসজিদের ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে একত্র করে যাত্রার ক্ষতি সম্পর্কে বুঝিয়ে এলাকার গণ্যমান্য লোকদেরকে নিয়ে জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলেন। অবশেষে তাঁর কঠোর আন্দোলনে যাত্রার উদ্যোক্তারা রাতের অন্ধকারে প্যাণ্ডেল খুলে নিয়ে যায় এবং যাত্রার

Dhaka University Institutional Repository

সরঞ্জামাদি নিয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। এভাবে তিনি বিদ'আত, শিরক, কুফর, মাযার পূজাসহ বহু অনৈসলামীক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। তিনি জীবনে কখনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেননি। শরীয়তের ব্যাপারে তিনি বাতিলের বিরুদ্ধে কখনো কোনো আপোষ করেননি। তিনি সমাজের বাস্তব-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমর বিল মা'রুফ ওয়ানাহী আনিল মুনকারের দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেন।[৪৪৬]

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও গুণীজনের দৃষ্টিতে মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান (রহ.) সম্পর্কে অভিমত-

১। মাওলানা ইয়াহইয়া বিন সিদ্দিকুর রহমান, প্রতিষ্ঠাতা ও মুরুব্বি বহু দ্বীনী মাদ্‌রাসার তিনি বলেন, আমার বাবা যেমন ছিলেন একজন হক্কানী আলেম, তেমনীভাবে তিনি ছিলেন অতি উঁচু মানের মানুষ। তিনি ছিলেন একজন মেধাবী ছাত্র, ভালো সংগঠক, আদর্শ আবেদ ও সফল দায়ী ইলাল্লাহ। তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতার মাধ্যমে মানুষের কাছে আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন তথা জীবন-বিধান ইসলামের সঠিক পরিচয় মানুষের মাঝে তুলে ধরে মুক্তি ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। নির্দ্বিধায় বলা যায় এ ক্ষেত্রে তিনি ব্যাপকভাবে সফলতা লাভ করেছেন।[৪৪৭]

২। মুফতী হাবীবুর রহমান ভৈরবী তিনি বলেন, মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান ছিলেন একজন যোগ্য শিক্ষক। তিনি ছাত্র অবস্থায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর সাথে যোগদান করে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি ছিলেন আপোষহীন জেহাদী চেতনা সম্পন্ন বিপ্লবী মুজাহিদ। তিনি বিদ'আত, শিরক, কুফর ও বিভিন্ন অনৈসলামীক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তাঁর বয়স যখন প্রায় একশত তখনো তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ফুলবাড়িয়াতে যাত্রা, গান-বাদ্য অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে গণজাগরণ সৃষ্টি করে প্রতিরোধ করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর আদর্শকে নিজ জীবন, পরিবার, সমাজ ও সমগ্র মানবতার মধ্যে বাস্তবায়িত করার জন্য আজীবন চেষ্টা চালিয়ে যান এবং এ ক্ষেত্রে তিনি সফলতাও অর্জন করেন।[৪৪৮]

৩। মাওলানা আবদুর রব, মুহাদ্দিস জামিয়া শরইয়্যাহ মালিবাগ ঢাকা। তিনি বলেন, মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান ছিলেন একজন প্রখ্যাত আলেম ও সমাজ সংস্কারক। তিনি ইসলামের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ ইলমে দ্বীনের খেদমত করেন। বিশেষ করে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মুসলিম উম্মাহর জন্য একজন অভিভাবক ছিলেন। তিনি আধুনিক জীবনে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে সাধারণ আলেমগণের চাইতে অধিক সচেতন ছিলেন। তিনি নিজ জীবনে, পরিবারে ও সমাজ জীবনে সীরাতুল মুস্তাকীমের পথ অনুসরণ করে বাস্তব জীবনে সফলতা লাভ করে আখেরাতে মুক্তির জন্য আজীবন চেষ্টা চালিয়ে যান। তিনি সমাজ জীবনে বিভিন্ন বিদ'আত, শিরক ও কুফরের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন দাওয়াতী কৌশলের কারণে ইসলামের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছেন।[৪৪৯]

---

[৪৪৬] এস.এম আজিজুল হক আনসারী, বাংলাদেশের পীর-আউলিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪০।

[৪৪৭] সাক্ষাৎকার: তারিখ ১২.০২.২০১৫ খ্রিস্টাব্দে।

[৪৪৮] গবেষকের ১৫.০৩.২০১৫ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত।

[৪৪৯] গবেষকের ১০.০৪.২০১৫ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-২.৫ : মাওলানা শাহ সুফী আবু সাঈদ আসগর আহমদ (রহ.) (১৮৭৫-১৯৩৭ খ্রি.)

মাওলানা আবু সাঈদ আসগর আহমদ আল-কাদেরী আল-হানাফী (রহ.) ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার আড়াইবাড়ি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুন্সী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী মুহাম্মদ আসহাব উদ্দীন। মাওলানা শাহ সুফী আবু সাঈদ আসগর আহমদ (রহ.) তার পিতা-মাতার নিকট পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াতসহ ইলমে দ্বীনের প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। অতঃপর ফেনী জেলা ছাগলনাইয়া উপজেলার পানুয়া গ্রামের পীর মাওলানা আবদুর গনি সাহেবের সার্বিক তত্ত্বাবধানে মাওলানা নুরুল্লাহ সাহেবের নিকট প্রায় এক বছর আরবী, ফার্সী ও উর্দু বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন। এরপর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জনের জন্য কুমিল্লার নবাব আবুল হাসান হায়দার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কুমিল্লা হুচ্ছামিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। তিনি ছিলেন খুবই মেধাবী এবং জ্ঞান আহরণের ইচ্ছাও ছিল তাঁর প্রবল। তাই তাঁর প্রতি ওস্তাদগণের সুদৃষ্টি থাকায় তিনি ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে জামাতে উলা পাশ করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। সে সময় অত্র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন মাওলানা ইউনুছ বিহারী (রহ.)। হুচ্ছামিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতার পক্ষ থেকে তাঁকে লক্ষ্ণৌ তিব্বিয়া কলেজে অধ্যয়নের জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু ভর্তি হওয়ার পর সেখানে তিনি অধ্যয়ন না করে কিছু দিন পর অন্যত্র চলে যান।

অতঃপর উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের রামপুর আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখানে তৎকালীন প্রসিদ্ধ উলামায়ে কেরামদের নিকট হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে দাওরায়ে হাদীস পাশ করেন। পরবর্তীতে বিশেষ করে ফিকহ ও হাদীস বিষয়ের ওপর উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তৎকালীন প্রসিদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্র ভারতের মুরাদাবাদ এমদাদিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখানকার বিজ্ঞ ইসলামীক পণ্ডিতদের নিকট অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে ফিকহ ও হাদীস বিষয়ে উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করে ডিগ্রি লাভ করেন। শাহ সুফী আবু সাঈদ আসগর আহমাদ আল-কাদেরী আল-হানাফী (রহ.) ওস্তাদ আস-সাঈদ মুহাম্মদ আল-মাক্কী আল-কুদসী আল-খালওয়াতী (রহ.) ছিলেন, বাইতুল্লাহ শরীফের খতীব ও সেখানকার মাদ্রাসার ওস্তাদ। তাঁর ওস্তাদও ছিলেন বাইতুল্লাহ শরীফের হানাফী মাজহাবের প্রধান মুফতী। তাঁর ওস্তাদ আস-সাঈদ মুহাম্মদ আলী আত্তাহতাবী (রহ.) ছিলেন বিশিষ্ট মুহাক্কিক আলেম ও দুররুল মুখতার কিতাবের হাসিয়ার লেখক। এছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য ওস্তাদগণ হলেন- মাওলানা হাসান আলী গিলাতলী (রহ.), মাওলানা মাকসুদ আলী নারুন্দী (রহ.) ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মাওলানা কলিমুল্লাহ (রহ.), কুমিল্লা, আল্লামা আবুল ফজল মুহাম্মদ ফজলুল হক (রহ.), মাওলানা তৈয়্যব (রহ.), আল্লামা মুহাম্মদ ফজল মাসহাক (রহ.), আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ লুৎফুল্লাহ (রহ.) প্রমূখ।

তিনি শিক্ষা জীবন শেষ করে ভারতের গুজরাটের পীরানে পাঠান সাইয়েদ আবদুল কাদের আল-কাদেরী এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন। কিছুদিন তার সান্নিধ্যে থাকার পর আধ্যাত্মিকতার তালীমের খেলাফত লাভ করেন। মাওলানা শাহ সুফী আবু সাঈদ আসগর আহমদ (রহ.) দীর্ঘদিন মক্কা শরীফে অবস্থানের পর সেখান থেকে ফিরে এসে তাঁর ওস্তাদ মাওলানা মাকসুদ আলী সাহেবের প্রথম কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। পরবর্তীতে তাঁর আপন এক চাচাতো বোনকে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। প্রথমা স্ত্রী থেকে দুই ছেলে তিন মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তারা হলেন:- মাওলানা হাফেয আবুল খায়ের মুহাম্মদ গোলাম জিলানী ও মাওলানা শাহ মুহাম্মদ গোলাম হাক্কানী। দ্বিতীয় স্ত্রী থেকে দুই ছেলে এক মেয়ের জন্মগ্রহণ করে, তারা হলেন:- আলহাজ্জ গোলাম রব্বানী ওরফে বোবা পীর সাহেব ও মাওলানা গোলাম ছামদানী।

Dhaka University Institutional Repository

পীরে কামেল আলহাজ্জ মাওলানা আবু সাঈদ আসগর আহমদ আল-কাদেরী আল-হানাফী (রহ.) ৮ ডিসেম্বর ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ২৬ রমযান ১৩৫৫ হিজরি রোজ বৃহস্পতিবার ৬২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। পরের দিন শুক্রবার জুমআর নামাযের পর আড়াইবাড়ি মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁর নামাযের জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার নামাযের ইমামতি করেন, তাঁর শিক্ষক মাওলানা হাসান আলী। অসংখ্য লোক তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মসজিদের পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়। প্রতি বছর ৮ ফাল্গুন তাঁর প্রতিষ্ঠিত আড়াইবাড়ি সাঈদীয়া কামিল মাদ্রাসা মসজিদ প্রাঙ্গণে ইছালে সওয়াবের মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। পীর সাহেবের ইন্তেকালের পর তাঁর চাচাতো ভাই মাওলানা আবদুল বারী (রহ.) ও তাঁর প্রথম ছেলে গোলাম জিলানী (রহ.) দরবার পরিচালনা এবং মুরিদদেরকে প্রশিক্ষণ দানের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তাঁর সুযোগ্য ছেলে মাওলানা শাহ সুফী মুহাম্মদ গোলাম হাক্কানী (রহ.) সকল দায়িত্ব পালন করেন।[৪৫০]

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা শাহ সুফী আবু সাঈদ আসগর আহমদ (রহ.) অবদান

মাওলানা শাহ সুফী আবু সাঈদ আসগর আহমদ উচ্চশিক্ষা লাভের পর, তাঁর পীর সাইয়েদ আবদুল কাদির আল-কাদিরী (রহ.)-এর নির্দেশে তিনি পবিত্র মক্কা নগরীতে গমন করেন। তৎকালীন বিশ্ববিখ্যাত মুফতীয়ে আযম আল্লামা আবদুল হক মুহাজেরী মক্কী এলাহাবাদী (রহ.)-এর প্রতিষ্ঠিত দারুল ইফতা-এর প্রধান মুফতীর পদে আত্মনিয়োগ করেন। সেখানে তিনি বারো বছর যাবৎ অত্যন্ত সুনামের সাথে সুন্দরভাবে উক্ত দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘদিন উক্ত পদে থেকে বহু মাসয়ালা-মাসায়েল কুরআন-হাদীসের আলোকে সময়োপযোগী হিসেবে সমাধা করেন।

ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান : বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলাদেশের ধর্মীয় অবস্থা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। কারণ শত শত বছর ভারত শাসন মুসলিম জাতির প্রতি ইংরেজ শাসকদের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি মুসলমানদেরকে দুর্বল করে দেয়। এদিকে ইংরেজদের দোসররাও মুসলমানদেরকে দাবিয়ে রাখার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে বিধর্মীদের প্রভাব মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে লাগলো। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আধুনিক মুসলিম শিক্ষিতরা পশ্চিমা শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হতে থাকে। চাকরিসহ বিভিন্ন লোভ দেখিয়ে তাদেরকে মুসলিম চেতনা থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। ঠিক তখনই সমাজ ও জাতীয় জীবন চেতনায় টিকিয়ে রাখার জন্য প্রাথমিক প্রশিক্ষণরূপে তিনি খানকাহ এবং মাদ্রাসা আকারে একটি দ্বীনী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এর পাশাপাশি তিনি একটি মসজিদও নির্মাণের সংকল্প করলে তৎকালীন অমুসলিম জমিদার তাঁকে মসজিদ নির্মাণ করতে বাধা প্রদান করেন। তিনি আল্লাহর ওপর ভরসা করে মুসলমানদের সহযোগিতায় প্রশাসনের বিনা অনুমতিতেই মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। ইতিমধ্যে মোসাহেব শ্রেণির কোনো লোক গিয়ে অমুসলিম জমিদারদের খবর দিল যে, পীর সাহেবের লাখ লাখ মুরিদ মসজিদ নির্মাণ শুরু করেছে। তারা এও বলল, তাঁকে এ থেকে বিরত রাখা হলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। এজন্য তাঁকে শর্তারোপ করা হউক যে, মসজিদ নির্মাণ করতে হলে একটি বড় অংকের কর দিতে হবে। এভাবে আমাদের কর পরিশোধ করলেই মসজিদ নির্মাণ করতে পারবে। কিন্তু জবাবে তিনি জানালেন, অমুসলিমদেরকে কর দিয়ে আমি মসজিদ নির্মাণ করবো না বরং আমরা 'কর' না দিয়েই পরিকল্পিত মসজিদের স্থাপন করব। শেষ পর্যন্ত পীর সাহেবের মসজিদ নির্মাণ কাজের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করতে অমুসলিম

[৪৫০] শেখ মো. কামাল উদ্দিন,একটি নাম একটি স্মৃতি, সাঈদিয়া দরবার শরীফ, ১৯৯২ খ্রি., পৃ. ১৮-২০।

Dhaka University Institutional Repository

জমিদার আর সাহস পেল না। সেই থেকেই তাঁর সুনাম চতুর্দিকে আরও ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ল এবং আড়াইবাড়ি দরবার শরীফে জুমার নামাজে দূর-দূরান্ত থেকে অধিক লোকের সমাগম আরম্ভ হতে লাগলো।[৪৫১]

মাওলানা শাহ সুফী আবু সাঈদ আসগর আহমদ (রহ.)-কে তৎকালীন আগরতলা রাজা নিমন্ত্রণ করেন, তিনি সে নিমন্ত্রণকে প্রত্যাখ্যান করেন। মসজিদ নির্মাণের সময় আগরতলার রাজা তাঁকে রাজ দরবারে আগমণের জন্যে হাতী প্রেরণ করেছিল। কিন্তু রাজার সেই নিমন্ত্রণ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন, এতে সারা দেশে পীর সাহেবের পরিচিতি বেড়ে যায় এবং জনগণের মাঝে ব্যাপক সাড়া পড়ে। পীর সাহেবের দরবার ছিল পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার কেন্দ্র। তাঁর ব্যক্তিগত একটি পাঠাগার ছিল। সেটি ছিল বহু কিতাবে সুসজ্জিত। অত্র পাঠাগারটি জ্ঞান সাধকদের জন্য শরীয়তের সঠিক ধারণা দিতে সাহায্য করে। তাতে বহু জ্ঞান সাধক জ্ঞান আহরণ করতো। তিনি তাঁর শিষ্যগণকে সর্বদা এখানেই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন এবং শরীয়তের বিভিন্ন মৌলিক দিকনির্দেশনা কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক শিক্ষা প্রদান করতেন। ইসলামের বিভিন্ন ঐতিহাসিক তারিখে ওয়াজ মাহফিল, যিকির-আযকার ও তালীমের ব্যবস্থা করতেন। ইবাদত ও ইসলামী সাংস্কৃতিক চেতনাকে অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তিনি ধর্মানুরাগীদেরকে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে গড়ে তুলতে ব্যাপক সফলতা লাভ করেন।

কুসংস্কার দূরীকরণে অবদান: মাওলানা শাহ সুফী আবু সাঈদ আসগর আহমদ আল-কাদেরী (রহ.) সমাজের কুসংস্কার ও অনৈসলামীক কার্যকলাপ দূরীকরণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। এজন্য তিনি প্রথমত দ্বীনী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন একজন ধর্মীয় বড় আধ্যাত্মিক ওস্তাদ, তিনি নিয়মিত পাগড়ী ব্যবহার করতেন। সবুজ, সাদা ও কালো রংঙের পাগড়ী পরিধান করতেন এবং সকলকে তা ব্যবহারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী ছিলেন, কুরআন-হাদীসের পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকায় কোনো প্রকার শরীয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ড তাঁর কাছে ভিঁড়তে পারেনি। কোনো শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ তাঁর নজরে পড়লে তাৎক্ষণিকভাবে এর সংশোধন করতেন। তাঁর নিজ এলাকায় হুক্কা ও ধূমপান উচ্ছেদে তিনি বিরাট ভূমিকা রাখেন। মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করা বহু অপসংস্কৃতি তিনি নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে ইসলামী সংস্কৃতি ও মুসলিম ঐতিহ্যের দিকে ফিরিয়ে আনেন। ইংরেজদের শাসনকে এদেশে টিকিয়ে রাখার অভিপ্রায়ে ইংরেজি শিক্ষা করাকে তিনি পছন্দ করতেন না। তবে এ দ্বারা ইসলামের সেবা করতে চাইলে তা অনুমতি দিতেন। তাঁর দরবারটি ছিল মুসলিম শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। তার পাঠাগারে রক্ষিত বহু কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা, ফিক্হ-উসূলসহ বিভিন্ন মাযহাবের অনেক দুর্লভ কিতাবাদি দেখা যায়। তাঁর স্বহস্তে লিখিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নোট রয়েছে। সেগুলো হলঃ- নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, আক্বিদা, দোয়া-দুরূদ, অযিফা, ফরয, সুন্নাত, নফল ইবাদতের নিয়ম, হালাল-হারাম, কবিরা ও ছগিরা গোনাহসহ অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান তাতে পাওয়া যায়। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত মসজিদের দীর্ঘদিন পর্যন্ত খতীবও ছিলেন। এলাকার মানুষ তাঁর নিকট ফতুয়া-ফরায়েজসহ বিভিন্ন মাসয়ালা-মাসায়েল সমাধানের জন্য আসতেন। তিনি খুব সুন্দরভাবে শরীয়ত মোতাবেক সামাজিক বিচারকদেরকে সাথে নিয়ে তা সমাধান করতেন। তাছাড়া সামাজিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে সামাজিক উন্নয়নেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি সমাজের সকল স্তরের মানুষের সাথে সহজেই মিশতে পারতেন যার ফলে সমাজের সকল স্তরের মানুষদেরকে ইসলামী অনুশাসনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষমতা লাভ করেন।[৪৫২]

---

[৪৫১] শেখ মো. কামাল উদ্দিন,একটি নাম একটি স্মৃতি, সাঈদিয়া দরবার শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২৭।

[৪৫২] এইচ.এম. জাভেদ হোসাইন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উলামা-মাশায়েখের কর্মময় জীবন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০-৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা শাহ সুফী আবু সাঈদ আসগর আহমদ (রহ.) সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত-

১। ড. আ.জ.ম. কুতুবুল ইসলাম নোমানী, সহকারী অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি বলেন, মাওলানা শাহ সুফী আবু সাঈদ আসগর আহমদ (রহ.) ছিলেন একজন উঁচু মানের প্রসিদ্ধ আলেম। তিনি কুরআন, হাদীস, উসুল ও ইলমুল ফারায়িজের পণ্ডিত ছিলেন। সমসাময়িক আলেমদের মাঝে তাঁর স্থান ছিল সবার ওপরে। তাঁর আরবী ও উর্দু হাতের লেখা ছিল খুবই চমৎকার। তিনি মক্কা মুকাররমা থেকে দেশে ফিরে এসে ভাবতে লাগলেন কী করে সমাজে শরীয়ত তথা দ্বীনের বিষয়ে অজ্ঞ মানুষদেরকে সত্যিকারের মুসলমান বানানো যায়। তাই তিনি সর্বপ্রথম আশেপাশের লোকদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাতে লাগলেন। আস্তে আস্তে মানুষ তাঁর কাছে জড়ো হতে লাগলো। তখন তিনি তাদেরকে শরীয়তের জ্ঞানের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক জ্ঞান দিতে লাগলেন। এভাবে অসংখ্য মানুষ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এমনকি বহু আলেম তাঁর নিকট থেকে আধ্যাত্মিকতার তা'লীম গ্রহণ করেন। তাঁর অসংখ্যা সাগরিত আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রচার-প্রসারে ও ইসলামের বহুবিদ খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি সমাজ ও জাতীয় জীবনে সকল ক্ষেত্রে ইসলামী চেতনায় প্রভাবিত করার লক্ষ্যে আজীবন চেষ্টা চালিয়ে যান। তিনি মুসলমানদের শিক্ষা-সংস্কৃতি রক্ষার্থে সর্ব প্রথম প্রশিক্ষণ রুপে তাঁর অসংখ্য মুরিদগণের জন্য একটি খানকা ও একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর দরবারটি ছিল মুসলিম শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। তিনি দীর্ঘ বার বছর যাবৎ মক্কা শরীফে দারুল ইফতার প্রধান মুফতী হিসেবে দায়িত্বও পালন করে ছিলেন। তিনি সমাজের বিভিন্ন কুসংস্কার ও অনৈসলামীক কর্মকাণ্ড দূর করার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন এবং সমাজে মানুষকে ইসলামের সঠিক পথে ফিরে আনার জন্য আজীবন সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের কারণে বহু মানুষ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা.) আদর্শে জীবনকে গড়ে তুলতে সক্ষমতা লাভ করেন।[৪৫৩]

২। মাওলানা শাহ মুহাম্মদ গোলাম সারওয়ার সাঈদী, অধ্যক্ষ, আড়াইবাড়ি সাঈদীয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা। তিনি বলেন, আমার দাদা মাওলানা শাহ সুফী আবু সাঈদ আসগর আহমদ (রহ.) ছিলেন একজন শীর্ষ স্থানীয় আলেম, বুযুর্গ, সমাজ সংস্কারক ও আধ্যাত্মিক রাহবার। দ্বীনের দুরুদ ও আন্তরিকতা নিয়ে পথহারা মানুষদের হিদায়াত কামনায় ইলমে দ্বীনের শিক্ষা দানের পাশাপাশি আধ্যাত্মিকতায় ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। তিনি ইসলামের প্রচার-প্রসারে দীর্ঘদিন যাবৎ নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। কুরআন-হাদীসের পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকায় কোনো প্রকার বাতিল তাঁর কাছে ঠাঁই পায়নি। তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করতেন।[৪৫৪]

৩। মাওলানা শেখ মোহাম্মদ কামাল উদ্দীন, সহকারী অধ্যাপক, আড়াইবাড়ি ইসলামীয়া সাঈদিয়া কামিল মাদ্‌রাসা। তিনি বলেন, মাওলানা শাহ সুফী আবু সাঈদ আসগর আহমদ (রহ.) ছিলেন একজন উঁচুমানের আলেম ও সমাজ সংস্কারক। তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জিন্দেগী পর্যবেক্ষণ করলে বুঝা যায় তিনি ছিলেন ইলমে নববীর বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তাঁর সদ্ব্যবহার ইসলাম, সততা, ন্যায়পরায়ন, মহান আল্লাহ তা'আলার মহাব্বত, সেবা ও সত্য সাহসিকতা তাঁকে সোনালি আভায় দীপ্ত করেছে। তিনি ছিলেন একজন সমাজের অবহেলিত সাধারণ মানুষের পথনির্দেশক এবং ধর্মীয় বড় আধ্যাত্মিক ওস্তাদ। তিনি সমাজে বহু অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন। এজন্য তিনি প্রথমত মাদ্‌রাসা-মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। আর সাধারণ মানুষের সংশোধনে এবং দ্বীনের প্রচার-প্রসারে বহু এলাকায় সফর করেন। ওয়াজ মাহফিল ও তা'লিম তরবিয়তের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার-প্রসারে ব্যাপক অবদান রাখেন।[৪৫৫]

---

৪৫৩ গবেষকের ১৩.০৫.২০১৬ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত।

৪৫৪ গবেষকের ২০.০৪.২০১৬ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত সাক্ষাতৎকার সূত্রে মাওলানা শাহ মুহাম্মদ গোলাম সারওয়ার সাঈদী হতে প্রাপ্ত তথ্য।

৪৫৫ গবেষকের ১১.০৩.২০১৬ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-২.৬ : মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল বারী (রহ.) (১৯০১-১৯৭৫খ্রি.)

আপন বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যে সমুজ্জ্বল মহান ব্যক্তিত্ব, যাদের স্পর্শে ও মুখের দর্শনে মহাপাপীর মনেও খোদা প্রেমের আগুন জ্বলে উঠে। যারা তাঁদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন। যাদের আহ্বানে অন্ধকার ছেড়ে হিদায়াতের পথে আগমন করেছেন শত শহস্র মানব-মানবী। তাঁদের অন্যতম হলেন মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল বারী (রহ.)। তিনি আনুমানিক ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার[৪৫৬] আড়াইবাড়ি গ্রামের[৪৫৭] ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী মো. মাসুন ও মাতার নাম মোসাম্মৎ জয়নবুন্নেসা। মাওলানা আবদুল বারী (রহ.) ছিলেন চার ভাইয়ের মধ্যে দ্বিতীয়। অত্র পরিবারটির ধর্মীয় ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রেও অত্র পরিবারের সুনাম-সুখ্যাতি দেশব্যাপী ছড়িয়ে আছে। এ বাড়িতে ঐতিহ্যবাহী আড়াইবাড়ি সাইদিয়া আলিয়া মাদ্রাসাটি অবস্থিত।

মাওলানা আবদুল বারী (রহ.) পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত ও দ্বীনী শিক্ষার প্রাথমিক স্তর তাঁর পরিবারেই সমাপ্ত করেন। অতঃপর মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের জন্য তাঁকে জমসিদপুর মাদ্রাসায় ভর্তি করানো হয়। তিনি অত্র মাদ্রাসায় আরবী, উর্দু, ফার্সী ও বাংলাসহ বিভিন্ন পুস্তকাদি পড়ালেখা করেন এবং অত্যন্ত সুনামের সাথে মাধ্যমিক স্তর সমাপ্ত করেন। তিনি ছিলেন খুবই মেধাবী এবং স্বভাবগতভাবে নরম তবিয়তের অধিকারী। যার ফলে তিনি সকল উস্তাদের নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র ছিলেন। অতঃপর ওস্তাদগণের এবং পরিবারের পরামর্শে ইল্ম ও আমলের ময়দানে উচ্চশিক্ষা অর্জনের স্পৃহা নিয়ে বিখ্যাত দ্বীনী প্রতিষ্ঠান ভারতের রামপুর আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন। সেখানে যুগশ্রেষ্ঠ আলেমগণের নিকট নাহু, সরফ, বালাগত, মানতিক, ফিকহ ও উসুলুল ফিকহ, হাদীস ও উসূলে হাদীস, সিহাহ সিত্তাহ ও বিভিন্ন তাফসীরের ওপর অধ্যয়ন করে সেখানকার সর্বোচ্চ ডিগ্রি টাইটেল পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সাথে পড়ালেখা করে সফলভাবে কামিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে এসে মুহতারামা খাদিজা খাতুনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর ঔরসে এক ছেলে ও তিন মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তারা হলেনঃ-

১) ড. আ.জ.ম. ফুতুবুল ইসলাম নো'মানী, সহকারী অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২) মোসাম্মৎ জোহরা খাতুন, স্বামী মাওলানা সাঈদুর রহমান, তিনি কসবা উপজেলার চণ্ডিদ্বার হাই স্কুলের হেড মাওলানার দায়িত্ব সফলভাবে আঞ্জাম দেন। কোমল ব্যবহার, আতিথেয়তা ও সামাজিকতার জন্য তিনি সকলের কাছে প্রিয় পাত্র ছিলেন। দ্বীনের প্রচার-প্রসারে তিনি বিভিন্ন স্থানে ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

৩) মোসাম্মৎ আরিফা খাতুন, স্বামী মাওলানা সাইয়েদ আবদুল মান্নান। তিনি পীর সাহেব হিসেবে সকলের নিকট ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। তিনি নিজ এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে এমনকি বিভিন্ন স্থানে ওয়াজ-মাহফিলের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন।

---

[৪৫৬] কসবা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার প্রসিদ্ধ একটি উপজেলা। সেখানে টি.আলী ডিগ্রি কলেজ, হাসপাতাল, কসবা মহিলা কলেন, কসবা বালক ও বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, আড়াইবাড়ী কামিল মাদরাসা, কসবা নতুন ও পুরাতন দুইটি বড় বাজার বিদ্যমান আছে, কবসা রেলস্টেশনটি ভারত সীমান্ত ঘেষে অবস্থিত। সেখান থেকে ভারতে কমলা সগর ও বি.এস.এফ চৌকি অবলোকন করা যায়।

[৪৫৭] আড়াইবাড়ী গ্রামটি অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে বিজনা নদীর পাশে অবস্থিত। এ গ্রামের সবুজ শ্যামল দৃশ্য চিত্তাকর্ষক। এই গ্রামটি পীরের গ্রাম হিসেবে সকলের নিকট পরিচিত। বৃহত্তর কুমিল্লা জেলাসহ সারাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে এর পরিচিতি রয়েছে। সকলেই এ গ্রাম ও গ্রামবাসীকে সম্মানের চোখে দেখে। এই গ্রামে তিনতলা বিশাল মসজিদ ও কামিল মাদরাসা, হেফজখানা ও প্রাইমারি স্কুল বিদ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

৪) মোসাম্মাৎ হুফুরা খাতুন, স্বামী মাওলানা মোহাম্মদ আইয়ূব। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত নিয়াজ মোহাম্মদ হাইস্কুলের হেড মাওলানা ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন হক্কানী কামেল পীর। দেশের বিভিন্ন জায়গায় ওয়াজ-মাহফিলের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার ও ইসলামের প্রচার-প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন।

মাওলানা আবদুল বারী (রহ.) ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি রোজ রবিবার সকাল আনুমানিক ১০ ঘটিকায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর জানাযার নামাযের ইমামতি করেন তাঁরই ভাতিজা তখনকার আড়াইবাড়ির পীর সাহেব মাওলানা শাহ গোলাম হাক্কানী (রহ.)। ঐতিহ্যবাহী আড়াইবাড়ি সাঈদীয়া আলিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর জানাজায় অসংখ্য মানুষ হাজির হয়েছিলেন।[৪৫৮]

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল বারী (রহ.)-এর অবদান-

মাওলানা আবদুল বারী (রহ.) ভারতে রামপুর আলিয়া মাদ্রাসা থেকে উচ্চশিক্ষা অর্জনের পর দেশে এসে তৎকালীন আড়াইবাড়ির পীর সাহেব মাওলানা আবু সাঈদ আসগর আহমাদ সাহেবের সান্নিধ্যে থেকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে নিজেকে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন। আড়াইবাড়ির পীর আবু সাঈদ আসগর আহমদ তৎকালীন আড়াইবাড়িতে একটি বিশাল মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন, কিন্তু সে মসজিদের কাজ পরিপূর্ণভাবে সমাপ্ত করার সুযোগ পাননি। সমাপ্ত করার আগেই আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে এ দুনিয়া চিরবিদায় দেন। পরবর্তীতে মাওলানা আবদুল বারী (রহ.) সে মসজিদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। তা ছাড়া আড়াইবাড়ি সাঈদীয়া আলিয়া মাদ্রাসাটি প্রথমত মক্তব আকারে ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি তা বাস্তবে মক্তব থেকে উন্নিত করে দারসে নিজামীতে পরিবর্তন করেন যা পরবর্তীতে আলিয়া নিসাবের মাদরাসায় রূপান্তরিত করেন যা পরবর্তীতে কামিল শ্রেণিতে উন্নীত হয়। তিনি ছিলেন উক্ত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। তিনি ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাদ্রাসার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পাশাপাশি মসজিদেরও দায়িত্ব পালন করেন। মাওলানা আবদুল বারী (রহ.) বহু সাধনা ও ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে মাদ্রাসা ও মসজিদ পরিচালনা গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দেন। তিনি মসজিদের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ভারতের আসাম থেকে টাইলস এনে মসজিদটিকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করেন। মসজিদের উপরের গম্বুজে প্লেইট ও পেয়ালার ভাঙ্গা কাঁচ লাগিয়ে সুন্দর্য বর্ধনে অবদান রাখেন। সে সময় অত্র এলাকায় উপরোক্ত মসজিদটি ছিল সবচেয়ে সুন্দর মসজিদ। মাওলানা আবদুল বারী (রহ.)-এর আমলে প্রথমত মসজিদে মক্তব পরিচালনা করতেন। সে সময় অত্র এলাকায় মুসলমান ছেলে মেয়েরা পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত ও মাসয়ালা মাসায়েল এবং ইসলামের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় বিষয়াদি শিখার জন্য আসতো। এলাকার সাধারণ মুসলমানদের প্রবল আগ্রহ দেখে তিনি মক্তব থেকে মাধ্যমিক স্তরের মাদ্রাসায় উন্নীত করেন। সরকারি সাহায্য সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা না থাকায় তখনকার সময় উক্ত মাদ্রাসাটি সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সাহায্য সহযোগিতায় পরিচালনা হতো। তিনি বিভিন্ন মৌসুমে ফসলি ধান, গম, পাট ও রবি শস্য সংগ্রহ করে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা, বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলসহ মাদরাসার বিভিন্ন উন্নয়নমূখী কার্যাদি সম্পাদিত করতেন। এভাবে তিনি অত্র মাদ্রাসাটিকে মাধ্যমিক স্তর থেকে উন্নতির দিকে ধাবিত করেন। যার বিশেষ অবদানের ফলে আজ মাদ্রাসাটি কামিল স্তরে উন্নতি লাভ করে এবং তাঁর পরিচলানায় মসজিদের সামনের পুকুরের

---

[৪৫৮] ড. মো. হেফজুর রহমান, বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় হাদীসচর্চা: সমাজ ও সংস্কৃতিতে এর প্রভাব, ২০১৪ খ্রি. থিসিস, পৃ. ৭৮, অপ্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

বিশাল দৈর্ঘ্য ঘাটলাটি নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে মাওলানা আবু সাঈদ আসগর আহমাদ আল কাদেরীর ৩য় ছেলে মাওলানা গোলাম হাক্কানী সাহেব লেখাপড়া শেষ করে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে মাদ্‌রাসা ও মসজিদ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মাওলানা আবদুল বারী (রহ.) ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে মাদ্‌রাসা ও মসজিদের খেদমত থেকে যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে অব্যাহতি নেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি আমৃত্যু মসজিদ ও মাদ্‌রাসার খেদমত করে গিয়েছেন।[৪৫৯]

মাওলানা আবদুল বারী (রহ.) নিজ এলাকাসহ দূর-দূরান্তে বিভিন্ন স্থানে ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। তাঁর মাহফিলের আলোচনা সুনার পর সাধারণ মানুষ সহজেই তার ভক্ত হয়ে যেতো। তিনি সাধারণ ও শিক্ষিত মানুষের সাথে অল্পসময় আলোচনা করার পর তাঁদেরকে সহজে আপন করতে সক্ষম হতেন। সে সময় তাঁর সাথে যুগ শ্রেষ্ঠ আলেমদের সুসম্পর্ক ছিল। তিনি তাঁদের সাথে শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে ও মাসয়ালা-মাসায়েল নিয়ে আলোচনা করতেন।

সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সমাজ প্রতিনিধিগণের সাথে পরামর্শ ভিত্তিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, যার ফলে সমাজের সকল স্তরের মানুষ তাঁকে পছন্দ করতো এবং খুবই ভালোবাসতো। তিনি সমাজের প্রচলিত বিদ'আত ও কুসংস্কার দূরীকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[৪৬০]

মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল বারী (রহ.) সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত-

১। ড. আ.জ.ম. কুতুবুল ইসলাম নো'মানী বিন আবদুল বারী (রহ.), সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি মাওলানা আব্দুল বারী সাহেবের একমাত্র পুত্র সন্তান। তিনি বলেন, আমার বাবা শুধু একজন আলেমই ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন অতি উচ্চমানের মানুষ। তিনি শিক্ষা জীবন শেষ করে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ইসলামের প্রচার-প্রসারে পুরোজীবনকে অতিবাহিত করেন। ইলমে দ্বীনের খেদমতসহ সামাজিক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ব্যাপক অবদান রাখেন। তিনি নিজ এলাকাসহ দূর-দূরান্তে ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর আদর্শকে নিজ জীবন, পরিবার, সমাজ ও সমগ্র মানবতার মধ্যে বাস্তবায়নের আজীবন চেষ্টা চালিয়ে যান। তিনি তাঁর বাস্তব-জীবনে আদর্শ আবেদ ও সফল দা'য়ী ইলাল্লাহ হিসেবে অতিবাহিত করেন। তিনি বহু ত্যাগ ও কঠোর সাধনার মাধ্যমে আড়াইবাড়ি সাঈদিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা-মসজিদ পরিচালনা করেন। তিনি মাদ্‌রাসা-মসজিদের উন্নয়ন ও ইল্‌মী-আমলী উন্নয়নের জন্য আজীবন চেষ্টা চালিয়ে যান। তাঁর সততা, ন্যায়পরায়ণতা, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ অনুগত্য প্রকাশ ও রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের অনুসরণ ছিল অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। তিনি ইলমে দ্বীনের খেদমতের পাশাপাশি আমৃত্যু, প্রজ্ঞা, ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে দ্বীন ও হিদায়াতে নববীর ওয়াছাতের দায়িত্ব পালনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। তিনি মাদরাসা-মসজিদ পরিচালনাসহ বাৎসরিক ৬টি মাহফিল অত্যন্ত দক্ষতার সহিত পরিচালনা করতেন। দূর-দূরান্তের মেহমানদের আপ্যায়নের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তখনকার প্রথা অনুসারে তিনি মেহমানদেরকে নিজ গ্রামসহ আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামে খাবারের

---

৪৫৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

৪৬০ গভেষকের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উক্ত তথ্য ড. আ.জ.ম. কুতুবুল ইসলাম নো'মানী থেকে সংগৃহিত।

Dhaka University Institutional Repository

জন্য পাঠিয়ে দিতেন। অবশিষ্ট মেহমানদেরকে নিজ বাসায় খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। তিনি সহ অবস্থানকে পছন্দ করতেন। তাই তিনি সকল কাজ সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করে করতেন। তিনি অত্যন্ত সামাজিক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন। সুখে-দুখে ও বিপদে-আপদে তিনি সমাজের লোকদের পাশে দাঁড়াতেন। তাই তিনি সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি সরাসরি রাজনীতির সাথে জড়িত না থাকলেও রাজনীতি সচেতন ছিলেন এবং ইসলাম পন্থীদেরকে পছন্দ করতেন।[৪৬১]

২। মাওলানা মুহাম্মদ গোলাম সারওয়ার সাঈদী, অধ্যক্ষ আড়াইবাড়ি সাঈদীয়া আলিয়া মাদ্রাসা। তিনি বলেন, মাওলানা আবদুল বারী (রহ.) ছিলেন একজন বিজ্ঞ আলেম ও সর্বজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ভারতের রামপুর আলিয়া মাদ্রাসা থেকে টাইটেল পাশ করার পর মাওলানা আবু সাঈদ আসগর (রহ.)-এর সান্নিধ্যে থেকে ইসলামের প্রচার-প্রসারে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। অত্র মাদ্রাসার উন্নয়নে তাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি। তিনি অত্র মাদ্রাসাকে মক্তব থেকে প্রথমে মাধ্যমিক স্তরে পরবর্তীতে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে যান। তাছাড়া তিনি ছিলেন বহু প্রতিভার অধিকারী। সামাজিক বিভিন্ন জন-কল্যাণমূলক কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে সামাজিকভাবে ব্যাপক অবদান রাখেন। তিনি বলেন, আমার পিতা মাওলানা মুহাম্মদ গোলাম হাক্কানী (রহ.) প্রায়শ বলতেন, আমি মাদ্রাসার প্রশাসনিক ও পাঠদানের কাজ দেখাশুনা করতাম। আর আমার চাচা মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল বারী (রহ.) মাদ্রাসার আর্থিক দিক দেখাশুনা করতেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইলমের পাশাপাশি একজন উঁচু পর্যায়ের মুত্তাবিউস্সুন্নাহ ও পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন।[৪৬২]

৩। মাওলানা মিয়া মোহাম্মদ আইয়ুব, সাবেক হেড মাওলানা নিয়াজ মোহাম্মদ হাইস্কুল। তিনি আব্দুল বারী সাহেবের ছোট জামাতা। তিনি বলেন, মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল বারী (রহ.) ছিলেন, একজন প্রখ্যাত আলেম দ্বীন ও সুন্নাতে রাসূলের একনিষ্ঠ অনুসারী। তাঁর ঐকান্তিক ও নিরলস প্রচেষ্টার ফলে আজ আড়াইবাড়ি ইসলামিয়া সাঈদিয়া কামিল মাদ্রাসা-মসজিদ এ পর্যায়ে উন্নিত হয়েছে এবং বহু জ্ঞান পিপাসুদের ইল্মী ও আমলী উন্নতি সাধিত হয়েছে। তিনি একান্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে একজন আপোষহীন মুজাহীদের ন্যায় ইসলামের প্রচার-প্রসারে আজীবন সচেষ্ট ছিলেন। তাছাড়া তাঁর সততা, বিনয়, নম্রতা, ভদ্রতা সহনশীলতা, পরহেজগারী, ইখলাস, তাকওয়া, সঠিক সময় হক কথা বলা ও হক পথে চলা তাঁর একটি অনবদ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে সামাজিক উন্নয়নে ও ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে, দূর-দূরান্তে ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন কুসংস্কার ও বেহায়াপনার বিরুদ্ধে কঠোর ভূমিকা পালন করেন।[৪৬৩]

৪। জোহরা খাতুন মাওলানা আব্দুল বারী সাহেবের বড় মেয়ে, তিনি বলেন, আমার পিতা সামাজিক ও মিশুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি তাঁর সন্তানদেরকে আদর স্নেহ দিয়ে বড় করেন। নামায-রোজা আদায় এবং আখলাকের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তাঁর মাঝে নেতৃত্বের বৈশিষ্টাবলী পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল।

---

[৪৬১] গবেষকের ০৫.০৪.২০১৫ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত।
[৪৬২] গবেষকের ১০.০১.২০১৫ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত।
[৪৬৩] গবেষকের ১৬.০৭.২০১৫ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত।

Dhaka University Institutional Repository

৫। আফরোজা খাতুন মাওলানা আব্দুল বারী সাহেবের দ্বিতীয় মেয়ে, তিনি বলেন, আমার বাবা আমাদেরকে অনেক আদর-স্নেহ করতেন এলাকার বাহিরে কোনো মাহফিলে গেলে বাড়িতে ফিরেই আমাদের খবর নিতেন এবং আমাদের জন্য মিষ্টান্ন নিয়ে আসতেন। তিনি সন্তানদের মেজাজ বুঝে তাঁর সাথে আচার-আচরণ করতেন।

৬। সফুরা খাতুন মাওলানা আব্দুল বারী সাহেবের তৃতীয় মেয়ে, তিনি বলেন, আমার বাবা ছিলেন সমাজ সচেতন ব্যক্তি। তিনি তাঁর সন্তানদেরকে ধর্মীয় লেখাপড়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। এ কারণেই আমাকে মাদরাসায় ভর্তি করেন। তিনি তাঁর প্রত্যেকটি মেয়েকে মাদরাসায় শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলেদের কাছে বিয়ে দেন। তিনি আমার ছোট ভাইকেও মাদরাসায় পড়ান। তাঁর দৃষ্টিকোণ ছিল, আমার বাবা আমাকে মাদরাসায় পড়ানোর কারণে আমি ঠকিনি। সুতরাং আমার ছেলেও মাদরাসায় পড়লে কোনোভাবে ঠকবে না।[৪৬৪]

[৪৬৪] গবেষকের ১৭.০৭.২০১৫ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-২.৭ : মাওলানা শাহ মুহাম্মদ গোলাম হাক্কানী (রহ.) (১৯৩১-২০০৯ খ্রি.)

মাওলানা শাহ মুহাম্মদ গোলাম হাক্কানী (রহ.) ছিলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আড়াইবাড়ি দরবার শরীফের পীর ও আড়াইবাড়ি ইসলামীয়া সাঈদীয়া কামিল মাদ্‌রাসার সাবেক অধ্যক্ষ, বহু ধর্মীয় গ্রন্থের লেখক, প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন ও বহু আলেমগণের ওস্তাদ। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার আড়াইবাড়ি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুন্সী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা আবু সাঈদ আসগর আহমাদ আল-কাদেরী ও মাতার নাম মোসাম্মৎ সালেহা খাতুন। বাল্য বয়সে তাঁকে মুহাম্মদ আবদুল্লাহ নামে ডাকতো। তিনি পিতার প্রতিষ্ঠিত আড়াইবাড়ি ইসলামীয়া সাঈদীয়া মাদ্‌রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর কুরআন-হাদীসের গভীর জ্ঞান লাভের অদম্য স্পৃহা নিয়ে তিনি ভারতের রিয়াছাতে রামপুর মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং সেখানে মাধ্যমিক শিক্ষা খুব সাফল্যের সাথে সমাপ্ত করেন। পরবর্তীতে দেশে ফিরে সিলেট জেলার গাছবাড়ি আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর সেখান থেকে ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসায় ফাযেল শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং অত্র মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ফাযেল পাশ করেন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে কামিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অত্যন্ত সুনামের সাথে প্রথম বিভাগ লাভ করেন। এর পাশাপাশি তিনি সমকালীন বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে জানার জন্য দেশি-বিদেশী পত্র-পত্রিকা নিয়মিত পড়তেন। তিনি উর্দু, ফার্সী ও আরবী ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য ওস্তাদগণ হলেন, মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী (রহ.), মুফতী আমিমুল এহসান (রহ.), মাওলানা আব্দুস সাত্তার (রহ.) ও মাওলানা আলাউদ্দীন আল-আজহারী (রহ.) প্রমূখ।

মাওলানা শাহ মুহাম্মদ গোলাম হাক্কানী (রহ.)-এর পাঁচ ছেলে ও চার মেয়ে ছিল। প্রত্যেকেই ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষাও অর্জন করেন। ছেলেরা হলো- (১) মাওলানা মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া সাঈদী (২) মুহাম্মদ গোলাম কবীর সাঈদী (৩) মাওলানা মুহাম্মদ গোলাম সারোয়ার সাঈদী, তিনি পিতার প্রতিষ্ঠিত আড়াই বাড়ি দরবার শরীফের গদ্দিনশীন পীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং আড়াইবাড়ি ইসলামীয়া সাঈদীয়া কামিল মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে কুরআন-হাদীসের প্রচার-প্রসারে নিজেকে নিয়োজিত করেন (৪) মাওলানা মুহাম্মদ গোলাম খাবীর সাঈদী (৫) মুহাম্মদ গোলাম হাদী সাঈদী।

মাওলানা শাহ মুহাম্মদ গোলাম হাক্কানী (রহ.) ২৬ এপ্রিল ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ, ২৯ রবিউস সানী ১৪৩০ হিজরি রোববার ইন্তেকাল করেন। তাঁকে আড়াইবাড়ি ইসলামী সাঈদীয়া কামিল মাদ্‌রাসার পার্শ্ববর্তী পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।[৪৬৫]

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা শাহ মুহাম্মদ গোলাম হাক্কানী (রহ.)-এর অবদান

মাওলানা শাহ মুহাম্মদ গোলাম হাক্কানী (রহ.) ছাত্রজীবন সমাপ্ত করার পর তাঁর পিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আড়াইবাড়ি মাদ্‌রাসার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি অত্র মাদ্‌রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদে নিযুক্ত হন এবং অত্র মাদ্‌রাসাটিকে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে দাখিল মঞ্জুরির ব্যবস্থা করেন। অতঃপর ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে আলিম, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে ফাযেল এবং ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে কামিল হাদীস বিভাগের মঞ্জুরি লাভ করেন। বর্তমানে অত্র মাদ্‌রাসাটি ইবতেদায়ী জুনিয়র, দাখিল, আলিম, ফাযেল ও কামিল পরীক্ষার কেন্দ্র অবস্থিত। অত্র মাদ্‌রাসাটি জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

---

[৪৬৫] এইচ.এম. জাভেদ হোসাইন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উলামা-মাশায়েখের কর্মময় জীবন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২-৩৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে পুরস্কার লাভ করে। এছাড়া ও তিনি অত্র মাদ্‌রাসা সংলগ্ন আড়াইবাড়ি হাক্কানীয়া হাফিজিয়া মাদ্‌রাসা ও নূরানী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনায় ফলে অত্র মাদ্‌রাসাটিতে ইলমি ও আমলি দিক থেকে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। যার ফলে মাদ্‌রাসাটির সুনাম আজও সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে।

তিনি তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত আড়াইবাড়ি দরবার শরীফের গদ্দিনশীন পীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত পাঠাগারটিও সংরক্ষণ করেন। অত্র পাঠাগারে রয়েছে অতি মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব। বহু মানুষ বিভিন্ন মাসয়ালা-মাসায়েল নিয়ে মাওলানা শাহ মুহাম্মদ গোলাম হাক্কানী (রহ.) নিকট আগমন করতো। আর তিনি সে সকল মাসয়ালা-মাসায়েলসমূহের খুব সুন্দর করে সমাধা দিতেন। প্রতিদিন শত শত ধর্মপ্রাণ মানুষ তাঁর সান্নিধ্যে এসে শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা গ্রহণ করতেন এবং বহু ফতুয়া-ফরায়েজ বিষয়ক সমাধান নিতেন। তিনি কাউকে কখনো শরীয়তের খেলাফ কোনো কাজ হতে দেখলে সাথে সাথে তার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতেন। তিনি বলতেন শরীয়তের বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করার নামই মা'রেফাত। শরীয়তের বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন না করে কেউ মা'রেফাত হাসিল করতে পারেনা। যারা শরীয়ত ছাড়া মা'রেফাত হাসিল হয়েছে বলে দাবি করে তারা অশিক্ষিত সরল মনা লোকদেরকে নিজেদের দলে টানতে চায় বলে তিনি তাদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করেন।[৪৬৬]

তিনি গরীব-অসহায়দের শিক্ষা গ্রহণের জন্য অত্র মাদ্‌রাসায় লিল্লাহ বোর্ডিং, ইয়াতীমখানা, নূরানী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। কোনো কোনো পরিবারে বঞ্চিত বয়স্ক অসহায় লোকদেরকে লিল্লাহ বোর্ডিং-এ খাবারের ব্যবস্থা করে তাদের অসহায়ত্ব দূর করার সুব্যবস্থা করেন। তিনি আড়াইবাড়ি জামে মসজিদের মুতাওয়াল্লী ও খতীব হিসেবে সমকালীন বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ের ওপর নিয়মিত খুতবা প্রদান করতেন। তৎকালীন সময়ে যাত্রা, মদ, জুয়া, সার্কাস, অশ্লীল এবং বিভিন্ন অনৈসলামীক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিরোধ করেন।

দূর-দূরান্ত থেকে আগত বহু গরীব-অসহায় ব্যক্তিদেরকে বিভিন্ন জটিল রোগের হোমিও চিকিৎসা প্রদান করেন। বহুবার এলাকায় খরা ও অনাবৃষ্টির কারণে ফসল বিনষ্ট হতে দেখা দেওয়ায় তিনি ইস্তেকার নামাযের ব্যবস্থা করেন এবং আল্লাহর দরবারে বিশেষভাবে দু'আ করেন। ফলে বৃষ্টিসহ বিশেষ সফলতা লাভ হয়। আর এসকল মহৎ কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। তিনি শরীয়ত পরিপন্থী বিদ'আত, শিরক, কুফরী, মাযার পূজা, কবর পূজা বা কোন অনৈসলামীক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে দেখলে কঠোরভাবে তাঁদেরকে প্রতিরোধ করেন। এছাড়াও তিনি ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও এনজিওসহ বিভিন্ন ফেতনার মূলোৎপাটনে সর্বকালীন বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। আদর্শ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। তিনি সবসময় মুসলমানদের পরিচিতি, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করার ব্যাপারে আত্ম-নিবেদিত ছিলেন। তাঁর একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য হলো, নিজের বাতেনকে সঠিক করে নিজের আত্মাকে উন্নততর করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করা এবং নৈকট্য প্রাপ্তগণ অন্যদেরকে সে পথ প্রদর্শন করা। আর ইমানের জীবন্ত বীজের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

গ্রন্থ রচনা: মাওলানা শাহ মুহাম্মদ গোলাম হাক্কানী (রহ.) ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। দ্বীন প্রচারের প্রধান অন্যতম মাধ্যম হল সাহিত্য চর্চা ও জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনা করা। তিনি ব্যাপক

---

[৪৬৬] বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার হাদীসচর্চা: সমাজ ও সংস্কৃতিতে এর প্রভাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৮০।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মব্যস্ততার মাঝেও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত মূল্যবান গ্রন্থসমূহ হলো-

(১) মেরাজুল আশেকীন (২) আওরাদে হাক্কানী বা যিকরে তরিকত (৩) রোযার আদর্শ (৪) আত্-তাহকীকু লিলহাক্কানী ফী খালকী নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা উর্দু ভাষায় রচিত (৫) ফতোয়ায়ে হাক্কানীয়া এতে গান বাদ্য নাজায়েজ হবার দলিলসমূহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন (৬) কুরআন-হাদীসের আলোকে নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৃষ্টির তথ্য (৭) শরীয়তের দৃষ্টিতে জুমার দ্বিতীয় আযান (৮) শরীয়তের দৃষ্টিতে রাজনীতি ও খেলাফত।

মাওলানা শাহ মুহাম্মদ গোলাম হাক্কানী (রহ.) তিনি শিক্ষা বিস্তার, ওয়াজ-নসিহত, আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ ও লেখনীর সাহায্যে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সুমহান শিক্ষার আলো বিস্তার করে দ্বীন মিল্লাতে ব্যাপক অবদান রাখেন। তিনি সকলকে সুন্নাতে রাসূল (সা.) আদলে গড়ে তোলার জন্য আজীবন সচেষ্ট ছিলেন। আমৃত্যু তিনি প্রজ্ঞা, ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে দ্বীন ও হিদায়াতের মাধ্যমে নবীগণের ওরাসাতের দায়িত্ব পালন করেন।[৪৬৭]

মাওলানা শাহ মুহাম্মদ গোলাম হাক্কানী (রহ.) সম্পর্কে শিক্ষাবিদ ও গুণীজনের অভিমত-

১। ড. আ.জ.ম. কুতুবুল ইসলাম নো'মানী, সহকারী অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি বলেন, মাওলানা শাহ মুহাম্মদ গোলাম হাক্কানী (রহ.) আমার চাচাতো ভাই এবং শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ছিলেন। আমি তাঁর কাছে মিজান-মুনশায়িব, নাহবুমীর, পাঞ্জেগাঞ্জ, হেদায়াতুন নাহু, কাফিয়া, উসূলুশ শাসী, নূরুল আনোয়ার, শরহুল বিকায়া পড়েছি। আমার জানামতে তিনি উঁচুমাপের মুহাক্কিক আলেম ও বুজর্গ ছিলেন। তিনি সহজ-সরল ও আবেগ-প্রবণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অতি সহজেই যাচাই-বাছাই ছাড়া মানুষকে বিশ্বাস করে ফেলতেন। তাই তিনি জীবনে বহুবার প্রতারিত হয়েছেন। তাঁর উর্দু, আরবী ও ফার্সী বিষয়ের ওপর খুব গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি সমকালীন বিশ্ব সম্পর্কে জানার জন্য নিয়মিত দেশ-বিদেশী পত্র-পত্রিকা পড়তেন এবং খোঁজ-খবর রাখতেন। তিনি ঢাকা আলিয়া মাদরাসা হতে কামিল ফিকহ পাশ করার পর বাড়িতে ফেরার পর থেকে মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আড়াইবাড়ি সাঈদীয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, হিফজ বিভাগ, এতিমখানা, মসজিদ ও আড়াইবাড়ি দরবার শরীফ পরিচালনার গুরু দায়িত্ব অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। তাঁর ঐকান্তিক ও নিরলস প্রচেষ্টার ফলে অত্র মাদ্‌রাসাটি ইসলামী ও আমলী অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে। তাঁর ওয়াজ মাহফিল শুনে সাধারণ মানুষ অতি সহজেই মুগ্ধ হতো এবং পরবর্তীতে তাঁর একান্ত ভক্ত হয়ে যেত। দ্বীনি চেতনা ছিল তাঁর মাঝে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। তিনি নিঃস্বার্থতার একটি আদর্শ জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সরাসরি জামাআতে ইসলামী বাংলাদেশের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। তাই ইকামতের দ্বীনের জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। রাজনীতি যে ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ তা তিনি সমাজের আলেম শ্রেণিকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি আলেমদের মাঝে ঐক্য গড়ে তোলার জন্য ইত্তেহাদুল উম্মাহ সংগঠনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে আজীবন কাজ করে গিয়েছেন। তিনি ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে কসবা-আখাউড়া এলাকা থেকে জামাআতে ইসলামীর পক্ষ থেকে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন করে তৃতীয় স্থান দখল করেন। তিনি সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা যাবতীয় কুসংস্কার বিদ'আত ও ভণ্ড পীর ফকিরদের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন।[৪৬৮]

---

[৪৬৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

[৪৬৮] ১৪.০৪.২০১৬ খ্রিস্টাব্দে সাক্ষাৎকার অনুযায়ী লিখিত।

Dhaka University Institutional Repository

২। মাওলানা মুহাম্মদ গোলাম সারওয়ার সাঈদী, অধ্যক্ষ আড়াইবাড়ি সাঈদীয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা। তিনি বলেন, আমার পিতা ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ আলেম। তাঁর ইসলামী জ্ঞানের মশালে পথ পেয়েছে শত সহস্র পথ হারা মানুষ। তাঁর হাতের ছোঁয়ায় ও মুখের অমীয় বাণীর মাধ্যমে বহু মানুষ অন্ধকার ছেড়ে হেদায়েতের পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি যেমনি ছিলেন শিক্ষিত তেমনি ছিলেন ভদ্র ও প্রভাবশালী। তিনি তাঁর পিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আড়াইবাড়ি সাঈদীয়া মাদ্‌রাসা পরিচালনা ও শিক্ষা কার্যক্রম মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার ও সুনামের সাথে করেন। তিনি অত্র মাদ্‌রাসাটিকে নিজ উদ্যোগে দাখিল থেকে কামিল পর্যন্ত সরকারিভাবে মঞ্জুরি লাভ করান। বহু কষ্ট ও ত্যাগের বিনিময় অত্র মাদ্‌রাসাটি জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুরস্কার লাভ করে। তিনি বহু কর্ম ব্যস্ততায় মাঝে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গুরুত্বপূর্ণ কিতাব রচনা করেন। সর্বোপরি তিনি ইসলামের প্রচার-প্রসারে ব্যাপক অবদান রেখে যান।[৪৬৯]

৩। মাওলানা শেখ মো. কামাল উদ্দিন, সহকারী অধ্যাপক আড়াইবাড়ি সাঈদীয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা। তিনি বলেন, প্রত্যেক যুগে কিছু মানুষকে আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে প্রেরণ করেন। যারা নবীগণের উত্তরসূরি হিসেবে নিজের জীবনকে বিলিয়ে দেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মাওলানা শাহ মুহাম্মদ গোলাম রাব্বানী (রহ.)। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। বিভিন্ন সময় বহু মানুষ তাঁর সান্নিধ্যে এসে শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা গ্রহণ করতো এবং ফতুয়া ফরায়েযের সমাধান গ্রহণ করতো। তিনি ছিলেন কুরআন-হাদীসের ইলেমের সুবিজ্ঞ পরিব্রাজক এবং সত্য-ন্যায়ের পথের আকুতোভয় মুজাহিদ। তিনি সমাজের অন্ধকার দূর করার জন্য বিশেষভাবে মাদ্‌রাসার শিক্ষাকে অত্যাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন এবং সমাজের মানুষের নিকট সঠিক ইসলামের পরিচয় তুলে ধরে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে পরিচালিত করতে সফল ভূমিকা পালন করেন। তিনি আমৃত্যু ইসলামের প্রচার-প্রসারে নিজের জীবনে অতিবাহিত করেন। তিনি ইলমে জাহেরীর পাশাপাশি ইলমে বাতেনী তথা আধ্যাত্মিক সাধনায়ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আল্লাহ প্রেম, ইসলামের সুন্দর ব্যাবহার, ন্যায়পরায়ণতা সেবা ও সাহসিকতা ইত্যাদি গুণাবলীর সমাহার তাঁকে সোনালী আভায় দ্বীপ্ত করেছেন। সমাজের বিভিন্ন অনৈসলামীক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[৪৭০]

---

[৪৬৯] ২৪.০৭.২০১৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রদত্ত সাক্ষাৎকার অনুযায়ী লিখিত।
[৪৭০] ২৮.০৫.২০১৬ খ্রিস্টাব্দে সাক্ষাৎকার অনুযায়ী লিখিত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-২.৮ : মাওলানা আবদুল হাই (রহ.) (১৯০৭-১৯৯৪ খ্রি.)

দ্বীনে ইসলামের একনিষ্ঠ খাদেম, আলেমে দ্বীন মাওলানা আবদুল হাই (রহ.) ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার ১৩নং মাছিহাতা ইউনিয়নের চান্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী বেলায়েত আলী। তিনি পিতার নিকট প্রাথমিক আক্ষরিক জ্ঞান লাভ করেন। এরপর মাওলানা আবদুল হাই (রহ.)-এর বাড়ি সংলগ্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে নবীনগর উপজেলাধীন কাইতলা গ্রামের মাওলানা আবদুল মান্নান সাহেবের নিকট আরবী, উর্দু ও ফার্সী বিষয়ের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। সেখানে অল্প কিছু দিন লেখাপড়া করার পর চিনাইর গ্রামের ফুরকানিয়া মক্তবে ভর্তি হয়ে কিছুদিন লেখাপড়া করেন। অতঃপর দশ বছর বয়সে পিতার ইন্তেকালের পর তিনি ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্র জামিয়া ইউনুসিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে দীর্ঘ সাত বছর যাবৎ অধ্যয়ন করেন। অত্র জামিয়া ইউনুসিয়া থেকে পড়ালেখা শেষ করে খুলনার গজালিয়া মাদ্রাসায় এক বছর পড়ালেখা করেন। এরপর ঢাকা বড়কাটারা মাদ্রাসায় দাওরায়ে হাদীসের উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে তাঁর শিক্ষা জীবন শেষ করেন। তখন অত্র মাদ্রাসার ওস্তাদ ছিলেন মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.), মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর (রহ.) ও মাওলানা আবদুল ওয়াহাব পীরজী হুযুর (রহ.)। মোগল আমলের ঐতিহাসিক নিদর্শন বড়কাটারার কিল্লাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। যা আজ "জামিয়া হোসাইনিয়া আশরাফুল উলূম বড় কাটারা" নামে বিখ্যাত। তিনি ছিলেন বড়কাটারা[৪৭১] মাদ্রাসার প্রথম ছাত্র এবং প্রথম দাওরায়ে হাদীস ফারেগীনদের একজন। এছাড়াও মাওলানা আবদুল হাই (রহ.)-এর উল্লেখযোগ্য ওস্তাদ হলেন, ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.)।

পড়ালেখা শেষ করে মাওলানা আবদুল হাই (রহ.) ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার বিটঘর গ্রামের জনাব আবদুল মুনয়েম সরকারের বড় কন্যা মোসাম্মৎ আমেনা বেগমকে বিবাহ করেন। তাঁর ঔরশে ৫ কন্যা ও ৪ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তান শৈশবেই ইন্তেকাল করেন। অন্যান্যরা হলেন: যথাক্রমে- মাওলানা কাজী আবদুর রকীব, মাওলানা আবদুল্লাহ, হাফেয মাওলানা মুফতী ইমদাদুল্লাহ, মোসাম্মৎ রুকাইয়া আক্তার, মোসাম্মৎ ওলিয়া আক্তার, মোসাম্মৎ নাজিবা আক্তার ভুহফা।

মাওলানা আবদুল হাই (রহ.) ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তাঁর নামাযে জানাযার ইমামতি করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (মুফাস্সির হুযুর) (রহ.)। তাঁকে চান্দপুর মাদ্রাসা মাঠের পার্শ্ববর্তী পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা আবদুল হাই (রহ.)-এর অবদান-

মাওলানা আবদুল হাই (রহ.) পড়ালেখা সমাপ্তির পর ওস্তাদগণ তাঁকে জামিয়া হুসানিয়া আশরাফুল উলূম বড় কাটারা মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দান করেন এবং তিনি মেধাবী হওয়ায় একই সাথে ফুনুনাতের ওপর উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন। অত্র মাদ্রাসায় তিনি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ অধ্যাপনা করেন। বড় কাটারায় শিক্ষকতাকালে তাঁর কিছু উল্লেখযোগ্য ছাত্র রয়েছে যারা পরবর্তীতে বাংলাদেশের বড় বড় উলামায়ে কেরামগণের মধ্যে শীর্ষ পর্যায়ে রয়েছেন; তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন- মাওলানা আবদুল মাজিদ ঢাকুবী, মুহাদ্দিস জামিয়া আরাবিয়া লালবাগ, ঢাকা, মাওলানা আলী আসগার (রহ.), প্রবীণ ওস্তাদ জামিয়া আরাবিয়া লালবাগ, ঢাকা। এরপর তিনি

---

[৪৭১] সাক্ষাৎকার : মাওলানা ইমদাদুল্লাহ, মুহতামিম মিফতাহুল উলূম আল ইসলামীয়া চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ২০/০৬/২০১৬ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

কুমিল্লা জেলায় মুরাদনগর উপজেলায় অবস্থিত মুযাফ্ফারুল উলূম মাদ্‌রাসা পরিচালনার জন্য তাঁকে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি অত্র মাদ্‌রাসায় প্রায় ৮ বছর পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পাঠদানসহ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর আত্মত্যাগ, আন্তরিকতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অত্র এলাকায় ইসলামের নব-জাগরণের সৃষ্টি হয় এবং অত্র প্রতিষ্ঠানটি দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণের জন্য পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করে। কুরআন হাদীসের সহীহ শিক্ষার মাধ্যমে এটি একটি আদর্শ দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তাঁর প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয়। তিনি অত্র মাদ্‌রাসা পরিচালনার পাশাপাশি এলাকার নিকাহ রেজিস্ট্রার তথা কাজীর দায়িত্ব গ্রহণ করে তা আজীবন অত্যন্ত সুনামের সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া বর্তমান উত্তর জগতসার ঈদগাহ ও ঈদগাহ সংলগ্ন মসজিদের ইমাম ও খতীবের দায়িত্বও দীর্ঘদিন পর্যন্ত পালন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় অত্র এলাকায় বিদ'আত, কুসংস্কার ও বিভিন্ন অপসংস্কৃতি নির্মূল হয় এবং সাধারণ জনগণ সঠিক ইসলামের দিক-নির্দেশনা লাভ করেন।[৪৭২]

মাওলানা আবদুল হাই (রহ.) মুরাদনগর নিজ গ্রামে একটি দ্বীনী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং এলাকাবাসীর পক্ষ থেকেও এ ব্যাপারে তাঁর প্রতি জোর দাবি ছিল। তাই তিনি ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান চান্দপুর উচ্চবিদ্যালয়ের স্থানে মিফতাহুল উলূম মাদ্‌রাসা নামে একটি মাদ্‌রাসার ভিত্তি স্থাপন করেন। তখন মাদ্‌রাসাটি ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি। চান্দপুর মাদ্‌রাসা ও প্রাইমারি স্কুল একই স্থানে পাশাপাশি হওয়ায় নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে লাগল। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নিজ বাড়ির সন্নিকটে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে নতুনভাবে মাদ্‌রাসা ও মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। ভিত্তি স্থাপনের সময় উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ, হাফিজ্জী হুযুর (রহ.)-সহ অনেক উলামায়ে কিরাম। প্রথমত নূরানী মক্তব বিভাগ থেকে জামাতে হিদায়াতুন্নাহু পর্যন্ত মাদ্‌রাসার শিক্ষাকার্যক্রম চালু করেন। এরপর হিফয বিভাগ চালু করেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ বদৌলতে মাদ্‌রাসার ছাত্রদের তা'লীম-তারবিয়াত, আমল-আখলাক ও মাদ্‌রাসার সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। যার কারণে এলাকায় সাধারণ জনগণ ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহসহ ইসলামী আদর্শের প্রতি সহজে উদ্বুদ্ধ হন।[৪৭৩]

বিভিন্ন কুসংস্কার প্রতিরোধ : মাওলানা আবদুল হাই (রহ.) মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সমাজ থেকে শিরক-বিদ'আত, কুসংস্কার ও শরীয়তবিরোধী বিভিন্ন কার্যকলাপ বিদূরিত করার জন্যও প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তখন বিভিন্ন এলাকায় মাইক দ্বারা কুরআন খতম ও শবীনার প্রচলন ছিল। এ বিদআতি কাজটি বন্ধ করতে তিনি অত্যন্ত জোরালো ভূমিকা পালন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় পুরো এলাকা থেকে এ প্রচলন উঠে যায়। অত্র এলাকায় গান-বাদ্যেরও প্রচলন ছিল প্রচুর, যেখানেই এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো তিনি তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেন। অত্র এলাকায় বিভিন্ন মৌসুমে মেলায় জুয়ার আসর বসতো, তিনি এলাকার সাধারণ জনগণকে তার অপকারিতা বুঝিয়ে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে তা প্রতিরোধ করেন। এসকল মহৎ অবদানের কারণে অত্র এলাকায় তিনি সকলের নিকট 'বড় হুযুর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[৪৭৪]

---

[৪৭২] মুফতী ইহতিশামুল হক নোমান, মাখায়েখে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জীবন ও কর্ম, (ঢাকা: মাদরাসায় মারকাজুল উলুম আল ইসলামীয়া, বনশ্রী, ২০১২খ্রি.), পৃ. ১৩৮-১৪০।

[৪৭৩] সাক্ষাৎকার সূত্রে মরহুমের সাহেব জাদা মুফতী ইমদাদুল্লাহ হতে প্রাপ্ত তথ্য, তারিখ: ১২.০৬.২০১৫খ্রি.।

[৪৭৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০-১৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আবদুল হাই (রহ.) সম্পর্কে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের সাক্ষাৎকার-

১। মাওলানা ইমদাদুল্লাহ বিন মাওলানা আবদুল হাই (রহ.), শিক্ষক জামিয়া কুরআনিয়া লালবাগ, ঢাকা। তিনি বলেন, আমার পিতা ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ আলেম, দ্বীনদার ও সমাজ সংস্কারক। তিনি সাধারণ আলেমগণের চাইতে মানুষের জীবন ও তার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সম্বন্ধে অধিক সচেতন ছিলেন। তিনি মাদ্‌রাসা পরিচালনা ও মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সমাজ থেকে বিদ'আত, কুসংস্কার ও শরীয়ত বিরোধী বিভিন্ন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আজীবন প্রাণপণ চেষ্টা করেন এবং এতে সফলতাও লাভ করেন। যার ফলে তিনি এলাকার সকল মানুষের নিকট "বড় হুজুর" নামে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।[৪৭৫]

২। মাওলানা আখতারুজ্জামান সাহেব, মুফাস্‌সির জামিয়া ইউনুসিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া। তিনি বলেন, মাওলানা আবদুল হাই (রহ.) ছিলেন এক প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন ও বাতেল বিরোধী আপোষহীন বিপ্লবী মুজাহিদ। তিনি সারা জীবন ইসলামের সঠিক পরিচয় মানুষের নিকট তুলে ধরে মানুষকে মুক্তি ও কল্যাণের পথে পরিচালনায় প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যান। সমাজ থেকে বিভিন্ন বিদ'আত ও কুসংস্কারমূলক কার্যকলাপ সংস্কারের ক্ষেত্রে নির্দিধায় বলা যায় এ ব্যাপারে তিনি ব্যাপক সফলতা লাভ করেছেন।[৪৭৬]

---

[৪৭৫] গবেষকের ০২.০২.২০১৫ খ্রিস্টাব্দে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত।

[৪৭৬] গবেষকের ০২.০৮.২০১৫ খ্রিস্টাব্দে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-২.৯ : প্রফেসর মাওলানা আবদুল খালেক ছতুরাভী (রহ.) (১৮৯২-১৯৫৫ খ্রি.)

বৃহত্তম কুমিল্লা জেলার বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রফেসর মাওলানা আবদুল খালেক (রহ.) ছিলেন আধ্যাত্মিক সাধকদের মধ্যে অন্যতম। বৃহত্তম কুমিল্লাসহ বাংলার বিভিন্নাঞ্চলে আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রসারে যার সুনাম ও সুখ্যাতি সর্বজনবিদিত। তিনি ছিলেন ফুরফুরা সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার এবং সোনাকান্দার পীর মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী (রহ.)-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এ মহান সাধক ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার অন্তর্গত ছতুরা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৪৭৭] তাঁর পিতার নাম গাউস আলী ও মাতার নাম মোসাম্মৎ খিলবারুন্নেসা। দাদার নাম আম্বর আলী। তাঁর ছিলো তিন ভাই ও চার বোন। তিনি তাদের মধ্যে সকলের বড় ছিলেন।[৪৭৮]

পারিবারিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর কুমিল্লা শহরের হোচ্ছামিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লার হোচ্ছামিয়া মাদ্রাসা হতে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে জামাতে উলা পাস করেন। অতঃপর ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লার ঈশ্বর পাঠশালায় সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন।[৪৭৯] ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ পাঠশালায় অধ্যয়ন করেন। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে অত্যন্ত সুনামের সাথে এন্ট্রান্স পাস করেন। এন্ট্রান্স পাস করার পর তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হন এবং দু'বছর পর ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে এফ.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর এম.এ. পড়ার জন্য ঢাকা চলে যান। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস অনুযায়ী ফার্সী ভাষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে এম.এ. পাস করেন। তখন ঢাকার নবাব ছিলেন স্যার সলিমুল্লাহ। স্যার সলিমুল্লাহ সাহেবের নবাব বাড়িতে জায়গির থেকে তিনি পড়াশুনা করেন। নবাব তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন এবং পড়াশুনার ব্যাপারে তাঁকে ব্যাপক সহযোগিতা করতেন। পুনরায় তিনি ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস অনুযায়ী আরবী ভাষায় এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।[৪৮০]

দাম্পত্য জীবনে তিনি ২ কন্যা ও ৪ পুত্র সন্তানের জনক। ৩ এপ্রিল ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।[৪৮১] কসবা উপজেলার ছতুরায় তাঁর নিজ গ্রামে দাফন করা হয়।

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা আবদুল খালেক (রহ.)-এর অবদান-

মাওলানা আবদুল খালেক (রহ.) শিক্ষা জীবন শেষ করে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ফেনী কলেজের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করে তাঁর কর্ম-জীবনের সূচনা করেন। এখানে প্রায় তিন বছর যাবৎ অত্যন্ত সুনামের সাথে অধ্যাপনা করেন। ফেনী কলেজে অধ্যাপনাকালীন তিনি বিখ্যাত ওলীয়ে কামেল ফুরফুরার বিশিষ্ট খলীফা সুফী সদর উদ্দীনের হাতে তুরিকাতের বায়'আত গ্রহণ করেন। অতঃপর স্বীয় শায়খের সোহবতে থেকে কঠোর রেয়াজত করে তিনি তাঁর কাছ থেকে খেলাফত প্রাপ্ত হন। অত্র কলেজে অধ্যাপনার সময় তিনি বিভিন্ন ইংরেজি শিক্ষিত মানুষের কাছে ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয় তুলে

৪৭৭ (কু.জে.ই.), প্রাগুক্ত পৃ. ২৪৪; মো. আবু ছালেহ পাটোয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯।
৪৭৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯।
৪৭৯ মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।
৪৮০ মো. আবু ছালেহ পাটোয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯।
৪৮১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

ধরার মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলেন। যার ফলে তারা ইসলামের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো অতি সহজেই বুঝতে পারেন এবং সঠিক ইসলামের প্রতি ধাবিত হন।

অতঃপর মাওলানা আবদুল খালেক (রহ.) ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার প্রেসিডেন্ট কলেজের লেকচারার পদ গ্রহণ করে কলকাতায় চলে যান। উক্ত পদে দীর্ঘদিন বহাল থাকার পর তিনি লেডি কলেজে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন।[৪৮২] ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল থাকেন। কলকাতা আসার কিছুদিন পর তিনি স্বীয় পীরের ইযাজত মোতাবেক ও নির্দেশে ফুরফুরা গমন করেন এবং মুজাদ্দিদে জামান আবু বকর ছিদ্দিকী (রহ.)-এর নিকট পুনরায় বায়'আত গ্রহণ করে ইলমে মারেফাতের উচ্চ মাকামে আসীন হন। ফুরফুরার মুজাদ্দিদে জামান (রহ.)-এর হাতে তিনি পুনরায় খেলাফত প্রাপ্ত হন।[৪৮৩] তিনি ছিলেন পীর সাহেবের অন্যতম খলীফা। বহু শিক্ষিত লোক তাঁর ইসলামী জীবনাদর্শে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন। তাঁর থেকেও চারজন খিলাফত লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলাধীন ফরাজী কান্দির শাহ বুরহান উদ্দীন আহমদ।[৪৮৪] দেশ বিভাগের পর তিনি পুনরায় ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন এবং বখশী বাজারে অবস্থিত বদরুন্নেসা সরকারি কলেজের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে তিনি ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং কিছু দিন পর ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের উপাধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করে দীর্ঘদিন পর্যন্ত চাকরি করার পর সরকারি চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করেন।[৪৮৫]

তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে তা'লীমাতই ইসলামীয়া বোর্ড গঠন করলে মাওলানা আবদুল খালেক (রহ.) তিনি এ বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাস পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল ছিলেন। এ সময় তিনি সপরিবারে করাচী চলে যান। করাচী থাকাকালীন সময়ে তিনি স্বীয় পুত্র মাওলানা কাউসার আহমদসহ হজ্জ সম্পাদন করেন। চাকরি শেষে তিনি করাচী হতে ঢাকা ফিরে আসেন এবং ইলমে শরী'আত ও তুরিকাতের দীক্ষা প্রদানে ব্রত হন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলাসহ বৃহত্তর কুমিল্লা বিশেষ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সংলগ্ন উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় জেলা অর্থাৎ বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও সিলেট জেলার দক্ষিণাংশে ইলমে মারিফাত প্রসারের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন। বিশেষ করে ঢাকা ও কলকাতাসহ শিক্ষিত সমাজে তিনি ইলমে তাসাউফের শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ইলমে তাসাউফের শিক্ষাদান ও প্রসারের জন্য তিনি হুতুরা দরবার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র কাউসার আহমদ পিতার গুরু দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।[৪৮৬]

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের নির্বাচনে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে নিজ এলাকা হতে সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু এসেম্বলির বৈঠক বসার আগেই ৩ এপ্রিল ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।[৪৮৭]

মাওলানা আবদুল খালেক (রহ.) ইসলামের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে "সাইয়েদুল মুরসালীন" এবং "সেরাজুস সালেকীন" অন্যতম।[৪৮৮] তিনি সিরাজুস সালেকীন কিতাবে নিম্নে উল্লেখিত বিবরগুলো উল্লেখ করেন। যেমন- আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর তা'রীফ,

---

[৪৮২] (কু.জে.ই.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪; মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।
[৪৮৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮; (কু.জে.ই.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪।
[৪৮৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪।
[৪৮৫] মো. আবু ছালেহ পাটোয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯।
[৪৮৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০।
[৪৮৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০।
[৪৮৮] (কু.জে.ই.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪; মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

ইল্‌ম, দুনিয়ার হাকীকত, ঈমান, তাকদীর, নিয়ত, গোনাহ কবীরা, বিদ'আত ও বদরোছম, কুফরী কালাম, ইবাদত, বেহেশত ও দোযখ, কেয়ামতের আলামত, দুরূদ শরীফের ফযীলত, নফল নামাজের ফযীলত, ইস্তেগফার ও তওবার ফযীলত, আল্লাহ তা'আলার জন্য ভয় ও ক্রন্দন, কামেল পীরের আলামত, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যকে সেজদা করা, আল্লাহ তা'আলার যিকির, পোষাক পরিচ্ছদ ও সুন্নাতি তরিকায় পানাহারের বিবরণ, পর্দার আবশ্যকতার বিবরণ এবং জিকিরের নিয়ম ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ উল্লেখ করেন।

তাঁর লিখিত গ্রন্থ দুটি বিরল পূর্ণ প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত যা বাংলা ভাষায় অমূল্য সম্পদ। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বাংলা ভাষা-ভাষীদের কাছে গ্রন্থ দুটি অতি পরিচিত ও সমাদৃত। বিশ্ববিখ্যাত সহীহ বুখারী শরীফের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকার। "ফতহুলবারী" কিতাবের লেখক আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)-এর লেখা "মুনাব্বেহাত" কিতাবটি তিনি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। তাছাড়া দুররাতুল আদব ১ম খণ্ড, দুররাতুল আদব ২য় খণ্ড ও সরল আরবী ব্যাকরণ তাঁর প্রাথমিক শিক্ষকতা জীবনের উল্লেখযোগ্য রচনাবলি। এছাড়া তিনি সৌভাগ্যের পরশমণি, ইমাম গাজালী (রহ.)-এর কিমিয়ায়ে সা'আদাত গ্রন্থের অনুবাদ করেন।[৪৮৯]

মাওলানা আবদুল খালেক (রহ.) সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার-

১। মাওলানা শাহ্‌সুফী আবু বকর সিদ্দীক, পীর সাহেব দারুল আমান গোবিন্দপুর, কুমিল্লা। তিনি বলেন, প্রফেসর মাওলানা আব্দুল খালেক ছতুরাভী (রহ.) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ আলেম ও সমাজ সংস্কারক। তিনি ফুরফুরা সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম খলিফা ছিলেন। তাঁর হাতে বহু ইংরেজি শিক্ষিত লোক ইসলামী জীবনাদর্শে আকৃষ্ট হয়ে বায়'আত গ্রহণ করেন। ফুরফুরার পীরসাহেব আবু বকর সিদ্দিকী (রহ.) তাঁকে আন্তরিকভাবে খুবই ভালোবাসতেন এবং জেনারেল শিক্ষিত মানুষের মাঝে ইসলামের পরিপূর্ণ আদর্শ তুলে ধরার লক্ষ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা প্রদান করেন। তিনি ছিলেন খুবই মেধাবী, কুরআন-হাদীসের ব্যাপক জ্ঞান থাকায় তিনি সাধারণ ও শিক্ষিত মানুষকে সহজেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারতেন।[৪৯০]

২। মাওলানা মোহাম্মদ হামিদুর রহমান, বিশিষ্ট খাদেম, সোনাকান্দা দরবার শরীফ। তিনি বলেন প্রফেসর মাওলানা আব্দুল খালেক ছতুরাভী (রহ.) ছিলেন একজন মেধাবী আলেম ও বুজুর্গ ব্যক্তি। তিনি মাদ্‌রাসায় উচ্চশিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষায় উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন। তিনি কর্মজীবনে বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপনার দায়িত্ব অত্যন্ত সুনামের সাথে পালন করেন। তিনি ফুরফুরা পীর সাহেবের হাতে ইলমে মারেফাতের খেলাফত লাভ করেন। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আধ্যাত্মিক সাধকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। সোনাকান্দার পীর আবদুর রহমান হানাফী (রহ.)-এর সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিলো এবং সোনাকান্দা দারুলহুদা বহুমুখী কামেল মাদ্‌রাসা পরিচালনা কমিটির সদস্যও ছিলেন। তিনি বৃহত্তম কুমিল্লাসহ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। তাঁর থেকে চারজন বিশিষ্ট আলেম খেলাফত লাভ করেন।[৪৯১]

৩। মাওলানা আবদুর রশিদ সাহেব, সাবেক ভাইস প্রিন্সিপাল সোনাকান্দা দারুল হুদা বহুমুখী কামিল মাদ্‌রাসা। তিনি বলেন প্রফেসর মাওলানা আব্দুল খালেক ছতুরাভী (রহ.) ছিলেন একজন

---

[৪৮৯] মো. আবু ছালেহ পাটোয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১।

[৪৯০] গবেষকের ০১.০৫.২০১৫ খ্রিস্টাব্দে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত।

[৪৯১] গবেষকের ২১.০২.২০১৫ খ্রিস্টাব্দে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রখ্যাত আলেম ও সঠিক আধ্যাত্মিক শিক্ষার ধারক-বাহক। বিশেষ করে উত্তর কুমিল্লাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামী তাহজীব-তামাদ্দুন প্রতিষ্ঠায় এবং সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণে শরীয়ত ও ত্বরিকতের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজের মানুষকে নতুন দিগন্তের পথে জাগিয়ে তোলেন। তিনি বহু জেনারেল শিক্ষিতদেরকে ইসলামী আদর্শে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর দিক-নির্দেশনামূলক অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তা'লিমাত বোর্ড গঠন করলে তিনি উক্ত বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নিজ এলাকা হতে সদস্য নির্বাচিত হন। এছাড়াও সমাজের বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডে তাঁর ব্যাপক অবদান রয়েছে।[৪৯২]

[৪৯২] গবেষকের ১১.০৩.২০১৫ খ্রিস্টাব্দে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-২.১০ : মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহহাব (রহ.) (১৯০২-১৯৯৬খ্রি.)

সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা নয়নাভিরাম এই বাংলার আনাচে-কানাচে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও পবিত্র কুরআনের আলো প্রজ্বলিত করে মানুষকে পরকাল সচেতন ও আখেরাতমুখী করে যে সকল ক্ষণজন্মা মনীষী বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান রেখে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে "বাংলাদেশ নাদিয়াতুল কুরআন"-এর প্রতিষ্ঠাতা, প্রখ্যাত বুযুর্গ মাওলানা আবদুল ওয়াহহাব (রহ.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বহুমুখী প্রতিভার জন্য বর্তমান অনাগত ভবিষ্যতের জ্ঞান পিপাসুগণ অনন্তকাল পর্যন্ত তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। তিনি নারী শিক্ষা, সমাজ সংস্কার, পবিত্র কুরআনের তা'লীম ও বিভিন্ন কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে অভাবগ্রস্ত মুসলমানদের জীবনে আনয়ন করেছিলেন এক নতুন প্রাণচাঞ্চল্য।

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহহাব (রহ.) ১৩২৭ বাংলা, ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সদর উপজেলায় ঐতিহ্যবাহী ভাদুঘর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলতাফ উদ্দীন ও মায়ের নাম মোসাম্মাৎ যুবায়দা খাতুন। তাঁর পিতা দেশের অভ্যন্তরে 'ভূঁইয়া সাহেব' নামে সকলের নিকট পরিচিতি লাভ করেন।

চার বছর বয়সে তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন, ফলে এতিম হিসেবে তাঁর জীবনযাত্রা শুরু হয়। লেখাপড়ার দায়িত্ব পড়ে তাঁর স্নেহময়ী মায়ের ওপর। প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের জন্য তাঁকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জর্জ স্কুলে ভর্তি করানো হয়। এ স্কুলে তিনি তিন বছর পর্যন্ত অত্যন্ত মনোযোগের সাথে পড়াশুনা করেন। মাওলানা আবদুল ওয়াহহাব (রহ.) স্কুলে ভর্তি হওয়ার অল্প কিছু দিন পূর্বে মাওলানা ইউনুস সাহেব ও মাওলানা আবুদল ওয়াহ্হাব সাহেবের পিতা আলতাফ উদ্দীন ভূঁইয়া সাহেবসহ অন্যান্য আলেম উলামা মুরুব্বীদের প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এরপর মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর নির্দেশে মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.), হাফেজ্জী হুযুর (রহ.), পীরজী হুযুর (রহ.) ও মাওলানা আতহার আলী (রহ.) ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্‌রাসার ওস্তাদ হিসেবে যোগদান করার পর হাফেজ্জী হুজুর (রহ.)-কে আলতাফ উদ্দীন সাহেব নিজ ঘরে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং বালক আবদুল ওয়াহহাবকে পবিত্র কুরআনুল কারীমের প্রাথমিক দ্বীনী তা'লীম দেওয়ার জন্য তাঁর হাতে সোপর্দ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, তাই তিনি স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগেই হাফেজ্জী হুজুর (রহ.)-এর নিকট পবিত্র কুরআনে কারীমের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত ও প্রাথমিক দ্বীনী তা'লিমের শিক্ষালাভ করেন এবং জামেয়া ইউনুসিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্‌রাসায় প্রাথমিক পর্যায়ের কিতাবগুলো পড়ে নেন।[৪৯৩]

অতঃপর তিনি ঢাকা বড় কাটরা মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে সেখানে অত্যন্ত সুনামের সাথে পাঁচ বছর পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। এরপর উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে ভারত উপ-মহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, উসূলে ফিকাহ, বালাগাত, মানতেক, আদবসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গভীর জ্ঞান লাভ করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

মাওলানা আবদুল ওয়াহহাব (রহ.) আরবী অক্ষরসমূহের সঠিক মাখরাজ ও সিফাতসহ স্পষ্ট উচ্চারণ করে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা যেন তাঁর একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁর সুললিত ও সুমিষ্ট কণ্ঠের পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত শ্রোতাদের মধ্যে এক অপূর্ব ভাবাবেগের সৃষ্টি করতো। তাঁর ক্বিরাতের মান ছিল অনেক আন্তর্জাতিক কারীদের চেয়ে উন্নত ও শ্রুতিমধুর।

---

[৪৯৩] এস.এম আজিজুল হক আনসারী, বাংলাদেশের পীর-আওলিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আবদুল ওয়াহহাব (রহ.) জীবনের দীর্ঘ সময় আলেম-উলামা ও বিভিন্ন মনীষীদের সান্নিধ্যে থেকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরী (রহ.)-এর নিকট সর্ব প্রথম বায়'আত গ্রহণ করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তিনি মাওলানা ইউসুফ (রহ.)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তিনি মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন এবং তাঁর ইন্তেকালের পর মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রহ.)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন এবং হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) থেকে ১৩৮৩ হিজরিতে খেলাফত লাভ করেন। খেলাফত লাভের পর তাঁকে ইসলাহী খেদমতের সাথে সাথে তালীমুল কুরআনের সঠিক পদ্ধতি প্রতিটি মুসলমানের ঘরে ঘরে পৌঁছানোর জন্য বিশেষভাবে দায়িত্ব প্রদান করেন।

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রখ্যাত মুফাসসির মাওলানা সিরাজুল ইসলাম সাহেবের প্রথমা কন্যা মোসাম্মাৎ সালেহা বেগমের সাথে তাঁর শুভ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় এবং শায়েখুল ইসলাম মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) এক বিশাল উলামা সমাবেশ পূর্ণ সুন্নাত তরীকায় এ বিবাহ সম্পূর্ণ হয়। তাঁর ঔরসে চার ছেলে পাঁচ মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তারা হলেন- মাওলানা মাহমুদুল হাসান মহাপরিচালক নাদিয়াতুল কুরআন শিক্ষা বোর্ড, মাওলানা মকবুল হাসান, প্রধান প্রশিক্ষক নাদিয়াতুল কুরআন শিক্ষা বোর্ড, মাওলানা মাহবুবুল হাসান, সহকারী পরিচালক নাদিয়াতুল কুরআন মহিলা মাদ্রাসা, মাওলানা মাসউদুল হাসান, পরিচালক নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী বিভাগ।

মাওলানা আবদুল ওয়াহহাব (রহ.) তাবলীগ ও দাওয়াতের মেহনত নিয়ে ভারত, পাকিস্তান, বার্মা, লণ্ডন, সউদী আরবসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফর করেন। সউদী আরব ও হজ্জের সফরে তিনি 'মাআরিফুন নিকাহ' নামক একটি বই লিখেন। "লন্ডন ফোর্ড স্কোয়ার ইসলামিক সেন্টারের আমন্ত্রণে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে লন্ডনে আগমন করেন। প্রায় চার মাস সেখানে অবস্থান করেন। অক্সফোর্ড, লোটন, ভিউজবাড়ি, বার্মিংহাম প্রভৃতি বড় বড় শহরে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। নাদিয়ার পদ্ধতিতে তিনি বহু জায়গায় ফুরকানিয়া মাদ্রাসা চালু করেন। প্রধানত ট্রেনিংপ্রাপ্ত সিলেটি মুয়াল্লেমগণই ঐ মাদ্রাসাগুলোতে কাজ করেন। মুয়াল্লেমদের আগ্রহে লন্ডন ও লোটনে দুটি ট্রেনিং ক্যাম্প চালু করেন। সেখানকার মুয়াল্লিমগণের আগ্রহে বৃটেন নাদিয়াতুল কুরআন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত লাভ করে, যার মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা হয়।

মাওলানা আবদুল ওয়াহহাব (রহ.) ২৮ আশ্বিন ১৪০২ বাংলা মোতাবেক ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত পাটাপুকুর মসজিদ সংলগ্ন ঈদগাহ ময়দানে জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার নামাযের ইমামতি করেন মাওলানা সিরাজুল ইসলাম বড় হুজুর। জানাযার পর পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[৪৯৪]

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহহাব (রহ.)-এর অবদান-

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, বাংলাদেশ নাদিয়াতুর কুরআনের প্রতিষ্ঠাতা, প্রখ্যাত আলেম ও বুযুর্গ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব (রহ.) দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমাজের বর্তমান অবক্ষয় নিয়ে গভীর চিন্তা ও গবেষণা করেন। অবশেষে এর কারণ উদঘাটন করে মুসলিম সমাজকে তাঁদের বর্তমান জরাজীর্ণ অবস্থা থেকে উত্তোলনের নিমিত্তে গ্রামে গ্রামে আদর্শ মক্তব প্রতিষ্ঠা করে কুরআনী শিক্ষাকে ঘরে ঘরে পৌঁছানোর এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে সকল আলেম-উলামাদেরকে নিয়ে একটি কনফারেন্সের আয়োজন করেন এবং বিশিষ্ট মুরুব্বীদেরকে ও তিনি এ কাজের প্রতি আকৃষ্ট

---

[৪৯৪] হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, আমরা যাদের উত্তরসূরি, প্রাগুক্ত পৃ. ২৯৭-২৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

করতে সক্ষম হন। তাঁর এ মহান উদ্যোগকে সকলেই স্বাগত জানায় এবং এ ব্যাপারে চেষ্টা ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ এবং উৎসাহ প্রদান করেন। 'বাংলাদেশ নাদিয়াতুল কুরআন' তারই চিন্তা-গবেষণা ও পরিশ্রমের ফল। উল্লেখ্য যে, নাদিয়াতুল কুরআন শিক্ষা বোর্ড ভ্রাম্যমাণ ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে কোনো প্রকার বেতনভাতা ছাড়াই সাড়ে নয়শত ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে প্রায় বিশ হাজার মুয়াল্লিমকে ট্রেনিং দিয়ে আদর্শ শিক্ষক হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হন। বাংলাদেশে ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু এবং শাগরিদগণ তাঁর আবিষ্কৃত নাদিয়া পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন নামে পবিত্র কুরআনের খেদমতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন।[৪৯৫]

এছাড়া ও মহিলাদের দ্বীনী তা'লীমের ত্রুটি-বিচ্যুতির ব্যাপারে তাঁর যে অনুভূতি-অনুশোচনা ছিল তা তিনি বিভিন্ন বই-পুস্তক ও বক্তৃতার মাধ্যমে প্রকাশ করেন। তিনি লিখেন- 'বর্তমানে বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ফরয, তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হাজারো দ্বীনী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এ সকল দ্বীনী প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র পুরুষদেরকে দ্বীনী শিক্ষা দান করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, কিন্তু তা মহিলাদের জন্য আলাদাভাবে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। ফলে শুধু দ্বীনী শিক্ষা থেকে নারী জাতি বঞ্চিত, তা নয়; বরং তারা তাঁদের বিশাল মঙ্গলজনক খেদমত থেকেও বঞ্চিত। কারণ, একজন নারী শুধু স্ত্রীই নয়; বরং সে একাধারে জীবন-সঙ্গিনী, জননী, শিশুদের শিক্ষিকা ও একজন গৃহিণী ও মাতৃজাতির ফরয ইল্‌ম হাসিলের ব্যাপারে কোনো চিন্তা-ভাবনা ও চেষ্টা-প্রয়াস না থাকায় বিভিন্ন অনাচার ও অশান্তি সমাজে প্রকাশ পেয়েছে শুধু তাই নয় বরং চরম বিপদগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের প্রায় ছয় কোটি মহিলার দ্বীনী শিক্ষা অবস্থা এতোই করুণ যে, তাঁদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশি মহিলা নামায পড়ে না। আর বাকী যারা নামায পড়ে তাঁদের মধ্যে চল্লিশ ভাগ মহিলা অশুদ্ধভাবে নামায পড়ে।[৪৯৬]

এসকল দিক বিবেচনা করে মাওলানা আবদুল ওয়াহহাব বহু চিন্তা ও গবেষণা করেন এবং এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। ফলে চিন্তাশীল উলামায়ে কেরামের সাহসিকতায় দেশে গড়ে ওঠে বহু মহিলা মাদ্‌রাসা। এ মহিলা মাদ্‌রাসা আন্দোলনের অগ্রনায়ক হিসেবে তাঁকে আখ্যায়িত করা যায়। তিনি মহিলাদের দ্বীনী শিক্ষার জন্য আরও কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য এবং মহিলা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে 'তালীমুন নিসওয়ান' নামক একখানা তথ্যনির্ভর বই রচনা করেন। এ বইয়ে তিনি বাস্তব চিন্তাধারার নিরিখে মহিলাদের দ্বীনী শিক্ষায় ব্যাপারে মৌলিকভাবে তিনটি স্তর নির্ধারণ করেন। যা মাদ্‌রাসাতুল বানাত, মাদ্‌রাসাতুন্নিছওয়ান ও মাদ্‌রাসাতুল উম্মাহাত নামে উল্লেখ করেন।

মাদ্‌রাসাতুল বানাত বা ইসলামী প্রাইমারি মহিলা মাদ্‌রাসা। সেখানে পাঁচ বছর বয়স হতে নয় বছর বয়সের ছাত্রীরা ভর্তি হবে। এখানে তাদেরকে দ্বীনের বুনিয়াদী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ শিক্ষা দেয়া হবে। আর মাদ্‌রাসাতুন্নিছওয়ান হচ্ছে বিশেষ ছাত্রীদের জন্য উচ্চ পর্যায়ের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেখানে তাঁরা দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করবে। এরই ধারাবাহিকতা হিসেবে বর্তমানে দেশে বহু মহিলা মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এছাড়া মাদ্‌রাসাতুল উম্মাহাত ঐ সকল মহিলাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যারা গৃহিণী ও বৃদ্ধা মহিলা তাঁদেরকে দ্বীনী শিক্ষা সংক্ষিপ্তভাবে শিক্ষা দেয়া হবে। যা বর্তমানে তাঁর নিজস্ব বাড়িসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সাপ্তাহিক ইজতেমার পদ্ধতিতে সুচারুরূপে চালু রয়েছে। এছাড়া স্কুল ও কলেজে পাশ করা মেয়েদের জন্য স্বল্প সময়ের একটি প্রকল্প গ্রহণ করেন, যেখানে মহল্লার শিক্ষিত মেয়েদের গার্ডিয়ানের মাধ্যমে উৎসাহিত করে দৈনিক দুই ঘণ্টা দ্বীনী তা'লিম

---

[৪৯৫] মুফতী ইহতেশামুল হক নো'মান, মাশায়েখে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯-২২০।

[৪৯৬] এস.এম আজিজুল হক আনসারী, বাংলাদেশের পীর-আউলিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬-৮১।

Dhaka University Institutional Repository

প্রদান করা হবে। এ প্রকল্পের জন্য তিনি ব্যাপক পরিকল্পনা তৈরি করে কাজ শুরু করেন। মাওলানা আবদুল ওয়াহহাব মহিলাদেরকে দ্বীনী শিক্ষার নিমিত্তে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মহাপরিকল্পনা গ্রহণের সাথে তাদের জন্য 'ইসলাহুন নিসওয়ান ক্যাম্প' এর মাধ্যমে মহিলাদের সহীহ নামাযের তা'লিম ও দ্বীনী জ্ঞান লাভের বিশাল সুযোগ সৃষ্টি করে দেন।

রচনাবলি : মাওলানা আবদুল ওয়াহহাব (রহ.) তাঁর কর্মজীবনের শত ব্যস্ততার মাঝেও মুসলিম জাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর ও সমাজ সংস্কারমূলক গ্রন্থ রচনা করেন। এ সকল গ্রন্থের সাবলীল ভাষা ও উন্নত বিষয়বস্তু সত্যিই পাঠককে বিমোহিত করে তোলে এবং আল্লাহর হুকুম আহকামগুলো মেনে চলতে ও খোদাভীরু হতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। তাঁর রচিত ও অনূদিত বইয়ের মধ্যে রয়েছে- (১) তালীমুল মুয়াল্লিম ১ম ও ২য় খণ্ড (২) পুলসিরাতের আগে ও পরে (৩) খাওফে খোদা (৪) তাকমীলুল ঈমান (৫) মহিলা সাহাবীদের জীবনাদর্শ (৬) পরকাল (৭) ফাযায়েলে আযকার (৮) হক্কুল ইবাদ (৯) তাহারাতুন নিসওয়ান (১০) মাআরিফুন্নিকাহ (১১) মুসলিম শিশু শিক্ষা সংস্কারের ডাক (১২) আদর্শ প্রশ্নাবলী (১৩) কুরআন ও হাদীসের আলোকে দৈনন্দিন আমল প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৪৯৭]

সমাজ সংস্কারে অবদান : বর্তমানে আমাদের মুসলিম সমাজ বিভিন্ন কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। বিশেষ করে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান বিবাহ শাদী যা আজ নানারূপ বিভিন্ন কুসংস্কারে নিমজ্জিত। বিভিন্ন উচ্ছৃঙ্খল কার্যক্রম নির্লজ্জ আচরণ এবং মনগড়া কুসংস্কারের বিপুল আয়োজন এই বিয়ে অনুষ্ঠানে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এসব প্রতিরোধের জন্য তেমন কোন প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ না করায় দিন দিন আরও ব্যাপক আকার ধারণ করছে। তিনি এসকল কুসংস্কার সমূলে উৎপাটন করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেন এবং এ প্রসঙ্গে 'মাআরেফুন নিকাহ' নামক অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ একটি বই রচনা করেন। তিনি আপন ছেলে-মেয়ে এবং আত্মীয়-স্বজন ও অধীনস্থ এবং মুহিব্বিনদের বেলায় সকল কুসংস্কার মুক্ত আদর্শ সুন্নাতী বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পাদন করে। মুসলিম জাতির সামনে একটি উত্তম নমুনাও পেশ করেন। এছাড়াও ভাদুঘর শাহী মসজিদ, ভাদুঘর পাটাপুকুর মসজিদ, ভাদুঘর ভূঁইয়া পাড়া মসজিদ, ভূঁইয়া বাড়ি মহিলা মাদ্রাসা, ভাদুঘর দারুল উলূম মাদ্রাসা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান তাঁর বিশেষ অবদান উল্লেখযোগ্য এবং জামেয়া ইউনুসিয়ার উন্নয়নে ও তিনি বিশেষ অবদান রাখেন।[৪৯৮]

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহহাব (রহ.) সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত-

১. মাওলানা মাহমুদুল হাসান বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহ.), মহাপরিচলাক নাদিয়াতুল কুরআন শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশ। তিনি বলেন, আমার পিতা ছিলেন একজন প্রখ্যাত আলেম ও বুযুর্গ এবং সমাজ সংস্কারক। তিনি বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামের প্রচার-প্রসারে ও পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের আলো প্রজ্বলিত করে মানুষকে পরকালের প্রতি সচেতন ও আখেরাতমুখী করতে বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি মুসলিম সমাজকে সঠিক পদ্ধতিতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করার লক্ষ্যে গ্রামে গ্রামে আদর্শ মক্তব প্রতিষ্ঠা করে ঘরে ঘরে কুরআনের আলো

---

[৪৯৭] এইচ. এম. জাবেদ হোসাইন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া উলামা-মাশায়েখ কর্মময় জীবন, (নাদিয়াতুল কুরআন ফাউন্ডেশন, ঢাকা: ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ২৯৫-২৯৮।

[৪৯৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪-২৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

পৌঁছানোর এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং ব্যাপকভাবে সফলতা অর্জন করেন। তিনি শত ব্যস্ততার মাঝে মুসলিম জাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ের ওপর অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কিতাব রচনা করেন। তাঁর লেখিত গ্রন্থসমূহ সকল পাঠকের মনে বিমোহিত করে তোলে এবং আল্লাহর হুকুম আহকামগুলো মেনে চলতে ও খোদাভীরু হতে বিশেষভাবে সহায়তা করে।[৪৯৯]

২. মাওলানা সাজিদুর রহমান, মুহাদ্দেস জামিয়া ইউনুসিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া। তিনি বলেন, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহহাব (রহ.) ছিলেন একজন ইসলাম প্রচারক ও সমাজ সংস্কারক। তিনি সমাজের অন্ধকার কিভাবে দূর করা যায় সে ব্যাপারে বিশেষ গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় মহাল্লায় আদর্শ মক্তব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে সফলতার সাথে ব্যাপক অবদান রাখেন। বর্তমানে বিভিন্ন বিবাহ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মনগড়া কুসংস্কার ও নির্লজ্জতা, বেহায়াপনতা দেখা যায়, তিনি আজীবন এসবের বিরুদ্ধে কঠোর ভূমিকা পালন করেন এবং যথাসম্ভব আত্মীয়-স্বজন ও অধীনস্থ অন্যান্যদের মাঝে সুন্নাত মোতাবেক বিবাহ সম্পাদনের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তিনি মহিলাদের দ্বীনী শিক্ষা প্রদানের নিমিত্তে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং তাঁদের জন্য "ইসলাহুন নিসওয়ান ক্যাম্প"-এর মাধ্যমে সহীহ নামাযের তা'লিম ও দ্বীনী জ্ঞান লাভের বিশাল সুযোগ করে দেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সমাজের বিভিন্ন সংস্কারমূলক অবদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[৫০০]

৩. মাওলানা হাবীবুর রহমান, শায়েখুল হাদীস দারুর রাশাদ মিরপুর ঢাকা। তিনি বলেন, মাওলানা আবদুল ওয়াহহাব (রহ.) ছিলেন, একজন প্রসিদ্ধ আলেম, সমাজ সংস্কারক ও আপোষহীন বিপ্লবী মুজাহিদ। তিনি সারাজীবন ইসলামের সঠিক পরিচয় মানুষের নিকট তুলে ধরেন এবং পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত করার পদ্ধতি রচনা করার মাধ্যমে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘকাল পর্যন্ত গভীর গবেষণা করে গ্রামে গ্রামে আদর্শ মক্তব প্রতিষ্ঠা করে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ঘরে ঘরে পৌঁছানোর চেষ্টা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত চালিয়ে যান এবং নাদিয়াতুল কুরআন বাংলাদেশ নামে একটি কুরআন শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। অত্র বোর্ডের মাধ্যমে শত সহস্র ব্যক্তিদেরকে মুয়াল্লিম ট্রেনিং প্রদান করে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেন। আর বহু মুয়াল্লিমকে ট্রেনিং দিয়ে বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াতের জন্য একজন আদর্শ শিক্ষক তৈরি করেন। বর্তমানে কয়েকজন ব্যক্তি তাঁর আবিষ্কৃত নাদিয়া পদ্ধতিতে বিভিন্ন নামে পবিত্র কুরআনের খেদমত করে যাচ্ছেন। পবিত্র কুরআনের এ খেদমতের কারণে তিনি সকল আলেম উলামা, জন সাধারণের মাঝে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।[৫০১]

---

[৪৯৯] গবেষকের ০১.০৩.২০১৬ খ্রিস্টাব্দে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত।

[৫০০] গবেষকের ০২.০২.২০১৬ খ্রিস্টাব্দে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত।

[৫০১] গবেষকের ০২.০৫.২০১৬ খ্রিস্টাব্দে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-২.১১ : মাওলানা আলী আকবর (রহ.) (১৯০৮-১৯৯৩ খ্রি.)

মাওলানা আলী আকবর (রহ.) ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার শ্যামবাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গাজী মুন্সী সেকান্দর আলী চৌধুরী, তিনি ছিলেন মসজিদের ইমাম। পিতামহ বাহলুল হাজারী (রহ.) ছিলেন একজন পরহেজগার ও আল্লাহ ভীরু। তিনি ধর্ম প্রচারে অক্লান্ত পরিশ্রমী কর্মবীর মুজাহিদের ভূমিকা পালন করেন। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহ.) যখন তাঁর মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে শিখ ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য বালাকোট ময়দানে উপনীত হন, তখন এই মহান মুজাহিদ তাঁর সাথে উক্ত জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। তৎকালীন বড় বড় আলেম উলামা, পীর মাশায়েখ তাঁর বাড়িতে যাতায়াত করতেন।

মাওলানা আলী আকবর (রহ.) প্রথম জীবনে তাঁর পিতার নিকট আক্ষরিক জ্ঞান লাভ করেন। এরপর সৈয়দাবাদ মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে সেখানে কিছুদিন পড়ালেখা করেন। পরবর্তীতে কয়েক বছর বরুড়া মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। অতঃপর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঐতিহ্যবাহী জামিয়া ইসলামীয়া ইউনুসিয়ায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করে। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দে গমন করেন এবং সেখান থেকে কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহসহ দ্বীনের উচ্চশিক্ষা লাভ করেন।

ছাত্র হিসেবে তিনি পড়ালেখার প্রতি খুবই মনোযোগী ছিলেন। তিনি ছিলেন ক্লাসের একজন নিয়মিত ছাত্র। দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, চাকচিক্য পোশাক-পরিচ্ছদ, খেলাধুলা, রঙ্গ-তামাশা, গল্প-গুজব একেবারেই তাঁর অপছন্দনীয় ছিল। আর্থিক সংকট, ঝড়-বৃষ্টি প্রভৃতি কোনো কিছুই তাঁকে ক্ষণিকের জন্যেও ইলম অর্জন করা হতে বিরত রাখতে পারেনি। তাঁর এ অধ্যাবসায় ও সাধনা কবর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শিক্ষার সাথে সাথে প্রাণপণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করতেন। কুরআন-হাদীসের মর্মস্পর্শী বাণীগুলো উস্তাদের মুখ থেকে শ্রবণ করে তাঁর সম্মান ও আদব রক্ষা করে নিজ কলবে অংকিত করার মাধ্যমে এবং বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়নে অভিপ্রায়ে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি কুরআন-হাদীসের সম্মান রক্ষার্থে যেমন ছিলেন বদ্ধপরিকর, তেমনি ওস্তাদগণের প্রতি মুহাব্বত, সম্মান প্রদর্শন ও চারিত্রিক গুণাবলির কারণে তাঁদের থেকে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেন।

মাওলানা আলী আকবর (রহ.) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মহিউদ্দীন নগর গ্রামের আশরাফ আলী বেপারীর কনিষ্ঠা কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

মাওলানা আলী আকবর (রহ.) জামিয়া ইসলামীয়া ইউনুসিয়ায় লেখাপড়া সমাপ্ত করে উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য দারুল উলূম দেওবন্দে গমন করেন। সেখানে অধ্যয়ন অবস্থায় মাওলানা ইউসূফ (রহ.)-সহ কয়েকজন তাবলীগী মুরুব্বী দারুল উলূম দেওবন্দে সফরে আসেন। তিনি মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর পরামর্শক্রমে তাঁর সফরসঙ্গী হন এবং দেওবন্দ হতে মুলতান পর্যন্ত তাঁদের সাথে সফর করেন। অতঃপর তিনি মুলতান এলাকায় নিয়মিতভাবে দাওয়াতে তাবলীগের কাজ চালিয়ে যান।

মাওলানা আলী আকবর (রহ.) প্রথম কর্মজীবনে হাটহাজারীর মাওলানা সাঈদ আহমদ (রহ.)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন। অতঃপর দেওবন্দের মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন (রহ.), মাওলানা আলী আকবর (রহ.)-কে খেলাফত প্রদান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

এই মহান বুযুর্গ মাওলানা আলী আকবর (রহ.) ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে ৩১শে ডিসেম্বর তাবলীগের মারকাজ কাকরাইল মসজিদে ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্বগ্রাম 'আহরণ' মাদ্‌রাসা প্রাঙ্গনে সমাহিত করা হয়।[৫০২]

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা আলী আকবর (রহ.)-এর অবদান-

মাওলানা আলী আকবর (রহ.) পড়ালেখা শেষ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিবাহ করেন, তাঁর শ্বশুর বাড়িতে তেমন কোন দ্বীনী পরিবেশ না থাকায় প্রত্যহ তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্‌রাসায় ক্লাস শেষ করে শ্বশুরবাড়িসহ আশপাশের বাড়ির সকল পুরুষ মহিলাদেরকে এক ঘরে জমা করে পর্দার সাথে বসিয়ে তাঁদের মাঝে ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা, তা'লীম-তারবিয়াত ও মাসয়ালা-মাসায়েল আলোচনা করতেন। কিন্তু তখনও তাবলীগী জামায়াতের পরিচয় সম্পর্কে তাঁর জানা ছিল না। তিনি শুধু মানুষকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করে দেয়ার জন্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে অত্র দ্বীনী কাজটি সম্পাদন করতেন। যাতে করে সাধারণ মানুষ সঠিক ইসলামের পথে নিজের ও পরিবারের জীবন পরিচালনা করতে পারেন। এ তা'লীমী কাজটি প্রচলিত তাবলীগ জামাতের সেই তা'লীমী কাজে পরিণত হয়, যার মাঝে তিনি তাঁর সারাজীবন অতিবাহিত করেন।

তাঁর তা'লীমের ফলে এলাকার সাধারণ লোকজনের ব্যাপক পরিবর্তন হতে লাগল। পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ-মহিলাদের মধ্যে নামায প্রতিষ্ঠিত হল এবং ১২/১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের প্রতি নামাযের তাগিদ চলতে লাগল। পর্যায়ক্রমে তাঁর তা'লীমের প্রভাবে ঐ এলাকায় মসজিদ ও মক্তব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অত্র এলাকায় মাদ্‌রাসাগামী ইসলামী শিক্ষার প্রভাব বিস্তার লাভ করতে লাগলো। তিনি ঐলাকার ছেলেমেয়েদেরকে মক্তবে পড়ার পর মাদ্‌রাসায় ভর্তি করে দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলার ব্যাপারে বিশেষ অবদান রাখেন।[৫০৩]

মাওলানা আলী আকবর (রহ.) পর্দা ও ইসলামী পোশাক সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে বয়ান করেন। পর্দার ওপর বয়ান প্রসঙ্গে তিনি বড় পীর আব্দুল ক্বাদীর জিলানী (রহ.)-এর মাতার পর্দাকে জন সমাবেশে নমুনা হিসেবে তুলে ধরেন। পোশাক সম্পর্কে বয়ান করার প্রাক্কালে তিনি নিজ হাতে তৈরি মহিলাদের পোশাক ও পাঞ্জাবী দেখিয়ে বলেন, এই ইসলামী পোশাকটি সকলেই তৈরি করে পরবেন। পর্দা সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনার জন্য তিনি মাওলানা সাঈদ আহমদ সাহেবকে তাঁর শ্বশুরবাড়ি মহিউদ্দীননগর নিয়ে আসেন। তিনি পর্দা ও ইসলামী পোশাকের ওপর মনোমুগ্ধকর বয়ান রাখলেন। তাঁর বয়ানে এমন প্রভাব পড়ল যা পুরো এলাকায় ও তাঁর আশপাশের এলাকায় ইসলামী পোশাকের প্রচলন চালু হয়, এর ফলে সেখানকার মানুষ ইসলামের আলোয় আলোকিত হতে লাগলো এবং নিজেদেরকে ইসলামের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালনার জন্য ব্যাপক উদ্বুদ্ধ করে তোলেন।

দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি দেশে ফিরে এসে তৎকালীন জামিয়া ইউনুসিয়ার সদর ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.)-এর পরামর্শক্রমে তিনি সৈয়দাবাদ মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। অত্র মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা অবস্থায় তিনি ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.)-কেও দাওয়াতে তাবলীগের কাজে অনুপ্রাণিত করে তোলেন।

ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.) ও শহরের বিশিষ্ট মুরুব্বীগণসহ ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্‌রাসায় প্রতি মাসে তাবলীগের কাজ প্রসঙ্গে পরামর্শ সভা নির্ধারিণ করেন। মাওলানা আলী আকবর

---

৫০২ হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, আমরা যাদের উত্তরসূরি,প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭।

৫০৩ মুফতী ইহতিশামুল হক নোমান, মাখায়েখে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫-১৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

(রহ.) শিক্ষকতার পাশাপাশি দাওয়াতে তাবলীগের কাজটি এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি নিয়মিতভাবে এলাকার বিভিন্ন স্থানে তাবলীগ ও তা'লীমের কাজ পরিচালনা করেন।[৫০৪]

ঢাকার কাকরাইলস্থ বাংলাদেশের তাবলীগের মারকায মসজিদ হিসেবে নির্ধারণ করে। এখান হতে সারা বাংলায় তাবলীগের কাজ পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আলেম উলামা ও মুরুব্বীগণ এ তথ্য পেয়ে মারকাযের সংঙ্গে যোগাযোগ করে তাবলীগের কাজে নিজেদেরকে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করলেন। মাওলানা আলী আকবর (রহ.) তাবলীগে দাওয়াতে কাজে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন এবং দ্বীনী দাওয়াতি কাজে পায়ে হেঁটে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত পৌঁছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া হতে চট্টগ্রামের দূরত্ব প্রায় ২০০ কিলোমিটার। বহু দূরের পথ গ্রাম, খাল-বিল, নদী-নালা প্রভৃতি অতিক্রম করে তিনি মানুষের নিকট দাওয়াত তাবলীগ পৌঁছান। আলেম উলামা ও পীর মাশায়েখদেরকে তাবলীগের কাজে আত্মনিয়োগের ব্যাপারে জাগিয়ে তোলেন।[৫০৫]

মাওলানা আলী আকবর (রহ.) দেওবন্দ থেকে দেশে ফিরে প্রথমে তিনি সৈয়দাবাদ ছানী ইউনুসিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষক নিযুক্ত হন। এখানে শিক্ষক থাকা অবস্থায় ফখরে বাঙ্গাল (রহ.)-এর সাথে তিনি পরামর্শ করেন এবং তাকে বলেন মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতার জন্য অনেক আলেম উলামা আছেন। কিন্তু তাবলীগে দাওয়াতের কাজের জন্য কেউই এগিয়ে আসছে না। তাই আপনি অনুমতি দিলে আমি দাওয়াতের মেহনতে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত করতাম। ফখরে বাঙ্গাল (রহ.) তাঁকে অনুমতি দিয়ে দিলেন। তাঁর অনুমতি পেয়ে খুশিতে তিনি তাবলীগ জামাতের কাজে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। পর্যায়ক্রমে দ্বীনের এ মহান কাজে তিনি তরাক্কী লাভ করেন এবং সারাবিশ্বে তাঁর দ্বীনী মেহনত ছড়িয়ে পড়ে। তিনি ছাত্র জামানা থেকে শুরু করে ইন্তেকাল পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল দ্বীনের এক মহান "দায়ী ইলাল্লাহ" হিসেবে জীবনকে অতিবাহিত করেন। একটি মুহূর্তের জন্য ও স্বীয় কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হননি। উপমহাদেশ ছাড়াও দুনিয়ার প্রায় প্রতিটি দেশে, প্রতিটি জনপদে দ্বীনের দায়িত্ব নিয়ে তিনি চারণের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন। আফ্রিকা মহাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অধুনালুপ্ত কম্যুনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা রাশিয়ার আনাচে-কানাচে দ্বীনের মেহনতে নিজেকে মশগুল রাখেন।[৫০৬]

মাওলানা আলী আকবর (রহ.) সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত-

১। মাওলানা মুফতী মোবারক উল্লাহ, মুহাদ্দিস জামিয়া ইউনুসিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া, তিনি বলেন, মাওলানা আলী আকবর (রহ.) ছিলেন একজন ইসলামের প্রসারক ও প্রচারক। তিনি মানুষের নিকট আল্লাহর পরিচয় ও তাঁদের কর্তব্যের বিষয় তুলে ধরেন। তিনি উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে চারণের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি তাবলীগের দাওয়াতের কাজে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নিজের পুরো জীবনকে ব্যয় করেন। তিনি মুসলমানদেরকে ইসলামের প্রচার-প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগের জন্য এক আপোষহীন বিপ্লবী মুজাহিদি ভূমিকা পালন করেন।[৫০৭]

২। মাওলানা আশেক এলাহী, মুহাদ্দিস জামিয়া ইউনুসিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া, তিনি বলেন, মাওলানা আলী আকবর (রহ.) ছিলেন একজন প্রখ্যাত আলেম ও দায়ী ইলাল্লাহ। তিনি সবসময় পরিপূর্ণ

---

[৫০৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।

[৫০৫] এইচ. এম. জাবেদ হোসাইন, তিনটি ফুলের গল্প,প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-৬০।

[৫০৬] জামেয়া ইউনুসিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ইতিহাস ঐতিহ্য ও অবদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০-১৩১।

[৫০৭] গবেষকের ২১.০৭.২০১৬ খ্রিস্টাব্দে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত।

Dhaka University Institutional Repository

সুন্নাতের অনুসরণ করতেন। তিনি ইসলামী শিক্ষা প্রদানসহ দাওয়াতে তাবলীগের মেহনতে উপমহাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমৃত্যু প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তিনি মানুষের মাঝে ইসলামের মর্মবাণী সঠিকভাবে তুলে ধরে মানুষের হৃদয়কে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করে তুলতে সার্থক ভূমিকা পালন করেন। ইসলামের প্রচার-প্রসারে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। যার ফলে তিনি আজও আমাদের সকলের মাঝে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন এবং থাকবেন।[৫০৮]

৩। মাওলানা আবদুল কুদ্দুস সাহেব, মুহতামিম জামিয়া ইমদাদিয়া ফরিদাবাদ ঢাকা, তিনি বলেন, মাওলানা আলী আকবর (রহ.) ছিলেন একজন বড় আলেম ও বুযুর্গ ব্যক্তি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের অনুসারী। সমাজ থেকে বিভিন্ন বিদ'আত ও কুসংস্কার দূরীকরণের ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখেন। তিনি ইসলামের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন মাদ্রাসা ও মসজিদ স্থাপন করেন এবং ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়কে ইসলামের প্রতি জাগিয়ে তোলেন। তিনি ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক। ইসলামের প্রচার-প্রসারে এবং সঠিক ইসলামী আকিদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আজীবন সংগ্রাম করেন। তিনি বিভিন্ন ইসলামীক মাহফিল ও আলোচনার মাধ্যমে শরীয়াত মোতাবেক জীবন-যাপন এবং মহিলাদের পরিপূর্ণ পর্দা পালন করার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।[৫০৯]

---

[৫০৮] গবেষকের ২৩.০৩.২০১৬ খ্রিস্টাব্দে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত।

[৫০৯] গবেষকের ১১.০৮.২০১৬ খ্রিস্টাব্দে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-২.১২ : মাওলানা মুফতী ফজলুল হক আমিনী (রহ.) (১৯৪৫-২০১২খ্রি.)

মাওলানা মুফতী ফজলুল হক আমিনী (রহ.) ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আমিনপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আলহাজ্জ ওয়ায়েজ উদ্দীন ও মাতার নাম মোসাম্মৎ ফুলবানু বেগম। তিনি আক্ষরিক শিক্ষা ও বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত তাঁর পরিবারের কাছেই অর্জন করেন। এরপর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার জামিয়া ইউনুসিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুর মোস্তাফাগঞ্জ মাদ্‌রাসায় তিন বছর পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সাথে লেখাপড়া করেন। অধিক মেধাবী হওয়ায় সকল শিক্ষক তাঁর প্রতি বিশেষ নজর রাখেন। তারপর উচ্চশিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী ঢাকার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগে ভর্তি হয়ে বিজ্ঞ আলেমগণের তত্ত্বাবধানে থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সাথে পড়ালেখা করেন।

অতঃপর ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিক্‌হ তথা ইসলামী আইনের ওপর উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের লক্ষ্যে পাকিস্তানের করাচী নিউ টাউন মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। সেখানে ইসলামী আইনের ওপর বিজ্ঞ আলেমগণের বিশেষ তত্ত্বাবধানে থেকে ইসলামী আইনের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ইলমে দ্বীনের খেদমত শুরু করার পর মাত্র নয় মাসে পবিত্র কুরআনের হিফয সম্পূর্ণ করেন।[৫১০]

মাওলানা মুফতী ফজলুল হক আমিনী (রহ.) বহু প্রসিদ্ধ ওস্তাদগণের নিকট ইলমে দ্বীনের শিক্ষা লাভ করেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.), মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফিজ্জী হুযুর (রহ.), মাওলানা আবদুল ওয়াহাব পীরজী হুযুর (রহ.), শায়েখুল হাদীস মাওলানা আজীজুল হক (রহ.), মাওলানা সিরাজুল ইসলাম মুফাসসির হুযুর (রহ.) ও আল্লামা ইউসুফ বিন্নোরী (রহ.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন।

মুফতী আমিনী (রহ.) প্রথমে হাফিজ্জী হুযুর (রহ.)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে হাফেজ্জী হুযুর (রহ.) ইন্তেকালের পর তাঁরই অন্যতম খলীফা মাওলানা আব্দুল কবীর সাহেবসহ আরও কয়েকজন বিশিষ্ট খলীফা তাঁকে বায়'আত করার অনুমতি প্রদান করেন।

মাওলানা মুফতী ফজলুল হক আমিনী (রহ.) কয়েকবার পবিত্র হজ্জ ও ওমরা পালন করেন। তিনি বিভিন্ন কনফারেন্সে যোগদানের উদ্দেশ্যে লন্ডন, সিরিয়া, ভারত, কুয়েত ও পাকিস্তানে সফর করেন। ইরাক, ইরান ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্যে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি হাফেজ্জী (রহ.)-এর শান্তি মিশনের অন্যতম সদস্য হিসেবে যোগদান করেন এবং যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে জোরালো ভূমিকা পালন করেন।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার মাদ্‌রাসা-ই নূরিয়া কামরাঙ্গীচর শিক্ষক হিসেবে যোগদান করার পর তিনি হাফেজ্জী হুযুর (রহ.)-এর কন্যায় মোসাম্মৎ মুবারাকা সাহেবার সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর ঔরসে জন্মগ্রহণ করে দুই ছেলে ও চার মেয়ে। তারা হলেন হাফেয মাওলানা আবুল ফারাহ মুহাম্মদ তাহের, তিনি দারুল উলূম করাচি থেকে উচ্চশিক্ষা অর্জন করে বর্তমানে জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ ঢাকার শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। হাফেয মাওলানা আবুল হাসানাত মুহাম্মদ আতহার আমিনী, ফাযেলে লালবাগ জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া ঢাকা। তিনি বর্তমানে আশরাফুল উলূম বড়কাটারা মাদ্‌রাসায় শিক্ষক হিসেবে ইলমে দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত আছেন। মেয়েরা হলেন মোসাম্মৎ যয়নব আক্তার, মোসাম্মৎ আয়েশা আক্তার, মোসাম্মৎ যাকিয়া আক্তার ও

[৫১০] স্মারক গ্রন্থ, জামেয়া আরাবিয়া লালবাগ, ঢাকা, ২০১৩খ্রি., পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

মোসাম্মৎ ফারহানা আক্তার। তাদের প্রত্যেকের স্বামী ইসলামী শিক্ষায় সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী। তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন মাদ্রাসার গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে ইলমে দ্বীনের খেদমত আনজাম দিয়ে যাচ্ছেন।

মুফতী আমিনী (রহ.) দেশ ও ইসলামের খেদমতে আজীবন সংগ্রাম চালিয়ে যান। বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ অবস্থানের কারণে সরকার কর্তৃক বহুবার জুলুম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রায় ২০ মাস ধরে তিনি গৃহবন্দী ছিলেন। ইন্তেকালের দিন মাগরিবের পর লালবাগ মাদ্রাসায় বুখারী শরীফের দারস প্রদান করেন। এশার নামাযের পর লালবাগ শাহী মসজিদে একটি জানাযার নামাযের ইমামতিও করেন। এরপর মাদ্রাসার ক্যাম্পাসে কিছুক্ষণ পায়চারী করেন। রাতে বাসায় যাওয়ার পর হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হলে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে ইবনে সিনা হাসপাতালে নেওয়া হয়। অতঃপর ২৬ মুহাররম ১৪৩৪ হিজরি মোতাবেক ১১ ডিসেম্বর ২০১২ ইংরেজি, ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪১৯ বাংলা রোজ মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টা ১৫ মিনিটে ৬৭ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকার ধানমন্ডিস্থ ইবনে সিনা হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। পরের দিন বিকাল ৩টায় জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর জানাযায় দেশের শীর্ষস্থানীয় উলামা মাশায়েখ, ১৮ দলীয় জোটের নেতৃবৃন্দ ও সর্বস্তরের তৌহীদী জনতা অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় ঈদগাহ মাঠ বিশাল জনসমুদ্রে পরিণত হয় এবং আশেপাশের সড়কগুলোও মুসুল্লীতে ভরপুর হয়ে যায়। প্রায় লক্ষাধিক লোক তাঁর জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর জানাযার নামাযের ইমামতি করেন লালবাগ মাদ্রাসার প্রবীণ মুহাদ্দিস মুফতী আমিনী (রহ.)-এর দীর্ঘকালীন সহপাঠী ও সহকর্মী মাওলানা আব্দুল হাই সাহেব। জানাযা শেষে তাঁকে লালবাগ মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদের সংরক্ষিত কবরস্থানে দাফন করা হয় এবং পরের দিন সকল দৈনিক জাতীয় পত্রিকাসমূহে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশিত হয়।[৫১১]

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা মুফতী ফজলুল হক আমিনী (রহ.)-এর অবদান-

মাওলানা মুফতী ফজলুল হক আমিনী (রহ.) ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাসা ই নূরিয়া কামরাঙ্গীর চরের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে ইলমে দ্বীনের খিদমত শুরু করেন এবং ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ঢাকার আলু বাজারে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, পাশাপাশি আলু বাজার জামে মসজিদের খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঐতিহ্যবাহী জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগের ওস্তাদ ও সহকারী মুফতী হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি লালবাগ জামিয়ার ভাইস প্রিন্সিপাল ও প্রধান মুফতী হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা মুহাম্মদুল্লা হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) ইন্তেকালের পর থেকে তিনি লালবাগ জামিয়ার প্রিন্সিপাল ও শায়েখুল হাদীসের দায়িত্ব সুচারুরূপে অত্যন্ত সুনামের সাথে পালন করেন। লালবাগ মাদ্রাসাটি হল বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মাদ্রাসার মধ্যে অন্যতম। অত্র মাদ্রাসায় বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলেম ও পীর মাশায়েখগণ ইলমে দ্বীনের খেদমত করেন এবং তাঁদের গভীর জ্ঞানের প্রসারতার মাধ্যমে হাজার হাজার ইসলামের প্রচার-প্রসারক তৈরি করেন। যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তিনি ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে লালবাগ জামিয়ার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি হুসাইনিয়া আশরাফুল উলূম বড় কাটারা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ও শায়েখুল হাদীস এবং মুতাওয়াল্লির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ইসলামের

[৫১১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করেন বহু দ্বীনী মাদ্রাসা, মক্তব ও মসজিদ, যার মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।[৫১২]

রচিত গ্রন্থাবলি: মাওলানা মুফতী ফজলুল হক আমিনী (রহ.) ইসলামের মৌলিক বিষয়ে ওপর বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেন, যার মাধ্যমে সমাজের মানুষের ব্যাপক উপকার সাধিত হয়েছে। উক্ত কিতাব রচনার মাধ্যমে ইলমে দ্বীনের প্রচার-প্রসারে ও ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। অত্র কিতাবগুলো অধ্যয়নের মাধ্যমে সমাজের মানুষ শরীয়তের জ্ঞান অর্জনে বিশাল উপকার সাধিত হচ্ছে। উল্লেখিত গ্রন্থগুলো হলো (১) দারসুল বুখারী লিসালাফিনাহ আকাবির (আরবী) (২) আল কানূনুল ইসলামী দামিগুন লিল কানূনিল অজয়ী (আরবী), যার বাংলা নাম ইসলামী আইন বনাম মানব রচিত আইন (৩) তরীকে মুভালায়া (৪) আদর্শ ছাত্র (৫) ফতোয়ায়ে জামেয়া ছয় খণ্ডে তিন ভলিয়মে প্রায় ১৫০০ ফতোয়া যা বর্তমান সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে (৬) আল্লাহর পথে (৭) কারবালার শিক্ষা (৮) তিলাওয়াতে কুরআন (৯) দীনে এলাহী অসৎ আলেম ও পীর (১০) দোয়া ও মুনাজাত। এছাড়াও আরও বহু গ্রন্থ রয়েছে যেগুলো এখনো প্রকাশিত হয়নি।

তাঁর উল্লেখযোগ্য বহু ছাত্র রয়েছে যারা বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্বীনের প্রচার-প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন, মুফতী দেলাওয়ার হোসাইন, মুহতামিম ও শায়েখুল হাদীস মসজিদুল আকবার কমপ্লেক্স মিরপুর, ঢাকা। মুফতী ইমরান মাযহারী, খতীব লালবাগ শাহী মসজিদ ও প্রিন্সিপাল খাদেমুল ইসলাম মাদ্রাসা, মিরপুর, ঢাকা। মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ মুহতামিম, মাদ্রাসাতুল মদীনাহ, আশরাফাবাদ, ঢাকা। মাওলানা মুহব্বিুল্লাহ, মুহাদ্দিস, জামেয়া লালবাগ ঢাকা। মাওলানা মুফতী ইয়াহইয়া মুহাদ্দিস, জামেয়া লালবাগ ঢাকা। মাওলানা মুফতী শিব্বীর আহমাদ, মুহাদ্দিস ঢালকানাগর মাদ্রাসা, ঢাকা। মাওলানা আব্দুল গাফফার নাযিমে তা'লিমাত ঢালকানগর মাদ্রাসা, ঢাকা। মাওলানা আব্দুল মতীন, পীর সাহেব, ঢালকানগর মাদ্রাসা, ঢাকা। মাওলানা জাফর সাহেব, মুহাদ্দিস, ঢালকানগর মাদ্রাসা, ঢাকা। হাফেয মাওলানা ইনদাদুল্লাহ, মুহাদ্দিস জামিয়া লালবাগ ঢাকা ও মুহতামিম, মিফতাহুল উলূম মাদ্রাসা চান্দপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। প্রমূখ।[৫১৩]

ফতোয়ার মাধ্যমে অবদান : মুফতী ফজলুল হক আমিনী (রহ.) ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে লালবাগ জামেয়ার প্রধান মুফতীর পদে দায়িত্ব লাভ করেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মহান এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেন। এ সময়ে তিনি ব্যাপক দ্বীনী গবেষণা ও ইফতার খেদমত আনজাম দেন এবং ফতোয়া বিভাগের শিক্ষানবিশ মুফতীগণকে ফতোয়ার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। মুফতী ফজলুল হক আমিনী (রহ.) যে সকল দ্বীনী গবেষণা ও ফতোয়ার বিশাল ভাণ্ডার লালবাগ জামিয়ার ফারিগীন আলেমগণের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে সন্নিবেশিত হয়েছে 'ফতোয়ায়ে জামেয়া' নামে গ্রন্থরূপে তা প্রকাশ করা হয়। এ যাবৎ 'ফতোয়ায়ে জামেয়া' মোট ছয়টি খণ্ড বের হয়েছে। প্রথম খণ্ড ১৪১৯ হিজরি, দ্বিতীয় খণ্ড ১৪২০ হিজরি, তৃতীয় খণ্ড ১৪২১ হিজরি, চতুর্থ খণ্ড ১৪২৩ হিজরি, পঞ্চম খণ্ড ১৪২৬ হিজরি এবং ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৪২৭ হিজরিতে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডে মুফতী মুঈয (রহ.) ও মুফতী ফজলুল হক আমিনী (রহ.) ফতোয়া সংকলিত রয়েছে এবং অবশিষ্ট খণ্ডগুলো শুধু মুফতী আমিনীর (রহ.) ফতোয়া সম্বলিত। পরে আমিনী (রহ.) এ ফতোয়াসমূহকে বিস্তারিতভাবে প্রচারের লক্ষ্যে তাঁর মৃত্যুর মাত্র তিন মাস পূর্বে নতুনভাবে সংস্করণ করে ছয় খণ্ডকে তিনটি ভলিয়মে সংকলন করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে প্রায় সাড়ে ছয়শত ফতোয়া, দ্বিতীয় ভলিয়মে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড

---

[৫১২] দৈনিক আমার দেশ, ১৩ই ডিসেম্বর ২০১২ খ্রি.।

[৫১৩] দৈনিক ইনকিলাব, ১৩ ডিসেম্বর ২০১২ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

সংকলিত প্রায় সোয়া ছয়শত ফতোয়া এবং তৃতীয় ভলিয়মে পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড সংকলিত প্রায় চারশত গুরুত্বপূর্ণ ও যুগোপযোগী ফতোয়ার সমাধান রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে জাতীয় ইস্যুতে বা পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে মুজাহিদে মিল্লাত মুফতী আমিনী (রহ.) প্রদত্ত ফতোয়া দেশে-বিদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেই ফতোয়ার ওপর ভিত্তি করে এদেশের জনগণের মধ্যে বিশেষ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। যা ইসলামের বিধানের হেফাজতে বেশ ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখে। এভাবে তিনি দ্বীনী ইলমের খেদমতের পাশাপাশি, ওয়াজ-নসীহত, দাওয়াতে তাবলীগ, ইসলামী আন্দোলনসহ বিভিন্ন সামাজিক অবদান এবং ফতোয়ার মাধ্যমে এদেশের জনগণের ধর্মীয় ও জাতীয় জীবনে ব্যাপক অবদান সর্বজন স্বীকৃত।[৫১৪]

খতমে বুখারীর দায়রা : পবিত্র কালামুল্লাহর পর সিহাহ্ সিত্তা হাদীসের কিতাবের মধ্যে বুখারী শরীফের মর্যাদা সর্বশীর্ষে। প্রতি বছর জামিয়া আরাবিয়া লালবাগের দাওরায়ে হাদীস ফারেগীন শিক্ষার্থীদেরকে উদ্দেশ্য করে বুখারী শরীফের শেষ সবকে বিশেষ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। জামিয়ার ওস্তাদ ও ছাত্রসহ বহু দূর-দূরান্ত থেকে অনেক উলামায়ে কেরাম এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সাধারণ মানুষদেরকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নসিহতের পর বিশেষ লম্বা দু'আ করতেন। তিনি এমন দু'আ করতেন যা ছিল বিরল। দু'আর সময় লালবাগ শাহী মসজিদের সকল লাইট বন্ধ করে দেয়া হতো। আর দু'আর মাঝে কান্নার রোল পড়ে যেত। উপস্থিত জনতার কান্নার রোল শুনে মনে হতো, আকাশ বাতাস ভারী হয়ে গেছে। তাঁর এই ক্রন্দন ও চোখের পানিতে সকলের অন্তর গলে যেত।

আধুনিক অর্থনীতিতে অবদান : মুফতী আমিনী (রহ.) ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থা প্রচলনে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করে ছিলেন। এজন্য গত কয়েক বছর ধরে লালবাগ ও বড় কাটারা মাদ্রাসায় ইফতা বিভাগের তরুণ আলেমদেরকে প্রচলিত অর্থ-ব্যবস্থা ও ইসলামী অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে আলাদাভাবে শিক্ষা দান করেন এবং গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য অর্থনীতি বিষয়ক সেমিনার সিরিজের আয়োজন করেন। একসময় ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রসারে 'আল-আমিন ইসলামী ব্যাংক' নামে একটি ব্যাংক খোলার পরিকল্পনাও গ্রহণ করেন। বহু প্রতিভার অধিকারী ক্ষণজন্মা এই মনীষী জাতিকে অনেক কিছুই উপহার দিতে চেয়ে ছিলেন। তিনি চেয়ে ছিলেন দুর্নীতি, ব্যাংক জালিয়াতি, ঋণখেলাপি ও অর্থনৈতিক বৈষম্যে নিমজ্জিত এই সমাজে ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রচলনে জাতিকে সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদানসহ অর্থনীতির ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে। কিন্তু সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়ে উঠেনি।[৫১৫]

রাজনৈতিক অবদান : মুফতী আমিনী (রহ.) নেশা ছিলো জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞান চর্চা করা। আর শিক্ষকতা ছিলো তার পেশা। ওয়াজ মাহফিল এবং ইসলামী সাহিত্যেও তাঁর বিচরণ ছিলো ব্যাপক। রাজনৈতিক জীবনও তাঁর ব্যাপক সমৃদ্ধ ছিলো। তিনি রাজনীতির প্রতি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) মাধ্যমে। হাফেজ্জী হুজুর ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হলে তিনি নির্বাচনী প্রচারণার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সে সময় থেকে মুফতী আমিনী (রহ.) রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। আশির দশকে হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন' নামে একটি রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ করলে তিনি খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনীতিতে আরও

---

৫১৪ এস.এম আজিজুল হক আনসারী, বাংলাদেশের পীর-আউলিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪-৩৬৫।

৫১৫ স্মারক গ্রন্থ, জামেয়া আরাবিয়া লালবাগ, প্রাগুক্ত, ২০-২৭।

Dhaka University Institutional Repository

সক্রিয় হয়ে উঠেন এবং সংগঠনের বিশেষ দায়িত্বও পালন করেন। তসলিমা নাসরীন বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মুফতী আমিনী (রহ.) প্রতিষ্ঠা করেন 'ইসলামবিরোধী তৎপরতা প্রতিরোধ মোর্চা'। এর আহ্বায়ক ছিলেন মাওলানা মুহিউদ্দীন খান এবং মুফতী আমিনী ছিলেন সদস্য সচিব। পরবর্তীতে এই সংগঠনটি ইসলামী মোর্চার পরিবর্তে 'খেলাফত ইসলামী' নামে নামকরণ করা হয়। তিনি ইসলাম বিরোধী তৎপরতার বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে আন্দোলন চালিয়ে যান। এক পর্যায়ে ইয়ং মুসলিম সোসাইটি নামে একটি সংগঠনের পক্ষ হতে তসলিমা বিরোধী হরতাল আহ্বান করা হয়। তখন বিশিষ্ট সাংবাদিক আনোয়ার জাহিদ সেই হরতালকে সামনে রেখে সকল ইসলামী দল, সংগঠন ও ব্যক্তিত্বকে একত্রিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং এ ব্যাপারে কয়েকটি বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়। পরে ইসলামী মোর্চা, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, নেজামে ইসলাম পার্টি, মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের সমন্বয়ে খতীব মাওলানা উবায়দুল হক ও মুফতী ফজলুল হক আমিনীকে যথাক্রমে আহ্বায়ক ও সদস্য-সচিব করে গঠিত হয় 'সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ'।[৫১৬]

জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতীব হিসেবে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়কের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেওয়ায় তখন খতীব সাহেবের পরিবর্তে চরমোনাইর পীর মাওলানা সৈয়দ মো. ফজলুল করীম সাহেবকে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক করা হয়। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে ফতোয়াবিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত হয়। তিনি ছিলেন সে কমিটির আমির। জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, নেজামে ইসলাম পার্টি, খেলাফত আন্দোলন, খেলাফত মজলিস, ইসলামী আন্দোলন ও ফারায়েজী জামায়াতের সমন্বয়ে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে গঠিত ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে কিছু সময়ের জন্য ইসলামী ঐক্যজোটের নির্বাহী চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে চার দলীয় জোট গঠনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ৬ ডিসেম্বর উগ্রবাদী হিন্দুদের কঠোর আঘাতে ঐতিহাসিক অযোধ্যায় চারশত বছরের পুরানো বাবরী মসজিদ শহীদ হয়ে যায়। তিনি এর বিরুদ্ধে মুসলমানদের মাঝে ব্যাপকভাবে সাড়া জাগিয়ে ঐতিহাসিক লংমার্চ করেন। তিনি ছিলেন অত্র লংমার্চ কমিটির সদস্য সচিব। এতে বিশ্বজনমত সৃষ্টি করে ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। মুফতী ফজলুল হক আমিনী (রহ.) ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আজীবন সংগ্রাম চালিয়ে যান। তাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে ইসলামী চেতনাবোধ জাগিয়ে তোলার পাশাপাশি বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা পুনঃপ্রতিস্থাপন সংক্রান্ত স্পর্শকাতর বিষয়ে এবং দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যখন ইসলাম ও দেশ বিরোধী যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তিনি এর বিরোধিতা করেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত পক্ষে একজন আপোষহীন বিপ্লবী মুজাহিদ। ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডয়নের সিপাহসালার ভূমিকা পালন করেন।[৫১৭]

---

৫১৬ মুফতী ইহতিশামুল হক লোমান, মাখায়েখে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭-৩৫০।

৫১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুফতী ফজলুল হক আমিনী (রহ.) সম্পর্কে শিক্ষাবিদ ও গুণীজনের অভিমত-

১। মাওলানা মন্সুরুল হক, প্রধান মুফতী ও শায়েখুল হাদীস জামিয়া রাহমানিয়া আরবিয়া, ঢাকা। তিনি বলেন, যুগে যুগে পৃথিবীতে কিছু মহাপুরুষ আগমন করেন, যারা ছিলেন বহু প্রতিভার অধিকারী, আপোষহীন বিপ্লবী মুজাহিদ ও সমাজ সংস্কারক। যাদের ইল্মী জ্ঞানের মশালে পথ পেয়েছে শত-সহস্র দিশেহারা মানুষ, তাঁদের মধ্যে মাওলানা মুফতী ফজলুল হক আমিনী (রহ.) ছিলেন অন্যতম। তাঁর নেশা ছিলো কুরআন-হাদীসের জ্ঞানের পরিচর্চা করা। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করেন। তাঁর পুরো জীবনটাই ছিলো ইসলাম ও মুসলমানদের খেদমতে নিবেদিত প্রাণ। বিভিন্ন সময়ে জাতীয় ইস্যুতে তাঁর প্রদত্ত ফতোয়া দেশ-বিদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে যা ইসলামের বিধানের হেফাজতে বেশ ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখে। তিনি এদেশের জনগণের ধর্মীয় ও জাতীয় জীবনে ব্যাপক অবদান রাখেন যা সর্বজন স্বীকৃত। তিনি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ হতে জীবনের শেষ পর্যন্ত ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে চার দলীয় জোট গঠনে ও তিনি গুরুত্ব পূর্ণ অবদান রাখেন।[৫১৮]

২। মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মুহতামিম জামিয়া ইসলামীয়া দারুল উলূম মাদানিয়া, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা। তিনি বলেন, মাওলানা মুফতী ফজলুল হক আমিনী (রহ.) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ আলেম ও সমাজ সংস্কারক। তিনি মাদ্রাসা পরিচালনা ইলমে দ্বীনের খেদমত, সমাজ ও শরীয়ত বিরোধী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করেন এবং এতে ব্যাপক সফলতা ও লাভ করেন। রাজনৈতিক জীবনেরও তাঁর ছিলো ব্যাপক সমৃদ্ধি । ২০০১ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ব্যাপকভাবে দ্বীনী গবেষণা ও ইফতার খেদমতের আনজাম দিয়ে যান। দ্বীনের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন, যার মাধ্যমে সমাজের মানুষের বহু উপকার সাধিত হয়। এক কথায় তিনি ইসলামী সমাজ কায়েমের ক্ষেত্রে এক সিপাহসালার ভূমিকা পালন করেন।[৫১৯]

৩। মাওলানা সফিকুল আলম, অধ্যক্ষ লালচাঁদপুর আজহারিয়া সিনিয়ার ফাযেল মাদ্রাসা, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা। তিনি বলেন, মাওলানা মুফতী ফজলুল হক আমিনী (রহ.) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ আলেম ও মুহাদ্দিস। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তিনি ইলমে হাদীসের অধ্যাপনা ও ইফতার প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তিনি দেশ ও ইসলামের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেন। বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার কারণে বহুবার তাঁকে সরকারের জুলুম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। বিভিন্ন সময় জাতীয় ইস্যুতে দেশ ও ইসলাম বিরোধী ফতোয়া দেশ-বিদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিশেষ করে ইসলামের হেফাজতে ইসলাম বিরোধী ফতোয়ার মাধ্যমে ব্যাপক অবদান রাখেন যা সর্বজন স্বীকৃত। তাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে ইসলামী চেতনাবোধ জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা প্রচলনে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হননি।[৫২০]

---

[৫১৮] ২১.০৭.২০১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার অনুযায়ী লিখিত।

[৫১৯] ০৫.০৩.২০১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার অনুযায়ী লিখিত।

[৫২০] ০৭.০১.২০১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার অনুযায়ী লিখিত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-২.১৩ : মাওলানা ফয়জুদ্দীন (রহ.) (১৯২৪-২০০১খ্রি.)

নীরব জ্ঞানসাধক ও সূক্ষ্মদর্শী আলেম মাওলানা ফয়জুদ্দীন (রহ.) ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার কোনাউড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রায়হানুদ্দীন। তিনি ছিলেন একজন দ্বীনদার ও সাধারণ কৃষক।

জন্মের কিছু দিন পর তাঁর পিতা ইন্তেকাল হওয়ায় শিক্ষার গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয় স্নেহময়ী মাতার ওপর। সাত বছর বয়সে নবীনগর কাইতলা মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে সেখানে আরবী, উর্দু ও ফার্সী কিতাবসমূহের প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন। অতঃপর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া ইউনুসিয়ায় ভর্তি হন। সেখানে বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলেম ও বুযুর্গ ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.)-এর তত্ত্বাবধানে জামাতে সাহারাম পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সাথে পড়ালেখা করেন। এরপর উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ গমণ করেন। দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে সেখানে সর্বোচ্চ শ্রেণি দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীতে অত্র মাদ্‌রাসায় ক্বিরাত শাস্ত্রের ওপর বিশেষ জ্ঞানের বুৎপত্তি লাভ করেন।

অতঃপর কুতুবুল ইরশাদ মাওলানা সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং তাঁর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী প্রার্থীব জীবন পরিচালনায় অব্যাহত রাখেন। মাদানী (রহ.)-এর মৃত্যুর পর ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.)-এর নিকট নতুনভাবে বায়'আত গ্রহণের পরামর্শ চাইলে তিনি বলেন, মাদানী (রহ.) প্রদত্ত উপদেশ বাণীসমূহের ওপর আমল করে যাও নতুন করে বায়'আত গ্রহণের প্রয়োজন নেই।

মাওলানা ফয়জুদ্দীন (রহ.) দারুল উলূম দেওবন্দে দাওরায়ে হাদীসে অধ্যয়নকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলাধীন সরকার বাড়িতে ধর্মীয় পরিবারে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর ঔরসে দুই ছেলে তিন মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেরা হলেন হাফেজ মাওলানা কাসেম ফয়জুদ্দীন, পরিচালক জামিয়া আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) আল ইসলামীয়া মিরপুর, ঢাকা। হাফেজ মাওলানা তাইয়িব, ইমাম ও খতীব উখরাবাজার মাদানী মসজিদ, কিশোরগঞ্জ। আর মেয়েরা হলেন মোসাম্মৎ ফাতিমা খাতুন, মোসাম্মৎ খাদিজা খাতুন ও মোসাম্মৎ আয়েশা খাতুন। প্রত্যেকেই দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষীত হয়ে ইসলামিক দিকনির্দেশনা অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে পরিচালনা করেন।

মাওলানা ফয়জুদ্দীন (রহ.) ২৭ অক্টোবর ২০০১ খ্রিস্টাব্দে শনিবার ঢাকার ঐতিহ্যবাহী জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ মাদ্‌রাসায় ইন্তেকাল করেন। মাগরিবের নামাযের পর অত্র মালিবাগ মাদ্‌রাসা মসজিদে তার সুযোগ্য ছাত্র হাফেয মাওলানা ইয়াহইয়া জাহাঙ্গীর তাঁর জানাযার নামাযের ইমামতি করেন। কিশোরগঞ্জ পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[৫২১]

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা ফয়জুদ্দীন (রহ.)-এর অবদান-

মাওলানা ফয়জুদ্দীন (রহ.) দারুল উলূম দেওবন্দের ছাত্র অবস্থায় সেখানের 'ছাত্র সংসদের' জেনারেল সেক্রেটারি করেন। তিনি ছিলেন বিভিন্ন ভাষাবিদ, অনন্য বাগ্মী। কিশোরগঞ্জ জামিয়া ইমদাদিয়ার প্রিন্সিপাল মাওলানা আতহার আলী (রহ.) দেওবন্দে ছাত্রদের এক অনুষ্ঠানে মাওলানা ফয়জুদ্দীনের বক্তৃতা শুনে খুবই মুগ্ধ হন এবং তখনই তাঁকে কিশোরগঞ্জের জামিয়া ইমদাদিয়ায় শিক্ষক হিসেবে মনোনীত করেন। কিশোরগঞ্জ জামিয়া ইমদাদিয়ায় শিক্ষকতা অবস্থায় ১৫ বছর যাবৎ হাদীসের

[৫২১] এইচ.এম. জাভেদ হোসাইন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উলামা-মাশায়েখের কর্মময় জীবন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯-২৬১।

Dhaka University Institutional Repository

দায়সসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে অধ্যাপনা করেন। পাশাপাশি জামিয়া আশরাফিয়া খাগডহর মোমেনশাহীতে প্রায় পাঁচ বছর পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। অত্র প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের নাযিমে তা'লীমাতের দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করেন। অতঃপর কিশোরগঞ্জ হয়বতনগর আনোয়ারুল উলূম মাদ্‌রাসায় ১৫ বছর যাবৎ হাদীসের অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। কিশোরগঞ্জে শিক্ষকতাকালে তিনি উখরাবাজার মাদানী মসজিদের ইমাম ও খতীবের দায়িত্বও পালন করেন। সর্বশেষ ঢাকার প্রসিদ্ধ ইসলামী বিদ্যাপীঠ জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ মাদরাসায় সুদীর্ঘ তের বছর মুহতামিম, নায়েবে মুহতামিম ও দারুল ইফতার মুনতাযিমের দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠায় সাথে পালন করেন এবং পূর্ণ বুখারী শরীফসহ হাদীসশাস্ত্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। পাশাপাশি ছাত্রদের সুন্দর হস্তলিপি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকতার জগতে এক বিশেষ অবদান রাখেন।

কিংবদন্তিতুল্য আলেম মাওলানা ফয়জুদ্দীন (রহ.) পাঠদান পদ্ধতি ছিল অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তিনি সবসময় অজু করে হাদীসের ক্লাসে যেতেন। হাদীসের বিশদ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও স্পষ্ট উদাহরণ বর্ণনায় তিনি ছিলেন প্রবাদতুল্য ব্যক্তিত্ব। উপরন্তু সমকালীন বিষয়াদির হাদীস উপস্থাপনেও বেশ পারদর্শী ছিলেন। প্রতিটি হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কুরআনের আয়াত বা অন্য হাদীস দিয়ে বিশ্লেষণ করতেন। প্রয়োজনে চার মাযহাবের বর্ণনাসহ হাদীসের ব্যাখ্যা করতেন। হাদীসের রাবীদের অবস্থাও বিশদভাবে আলোচনা করতেন, হাদীসের সনদের মানদণ্ডও বর্ণনা করতেন। সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ইজতেহাদী যোগ্যতা ব্যাপকভাবে দান করেন। তিনি নিয়মিত ক্লাস নিতেন এবং অত্যন্ত যত্ন সহকারে পড়াতেন। তাঁর পড়ানোর পদ্ধতি ছিল ধীরে ধীরে। উদাহরণ-উপমা আর ঘটনাবলির মাধ্যমে অত্যন্ত কঠিন বিষয়কে সহজ করে উপস্থাপন করতেন। প্রয়োজনে কোনো কোনো হাদীস বার বার উল্লেখ করে ছাত্রদের হৃদয়গ্রাহী করে তুলতেন।[৫২২]

শিক্ষাবিস্তার ও সমাজ সংস্কারে অবদান : জ্ঞান তাপসী মাওলানা ফয়জুদ্দীন (রহ.) বহু মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন সহযোগিতায় ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। তিনি বহু মাদ্‌রাসার মজলিসে শূরার আজীবন সদস্য ছিলেন। কিশোরগঞ্জ মাদানীয়া হাফিযিয়া মাদ্‌রাসা ও মাদানীয়া ফুরকানিয়া মক্তব প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাঁর মাধ্যমে। কিশোরগঞ্জের বিশাল এলাকা থেকে ভ্রান্ত আক্বীদা ও কুসংস্কার প্রতিরোধে তাঁর ভূমিকা ছিল ব্যাপক প্রশংসনীয়। তাঁর বিভিন্ন দাওয়াতী কৌশল ও পরিশ্রমের ফলেই কিশোরগঞ্জ বহু কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়েছে। তাছাড়া তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবও ছিল ব্যাপক। এই প্রভাবের কারণে কিশোরগঞ্জে তাবলীগ জামায়াতের মারকায স্থানান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছেন। তাছাড়া ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারে ও বিভিন্ন বাতিল ফিরকার বিরুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী ও বিভিন্ন ভাষায় পণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন আলেম ছিলেন।

তাঁর স্বহস্তে কিছু লিখিত অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হল বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খণ্ডের কিতাবুল তাফসীর অধ্যায়ের ওপর একটি পাণ্ডুলিপি এবং তাফসীরে উসমানীর বিশেষ অধ্যায়সমূহের ওপর একটি পাণ্ডুলিপি সংকলন করেন। কিন্তু উক্ত পাণ্ডুলিপিগুলো বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

রাজনীতিতে অবদানঃ মাওলানা ফয়জুদ্দীন (রহ.) ছিলেন উপমহাদেশের প্রাচীনতম সংগঠন জমিয়াতে উলামায়ে ইসলামের অন্যতম সদস্য। পরবর্তীতে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পার্টির মাধ্যমে সেখানে

[৫২২] এস.এম আজিজুল হক আনসারী, বাংলাদেশের পীর-আউলিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম পার্টি গঠন প্রক্রিয়ায় তিনি অসামান্য ভূমিকা পালন করেন। রাজনীতেতে উলামায়ে কিরামের মহান ভূমিকা ও ইসলামের অন্যান্য অবদান রাখার ক্ষেত্রে সকলকে উদ্বুদ্ধ করতেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকবাহিনী কিশোরগঞ্জের হিন্দু বস্তি আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। তখন কিছু হিন্দু পরিবার তাঁর বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে। বহু হিন্দুদেরকে তিনি বাড়িতে এনে চিড়া, কলা ও রুটি দ্বারা আপ্যায়ন করেন এবং অন্যান্য জনসেবামূলক সহযোগিতার মাধ্যমে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। অধিকন্তু উখড়াবাজার এলাকার রাস্তা-ঘাট তৈরি ও এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে এবং সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বহু অবদান রাখেন।

দাওয়াত ও তাবলীগ : মাওলানা ফয়জুদ্দীন (রহ.) ছিলেন একজন ইসলামী আলোচক। কুরআন-হাদীসের তথ্য সম্বলিত ওয়াজ নসীহতে বেশ দক্ষ ছিলেন। ইসলামের বিধিবিধান হিকমতের মাধ্যমে উপস্থাপনেও তিনি ছিলেন খুব দক্ষ, বাতিলের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন খুবই কঠোর। তাঁর ওয়াজ নসীহতে প্রতিবাদ করার মতো কেউ সাহস পেতনা। মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) এবং মাওলানা ইউসুফ (রহ.) তাঁর ওয়াজের খুব প্রশংসা করতেন। দাওয়াতে তাবলীগের পদ্ধতি সম্পর্কে সুউচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তবে সাম্প্রতিকালের কতিপয় নীতিমালার মৃদু প্রতিবাদ করেন। মাঝে মাঝে আক্ষেপ করে বলেন, হয়তো উলামায়ে কিরাম এক সময় তাবলীগ জামাতের বিরোধিতা করার প্রয়োজন মনে করতে পারে। কেননা, এরা বাহ্যিকভাবে আলেমগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বটে, কিন্তু তাঁদের পরামর্শে পরিচালিত হউক এতে তাঁরা আগ্রহী নয়।[৫২৩]

বিভিন্ন মনীষীদের দৃষ্টিতে মাওলানা ফয়জুদ্দীন (রহ.)-

১। মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আবদুস সালাম, মুহাদ্দিস জামেয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা। তিনি বলেন, মাওলানা ফয়জুদ্দীন (রহ.) ছিলেন এক জন সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রসিদ্ধ আলেম, বাংলার যে কয়জন আলেম ইসলামী জীবন ধারাকে সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সফল ভূমিকা পালন করেন, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। সমাজ জীবনের সর্বস্তরে ব্যাপকভাবে ইসলামী জিন্দেগি কায়েমের লক্ষ্যে কুরআন-হাদীসের আলোকে মানুষের মাঝে হিদায়াতের লক্ষ্যে আজীবন বিজয়ী সিপাহসালারের ভূমিকা পালন করেন। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে ছাত্র অবস্থায় ছাত্র সংসদের জেনারেল সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন ভাষায় খুব পারদর্শী ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন মাদ্রাসায় বুখারী শরীফসহ হাদীসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর দারস প্রদান করেন। তিনি রাজনীতি জীবনে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের একজন বলিষ্ঠ নেতা ছিলেন। তিনি বহু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতার মাধ্যমে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সার্বিক বিবেচনায় তিনি নিতান্ত সাদামাঠা ও প্রাণ খোলা মানুষ ছিলেন।[৫২৪]

২। মাওলানা কাসেম বিন ফয়জুদ্দীন, পরিচালক জামিয়া আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) আল-ইসলামীয়া। তিনি বলেন, আমার বাবা বাংলাদেশের বিভিন্ন মাদ্রাসার মাধ্যমে ইলমে দ্বীন প্রচার-প্রসার এবং পরকালের প্রতি সচেতন করে আখেরাতমুখী করে তোলার ব্যাপারে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার ধারক-বাহক এবং বর্তমান অনাগত ভবিষ্যতের জ্ঞান পিপাসুদের জন্য এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তার জ্ঞান-গরিমা ও ব্যাপক যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোনো অহমিকা আত্মগৌরব তাঁকে কলুষিত করতে পারেনি।

---

[৫২৩] সাক্ষাতৎকার সূত্রে মরহুমের সাহেব জাদা মাও. আবুল কাসেম হতে প্রাপ্ত তথ্য।

[৫২৪] গবেষকের ২৫.০৫.২০১৬ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরে কুরআন। তিনি ছিলেন বহু মাদ্‌রাসা ও দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ভ্রান্ত আকিদা ও বিভিন্ন কুসংস্কার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল ব্যাপক প্রশংসনীয়। তাঁর ব্যক্তিত্বের কারণে ও বিভিন্ন দাওয়াতী কৌশলের ফলে সমাজের বিভিন্ন অনৈসলামীক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ করতে খুব সহজেই সক্ষম হয়েছেন। তাঁর কর্ম জীবনে মাদ্‌রাসা পরিচালনা, শিক্ষকতা ও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে সকলেই খুবই সন্তুষ্ট হতেন। দ্বীনী দাওয়াতের ক্ষেত্রে দাওয়াতে তাবলীগের সাথে আজীবন সম্পর্ক রাখেন।[৫২৫]

৩। মাওলানা নাসিম আরাফাত, মুহাদ্দিস জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা। তিনি বলেন, মাওলানা ফয়জুদ্দীন (রহ.) ছিলেন একজন আদর্শবান শিক্ষক। দীর্ঘদিন তিনি ইলমে নববীর খেদমত করেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন একজন ইসলামী আলোচক, তিনি হিকমতপূর্ণ উপস্থাপনে খুবই দক্ষ ছিলেন। তাঁর ওয়াজ-মাহফিল সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম ও সাধারণ মানুষ খুব প্রশংসা করতেন। তিনি আরবী, উর্দু, ফার্সী ভাষায় খুব পারদর্শী ছিলেন। তিনি যখন হাদীসের দারস প্রদান করতেন তখন মাঝে মাঝে তিনি নিজেই হাদীসের ইবারত পড়তেন। হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে অধিকাংশ সময় কুরআনের আয়াত বা অন্য হাদীস দ্বারা ব্যাখ্যা করতেন। হাদীসের দারস প্রদানের সময় কখনো কোন দুনিয়াবী বিষয় নিয়ে ছাত্রদের মাঝে আলোচনা করতেন না। প্রয়োজনে হাদীসের দারস শেষ করে, সে বিষয় আলোচনা করতেন। তিনি ইসলামী আন্দোলনেও ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলামী চিন্তা-চেতনা বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করেন।[৫২৬]

---

[৫২৫] গবেষকের ১৬.০৮.২০১৬ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত।
[৫২৬] গবেষকের ১১.০২.২০১৬ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-২.১৪ : মাওলানা শাহ সৈয়দ মুছলেহ উদ্দীন (রহ.) (১৯০৬-১৯৮৯খ্রি.)

বৃহত্তম উত্তর কুমিল্লার ইসলামী আন্দোলনের অন্যমত স্থপতি পুরুষ মাওলানা শাহ সৈয়দ মুছলেহ উদ্দীন (রহ.) ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ঐতিহ্যবাহী মাছিহাতা গ্রামে পীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মাওলানা শাহ সৈয়দ ইয়াকুব আলী (রহ.) ও মাতার নাম সৈয়দ মোসাম্মৎ আফিফা খাতুন। সৈয়দ মুছলেহ উদ্দীন তাঁর মায়ের কাছে বাল্যকালেই পবিত্র কুরআন শরীফের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ছোট বেলায় তিনি তাঁর মায়ের কাছে থেকে অনেক আরবী, ফার্সী কবিতা মুখস্থ করেন। পারিবারিক পরিবেশে থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামিয়া ইউনুসিয়ায় কয়েক বছর লেখাপড়া করেন। এরপর কুমিল্লা নাজেরিয়া মাদ্রাসায় কিছুদিন লেখাপড়া করেন। তারপর ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। উচ্চশিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে উপমহাদেশের বিখ্যাত দ্বীনীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভারতের সাহারণপুরের দারুল উলূম দেওবন্দে অধ্যয়ন করেন এবং সর্বশেষে বোম্বাইয়ের ডাবেলে কুরআন-হাদীস, তাফসীর, মানতেক, কালাম শাস্ত্রের ওপর বিশেষ জ্ঞানের বুৎপত্তি লাভ করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। মাওলানা শাহ সৈয়দ মুছলেহ উদ্দীন (রহ.) দারুল উলূম দেওবন্দে অধ্যয়নকালে জগৎশ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) নিকট বুখারী শরীফ অধ্যয়ন করেন।

এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য ওস্তাদ ছিলেন মুফতী ফয়জুল্লাহ হাটহাজারী, মাওলানা সাব্বির আহম্মদ ওসামনী, মুফতী আজিজুর রহমান, মাওলানা হিফজুর রহমান, মাওলানা সিরাজ আহমদ, আল্লামা মুফতী কিফায়েত উল্লাহ ও আল্লামা ইবরাহিম বলিয়াভী (রহ.) প্রমূখ।[৫২৭]

মাওলানা সৈয়দ মুছলেহ উদ্দীন (রহ.) ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত সিলেট বিভাগের প্রথম মুসলিম রাজপরিবার, প্রতাপশালী জমিদার, দেওয়ান সৈয়দ ইয়াকুব রেজা সাহেবের প্রথম কন্যা সৈয়দা ফাতেমা বানুর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

মাওলানা শাহ সৈয়দ মুছলেহ উদ্দীন এর চার ছেলে ও চার কন্যা ছিল তারা হলেন- মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ হাসান, সৈয়দ মুহাম্মদ হোসাইন, সৈয়দ মুহাম্মদ আহছান, সৈয়দ মুহাম্মদ হাসসান ও চার কন্যাগণ হলেন সৈয়দা কানিজ আয়েশা, সৈয়দা কানিজ উম্মে সালমা, সৈয়দা কানিজ আসমা ও সৈয়দা কানিজ হুসনা।

মাওলানা সৈয়দ মুছলেহ উদ্দীন (রহ.) ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে ৩০ জুলাই ৮৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে মাছিহাতা গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।[৫২৮]

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা শাহ সৈয়দ মুছলেহ উদ্দীন (রহ.)-এর অবদান-

মাওলানা শাহ সৈয়দ মুসলেহ উদ্দীন (রহ.) শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর তিনি দ্বীনীশিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রথমে নরসিংদী জেলার অন্তর্গত শাররাবাদ মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। অত্র মাদ্রাসায় ইলমে দ্বীনের খেদমত অত্যন্ত সুনামের সাথে পালন করেন। কিশোরগঞ্জ এলাকায় ইলমে দ্বীন শিক্ষার উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান না থাকায় ধর্মপ্রাণ মানুষ ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারে এমন একজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্বের অভাব অনুভব করেন, যিনি অত্র এলাকায় দ্বীনী শিক্ষা অনুরাগীদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে অত্র এলাকাকে

---

[৫২৭] এইচ.এম. জাভেদ হোসাইন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উলামা-মাশায়েখের কর্মময় জীবন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩।

[৫২৮] দৈনিক ইনকিলাব ৩১ জুলাই ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে।

Dhaka University Institutional Repository

আলোকিত করতে পারেন। তাই তাঁকে কিশোরগঞ্জের হয়বতনগরে চলে আসার আমন্ত্রণ করলে তিনি তা গ্রহণ করেন। শাররাবাদ মাদ্রাসা শিক্ষকতার পদ ছেড়ে দিয়ে তিনি ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে কিশোরগঞ্জের হয়বতনগরে আগমন করে দ্বীনের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) নামানুসারে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে তাঁর নামে নামকরণ করেন 'আনোয়ারুল উলূম মাদ্রাসা'। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে অত্র মাদ্রাসাটিকে তিনি কামিল শ্রেণিতে উন্নীত করতে সক্ষম হন। তখনকার সময়ে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ৩টি কামিল মাদ্রাসা ছিলো। তার মধ্যে হয়বতনগর আনোরুল উলূম মাদ্রাসা ছিল অন্যতম। এই প্রতিষ্ঠানটি আজও কিশোরগঞ্জের প্রাণকেন্দ্রে দেশের অন্যতম সেরা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের গৌরব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অত্র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন করে শিক্ষা সংস্কারে ব্যাপক পরিবর্তন আনেন। জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের ও শিক্ষা উন্নয়নে ব্যয় করেন। অত্র মাদ্রাসায় দূর দূরান্ত থেকে আগত বহু ছাত্র দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। প্রতি বছর বহু ছাত্র কামিল হাদীস বিভাগে অধ্যয়ন করে হাদীসের ওপর উচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেন। অত্র মাদ্রাসার বহু ছাত্র বাংলাদেশের বিভিন্ন মাদ্রাসায় মুহাদ্দিসসহ বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন।[৫২৯]

সমাজ সংস্কারে তার বিশেষ অবদান: মাওলানা শাহ সৈয়দ মুসলেহ উদ্দীন (রহ.) দীর্ঘ সময় অত্র প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এবং কামিল শ্রেণিতে বুখারী শরীফসহ গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহের অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। আর অত্র এলাকার সামাজিক বিভিন্ন জটিল সমস্যা সমাধানে তাঁর ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। সমাজের বিভিন্ন বিচার-আচার ও গোত্রের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ঝগড়া-বিবাদের নিষ্পত্তি, বাতেল ফেরকা, ভণ্ড ও বেদাতীদের মোকাবেলায় তাঁর ভূমিকা ছিল ব্যাপক। ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে তিনি সাধারণ মানুষের মন ইসলামের প্রতি অতিসহজে আকৃষ্ট করতে পারতেন। সমাজ জীবনের প্রতিটি স্তরে তিনি ইসলামী আদর্শকে সমুন্নত রাখতে চেষ্টা চালিয়ে যান। তাঁর মাঝে সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক যুগোপযোগী নেতৃত্বের যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকায় তিনি সমাজ সংস্কারে ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষমতা লাভ করেন।

ব্রিটিশ আমলে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি আখড়া বাজারে এক বাসায় থাকতেন, তখন হিন্দুদের প্রভাবে এ শহরের মুসলমানেরা প্রকাশ্যে কুরবানী করতে সাহস পেত না। তিনি শহরে এসে মুসলমানদের প্রেরণা ও সাহস জুগিয়ে তাদেরকে প্রকাশ্যে কুরবানী করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। এতে তিনি বহু বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হন। অবশেষে আল্লাহ তা'য়ালার মেহেরবানীতে সফলতা লাভ করেন। কিশোরগঞ্জ শহরে প্রথমে আগমন করে দেখলেন, মুসলমানগণ অনেক কাজে এবং পোশাক-পরিচ্ছদে হিন্দুদের নিয়মনীতি মেনে চলছে। তখন তিনি ধীরে ধীরে তাদেরকে মুসলমানী লেবাস ও ইসলামি নিয়মনীতির প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন সরকার কিশোরগঞ্জের রসিদাবাদ, লতিফপুর, শ্রীনন্তপুর এই ৩টি গ্রামকে অন্য জায়গায় পুনর্বাসিত না করে সরকার এরোয়ার করে নেয়। এতে তিনি খুবই দুঃখিত হলেন। তখন শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা ছিল। তিনি এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে কয়েকবার কলকাতা গিয়ে বৈঠক করে সরকারের এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করাতে সক্ষম হন।

কিশোরগঞ্জে খরা ও অনাবৃষ্টির কারণে ফসলাদি বিনষ্ট হতে দেখা দেওয়ায় বহুবার বৃষ্টির জন্য ইস্তেখারার নামায পড়ান। আল্লাহর অশেষ রহমতে নামাযের সাথে সাথে বৃষ্টি হতে দেখা যায়। তিনি

[৫২৯] দৈনিক সংগ্রাম ২৬ অক্টোবর ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘ কর্মজীবনে ৫৫টি মাদ্‌রাসা, ১৭৫টি মক্তব ও বহু মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে থেকে বহু বছর যাবৎ কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা বোর্ডের আলিম, ফাযেল ও কামিল ক্লাসের পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু পরবর্তীতে যখন সরকার কলকাতা হতে মাদ্‌রাসা বোর্ডকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ে মাদ্‌রাসা বোর্ডের পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে, তখন তিনি এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন ও হয়বতনগরে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী আবদুল হামিদ সাহেবের সভাপতিত্বে সভা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন থেকে মাদ্‌রাসা বোর্ডকে আলাদা করেন। তখন থেকেই তিনি মাদ্‌রাসা বোর্ডের সদস্য মনোনীত হন এবং বহু বছর যাবৎ এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করে ইস্তফা দেন। তিনি দীর্ঘ ৮ বছর স্কুল টেক্সটবুক বোর্ডের মেম্বার ছিলেন। তিনি একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন, বহু বছর যাবৎ হাদীসের কিতাবগুলো অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে পাঠ দান করে ইলমে নবুয়তের খেদমতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[৫৩৩]

জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া নাম সংগঠন তৈরি: ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে মাদ্‌রাসার ছাত্রদেরকে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টায় "জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া" নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন। তিনি অত্র সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন তাঁরই ছাত্র মাওলানা হাফেয হাকীম আজিজুল ইসলাম, অধ্যক্ষ তিব্বিয়া কলেজ, ঢাকা। পুনরায় ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে তালাবায়ে আরাবিয়ার সভাপতি নির্বাচিত হন। তখন এর সাধারণ সম্পাদক হয় মাওলানা ড. মুস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি তালাবায়ে আরাবিয়ার সভাপতি হিসেবে দেশব্যাপী সফর করে মাদ্‌রাসার ছাত্রদেরকে ইসলামী আন্দোলনমুখী এবং ইকামতে দ্বীনের আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার সক্রিয় প্রয়াস চালান। পরবর্তীতে এ সংগঠনটি ইসলামী আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

ঐতিহাসিক শোলাকিয়া ঈদগাহের ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন: মাওলানা শাহ সৈয়দ মুছলেহ উদ্দীন (রহ.) উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ঈদ জামাত কিশোরগঞ্জের ঐতিহাসিক শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দানে দীর্ঘ ৩৯ বছর ইমামতি করেন। মাওলানা সৈয়দ মুছলেহ উদ্দীন (রহ.) শোলাকিয়া মাঠের ইমাম হওয়ার সাথে সাথে ক্রমাগত লোক সংখ্যা বেশি হতে লাগলো। তাছাড়া অনেকেই তাঁর পেছনে নামায পড়ে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। তাঁর হৃদয়গাহী কুরআন-হাদীসের তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা শুনার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে সাধারণ মুসলমান আগমন করতো। তাই ক্রমাগত তাঁর পেছনে মুসল্লীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে সাড়ে চার লাখে পৌঁছেছিল।

রাজনৈতিক অবধান : মাওলানা শাহ সৈয়দ মুছলেহ উদ্দীন (রহ.) ছোটবেলায় তাঁর পিতার কাছ থেকে রাজনৈতিক প্রেরণা লাভ করেন। ছোট বেলায় তিনি যখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্‌রাসার ছাত্র তখন খেলাফত আন্দোলনের প্রসারতা লাভ করে। তাঁকে এসডিও সাহেবের বাংলোর সামনে দিয়ে মাদ্‌রাসায় যেতে হত। একদিন কয়েকজন ছাত্রসহ মাদ্‌রাসা থেকে ফেরার পথে তিনি এসডিও সাহেবের বাংলোর সামনে শ্লোগান দিয়ে বসলেন- "বন্দে মাতারাম" (যা ছিল তখন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের শ্লোগান) সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ এসডিও সাহেব ইংলিশ সিপাহী পাঠিয়ে ছাত্রদেরকে ধরিয়ে নিলেন। ছাত্রদের নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে মাওলানা শাহ সৈয়দ মুছলেহ উদ্দীন (রহ.)-কে বেত্রাঘাত করা হয়। কিশোরগঞ্জ অবস্থান করেই তিনি জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ, পরবর্তীতে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতৃত্বে পাকিস্তান আন্দোলনের বহু গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন সমাবেশে বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি খেলাফত আন্দোলনের সময় সরকার পরিচালিত

---

[৫৩৩] এইচ.এম. জাভেদ হোসাইন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উলামা-মাশায়েখের কর্মময় জীবন প্রাগুক্ত, ১৪৫-১৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসা বর্জন করেন। তিনি প্রথমত 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ-হিন্দ' এর একজন কর্মী ছিলেন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে লাহোর প্রস্তাব পাসের পর তিনি ঐ দল ত্যাগ করে মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার মোহাম্মদ আলী পার্কে অনুষ্ঠিত উপমহাদেশের উলামা সম্মিলনে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন, যা ছিল তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। ঐ সভায় সর্বভারতীয় 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ-ইসলাম' এর উদ্বোধন করা হয়। তখন তিনি দলের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিলেটের রেফারেন্ডামে তিনি পাকিস্তানের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি পূর্ববঙ্গীয় জমিয়ত-এ-উলামা-এ-ইসলাম-এর সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে হয়বতনগরে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে জমিয়ত-এ-উলামা-এ-ইসলাম 'নেজামে ইসলাম' নাম ধারণ করে। ঐ সময় তিনি নেজামে ইসলাম পার্টির সেক্রেটারি নিযুক্ত হন এবং ৫ বছর উক্ত পদে বহাল ছিলেন। তিনি নিখিল ভারত উলামা পরিষদের সাবেক সদস্য এবং ইত্তেহাদুল উম্মা-র একজন প্রেসিডিয়াম সিনিয়র সদস্য ছিলেন।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দল যুক্তফ্রন্টের অঙ্গদল হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। তিনি তাঁর দলের পার্লামেন্টারি বোর্ডের সেক্রেটারি ছিলেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে গঠিত 'পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন' দলের পূর্ব পাকিস্তান শাখার তিনি সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে তিনি জনাব নূরুল আমিনের নেতৃত্বে গঠিত 'পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক লীগে' যোগদান করেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে কারাবরণের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তিনি পূর্ব পাকিস্তান পি.ডি.পি. এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে উপ-নির্বাচনে তিনি কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ এলাকা হতে জাতীয় পরিষদের সদস্য ঘোষিত হন।[৫৩১]

দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসার ছাত্র থাকাকালীন তিনি ইসলামী রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হন। তখন তিনি জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের প্রাথমিক সদস্য হিসেবে কাজ করেন। তিনি যখন ডাবেল মাদ্রাসার ছাত্র তখন বোৰিলাস সারদা সর্ব ভারতীয় পরিষদে 'সারদা বিল' নামে নাবালিকা কন্যা বিবাহ বন্ধের জন্য একটি বিল প্রস্তাব করে। তখন তিনি তুমুল আন্দোলন করে এই বিলের কঠোর বিরোধিতা করেন।

মাওলানা শাহ সৈয়দ মুছলেহ উদ্দীন (রহ.) সম্পর্কে বিভিন্ন মনিষীদের মতামত-

১। মাওলানা মুমিনুল হক (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ) নয়াটোলা এ.ইউ.এন. মডেল কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা। তিনি বলেন, মাওলানা শাহ সৈয়দ মুছলেহ উদ্দিন (রহ.) ছিলেন একজন উঁচু মাপের আলেম ও ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি পুরুষ। আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান ব্যাপক। তিনি দীর্ঘদিন কিশোরগঞ্জ আনোয়ারুল উলুম কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সামাজিক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তাঁর ব্যাপক অবদান রয়েছে। তাছাড়া সমাজে বিভিন্ন অনৈসলামীক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে সাধারণ মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে ব্যাপকভাবে সক্ষম হন। সে সময় মুসলমানগণ বহু অনৈসলামিক রীতি-নীতি অনুসরণ করত। তিনি তাদেরকে ইসলামী তাহজীব-তামাদ্দুনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে সমাজ সংস্কারের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত করেন। রাজনীতিতেও তাঁর ব্যাপক প্রসারতা রয়েছে।

---

[৫৩১] হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, আমরা যাদের উত্তরসূরি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩-৩৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববাংলার জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।[৫৩২]

২। মাওলানা শফিকুল ইসলাম (সহকারী অধ্যাপক খণ্ডকালীন), সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা। তিনি বলেন, মাওলানা শাহ সৈয়দ মুছলেহ উদ্দিন (রহ.) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ আলেম ও সমাজ সংস্কারক। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ বুখারী শরীফের দারস প্রদান করেন। দ্বীনী শিক্ষা প্রদানে তাঁর ব্যাপক অবদান রয়েছে। সমাজের বিভিন্ন অনৈসলামীক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম চালিয়ে যান এবং সমাজ সংস্কারে ব্যাপক সফলতা লাভ করেন। তাঁর গোটা জীবনটাই ছিলো ইসলাম ও মুসলমানদের খেদমতে নিবেদিত। তিনি মানুষের মাঝে ইসলামের সঠিক দিকনির্দেশনা তুলে ধরে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। দ্বীনী শিক্ষা প্রদানসহ ইসলামের প্রচার-প্রসারে আপোষহীন বিপ্লবী মুজাহীদের ভুমিকা পালন করে সঠিক ইসলামী আকিদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আজীবন চেষ্টা চালিয়ে যান। ইসলামী রাজনীতে তাঁর ব্যাপক সফলতা রয়েছে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে নেজামে ইসলাম পার্টির সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। দীর্ঘ ৩৯ বছর পর্যন্ত কিশোরগঞ্জের ঐতিহাসিক শোলাকিয়া ঈদগাহ্ ময়দানের ইমাম হিসেবে খুব সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন।[৫৩৩]

৩। মাওলানা মাহমুদুর রহমান নদভী (লেখক ও সাংবাদিক)। তিনি বলেন, মাওলানা শাহ সৈয়দ মুছলেহ উদ্দিন (রহ.) ছিলেন একজন প্রখ্যাত আলেমদ্বীন ও সুন্নাতে রাসূলের একনিষ্ঠ অনুসারী। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ ইলমে-দ্বীনের প্রচার-প্রসারে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। তাছাড়া এলাকায় বিভিন্ন বিদ'আত ও কুসংস্কার দূর করার ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রয়েছে। তিনি সমাজ জীবনের প্রতিটি স্তরে ইসলামী আদর্শকে বাস্তবায়ন করার জন্য সদা সচেষ্ট ছিলেন। সামাজিক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যাপক ভুমিকা পালন করেন। রাজনৈতিকভাবেও তাঁর যুগোপযোগী নেতৃত্ব সমাজের মাঝে ব্যাপক প্রভাব পড়ে। তিনি দীর্ঘ কর্মজীবনে বহু মাদ্রাসা, মক্তব ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঐতিহাসিক কিশোগঞ্জের শোলাকিয়া ঈদগাহের ইমামের দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেন।[৫৩৪]

---

[৫৩২] গবেষকের ০৯.০৩.২০১৩ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত।

[৫৩৩] গবেষকের ২৪.০৩.২০১৩ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত।

[৫৩৪] গবেষকের ১১.০৮.২০১৩ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-২.১৫ : অধ্যাপক মাওলানা মো. আবুল কালাম

অধ্যাপক মাওলানা মো. আবুল কালাম সাহেব ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার শশীদল ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের স্থানীয় আরেকটি নাম হলো বাল্লাগ। ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলাটি কুমিল্লার সবচেয়ে উত্তরের উপজেলা। এই উপজেলাটি পূর্বে বুড়িচং উপজেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তাঁর পিতার নাম মৌলভী রমীজ উদ্দীন ও মাতার নাম মোসাম্মৎ ফাতেমা বেগম। মৌলভী রমীজ উদ্দীন ছিলেন একজন বিশিষ্ট আলেম ও বুজুর্গ ব্যক্তি।[৫৩৫] তাঁর ছিল সাত ছেলেমেয়ে। তাঁদের মধ্যে আবুল কালাম ছিলেন পঞ্চম এবং ভাইদের মধ্যে তৃতীয়। প্রিয় সন্তান আবুল কালামকে 'নাজাত মিয়া' নামেও ডাকতেন।

মাওলানা আবুল কালাম তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার নিকট পবিত্র কুরআনের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। নিজ গ্রামে কোনো ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় দ্বীনী শিক্ষা হাসিলের জন্য তিনি পার্শ্ববর্তী বাগড়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দ্বীনী ইল্‌ম অর্জন করা শুরু করেন। বর্তমানে মাদ্‌রাসাটির নাম বাগড়া দারুল উলূম সিনিয়র মাদ্‌রাসা। গ্রামের পশ্চিম দিকের রেল সড়ক পার হয়ে পায়ে হেঁটে মাদ্‌রাসায় যাতায়াতের একমাত্র ব্যবস্থা ছিল।[৫৩৬] তিনি সেখানে ইবতেদায়ী পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সাথে পড়াশুনা শেষ করে পরবর্তীতে হরিমঙ্গল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। সেখানে দাখিল অবধি পড়লেও পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশনের অনুমোদন না থাকায় ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে ছয়গ্রাম মাদ্‌রাসা থেকে দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল সেই সময়কার বিখ্যাত গাজীমুড়া আলিয়া মাদ্‌রাসায়। হরিমঙ্গল মাদ্‌রাসায় পড়াকালীন সময়ে তিনি জায়গীর থাকেন ছয়গ্রামের এক ধনাঢ্য পরিবারে। এছাড়াও তিনি কিছুদিন ভারতের সীমান্তবর্তী পূর্ণমতি গ্রামেও জায়গীর ছিলেন এবং সেখানে তিনি স্থানীয় মসজিদে নিয়মিত নামাজ পড়াতেন। শৈশব থেকেই তিনি দেশের প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত জনবলের সঙ্কট অনুভব করেন।

অধ্যাপক মাওলানা আবুল কালাম দাখিল পাশ করার পর নোয়াখালীর টুমচর আলিয়া মাদারসায় আলিম ক্লাসে ভর্তি হবার জন্য রওয়ানা হন। মা-বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ইল্‌ম হাসিলের অধিক বাসনা মনে নিয়ে নোয়াখালীর দিকে রওয়ানা হন। কিন্তু, দূরত্ব ও যাতায়াতের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত টুমচর মাদ্‌রাসায় আর পড়া হয়নি। বাধ্য হয়েই ভর্তি হন নিকটবর্তী হরিমংগল মাদ্‌রাসায়। সে মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেব।[৫৩৭]

অধ্যাপক মাওলানা আবুল কালামের মেধার পরিচয় পেয়ে মাওলানা আব্দুর রহমান তাঁকে নিজ মাদ্‌রাসার বাইরেও কুমিল্লা শহরের অন্যতম বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধামতী আলিয়া মাদ্‌রাসায়ও ক্লাশ করার জন্য পাঠাতেন। এ সময় দাউদকান্দির মুহাম্মদ ইয়াসীনের সঙ্গে তার পরিচয়। যিনি পরবর্তীতে বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। মাওলানা

---

[৫৩৫] মৌলভী রমীজ উদ্দীন অল্প বয়সে জন্মস্থান ত্যাগ করে ভারতের বোম্বেতে দ্বীনী ইল্‌ম হাসিলের জন্য গমন করেন এবং সেখানে লেখাপড়া সমাপ্ত করেন। তারপর জাহাজে সফর করে পবিত্র মক্কা ভূমিতে যান এবং হজ্জ সম্পাদন করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। গ্রামের অশিক্ষিত ও দ্বীনী শিক্ষা বঞ্চিত মুসলমানদেরকে কুরআন-হাদীসের বিশুদ্ধ জ্ঞান বিতরণের জন্য নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন এবং ইসলাম প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি নিজের জমি ওয়াকফ করে মসজিদ, মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন।

[৫৩৬] অত্র মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মাওলানা আব্দুল হাকিম সাহেব।

[৫৩৭] মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেবের পিতা মাওলানা আব্দুল মান্নান ছিলেন অত্র মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ভারত থেকে হিজরত করে এদেশে আসেন এবং অত্র মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুর রহমান আবুল কালামকে নিজের পরিচালিত হরিমঙ্গল মাদ্রাসার ছাত্র হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করেন এবং ঢাকাস্থ আলিয়া মাদ্রাসায় পরীক্ষার সেন্টার হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি প্রিয় ছাত্র আবুল কালামকে নিয়ে ঢাকা আসেন এবং আলিয়া মাদ্রাসা হোস্টেলে থেকে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তিনি ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে আলিম পরীক্ষায় সারাদেশের সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৯তম স্থান অধিকার করে সরকারি বৃত্তি লাভ করেন। এ সময় তার সাথে ঢাকায় পরীক্ষা দিতে আসা আরও কিছু মেধাবী মুখের সাথে পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সিলেট জকিগঞ্জের মোহাম্মদ রকীবুদ্দীন। যিনি পরবর্তীতে সৌদি গ্র্যান্ড মুফতী বিন বাযের দফতরে মুয়াল্লিম হিসেবে কাজ করেছেন।

১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তিনি লাকসাম গাজীমুড়া মাদ্রাসায় ফাযেল শ্রেণিতে ভর্তি হন।[৫৩৮] ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে অত্র মাদ্রাসার ফাযেল সেন্টার পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণিতে ২০তম স্থান অধিকার করেন। সে সময় তিনি একজন কৃতী ছাত্র হিসেবে সাধারণ ছাত্রদের কল্যাণে বহুমুখী ভূমিকা পালন করেন। মাদ্রাসায় সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ছাত্র পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে তিনি নেতৃত্বের যোগ্যতা প্রমাণ করেন। সে সময় সারাদেশে আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সমান মান দেয়ার জন্য প্রথমবারের মতো আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। নিজ মাদ্রাসার ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে তিনি সেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং নেতৃত্ব দান করেন। আন্দোলনের কর্মসূচি পালন করতে সে সময় তিনি ঢাকায় আসেন। দাবি আদায় করতে গিয়ে পুলিশের লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস এবং নানা নিপীড়নেরও শিকার হন।

ইলমে হাদীসের সর্বশেষ পাঠ গ্রহণ করার জন্য তিনি ভর্তি হন বরিশালের ছারছীনা আলিয়া মাদ্রাসায়। হাদীস গবেষণার অদম্য পিপাসা নিয়ে তিনি কুমিল্লা থেকে বহুদূরের এই মাদারসায় গমন করেন। সেখানে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভকারী মাওলানা খাস্তগীর সাহেবের নিকট হাদীসের দারস গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁর সহপাঠী ছিলেন মাওলানা রুহুল আমীন, যিনি পরবর্তীতে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার সহ-সম্পাদক হন এবং মাওলানা ইসমাঈল যিনি পরবর্তীতে ধামতী মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হন। তখন হাদীস গবেষক সহপাঠীদের ভোটে তিনি এই মাদ্রাসার ছাত্র প্রতিনিধিদলের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে সফলতার সাথে ১ম শ্রেণিতে কামিল হাদীস বিভাগে পাশ করেন।

অধ্যাপক মাওলানা আবুল কালামের জ্ঞানের অর্জনের আগ্রহ ছিল প্রবল। জ্ঞানার্জানের প্রবল আগ্রহ তাঁকে সাধারণ শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী করে তোলে। তাই তিনি ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লার অতুলাই হাই স্কুল থেকে প্রাইভেটভাবে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। ইংরেজি ও অংক বিষয়ে দুর্বলতা কাটানোর জন্য প্রাইভেট পড়েন শহরের বিখ্যাত শিক্ষক সুধীর বাবুর নিকট। এরপর তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ইন্টারমেডিয়েটে ভর্তি হন। জনাব আবুল কালাম ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ২য় বিভাগে আই.এ. পাশ করার পর ঢাকায় পড়তে আসেন। আলিম শ্রেণিতে পড়ার সময় পরিচয় হওয়া মেধাবী সহপাঠী ইয়াছিন এবং রাকীবুদ্দেনের সাথে যোগাযোগ ছিল সবসময়। সবাই মিলে ঢাকায় এসে ভবিষ্যৎ পড়াশুনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বন্ধু রাকীবুদ্দীনের সাথে পরামর্শ করে দু'জনেই মিরপুর সরকারি বাংলা কলেজে বি.এ.তে ভর্তি হন এবং ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে খুব সুনামের সাথে বি.এ. পাশ করেন। মিরপুর বাংলা কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিভাগে এম.এ. (প্রিলিমিনারি)-তে ভর্তি হন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার

---

৫৩৮ তখন গাড়িমুড়া আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন মাওলানা আব্দুল মজিদ সাহেব।

Dhaka University Institutional Repository

করে প্রিলিমিনারি শেষ করেন। অতঃপর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এম.এ. (ফাইনাল) ব্যাচের পরীক্ষা ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়। এই পরীক্ষায়ও তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে প্রথম শ্রেণিতে চতুর্থ স্থান দখল করেন।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে বি.এ. পাশ করার পর তিনি ঢাকা নিবাসী অধ্যাপক আ.ন.ম. ইব্রাহীম সাহেবের[৫৩৯] বড় মেয়ে রওশন আরা বেগমকে বিবাহ করেন। অধ্যাপক ইব্রাহীমের সাথে পরিবারিক যোগসূত্র তৈরির মধ্য দিয়ে মাওলানা আবুল কালামের ইসলামী জ্ঞান চর্চা ও সেবার পরিধি আরও বিস্তৃতি লাভ করে। তিনি কওমী উলামায়ে কেরাম এবং ইসলাহী রুহানী খিদমাত সম্পর্কে জানা এবং এর বিস্তৃত অঙ্গনে পদচারণা করার সুযোগ লাভ করেন।

অতঃপর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য নিজ স্ত্রীকে কুমিল্লার গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। কুমিল্লায় গ্রামের বাড়িতে অবস্থানরত বাবা মৌলভী রমিজ উদ্দীনসহ অন্য সকলের সাথে তাঁর স্ত্রীও ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আর ছোট ভাই আবু নাছের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি পরিবার নিয়ে ঢাকার খিলগাঁয়ে শ্বশুরালয়ে চলে আসেন। জনাব অধ্যাপক আবুল কালাম চার মেয়ে ও তিন ছেলের জনক। পারিবারিক জীবনেও তিনি এদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণকারীদের জন্য একজন রোল মডেল। তিনি নিজে যেমন মাদ্রাসায় পড়েছেন এবং সফল জীবন গড়েছেন, ঠিক তেমনি ছেলেদেরকেও তিনি মাদ্রাসায় পড়িয়েছেন এবং সফল জীবন গঠনে সহায়তা করেছেন। তাঁর মেয়ে ও জামাতাদের প্রায় সকলেই মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত এবং অত্যন্ত সামাজিকভাবে উঁচু মর্যাদার অধিকারী।

১। বড়মেয়ে ফাতিমা ফেরদৌসী ইসলামীক স্টাডিজে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেছেন। তাঁর স্বামী ড. আ.জ.ম কুতুবুল ইসলাম নো'মানী, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন।

২। বড়ছেলে মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, তিনি বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিষয়ে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন।

৩। মেঝো ছেলে আহমাদুল হাসান, তিনি তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা থেকে হাদীস বিষয়ে কামিল এবং ইসলামী শিক্ষায় সম্মান ও এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেছেন। পিতার আদর্শ অনুসরণে 'স্বদেশী উদ্যোগ' নামে একটি দেশী ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা করে সফলভাবে তৈরি পোশাক খাতে ব্যবসা পরিচালনা করছেন।

৪। মেঝো মেয়ে ফারহানা আঞ্জুম, তিনি ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে স্নাতক এবং এম.এ. ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তাঁর স্বামী ড. আব্দুল হান্নান। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগের অধ্যাপক।

---

[৫৩৯] আ.ন.ম. ইব্রাহীম (রহ.) ছিলেন অবিভক্ত পাকিস্তানের শিক্ষা ক্যাডারভুক্ত শিক্ষক। তিনি বহু ইসলামী শিক্ষা বিষয়ক বই রচনা করেন। উপমহাদেশের বিখ্যাত আরবী ভাষাবিদ আলাউদ্দীন-আল-আজহারী'র সাথে তিনি আরবী অভিধান রচনা করেছেন। তিনি আলিয়া নেসাবের একজন বিদগ্ধ আলেম ছিলেন, আবরী ভাষা বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং বাংলাদেশে ইসলাম চর্চার সবগুলো ধারার আলেমদের নিকট তিনি সমাদৃত ছিলেন। তিনি নিজে আলিয়া মাদ্রাসায় পড়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষা-সাহিত্য ও ইসলামী শিক্ষার মেধাবী ছাত্র হিসেবে স্বর্ণপদকও লাভ করেন। পাশাপাশি, কওমী ধারার আলেমদের সাথেও তাঁর গভীর সম্পর্ক এবং যোগাযোগ ছিল। কওমী ধারার শিক্ষার প্রতি তাঁর ছিল অগাধ ভালোবাসা। ঢাকার মাখজানুল উলুম মাদ্রাসাসহ একাধিক কওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় তিনি সক্রিয় আবদান রাখেন। ইসলামের আধ্যাত্মিক ধারায় তাঁর শায়েখ ছিলেন আওলাদে রাসূল মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.)।

Dhaka University Institutional Repository

৫। সেজো মেয়ে তাহমিনা আঞ্জুম, তিনি কানাডার আলবার্টা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন এবং ওমানের সুলতান কাবুস বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞানে অনার্স পড়ছেন। তাঁর স্বামী ড. মামুন বিল্লাহ, তিনি বর্তমানে ওমানের সুলতান কাবুস বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক।

৬। ছোট ছেলে রাশিদুল হাসান তিনি প্রথমে মাদারাসায় পড়েছেন এবং পরে ঢাকা কলেজ থেকে অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছেন। তিনি তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন।

৭। ছোট মেয়ে নুসরাত জাহান হুমায়রা, তিনি ফিন্যান্স ও ব্যংকিং বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছেন তাঁর স্বামী জিয়াউদ্দীন, তিনি ঢাকার নটরডেম কলেজের প্রভাষক।[৫৪০]

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে অধ্যাপক মাওলানা আবুল কালাম সাহেবের অবদান-

অধ্যাপক মাওলানা আবুল কালাম সাহেব ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে আই.এ. পাশ করার পর বন্ধুদের সাথে মিলে ঢাকার অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ওয়েস্ট এন্ড হাই স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষক পদে পরীক্ষা দেন। ৭৫ জন চাকরি প্রার্থীর মধ্যে তিনি নিয়োগ পরীক্ষায় প্রথম হন এবং প্রথম কর্মস্থলে যোগদান করেন। শুরু হয় তাঁর সাফল্যময় ও বর্ণাঢ্য কর্মজীবন।

সে সময় পূর্বপাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ হেডমাস্টার ছিলেন ওয়েস্ট এন্ড হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব শামসুদ্দীন। তাঁর স্কুলের ইসলামিয়াতের শিক্ষক জনাব আবুল কালামের অসামান্য সাফল্যে তিনি দারুণভাবে আনন্দিত হন। বিশেষ করে, ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তাঁর পাণ্ডিত্ব স্কুলে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্বপালন এবং নিয়মানুবর্তিতা ছিল প্রশংসার পাত্র। এর সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া এবং সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জন করা তাঁর অধ্যাবসায়, পরিশ্রম, তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী হওয়া, যা সকলের অনুসরণযোগ্য। তাঁর এই সামান্য কৃতিত্বের প্রতিদান স্বরূপ তাঁকে দারুণভাবে সংবর্ধিত করা হয় এবং স্কুলের মর্নিং-শিফটের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়। সে সময় দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন স্কুলের দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁকে ঢাকায় অবস্থান করতে হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁর কর্মস্থল ওয়েস্ট এন্ড স্কুলের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম নতুন করে শুরু হয়।

অতঃপর অধ্যাপক মাওলানা আবুল কালাম সাহেব ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে বি.সি.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং শিক্ষা ক্যাডারে নিয়োগ পান। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা কলেজে আরবী বিষয়ের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। শিক্ষা ক্যাডারে নিয়োগ পাওয়ার শুরু থেকেই সরকারি কলেজগুলোতে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক স্বল্পতার বিষয়টি অনুধাবন করতে শুরু করেন। সমাজ ও দেশ সেবার অদম্য স্পৃহা তাঁকে তখন থেকেই এ বিষয়ে কিছু একটা করার জন্য পীড়া দিতে থাকে। এরপর তিনি বগুড়া আজিজুল হক কলেজ, কবি নজরুল কলেজ, টঙ্গী কলেজের শিক্ষার্থীদের মাঝে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে পাঠদান করেন। পরবর্তীতে কবি নজরুল কলেজে বিভাগীয় প্রধান এবং টঙ্গী সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষের দায়িত্বও পালন করেন। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি আবার ঢাকা কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন এবং একই বছর এই কলেজ থেকেই চূড়ান্তভাবে শিক্ষকতা পেশা থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

সরকারি কলেজে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে পাঠদান করতে গিয়ে এই বিষয়ের শিক্ষক স্বল্পতা দারুনভাবে উপলব্ধি করেন। নেতৃত্বের সহজাত গুণাবলী তাঁকে এ সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী ও অগ্রণী

[৫৪০] আল-মুনতাক্বিম (বাগরা দারুল উলূম ফাযেল মাদরাসা, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ১৫-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা পালন করতে অনুপ্রেরণা জোগায়। এর মধ্যে সারাদেশের আরবী ও ইসলামী শিক্ষার সকল শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় করে তিনি একটি ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন অনুভব করেন। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টা ও নিরলস পরিশ্রমের ফল হিসেবে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বাংলাদেশ আরবী ও ইসলামী শিক্ষা শিক্ষক পরিষদ'। এই সংগঠনের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে তিনিই তখন এর সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা বিভাগ এবং সকল সরকারি কলেজসমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগে যোগাযোগ করে তিনি সৃষ্টপদ ও শূন্যপদের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন। বিভিন্ন শিক্ষানীতি, শিক্ষা আইন, বিভিন্ন শিক্ষা কমিটির রিপোর্ট এবং কলেজসমূহে বিরাজমান আরবী ও ইসলামী শিক্ষা-শিক্ষক-শিক্ষার্থীর বর্তমান অবস্থার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে সরকারের বিভিন্ন মহলে যোগাযোগ শুরু করেন। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে এই সংগঠনের মাধ্যমে তিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নানা পর্যায়ে দেন-দরবার করতে থাকেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে নতুন পদ সৃষ্টি এবং শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া গুরুত্ব অনুধাবন করেন। এরই ফলশ্রুতিতে, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে ৪৮টি সরকারি কলেজে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে ৫৬টি নতুন পদ সৃষ্টি করে সরকার একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। এতে, কলেজ পর্যায়ে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার ইতিহাসে সরকারি শিক্ষকদের পদ, পদায়ন, পদোন্নতি এবং শিক্ষা প্রশাসনে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী সাফল্য অর্জিত হয়।

২০০২ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক আবুল কালাম সাহেব বাংলাদেশে আধুনিক ইসলামী শিক্ষার মূলকেন্দ্র সরকারি আলিয়া মাদ্‌রাসাসমূহের নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রার হিসেবে দায়িত্ব পান। নতুন নতুন মাদ্রাসার অনুমোদন, মাদরাসাগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ, ইসলামী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ইত্যাদি নানা মৌলিক বিষয়ে মাদ্‌রাসা বোর্ডকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য ভূমিকা পালন করেন। তাফসীর, হাদীস, ফিকহ এবং আদব ইত্যাদি বিষয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পঠন-পাঠন ও গবেষণা বাড়ানোর জন্য ফাযেল মাদ্‌রাসাকে কামিলে উন্নীত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপক আবুল কালাম সাহেব ছিলেন আড়াইবাড়ির স্বনামধন্য পীর মাওলানা গোলাম হাক্কানীর একান্ত প্রিয় এবং ঘনিষ্ঠ আত্নীয়। তাঁর অনুরোধে অধ্যাপক আবুল কালাম তাঁরই এলাকাধীন আড়াইবাড়ি ফাযেল মাদ্রাসাকে কামিল মঞ্জুরি প্রদান করেন।

মাদ্রাসা-মসজিদ প্রতিষ্ঠা : অধ্যাপক আবুল কালাম ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার প্রাণকেন্দ্র মিরপুর মধ্যপাইকপাড়ায় বাড়ি কিনে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে এই এলাকায় তিনি মুহাম্মদাবাদ ইসলামীয়া মাদ্‌রাসা নামে একটি আলিয়া নেসাবের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মাদ্‌রাসাটি প্রথম দশ বছর এবতেদায়ী মাদ্‌রাসা হিসেবে পরিচালিত হয়। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি এই মাদ্‌রাসার জন্য তাঁর শারীরিক-মানসিক-আর্থিক সকল প্রচেষ্টা ব্যয় করতে থাকেন। অত্র মাদ্‌রাসাটিকে পর্যায়ক্রমে দাখিল পরবর্তীতে আলিম স্তরে উন্নীত করেন। তাঁর নিষ্ঠা, অভিজ্ঞতা ও ইখলাস এই মাদ্‌রাসাকে অতিক্রান্ত অনন্য সফলতায় সমাসীন করে। পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই মাদ্‌রাসাটির পরিচিতি এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর নেতৃত্বে মুহাম্মদাবাদ মাদ্‌রাসা সারা বাংলাদেশের সেরা মাদ্‌রাসার তালিকায় ৬ষ্ঠ স্থান দখল করে এবং ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মহানগরীর শ্রেষ্ঠ মাদ্‌রাসা হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে। মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ ২০১৬ এবং ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে পরপর দুই বছর ঢাকা মহানগরীর শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ হিসেবে সরকারি পুরস্কার লাভ করে।

অবসর পরবর্তী জীবনে তিনি জোরালোভাবে ইসলামী সামাজিক কর্মকাণ্ড শুরু করেন। নিজ গ্রামে মসজিদ ও ইসলামী দাওয়াহ'র কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁর মরহুম পিতা

Dhaka University Institutional Repository

মৌলভী রমিজ উদ্দীনের ওয়াকফকৃত জমিতে বহুতলা মসজিদ ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করেন। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে মসজিদের পাশে 'রামচন্দ্রপুর (বাল্লাগ) ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা' প্রতিষ্ঠা করেন। নিজে জমি ক্রয় করে মাদ্‌রাসার নামে ওয়াকফ করে দেন। সরকারি মঞ্জুরি না পাওয়ায় মাদ্‌রাসার অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন-ভাতা এবং অন্যান্য সকল ব্যয় প্রায় এককভাবে নিজেই চালিয়ে নিতে থাকেন। ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসাটির আদলে এই মাদ্‌রাসায়ও মানসম্পন্ন দ্বীনী শিক্ষা প্রদান করার জন্য নিয়মিত মনিটরিং এবং সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করেন। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে এই মাদারসার ছাত্র-ছাত্রীরা ৫ম, ৮ম এবং দাখিল বোর্ড পরীক্ষায় কুমিল্লা জেলার সবচেয়ে ভালো ফলাফল অর্জন করে।

সমাজসেবায় অবদান : ২০১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকার মিরপুরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসা সংলগ্ন বিশাল কেন্দ্রীয় জুম'আ মসজিদের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মসজিদ-মাদ্‌রাসাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মুসল্লীদের সংগঠিত করে সামাজিক অন্যায়, জুলুম, চাঁদাবাজির মতো সামাজিক ব্যাধি মোকাবিলায় তিনি এক অনন্য নজির স্থাপন করেন। মসজিদের বহুমুখী সম্প্রসারণের কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। সকল দল-মত এবং শ্রেণির মুসল্লীদের নিয়ে সকল সমাজ বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। মসজিদের জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে সন্ত্রাসী ও চাদাবাজ চক্রের মোকাবিলায় তিনি সাহসী ভূমিকা পালন করেন। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর অবসর গ্রহণের কয়েক মাস আগে মসজিদে সালাতুল ফজর আদায় করতে যাবার পথে সমাজের কুচক্রী মহলের ইন্ধনে অস্ত্রধারী খুনিরা তাঁকে হত্যার প্রচেষ্টা চালায়। সন্ত্রাসীদের পিস্তলের গুলি তাঁর শরীরে মারাত্মকভাবে আঘাত করে। সেদিন জনাব আবুল কালাম মহান আল্লাহ পাকের প্রত্যক্ষ অনুগ্রহে বেঁচে যান। আল্লাহর মদদে অধ্যাপক আবুল কালাম গুলিতে আহত হয়েও আক্রমণকারী খুনিকে জাপটে ধরে ফেলেন। পরে সমবেত মুসল্লীদের সম্মিলিত প্রতিরোধে বাকী সন্ত্রাসীরা অস্ত্র ফেলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। মহা-পরাক্রমশালী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর দ্বীনের এই খাদেমের জীবনকে রক্ষা করেন। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজ, দখলদারদের বিরুদ্ধে এই জিহাদ তাঁর দ্বীনী খেদমতের আরেকটি অনন্য দিক। তাঁর জ্ঞান-সাধনা আর জ্ঞান-বিতরণ শুধুমাত্র মসজিদ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আল্লাহর ইবাদত, ইসলামী জ্ঞান চর্চার স্বাভাবিক বিকাশে যেসব সামাজিক বাধা আমাদের চারদিকে রয়েছে, যেসব কায়েমী স্বার্থ মুসলমানের সমাজে ইসলামের সামাজিক কাজকর্মকে কোণঠাসা করে রাখতে চায়, তাঁর বিরুদ্ধে জীবনবাজি রেখে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অধ্যাপক আবুল কালাম সাহেব এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

আমাদের বাঙ্গালি সমাজে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে সরাসরি কুরআনের আলোচনা ও চর্চা খুব কম লক্ষ্য করা যায়। মসজিদে মসজিদে সাধারণ মুসল্লীদের নিয়ে কুরআনের আলোচনা সাম্প্রতিক সময়ের একটি ইতিবাচক ইসলামীক সামাজিক আন্দোলনের নাম। অধ্যাপক আবুল কালাম ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের শুরু থেকেই কুরআনী জ্ঞান বিতরণের এই আন্দোলনে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। মধ্য পাইকপাড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে তিনি দীর্ঘ ২৫ বছর পবিত্র কুরআনের ধারাবাহিক তাফসীর করেন। কুরআনের আলো মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে ইসলামীক কাজে উদ্বুদ্ধ করেন। এছাড়া গোটা জীবনে তিনি অসংখ্য ইসলামিক সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, মাহফিল ও ইসলামী জলসার আয়োজন করেন এবং এতে অংশগ্রহণ করেন। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করেন এবং বিভিন্ন প্রোগ্রামের পরিচালনা ও সভাপতিত্ব করেন। দ্বীনের এই অসামান্য খেদমতের স্বীকৃতি স্বরুপ ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি সৌদী সরকার কর্তৃক রাজকীয় মেহমান হিসেবে পবিত্র হজ্জব্রত পালনের জন্য আমন্ত্রণ পান। ৪০টি মুসলিম দেশের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের সাথে পবিত্র মক্কা মুকাররামায় হজ্জব্রত পালন করেন,

Dhaka University Institutional Repository

বায়তুল্লাহ জিয়ারত করেন, মদিনায় মসজিদে নববীতে সালাত আদায় করেন এবং রাসূলের (সা.) রাওজা মুবারকে সালাম প্রদান করেন। এছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগেও তিনি একাধিকবার সস্ত্রীক এবং তাঁর পরিবারবর্গের সাথে নিয়ে হজ্জ, উমরাহ ও ইতিকাফ-বায়তুল-হারাম আদায় করেন।

'কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা : ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক আবুল কালামের বড় ছেলে অধ্যাপক মাহমুদুল হাসানের পরিকল্পনা ও সহযোগিতায় 'কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন' নামে একটি বেসরকারি এবং অলাভজনক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এর মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে তাঁর পরিচালিত ইসলামী সামাজিক কর্মকাণ্ডসমূহ একটি স্থায়ী ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে এবং দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম ও দুস্থ মানুষদেরকে তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ যেভাবে আর্থিক সাহায্য করে আসছেন, তা আরও সুসংগঠিত, স্বচ্ছ, নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত করার জন্য তা আজীবন চালু রাখার মানসে এই ফাউন্ডেশন কাজ করে যাচ্ছে।

অত্র প্রতিষ্ঠান অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি করা, ইসলামী শিক্ষা বৃত্তি চালু করা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ, ইসলামী সামাজিক গবেষণা, ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রজেক্ট বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলামের নানা সামাজিক, ধর্মীয় জ্ঞান পূরণের ক্ষেত্রে এই ফাউন্ডেশন অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

ব্যবসা-বাণিজ্যে সফলতা : আমাদের আকাবিরদের মধ্যে অনেকেই সফল ও ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। রাসূলের (সা.) সাহাবী ও জামাতা ওসমান (রা.), ইমাম আবু হানীফা (রহ.), ইমাম বুখারী (রহ.)-সহ অনেকেই দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রেই দারুণভাবে সফল ছিলেন। তাঁরা ইসলামী জ্ঞান সাধনার পাশাপাশি সফল ব্যবসায়ীও ছিলেন। সততা, আমানতদারিতা, বিশ্বস্ততা, ওয়াদা রক্ষা ইত্যাদি ইসলামী চরিত্রের বাস্তব নমুনা ছিলেন তাঁরা নিজেই। তাঁদের ইসলাম মানা শুধু জ্ঞান অর্জন আর বিতরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। হাত পেতে গ্রহণ করার পরিবর্তে আল্লাহর রাস্তায় অকাতরে দান করার শিক্ষাও দিয়ে যান। আজকের বাংলাদেশের আলেম-উলামাদের মধ্যে সম্পদশালী এবং দানশীল হওয়ার নজির খুব কম।

ইসলামের একজন একনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে অধ্যাপক আবুল কালাম আমাদের পূর্বসূরিদের প্রায় হারিয়ে যাওয়া সেই সোনালি ঐতিহ্য অনুসরণ করার স্বপ্ন দেখেন। নেতৃত্বের অসাধারণ গুণাবলীসম্পন্ন নবীন এই আলেমে-দ্বীন অনুধাবন করেন যে, বাংলাদেশে মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রধানতম সমস্যা হচ্ছে তাঁদের আর্থিক দুর্দশা। 'গ্রহীতার হাতের চেয়ে দাতার হাত উত্তম' ইসলামের এই শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে তিনি ছারছিনা মাদ্রাসায় হাদীসশাস্ত্রে ডিগ্রি অর্জনের সময় থেকেই নিজেকে ব্যবসা-বাণিজ্যে সম্পৃক্ত করেছিলেন। আর্থিক স্বাবলম্বিতা অর্জন তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। কিন্তু, ইসলামী জ্ঞানচর্চা, উচ্চতর যোগ্যতা অর্জন এবং সামাজিক ও দ্বীনী দায়িত্ব পালনে তিনি কখনো পিছিয়ে পড়েননি। বরং ইসলামী পেশাগত জীবনে গৌরবময় সাফল্যের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন।

জনাব অধ্যাপক আবুল কালাম সাথে তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যে মহান আল্লাহ তা'আলার অশেষ সাহায্য লাভ করেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি ঢাকার পীর ইয়ামেনী মার্কেটে নবী-রাসূল ও সাহাবীদের সুন্নাত মেনে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন। তাঁর সততা ও ন্যায়নিষ্ঠতা ব্যবসায়ীদের মধ্যেও তাঁকে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করে। ব্যক্তিগত ব্যবসা গুটিয়ে তিনি মার্কেট নির্মাণ ও পরিচালনায় কাজে

Dhaka University Institutional Repository

সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। তিনি ছিলেন পীর ইয়ামেনী মার্কেটের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। পরবর্তীতে তিনি মিরপুর শাহ-আলী শপিং কমপ্লেক্স ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দীর্ঘদিন এই দুই মার্কেটের ব্যবসায়ীদের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি অত্যন্ত সফলতা আর সম্মানের সাথে দায়িত্ব পালন শেষে পীর ইয়ামেনী মার্কেটের সভাপতি পদ থেকে অব্যাহতি নেন।

ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে অধ্যাপক আবুল কালাম সাহেবের সফলতা ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণে তাঁর দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন পূরণের অন্যতম নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে। নিজ এলাকায় মাদরাসা-মসজিদ প্রতিষ্ঠা, গরীব, ইয়াতীম, তালিবে ইল্মদের সহায়তা ও ইসলামী পাঠাগার প্রতিষ্ঠা এবং দেশব্যাপী ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমুহে সাহায্য সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহর দেয়া সম্পদকে ব্যবহার করেছেন।

সম্মাননা : অধ্যাপক আবুল কালাম সাহেব বাগড়া দারুল উলূম সিনিয়র মাদ্রাসায় ইবতেদায়ী তথা প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত দ্বীনী শিক্ষা লাভ করেন। অত্র এলাকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন মাওলানা আবদুল হাকীম ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ অধ্যাপক মাওলানা মো. আবুল কালাম-কে সেরা 'প্রাক্তন শিক্ষার্থী সম্মাননা' প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২২ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ মাদ্রাসার ৭৫তম বার্ষিক ইসলামী মহাসম্মেলনে অধ্যাপক আবুল কালামের পক্ষে তাঁর ছেলে অধ্যাপক মাহমুদুল হাসান এই সম্মাননা ক্রেস্ট, মানপত্র ও উপহার সামগ্রী গ্রহণ করেন। সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে পঠিত মানপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "বাংলাদেশে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ব্যক্তিত্ব অত্র এলাকার কৃতী সন্তান বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সাবেক রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মো. আবুল কালাম তাঁর প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে তাৎপর্যময় ভূমিকা পালন করেন। পুরো জীবনব্যাপী তিনি যা কিছু করেছেন, তা অনন্য উচ্চতা মর্যাদা লাভ করেছে। সফলতায় পরিপূর্ণ বর্ণাঢ্য এই ব্যক্তিত্ব এ যাবৎ কালে এই মাদ্রাসার সবচেয়ে সফল কৃতী ছাত্র হিসেবে সকল প্রাক্তন শিক্ষার্থীকে প্রতিনিধিত্ব করেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। মাদ্রাসার প্রাক্তন শিক্ষার্থী এই গুণী ব্যক্তি বাংলাদেশে ইসলামী জ্ঞানচর্চা ও বিকাশে অসামান্য অবদানের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর সফল ও কৃতিত্বময় জীবন গড়ার অংশীদার হিসেবে তাকে সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত নিতে পেরে আমরা দারুণভাবে গর্বিত। মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটি এবং সকল শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবকসহ এলাকার সর্বস্তরের জনসাধারণের পক্ষ থেকে আমরা জনাব অধ্যাপক আবুল কালামকে এই সম্মাননা পাওয়ার জন্য অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। অধ্যাপক কালাম বর্তমান সময়ে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য একটি উদাহরণ এবং রোল মডেল। যারা নিজেদের জীবন ও সমাজে দৃষ্টান্তমূলক এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করার স্বপ্ন দেখে, তাদের জন্য তিনি একটি অনন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবেন।"[৫৪১]

---

৫৪১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৮।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-৩ : চাঁদপুরের আলেমগণ

পরিচ্ছেদ-৩.১ : মাওলানা ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) (১৯৬৩-১৯৪৩ খ্রি.)

যুগে যুগে পৃথিবীতে কিছু ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ আগমন করেন, যারা তাঁদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন। যাঁদের ইল্মী জ্ঞানের মাধ্যমে পথ পেয়েছে শত-সহস্র পথহারা মানব-মানবী। যাঁদের হাতের ছোঁয়ায় মুখের দর্শনে মহাপাপীর মনেও আল্লাহ প্রেমের আলো জ্বলে ওঠে। তাঁরা অন্ধকার ছেড়ে হিদায়াতের পথ গ্রহণ করে। তাঁদেরই অন্যতম একজন রুহানী চিকিৎসক হলেন মাওলানা ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.)।[৫৪২] তিনি ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে নোয়াখালী জেলার সুধারাম উপজেলার নলুয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জনাব পনা মিঞা ভূঁইয়া, দাদার নাম জনাব বদরুদ্দীন ভূঁইয়া। তাঁর দাদা ছিলেন একজন বিশিষ্ট জমিদার। তিনি ছিলেন যেমন শিক্ষিত, তেমনি ছিলেন ভদ্র ও প্রভাবশালী। পিতার উত্তরসূরি হিসেবে জনাব পনা মিঞা সাহেবও পরবর্তীতে একজন প্রভাবশালী জমিদারী লাভ করেন। সে পরিবেশেই মাওলানা ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) ধীরে ধীরে বড় হন।[৫৪৩]

মাওলানা ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) শিশু বয়সে গ্রামের মক্তবে পড়াশুনা করেন।[৫৪৪] সেখানে তিনি আরবী ও ফার্সীর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর আপন চাচাত ভাই ইয়াকুব সাহেবের সাথে পরামর্শ করে ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য ভারতের কলিকাতা মাদ্‌রাসায় গমন করেন। সেখানে কয়েক বছর অত্যন্ত সুখ্যাতির সাথে পড়ালেখা করেন এবং ইলমে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে তথা ইল্‌মে ছরফ, ইল্‌মে নাহু, কাছাহাত-বালাগাত, মান্‌তিক, হাদীস ও তাফসীরসহ বিভিন্ন বিষয়ের গভীর জ্ঞান লাভ করেন। এরপর সেখান থেকে তিনি উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার জন্য মক্কা মুকাররমায় গমন করেন।[৫৪৫]

মাওলানা ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা লাভের পর বিশ্ব মানবতার একমাত্র মুক্তির সংবিধান পবিত্র আল্ কুরআন এর যথাসাধ্য হক আদায় করে বিশুদ্ধভাবে পড়ার অতৃপ্ত বাসনা মনের মধ্যে জাগ্রত হয়। কিন্তু সে সময় একমাত্র আরবজাহান ছাড়া এ উপমহাদেশে পবিত্র কুরআন বিশুদ্ধভাবে পড়ার ভালো কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। অপরদিকে কলিকাতার চাকচিক্যময় পরিবেশে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেন। তাই তিনি পবিত্র কুরআন শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ না পাওয়ায় বিভিন্ন আলেম ওলামার সাথে পরামর্শ গ্রহণ করেন। তাঁর চাচাত ভাইসহ অন্যান্য ওস্তাদগণ বলেন, "ইব্রাহীম, তুমি আরবে চলে যাও। আশা করি, সেখানে তোমার পড়াশুনায় আরও উন্নতি করতে পারবে।"

তিনি মনস্থির করলেন আরব দেশে যাবেন। ঠিক তখন কলিকাতা শহরে একটি বাণিজ্য জাহাজ জেদ্দার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে, কোন যাত্রী যেতে চাইলে ফ্রি যেতে পারবেন। এই ঘোষণা শোনার পর ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) সাথে সাথে বড় ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে খালি হাতে সুদূর আরবের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালেন। ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) আরব ভূমিতে পৌঁছে মক্কা নগরীর সাওলাতিয়া নামক মাদ্‌রাসায় ইল্‌মে ক্বেরাতে ভর্তি হন। লেখাপড়ায় একনিষ্ঠতার সাথে তিনি ইল্‌মে ক্বেরাতের সকল স্তর অতিক্রম করেন। ইল্‌মে ক্বেরাতের শ্রদ্ধাভাজন ওস্তাদ শেখ মুহাম্মদ ইয়াবে ফুসুস (রহ.)-এর কাছে সাত ক্বেরাতের প্রত্যেক স্তরেই তিনি প্রথম স্থান লাভ করেন। মাদ্‌রাসায়ে

---

[৫৪২] হিফজুর রহমান, মাশায়েখে কুমিল্লা, প্রাগুক্ত, পৃ. ০১।

[৫৪৩] মাওলানা মাহবুবে ইলাহী, মাশায়েখে চিশ্‌ত ও ক্বারী ইবরাহীম সাহেব (রহ.), (চাঁদপুর : ইব্রাহীম প্রকাশনী., ২০০৮খ্রি.), পৃ. ১২০।

[৫৪৪] মাওলানা ফজলে ইলাহী, উজানীর হযরত ক্বারী ইব্রাহীম ছাহেব (রহ.)-এর জীবনচরিত, (ঢাকা: আল-ইব্রাহীম প্রকাশনী, ১৯৯৯খ্রি.), পৃ. ১৬।

[৫৪৫] হিফজুর রহমান, মাশায়েক কুমিল্লা, প্রাগুপ্ত, পৃ. ০১।

Dhaka University Institutional Repository

সাওলতিয়ায় তিনি একাধারে চার বৎসর যাবৎ লেখাপড়া করেন। তখন সে সময়ের বাদশাহ শরীফ হাসান কর্তৃক এক ক্বিরাত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রথমস্থান অধিকার করেন। এ অসামান্য সাফল্যের জন্য বাদশা তাঁকে উক্ত মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দান করেন।[৫৪৬]

ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) সাওলতিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষাদানের সময় তাঁর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। একজন বাঙ্গালি ছেলে মক্কা শরীফে শিক্ষকতা করেন এটা মক্কাবাসীকেও বিস্মিত করে। ফলে তাঁর সাহচর্য লাভের আশায় অনেকেই চেষ্টা করতে থাকে। এ সময় মক্কার এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁর সাথে তাঁর শিক্ষিতা কন্যাকে বিবাহ দেন। ক্বারী সাহেবও এমন স্ত্রী পেয়ে ধন্য হন। যিনি মক্কাতে জন্মলাভ করেন। তিনি জীবনে বেশ কয়েক বার হজ্জ ব্রত পালন করেন।[৫৪৭]

ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) মক্কার সাওলতিয়া মাদ্রাসায় একটানা দশটি বছর কাটিয়ে দেন। মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের প্রাণঢালা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে দ্বীনী খেদমত করার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। তাই তিনি প্রিয় সহধর্মিণীর কাছে জন্ম ভূমিতে ফিরে আসার বিদায় চাইলেন। প্রতি উত্তরে বেগম বললেন- "আমিও আপনার সাথে যাব। দয়া করে বাকি জীবন আপনার খেদমতে কাটিয়ে দিতে চাই।"এরপর তিনি বেগমকে নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। দেশে পৌঁছে তিনি নিজ বাড়িতে উঠলেন না। অস্থায়ীভাবে ফিরুদিন নোয়াখালী জেলার রায়পুরের এক বৃদ্ধার বাড়িতে অবস্থান করেন। এরপর একটি বজরা-পান্সী (এক ধরনের নৌকা যার মধ্যে বসবাসের ব্যবস্থা থাকে) তৈরি করে বেগমসহ বসবাস শুরু করেন। নিজ বাড়িতে প্রথমে উঠেননি হয়ত এ কারণে যে, শৈশবকালেই পৈতৃক জমিদারী পছন্দ করেননি, আর এখন আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য লাভ করে পার্থিব ধনসম্পদে কিভাবে নিজকে জড়াবেন? বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে নৌকার মধ্যে দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন এবং বিভিন্ন স্থানে পবিত্র কুরআন শিক্ষা দান ও তাফসীর মাহফিলের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসার শুরু করেন। সেকালে বাংলা-ভারত উপমহাদেশে পবিত্র কুরআন বিশুদ্ধ শিক্ষা লাভ করার কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না বললেই চলে। ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ, সাহারানপুর এবং এরকম কিছু আলিয়া ও কৃওমী মাদ্রাসায় কুরআন সহীহ্ শুদ্ধভাবে পড়ার সুযোগ পাওয়া যেত।[৫৪৮]

ক্বারী মাওলানা ইব্রাহীম (রহ.) সেকালের শ্রেষ্ঠ আলেমগণের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। কিন্তু তাঁকে সকলেই "ক্বারী" সাহেব বলে সম্বোধন করা হয় কেন এ প্রশ্ন অনেকেরই। মূলকথা হলো, তিনি ইল্মে ক্বেরাতের ওপর এতই গভীর জ্ঞান লাভ করেন যে, সে সময়ে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। ইল্মে ক্বেরাতের খিদমাতও তিনি সবচেয়ে বেশি করেন। এ দেশের সিংহভাগ অভিজ্ঞ ক্বারী তাঁর ছাত্রের ছাত্র। এজন্য তিনি ক্বারী হিসেবেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[৫৪৯]

মাওলানা ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) সর্বমোট তিনটি বিবাহ করেন। প্রথম বিবাহ করেন আরবে থাকাকালীন সময়ে মক্কা নগরীর এক সম্ভ্রান্ত বংশে। দ্বিতীয় বিবাহ করেন নোয়াখালী জেলার রামগঞ্জ উপজেলার দেব নগর গ্রামে। তৃতীয় বিবাহ করেন চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলার পাঁচানী গ্রামে। আরবের বিবি সাহেবার ঘরে পাঁচ জন সাহেবজাদা ও পাঁচ জন সাহেবজাদী জন্মগ্রহণ করেন। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিবি সাহেবাদ্বয়ের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন সাত জন সাহেবজাদা ও ছয় জন সাহেবজাদী। নিম্নে তাঁদের নাম উল্লেখ করা হলো।

---

[৫৪৬] প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৪৯।

[৫৪৭] আফতাব স্মরণিকা, (কুমিল্লা : আল-জামিয়াতুল ইসলামীয়া দারুল উলূম বরুড়া, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৪২।

[৫৪৮] হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, আমরা যাদের উত্তরসূরি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮।

[৫৪৯] আফতাব স্মরণিকা, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

আরবের বিবির ঘরে সাহেবজাদাদের নাম : আলহাজ্ব মাওলানা ক্বারী ইসমাইল (রহ.), মাওলানা হাফেজ ইসহক (রহ.), আলহাজ্ব মাওলানা সামছুল হক (রহ.), মাওলানা ক্বারী মকবুল হক (রহ.),ও মাওলানা ক্বারী ওয়াহিদুল হক (রহ.)।

নোয়াখালীর বিবির ঘরে সাহেবজাদাদের নাম : মাওলানা ক্বারী সিরাজুল হক (রহ.), মাওলানা ক্বারী ওবায়দুল হক (রহ.), মাওলানা ক্বারী নাজমুল হক (রহ.), মাওলানা ক্বারী আমিনুল হক (রহ.), ও মাওলানা ক্বারী জিয়াউল হক (রহ.)।

চাঁদপুরের বিবির ঘরে সাহেবজাদাদের নাম : আলহাজ্ব মাওলানা ক্বারী মঞ্জুর আহ্মাদ এবং এই ঘরে শিশু অবস্থায় একজন সাহেবজাদা মৃত্যু বরণ করেন।[৫৫০]

মাওলানা ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) আরবে থাকাকালীন প্রায়ই কা'বার তাওয়াফ অবস্থায় আল্লাহর নিকট দুআ করতেন, যেন একজন হক্কানী আলেমে দ্বীনের সন্ধান পান। একদিন তিনি রাত্রে কা'বার তাওয়াফ কালে এক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে কা'বা তাওয়াফ অবস্থায় পেলেন। ক্বারী সাহেব বৃদ্ধকে দেখে জড়িয়ে ধরলেন। বৃদ্ধ বললেন, আচ্ছা বাবা তুমি কি চাও? তিনি বললেন, আমি আল্লাহকে চাই। বৃদ্ধ (আল্লাহর ওলী) বললেন, যাও বাবা আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত করবেন। এরপর ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) বিভিন্ন আলেমদের সান্নিধ্য পেতে থাকেন এবং বড় বড় আল্লাহর ওলীদের জীবনী পড়ে একজন হক্কানী পীরের তালাশে অস্থির হয়ে পড়েন। একদিন আল্লাহর নিকট নামায, দু'আ ও বিশেষ মুনাজাতের পর স্বপ্নে দেখেন, কে যেন তাঁকে আধ্যাত্মিকতা ও আত্মশুদ্ধির বয়ান শোনাচ্ছেন। বয়ান শেষে বললেন,"ইব্রাহীম! তুমি বিলম্ব না করে বিখ্যাত বুযুর্গ ভারতের মাওলানা রশীদ আহ্মাদ গাঙ্গূহী (রহ.)-এর দরবারে চলে যাও।[৫৫১] পরবর্তীতে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গূহী (রহ.)-এর নিকটে গিয়ে বাই'আত গ্রহণ। ক্বারী মাওলানা ইব্রাহীম (রহ.) দীর্ঘ ১৮ দিন গাঙ্গুহী (রহ.)-এর নিকট অবস্থান করে চিশতিয়া সাবেরিয়া তরীকার সম্পূর্ণ সবক শেষ করে ইলমে তাজকিয়ার পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জনের পর তিনি খেলাফত লাভ করেন।[৫৫২] অতঃপর গাঙ্গুহী (রহ.) বললেন, আল্লাহ তা'আলার বান্দাগণকে ইলমে যাহেরি ও ইলমে বাতেনি দ্বারা আখেরাতের দিকে ডাক। আমি আল্লাহর দরবারে তোমার জন্য দু'আ করে দিলাম এবং তোমাকে আল্লাহর দরবারে সোপর্দ করে দিলাম।

ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) সর্বত্র উজানীর ক্বারী সাহেব নামে প্রসিদ্ধ। নোয়াখালীর দৌলতপুর গ্রামের বাড়িতে স্থান সংকুলান না হওয়ায় তিনি বর্তমান চাঁদপুর জেলা উজানী গ্রামে বাড়ি কিনে বসবাস করেন। এজন্য তিনি উজানীর ক্বারী সাহেব নামেও পরিচিতি লাভ করেন। অবশেষে এই রূহানী চিকিৎসক ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে উজানীর বাড়িতে ইন্তেকাল করেন এবং উজানীতেই তাঁর কবর অবস্থিত। মৃত্যুকাল তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। এ সময় তিনি এগারো পুত্র এবং সাত কন্যাকে রেখে যান।[৫৫৩]

---

[৫৫০] মাওলানা মাহবুবে ইলাহী, মাশায়েখে চিশ্‌ত ও ক্বারী ইবরাহীম সাহেব (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.১১৬-১১৭।
[৫৫১] মাওলানা ফজলে ইলাহী, উজানীর হযরত ক্বারী ইব্রাহীম ছাহেব (রহ.)-এর জীবনচরিত, প্রাগুপ্ত, পৃ.৩৪-৩৫।
[৫৫২] প্রাগুপ্ত, পৃ.৩-৪।
[৫৫৩] প্রাগুপ্ত, পৃ. ৪।

Dhaka University Institutional Repository

মক্কায় বাদশা শরীফ হাসান কর্তৃক ইলমে দ্বীনের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ : তখনকার আমলে মক্কার বাদশাহ্ শরীফ হাসানের রাজকীয় দরবারের প্রচলন ছিল প্রতিবছর রাষ্ট্রীয়ভাবে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হতো। প্রথম স্থান অধিকারীকে রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করা হতো। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য দেশের প্রসিদ্ধ ক্বারী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে দাওয়াত করা হতো। যাঁরা দাওয়াতপত্র পেতেন কেবল তাঁরাই ঐ অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারতেন, অন্য কেউ নয়। ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) মক্কায় সাওলতিয়া মাদ্রাসায় কুরআন শিক্ষার চতুর্থ বৎসরের সময় তাঁর ওস্তাদ শায়েখ মুহাম্মদ ইয়ায়ে ক্বুদুস (রহ.) শাহী দরবারে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতার দাওয়াতপত্র পেলেন। শায়েখ মুহাম্মদ যেদিন শাহী দরবারে যাবেন, সেদিন ছাত্র ইব্রাহীম তাঁর কাছে বিনীতভাবে আবদার রাখলেন বাদশাহর দরবারে যাওয়ার জন্য। শায়েখ মুহাম্মদ এ কথা শুনে বিপাকে পড়লেন। তিনি বললেন," দেখ বাবা! সেখানে তো আমন্ত্রিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে ঢুকতে দেবে না। তোমাকে আমি কিভাবে সেখানে নিয়ে যাই?" কিন্তু ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) কিছুতেই হুজুরকে ছাড়লেন না। নিরুপায় হয়ে শায়েখ মুহাম্মদ বলেন,"তুমি যদি আমার সাথে যাও তবে শাহী ফটকের বাহিরে থাকতে হবে, ফটকের ভেতর তোমাকে নিতে পারব না। ইব্রাহীম (রহ.) এতেই শুকরীয়া আদায় করে বাদশাহর দরবারে রওয়ানা হলেন। পূর্বকথা মতো দরবারের বাইরে ইব্রাহীম (রহ.)-কে রেখে শায়েখ মুহাম্মদ (রহ.) ভেতর চলে গেলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রতিযোগিতা শুরু হলো। এদিকে ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) হৃদয় মন ও শ্রবণ শক্তিকে এক করে পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত শোনার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু বন্ধ ফটকের বাহিরে থেকে স্পষ্টভাবে কিছুই বুঝা যাচ্ছিল না। তাই তিনি মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে ফরিয়াদ জানালেন,"হে আল্লাহ! এই অধম গোনাহ্গারকে তুমি তোমার পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত শোনার ব্যবস্থা করে দাও। শাহী ফটকের ভেতর থেকে দারোয়ান হঠাৎ শুনল বাহিরে কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। অমনি ফটক খুলল। ইব্রাহীম (রহ.) কে কাঁদতে দেখে দারোয়ান বলল,"কি হয়েছে ভাই তোমার? তুমি কাঁদছো কেন?" ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) বললেন,"ভাই! আমি এখানে শাহী তিলাওয়াতে কুরআন প্রতিযোগিতায় এসেছিলাম, কিন্তু নিমন্ত্রণ পত্র পাইনি বলে ভেতরে ঢুকতে পারছি না, তাই কাঁদছি। আপনি যদি দয়া করে একটু ফটকের ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দিতেন, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র কালামের তেলাওয়াত শুনতে পারতাম।" পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত শোনার এমন আকুতি দেখে দারোয়ানের মনে দয়ার উদ্রেক হলো এবং বললো,"ঠিক আছে ভিতরে এসো, তবে ওপরে বাদশাহ্র দরবারে যেতে পারবে না।[৫৫৪]

ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) অনুমতি পেয়ে ভেতরে ঢুকে শাহী দরবারে উঠার সিঁড়ির নিচে বসে পড়েন, এখানে থেকে পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াতের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। তিনি সে আওয়াজের সাথে সুললিত সুর মিলিয়ে গুন গুন কণ্ঠে কালামে পাক পড়তে লাগলেন।

এদিকে বাদশাহ অনেক সময় ধরে লক্ষ্য করছেন যে, পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত প্রতিযোগীদের আওয়াজের সাথে আরেকটি সুমধুর স্বর মিলে শাহী মহলটিতে যেন একটি বেহেশ্তী পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সে সুরের চুম্বাকর্ষণে তিনি যেন বার বার হারিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি অনেক ভেবেও এর রহস্য উদ্ঘাটন করতে ব্যর্থ হলেন। অবশেষে তিনি ক্বারী সাহেবদের একত্র করে বললেন,"সম্মানিত ক্বারী সাহেবগণ! আপনারা এতক্ষণ কিছু লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না, তবে আমি বেশ কিছুক্ষণ ধরে

---

[৫৫৪] এইচএম জাবেদ হোসাইন, এক মনীষীর গল্প শোন, প্রাগুক্ত, পৃ.২২

Dhaka University Institutional Repository

আপনাদের পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের সাথে এমন একটি অদৃশ্য সুর শুনতে পাচ্ছি, যা মনে হয় বেহেশ্তী সুরের কোনো অংশ। এর রহস্য কি আমাকে দয়া করে বলুন। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণরত ক্বারীগণও বিমোহিত ছিলেন এমন একটি অদৃশ্য সুরে। তাঁরাও এর রহস্যের উপকূলে পৌঁছতে পারেনি। সুতরাং, বাদশাহর প্রশ্নের কিইবা জবাব দিবেন তারা? কিছুক্ষণ পর মুখ খুললেন, সাওলতিয়া মাদ্রাসার ক্বারী শায়েখ মুহাম্মদ ইয়ারে কুদ্দুস (রহ.)। তিনি বললেন,"মহামান্য বাদশাহ! আমি এর কারণ বলতে পারি। বাদশাহ্ বললেন,"জনাব! তাড়াতাড়ি বলুন, আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাচ্ছে।[৫৫৫]

শায়েখ মুহাম্মদ ছাত্র ইব্রাহীমের পরিচয় দিয়ে বললেন,"আজ আমি তাঁকে এখানে এনেছিলাম। কিন্তু ভেতরে প্রবেশের অনুমতি নেই বলে তাঁকে শাহী ফটকের বাইরে রেখে এসেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই সুমধুর আওয়াজ তাঁরই কণ্ঠধ্বনি।" শায়েখ মুহাম্মাদ (রহ.)-এর কথা শোনামাত্রই বাদশাহ্ ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.)-কে রাষ্ট্রীয় সম্মানে দরবারে নিয়ে আসতে আদেশ দিলেন। অতঃপর তাঁকে আনা হলে স্বয়ং বাদশাহ্ তাঁকে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের জন্য অনুরোধ করলেন। সম্পূর্ণ দরবারে পিন-পতন নীরবতা। সবাই স্বদৃষ্টি ও শ্রবণ এক করে ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.)-এর দিকে তাকিয়ে আছেন। ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) শুরু করলেন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, তিনি ক্বিরাতে সাব'আ সবকটি স্তরের নিয়মে কালামে পাক তেলাওয়াত করলেন। অবশেষে সেই বৃদ্ধা মহিলার সুরের ধারাগুলোও তাঁর সুরের মোহনায় স্থান পেল। পবিত্র কুরআনে তিলাওয়াতের এই অমীয় সুরের জান্নাতী পরশে দরবারের সবাই সেই মুহূর্তে ছিলেন আবেগে আচ্ছন্ন। সবার চোখে ভক্তির অশ্রু ঝরল। বাদশাহ্ শাহী সিংহাসন থেকে নেমে আনন্দে ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.)-কে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করতে লাগলেন। নিজ হাতে বহুবিধ পুরস্কার দিয়ে ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.)-কে রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করলেন। ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.)-এর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার এই অভূতপূর্ব সাফল্য দেখে বাদশাহ তাঁকে সাওলতিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতার দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন এবং দীর্ঘ ছয় বছর যাবৎ তিনি পবিত্র কুরআনের শিক্ষাদানের মাধ্যমে ইলমে দ্বীনের খেদমত নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন।[৫৫৬]

নিজ মাতৃভূমিতে আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় প্রচার-প্রসার : উপমহাদেশের প্রখ্যাত ওলীয়ে কামেল, শায়খুল কুররা আরব ওয়াল আজম মাওলানা ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) কুতুবে আলম রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.)-এর দরবার থেকে ফিরে এসে তিনি কঠোর সাধনায় মগ্ন হন। এরপর তিনি মানুষের রূহানী চিকিৎসায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন এবং আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে মাদ্রাসার দ্বীনী খিদমতে নিজেকে নিযুক্ত রাখেন এবং বিভিন্ন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মাদ্রাসা থেকে অসংখ্য ছাত্র ইলমে ক্বেরাতের ওপর বিশেষ জ্ঞান অর্জন করে ইলমে ক্বেরাতের পাণ্ডিত্য লাভ করে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে যত বড় বড় ক্বারী হয়েছে তারা তাঁর ছাত্র বা ছাত্রের ছাত্র। একবার ঢাকায় কুরআনের শিক্ষার ওপর অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশী বেশ কিছু লোককে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিল। সে অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা বলেছিল আজ আমরা এখানে যারা উপস্থিত আছি তাঁরা সকলে কোনো না কোনোভাবে উজানীর ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.)-এর ছাত্র। এমনকি এখন যত মানুষ পবিত্র কুরআন বিশুদ্ধভাবে পড়া শিখেছেন তাদের সকলের কোনো একদিক থেকে ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) ওস্তাদ হবেন। এ সকল ব্যাপ্তী লাভ করেছিল একমাত্র তাঁর কুরবানী ও নিজে পবিত্র কুরআন শিখে মানুষকে সহীহ তা'লীম দেয়ার আন্তরিক ইচ্ছা ও ফিকিরের কারণে।[৫৫৭]

---

[৫৫৫] প্রাগুপ্ত,পৃ. ২১-২২

[৫৫৬] মাওলানা ফজলে ইলাহী, উজানীর হযরত ক্বারী ইব্রাহীম ছাহেব (রহ.)-এর জীবনচরিত, প্রাগুপ্ত, পৃ.২৩-৪২।

[৫৫৭] মাওলানা মাহবুবে ইলাহী, মাশায়েখে চিশ্‌ত ও ক্বারী ইবরাহীম সাহেব (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০।

Dhaka University Institutional Repository

নোয়াখালীতে আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় প্রচার-প্রসার : শত বৎসর পূর্বে আমাদের এ দেশে তেমন কোনো মাদ্‌রাসা ছিল না। আর সহীহ্ শুদ্ধ করে তেলাওয়াত করার মতো লোক খুঁজে পাওয়া ছিলো দুষ্কর। যারা কিছু পড়া জানতেন তাঁরা দেওবন্দ, সাহারানপুর, পাকিস্তান ও ভারতের অন্যান্য এলাকা থেকে শিখে আসতেন। ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) যখন আরব থেকে এসে পবিত্র কুরআনের তা'লীম শুরু করলেন তখন মানুষ বলাবলি শুরু করলো,"সে তো পবিত্র কুরআনকে ভুল পড়ছে, পবিত্র কুরআনকে সে বিকৃত করে পড়ছে, সে কি আসলে পবিত্র কুরআন পড়ে না পবিত্র কুরআনের সুরে গান গায়"। একদিকে তারা এসব কথা বলাবলি করছে, অন্যদিকে তাঁরা ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.)-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে বলতে লাগলো-'তোমার কোনো কথাই হয় না এমনকি তোমার পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতও সহীহ-শুদ্ধ হয় না! এ হচ্ছে তাঁর বিরুদ্ধে তাদের দাবি। অথচ যিনি সহীহ-শুদ্ধ করে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত শিখাবেন, সেখানে বলা হচ্ছে তাঁর পড়া-ই সহীহ্ নেই। তারা এ কথাটি ষড়যন্ত্র করে বলছে এমন নয় বরং তারা ভুল পড়তে পড়তে তাদের ভুলের প্রতি তাদের বদ্ধমূল ধারণা হয়ে যায় যে, তাদের পড়া সঠিক। বরং ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) ভুল পড়ছেন। এমন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর মিশন চালিয়ে যেতে লাগলেন। এরই মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত পড়ার পদ্ধতিকে সঠিক বলার জন্য মাওলানা জৌনপুরের হুজুরের সহায়তার ব্যবস্থা করে দিলেন।[৫৫৮]

জৌনপুরের শায়েখ মাওলানা হাফেজ আহ্‌মাদ (রহ.) নোয়াখালীতে আসেন। এখানে তাঁর যথেষ্ট ভক্ত-মুরিদান ছিল। এ সুযোগে শায়েখ জৌনপুরীর কাছে অভিযোগ পেশ করা হলো যে, আমাদের এখানে আরব দেশ থেকে এক লোক এসেছে। তিনি গানের সুরের মতো পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন। এমন তেলাওয়াত আমরা কোনোদিন শুনিনি। সবশুনে শায়েখ জৌনপুরী বললেন,"ঠিক আছে তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো, দেখি তিনি কি পড়েন।" এরপর লোকজন এসে ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.)-কে জৌনপুরী হুজুরের নিকট যাওয়ার জন্য বললে, তিনি সেখানে গেলেন। শায়েখ জৌনপুরী তাঁকে কালামে পাক থেকে তেলাওয়াত করতে অনুরোধ করলেন। ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) খুবই সুমধুর সুরে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করলেন। পুরো মজলিসে পিন-পতন নীরবতা। অলৌকিক এক সুর যেন মজলিসকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তেলাওয়াত শেষ হতেই শায়েখ জৌনপুরী (রহ.) ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.)-কে জড়িয়ে ধরে আনন্দে কোলাকুলি করতে লাগলেন এবং উপস্থিত লোকজনের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন যে, "ভাইসব! আপনাদের যে কত বড় সৌভাগ্য তা ভাষায় প্রকাশ করে বোঝানো অসম্ভব। আপনারা যে নেয়ামত পেয়েছেন, তা সকলে মিলে এই নেয়ামতের যথাযোগ্য মর্যাদা করবেন। তাঁর উপদেশ মতো যথাসাধ্য চলার চেষ্টা করবেন। তাঁর কুরআন তাফসীর মাহফিলে দলে দলে যোগ দিয়ে দ্বীনী শিক্ষা লাভে ধন্য হবেন। মনে রাখবেন, এটিই হলো তিলাওয়াতে কুরআনের সঠিক পদ্ধতি যা আপনারা শুনলেন। খবরদার! তাঁর সাথে ভুলেও কখনো বে-আদবী করবেন না। আল্লাহ্ পাক তাঁকে দিয়ে কুরআনে কারীমের বিরাট খেদমত করাবেন।" এরপর ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) কে অনেক অনুরোধ ও যতনের সাথে শায়েখ জৌনপুরী (রহ.) তাঁর নিজ নৌকায় নিয়ে গেলেন। তখন জৌনপুরের পীর সাহেবও নৌকায় বসবাস করে একস্থান থেকে অন্য স্থানে ওয়াজ নসীহতের জন্য যেতেন। প্রায় তিন মাস ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.)-কে নিজ নৌকায় রেখে পবিত্র কুরআন পাক তেলাওয়াত শ্রবণ ও শিক্ষায় মশগুল রাখেন। এভাবেই ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারে করে নিজের জীবন অতিবাহিত করেন।[৫৫৯]

---

[৫৫৮] প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৯৬।

[৫৫৯] হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, আমরা যাদের উত্তরসূরি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করার পরও তাঁর দেশের সম্পদের প্রতি কোনো আকর্ষণ না থাকায় এবং বিবি সাহেবাও আরবের হওয়ায় সকলেই ধারণা করেছিল হয়ত তিনি আবার আরবে চলে যেতে পারেন। সেজন্য নোয়াখালীর নলুয়া ও দৌলতপুরের মানুষ সবাই তাঁকে দেশে একটি বিবাহ করানোর চিন্তা-ভাবনা করেন। ফলে, ভক্তবৃন্দের অশেষ অনুরোধে ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) দেবনগর পালবাড়ির এক সম্ভ্রান্ত বংশে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। সে সময় অনেক দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্র ও সাধারণ লোকজন দলে দলে ক্বারী সাহেব (রহ.)-এর নিকট পবিত্র কুরআনের সঠিক তেলাওয়াত শিখতে আসতো। ফলে লোকজনের থাকা খাওয়ার সুবিধার্থে একটি আদর্শ মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এটিই হচ্ছে ক্বারী সাহেব (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসাটির মাধ্যমে বহু মানুষ ইসলামের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারক হিসেবে নিজেদেরকে তৈরি করেন।[৫৬০] বর্তমানে মাদ্রাসাটি আলিয়া নেসাবে ফাযেল পর্যন্ত উন্নতি লাভ করে।

নোয়াখালী জেলার রায়পুরে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিতর্ক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন তাফসীর মাহফিলের মাধ্যমে দ্বীনের প্রচার ও প্রসার : শায়েখ হাফেজ আহমাদ জৌনপুরী (রহ.)-এর কাছ থেকে এসে ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) আবার পবিত্র কুরআনের তা'লীম ও তাফসীর মাহ্ফিল পূর্ণমাত্রায় শুরু করেন। তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়লো। এ সুনাম তাঁর জন্মস্থান নলুয়াতেও পৌঁছল। একবার নোয়াখালী জেলার রায়পুরে বিদ'আতের বিরুদ্ধে বিরাট বিতর্ক ও তাফসীর মাহ্ফিল অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, সে মাহ্ফিলে নুলয়া থেকে ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.)-এর বড় চাচা মুহাম্মদ ননা মিয়া ভূঁইয়া এবং দৌলতপুরের জমিদারও আসেন। জমিদার ননা মিয়া আসেন বিশেষ জমিদার পাল্কিতে করে। তিনি মাহ্ফিলের একপাশে বসে মনোযোগের সাথে ভ্রাতুষ্পুত্রের অমিয়বাণী শুনছিলেন। ভাতিজার মর্মস্পর্শী কণ্ঠে পবিত্র কুরআনের তাফসীর মাহফিল শেষে বহুদিন পর ভাতিজার সাথে দেখা হল। চাচা-ভাতিজা অনেকক্ষণ আবেগাপ্লুত হয়ে একান্তভাবে সময় কাটালেন। চাচা ননা মিয়া ভাতিজাকে অনেক বোঝালেন যে,"আমার সময় শেষ হয়ে গেছে, বাবা! তুমি এবার জমিদারীর দায়িত্ব বুঝে নাও।" কিন্তু আল্লাহ্ পাগল মানুষরা তো দুনিয়ার সম্পদ থেকে দূরে থাকে। সুতরাং অনেক বুঝিয়েও ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.)- কে পৈতৃক জমিদারিত্ব অর্পণ করা গেল না। ব্যর্থ মনে বাড়ি ফিরলেন জমিদার ননা মিয়া। উক্ত বিতর্ক অনুষ্ঠানে বিদ'আতীরা পরাস্ত হল। আর ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.)-এর সুনাম চারদিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল।[৫৬১] এভাবে তিনি নোয়াখালী ও বৃহত্তম কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে পবিত্র কুরআনের তাফসির মাহফিল করে দ্বীনের পথে দাওয়াত দিয়ে ইসলামের প্রচার ও প্রসার করেন।

চাঁদপুর জেলার উজানীতে ঐতিহ্যবাহী জামিয়া ইব্রাহীমীয়া মাদ্রাসা ও সাত ক্বিরাতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন: চাঁদপুর জেলার উজানীতে আগমণ এবং মাদ্রাসা স্থাপনের ইতিহাস ছিল অত্র এলাকার জন্য এক উজ্জ্বল ইতিহাস। ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) উজানী অঞ্চল দিয়ে নবাবপুর নামক জায়গায় একটি বহসে যোগদান উপলক্ষে আসা-যাওয়ার পথে উজানীর তখনকার সে বিশাল জঙ্গলটি দেখে আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করলেন,"হে আল্লাহ! আপনি এ জঙ্গলটি আমার অধীনস্ত করে দিন। আল্লাহ্ তা'আলা তার ইচ্ছে তাঁর আশেক বান্দাকে এই উজানীতে এনে অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশকে আলোকিত করবেন। ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) এই দোয়া করার কিছু দিন পর তাঁর নিকট সংবাদ পৌছল যে, জঙ্গলের মালিক জঙ্গলটি বিক্রি করে দিবেন। সংবাদ শুনে তিনি উক্ত জঙ্গলের উপযুক্ত দাম নির্ধারণ করে খরিদ করে নিলেন।

---

৫৬০ প্রাগুপ্ত,পৃ. ১৯০।

৫৬১ মাওলানা ফজলে ইলাহী, উজানীর হযরত ক্বারী ইব্রাহীম ছাহেব (রহ.)-এর জীবনচরিত, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) যে অঞ্চলেই গমন করেন, সেখানেই মানুষ কীট-পতঙ্গের মতো তাঁর দিকে ধাবিত হতো। যাঁরা আল্লাহর মারিফত হাছেল করতে আসতো তাঁরাতো ছিলেনই, তদুপরি একদল লোক আসতো সহীহ্ শুদ্ধ করে পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত শিখানোর জন্য। সে জন্যই ১৩২১ হিজরি মোতাবেক ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এ জামিয়া ইসলামীয়া ইব্রাহীমিয়া উজানী মাদ্রাসা কমপ্লেক্স। বিশাল এ বাড়ির এমন এক স্থান মাদ্রাসার জন্য চয়ন করা হয়েছে যার সন্নিকটে দাঁড়িয়ে আছে-প্রাচীন কালের মুসলিম সভ্যতার এক নীরব সাক্ষী "বখতিয়ার খাঁ শাহী জামে মসজিদ।"

মাদ্রাসার কার্যক্রম শুরু হয় প্রথমে একটি দু'চালা বিশিষ্ট ঘর থেকে। অবশ্য তখনও অনেক সময় ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) বিভিন্ন গাছের নিচে বসে ছাত্রদের আরবী ও ইসলামী শিক্ষার দারস দিতেন। তিনি নিজেই মাদ্রাসার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে মাদ্রাসাকে ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে ধাবিত করে যান।

পবিত্র কুরআন পড়ার সঠিক পদ্ধতি তৎকালীন সময়ে অধিকাংশ মানুষেই জানতে না। যারা কিছু জানতেন তারাও প্রচুর ভুল পড়তেন। তাই ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) পবিত্র কুরআন সহীহ্ শুদ্ধ করে পড়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। চতুর্দিকে যখন সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো উজানীতে ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) হুজুরের তত্ত্বাবধানে সহীহ্ শুদ্ধ করে কুরআন শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তখন পঙ্গপালের ন্যায় মানুষ পবিত্র কুরআনের সহীহ-শুদ্ধ করে শিক্ষার জন্য উজানীতে সমবেত হতে লাগলো। শিশু, বুড়ো সবাই পবিত্র কুরআনের সঠিক শিক্ষার আগ্রহ নিয়ে একত্রিত হতে লাগলো। যারা কিছু পড়তে পারতো তাঁরাও আরও অধিক আগ্রহ নিয়ে সহীহ্ শুদ্ধ করে পড়ার জন্য একত্রিত হতে লাগলো।

আজও দেখা যায়, বহু মাদ্রাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস পাস করে অনেক আলেম-ওলামা আসেন ক্বিরাত বিভাগে বিশুদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন পড়ার জন্য এবং ষাট-সত্তর বছরের বৃদ্ধরাও আসেন পবিত্র কুরআন শিখার জন্য। ক্বিরাত বিভাগের প্রায় সবগুলো কিতাব একমাত্র উজানীতেই পড়ানো হয়। এই ক্বিরাত বিভাগকে তিনটি স্তরে বিন্যাস করা হয়েছে। প্রতিটি স্তর অতিক্রম করতে এক বৎসর লাগে। সর্বমোট তিন বৎসর সময় পড়ার পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তাকে ক্বিরাতের সনদ প্রদান করা হয়। ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) ইন্তেকালের পর তাঁর সন্তান মাওলানা আমিনুল ইসলাম মাদ্রাসা নেজামতের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তাঁর আরবের ঘরের সাহেবজাদা মাওলানা সামছুল হক পীর সাহেব অত্র মাদ্রাসার সেক্রেটারি পদে অধিষ্ঠিত হন।[৫৬২] শামছুল হক পীর সাহেব ইন্তেকাল পর্যন্ত মাদ্রাসার সেক্রেটারি পদে বহাল থাকেন। তিনি সেক্রেটারি থাকাকালীন বরুড়া উপজেলার ঝাড়ুয়া গ্রামের মাওলানা সেকেন্দার আলী সাহেবকে মুহ্তামিম নিযুক্ত করেন। এরপর, কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলার সিং আড্ডা গ্রামের মাওলানা মাজহারুল হক সাহেব মুহ্তামিমের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের দায়িত্ব থাকাকালীন মাদ্রাসার কিতাব বিভাগ ক্রমান্বয়ে জামাতে উলা পর্যন্ত উন্নীত হয়। তারপর মাওলানা আবুল বারাকাত সাহেব কয়েক বৎসর মুহ্তামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে মাওলানা হেফাজ উদ্দিন সাহেব অস্থায়ী মুহ্তামিম হিসেবে কয়েক বৎসর দায়িত্ব পালন করেন। মাওলানা সামছুল হক পীর সাহেব ইন্তেকালের পর সেক্রেটারির এ মহান দায়িত্ব এসে পড়ে তাঁর বড় ছেলে মাওলানা মোবারক করীম পীর সাহেবের ওপর। সর্বশেষ অস্থায়ী মুহ্তামিম মাওলানা হেফাজ উদ্দিন সাহেব ও এলাকাবাসীর একান্ত আহ্বানে এবং মাদ্রাসা কমিটির বহু প্রচেষ্টায় পর মুহতামীমের এই গুরুদায়িত্ব আসে পীর ছাহেব মাওলানা মোবারক করিমের ওপর। তিনি বার বার কমিটি কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃতি জানানোর আবেদনের পরও তাদের জোড়ালো সিদ্ধান্তের

[৫৬২] প্রাগুপ্ত, পৃ. ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেক্ষিতে দায়িত্ব নিতে হয়েছে। তিনি এ দায়িত্ব নেওয়ার পর, মাদ্রাসার উন্নতি অতি দ্রুত এগিয়ে যায় এবং ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রসার লাভ করে। প্রায় দুই যুগব্যাপী মাওলানা মোবারক করিম পীর সাহেব (রহ.) এই জামিয়ার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং ১ম শ্রেণি থেকে দাওরা হাদীস পর্যন্ত প্রতি বৎসর প্রায় এক হাজার ছাত্রকে অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। যার মাধ্যমে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রচার প্রসার হচ্ছে। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে ক্বারী ইব্রাহীম (রহ)-এর উত্তরসূরি হিসেবে ওয়াজ-মাহফিলের মাধ্যমে দ্বীনের খেদমত করেন। ক্বারী ইব্রাহীম সাহেব (রহ.) এই প্রতিষ্ঠানের শুধু শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন না বরং তিনি আল্লাহ্ পাকের দরবারে মাদ্রাসার মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসার জন্য বিশেষ দু'আ করে যান। আজ দেখা যায় অত্র প্রতিষ্ঠান থেকে যাঁরা লেখাপড়া শেষ করে বিদায় হয়ে যান তাদেরকে কোন না কোন দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারের কাজে আল্লাহ্ পাক সম্পৃক্ত করে দেন।[৫৬৩] অত্র মাদ্রাসায় বিভিন্ন বিভাগসমূহের মাধ্যমে ইলমে দ্বীনের বিশাল খেদমতের আঞ্জাম দিয়ে আসছে। বিভাগসমূহ হলো-

- মক্তব বিভাগ : এখানে দুই বছরের একটি কোর্স চালু আছে।
- ক্বিরাত বিভাগ : এখানে তিন পর্যন্ত ক্বিরাত শিক্ষা দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের তাজবীদ ও মাসায়েলের কিতাবসমূহ পড়ানো হয়।
- হিফজ বিভাগ : এখানে পবিত্র কুরআনের হিফজ সম্পন্ন করা হয়।
- কিতাব বিভাগ : এ বিভাগটি হচ্ছে মাদ্রাসার মূল বিভাগ, এখানে এবতেদায়ী থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত পড়ানো হয়।
- ইফতা বিভাগ : এ বিভাগে মুসলিম সমাজের দৈনন্দিন ইসলামীক, পারিবারিক সমস্যা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসহ ফতোয়ার যাবতীয় কিতাবসমূহ ২ বছর যাবৎ পড়ানো হয়।

কিতাব রচনা : উপমহাদেশের ক্বিরাতের ওপর যেসব কিতাব পড়ানো হয়। তার মধ্যে ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.)-এর লিখিত গ্রন্থ 'নুজহাতুল ক্বারী' অন্যতম। তাজবীদের ওপর যত কিতাব পড়ানো হয়, সকল কিতাবের সার সংক্ষেপ হচ্ছে নুজহাতুল ক্বারী। এই কিতাবে পবিত্র কুরআন সহীহ শুদ্ধ করে পড়ার সকল নিয়ম-কানুন অতি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। তার এই কিতাবটি অনুকরণ করে বর্তমানে ক্বিরাত ও তাজবীদের ওপর বহু কিতাব রচিত হয়েছে।

মাওলানা ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.)-এর বাড়ির সাথে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের বসতি স্থাপন : উজানী এলাকাটি এক সময় অনাবাদী ছিলো। এর একটি জীবন্ত প্রমাণ হলো বর্তমানে উজানী মাদ্রাসার বিশাল এলাকা জুড়ে যে মানব বসতি রয়েছে। তাঁরা সকলেই বিভিন্ন এলাকা থেকে এখানে এসেছে। যেমন ক্বারী ইব্রাহীম সাহেব (রহ.) নোয়াখালীর দৌলতপুর থেকে এসে বাড়ি করার পর লোকজন এসে তাঁর পড়শী হওয়ার জন্য বসতি স্থাপন করতে থাকেন। এদের মধ্যে উজানী দেওয়ান বাড়ি বলে পরিচিত যারা এসেছেন বরিশাল থেকে। আর ফুলছোঁয়া বাড়িতে যারা বসবাস করেন তারা এসেছেন চাঁদপুর জেলার বাক্সিলা গ্রামের ফুলছোঁয়া গ্রাম থেকে। এভাবে প্রায় সকলেই দূর-দূরান্ত থেকে এসে এখানে বসতি স্থাপন করেন।[৫৬৪] যেন তাঁর মতো একজন হক্কানী আলেম ও বুজর্গ ব্যক্তির পড়শী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করা যায়।

---

[৫৬৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯-৬২।
[৫৬৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে এ যাবৎকাল পর্যন্ত যত বড় বড় ক্বারী হয়েছে তাঁরা মাওলানা ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.)-এর ছাত্র বা ছাত্রের ছাত্র। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে নিম্ন লিখিত কয়েকজন ক্বারীর নাম উল্লেখযোগ্য, ক্বারী মুহাম্মদ ইসমাঈল, ক্বারী বশীরুল্লাহ, ক্বারী হাবীবুল্লাহ, ক্বারী ইব্রাহীম, ক্বারী আব্দুস সোবহান, ক্বারী সাখাওয়াতুল্লাহ, ক্বারী আহ্‌মদ উল্লাহ্ প্রতিষ্ঠাতা জামেয়া ইসলামীয়া কচুয়া, চাঁদপুর।[৫৬৫]

একবার কুমিল্লা জেলায় মারাত্মক খরা দেখা দেয়। অনাবৃষ্টির কারণে মাঠ-ঘাট শুকিয়ে চৌচির হয়ে যায়, মাঠ ভরা সবুজ ফসল হয়ে যায় বিবর্ণ। জনজীবনে নেমে আসে ভয়াবহ অস্বস্তি। লোকজন ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.)-এর কাছে বৃষ্টির জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করার বিনীত আবেদন জানান। অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি ঘোষণা দেন ইস্তিস্কার নামাজের। নির্দিষ্ট দিনে কুমিল্লা জেলার নবাবপুর বাজার সংলগ্ন মাঠে হাজার হাজার লোক সমবেত হয়। নির্ধারিত সময়ে নামাজের পর দু'আ শুরু হয়, মুনাজাত শেষ হওয়ার পূর্বেই অবিরাম বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। দেখতে দেখতে খাল বিল জলাশয় পানিতে ভরপুর হয়ে যায় এবং মানুষের জীবনেও স্বস্তি ফিরে আসে।[৫৬৬]

মাওলানা ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.)-এর খলিফাবৃন্দ : মাওলানা ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.)-এর খলীফাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য কয়েকজন খলিফা হল- সাহেবজাদা ক্বারী মাওলানা সামছুল হক (রহ.), চরমোনাইর পীর মাওলানা ফজলুল করীম (রহ.)-এর শ্রদ্ধেয় পিতা মাওলানা ইসহাক (রহ.), দারুল উলূম বরুড়া মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা লাকসাম উপজেলার মাওলানা আফতাব উদ্দীন (রহ.) বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। তারা আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে তাঁরা ইসলামের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অনেক মাদ্‌রাসা, মসজিদ ও মক্তব। যার মাধ্যমে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।[৫৬৭]

বিভিন্ন মনীষীদের দৃষ্টিতে মাওলানা ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.)-

১. **হাফেজ মাওলানা আবুল কাসেম :** মুহাদ্দিস মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্‌রাসা চট্টগ্রাম, তিনি উজানীর ক্বারী ইব্রাহীম সাহেব (রহ.) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, একবার আমাদের চট্টগ্রামে বহুদিন অনাবৃষ্টির কারণে ফসলি জমিতে বড় বড় ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল। গাছ-পালা, তরু-লতা শুকিয়ে মরতে শুরু করেছে। মানুষের মাঝে বিভীষিকাময় হাহাকার শুরু হয়েছে। মানুষ উপলব্ধি করতে শুরু করেছে যে, এ মুহূর্তে যে কোন একজন ওলীর মাধ্যমে তাওবা, ইস্তিগফার করে আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা প্রয়োজন। এ নিয়ে সকলেই পরামর্শ করলো উজানীর ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) অনেক বড় বুযুর্গ ব্যক্তি তাঁকে দিয়ে দু'আ করালে হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ওপর রহম ও বরকতের দৃষ্টিপাত করতে পারেন। প্রস্তাব মতে তাই করা হলো। ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) দাওয়াত পেয়ে চট্টগ্রামে আসলেন এবং বললেন,"আমরা সকলে মিলে ইস্তেস্কার নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব।" নির্দিষ্ট দিনে নির্ধারিত সময়ে শত-সহস্র লোক জমায়েত হলো। খোলা ময়দানে ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) নামাজ পড়ালেন। নামাজ শেষে সকলকে নিয়ে মুনাজাত করলেন। মুনাজাত শেষ হতে না হতেই রৌদ্রে উজ্জ্বল পরিষ্কার আকাশ হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে বৃষ্টিপাত শুরু হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই খাল-বিল পানিতে ভরপুর হয়ে গেল। মানুষের মাঝেও স্বস্তি ফিরে এলো।[৫৬৮]

---

[৫৬৫] হিফজুর রহমান, মাশায়েখে কুমিল্লা, প্রাগুপ্ত, পৃ. ০৪।

[৫৬৬] প্রাগুপ্ত, পৃ. ৪০৭।

[৫৬৭] আফতাব স্মরণিকা, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩০।

[৫৬৮] সাক্ষাতকার : ১১ মার্চ, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে।

Dhaka University Institutional Repository

২. **মাওলানা অলী উল্লাহ হোসাইনী :** মুহাদ্দিস জামিয়া ইসলামিয়া ইব্রাহীমীয়া উজানী তিনি বর্ণনা করেন,"আমার ছাত্র জীবনে একবার চট্টগ্রাম হাটহাজারী মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা হাবীব উল্লাহ (রহ.), মাওলানা জমীর উদ্দীন (রহ.), মাওলানা আজিজুল হক (রহ.), তাঁরা সকলে ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.)-এর সাথে দেখা করার জন্য উজানীতে আসেন। ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) তখন আল্লাহ তা'আলার প্রেমে মত্ত ছিলেন। এ অবস্থা দেখে তখন তাঁরা একটু দূরে দাঁড়ালেন এবং ভাবলেন কি করা যায় কিন্তু আজিজুল হক সরাসরি চলে গেলেন ঐ অবস্থায় ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.)-এর নিকটে। সালাম দেওয়ার সাথে সাথেই ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) তখন তাকে প্রচণ্ডভাবে হাতের লাঠি দিয়ে প্রহার শুরু করলেন। দূরে দাঁড়ানো সাথী দু'জন এ কাণ্ড দেখে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ এভাবে পিটানোর পর ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন। সাথীগণ আজিজুল হক সাহেবের কাছে গিয়ে দেখলেন তাঁর কিছুই হয়নি বরং তিনি তখন আল্লাহর প্রেমে অস্থির হয়ে ধ্যানে মগ্ন থাকেন।[৫৬৯]

৩. **মাওলানা আশেক এলাহী ইব্রাহীমী :** শায়েখুল হাদীস জামেয়া ইউনুসিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া তিনি বলেন, মাওলানা ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ আলেম, প্রখ্যাত বুজুর্গ ও সমাজ সংস্কারক। যার ইলমি জ্ঞানের মাধ্যমে পথ পেয়েছে শতসহস্র পথহারা মানুষ। যার হাতের ছোঁয়ায় মুখের দর্শনে মহাপাপীর মনেও আল্লাহ প্রেমের আলো জ্বলে উঠে। তিনি ছিলেন একজন রুহানী চিকিৎসক। নিঃসন্দেহে বলা যায় তিনি ছিলেন দা'য়ী ইলাল্লাহ। তার মাধ্যমে এদেশের মানুষ বিশুদ্ধ কুরআনের তেলাওয়াত অর্জনে সক্ষমতা লাভ করে। তিনি ছিলেন ইলমে দ্বীনের প্রচার-প্রসারক। তিনি দীর্ঘ সময় পবিত্র মক্কা শরীফে অবস্থান করার পর একমাত্র ইলমে দ্বীনের শিক্ষা প্রদানসহ ইসলামের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে পবিত্র ভূমি ছেড়ে নিজ মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন। বর্তমানে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ যারা পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত শিখেছেন তাদের সকলের কোনো কোনো দিক থেকে ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) ওস্তাদ হবেন। তিনি বিভিন্ন তাফসির মাহফিলের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে ইসলামের প্রতি অতি সহজেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন। কোনো মানুষ জীবনে একবার তার তাফসিরের আলোচনা শোনার সাথে সাথে সে তার একান্ত ভক্ত হয়ে যেত।[৫৭০]

৪. **মুফতী মাওলানা আবু সাইদ :** মুহাদ্দিস ফরিদাবাদ মাদ্‌রাসা ঢাকা ও প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক দারুল ফিকর ওয়াল ইরশাদ বাংলাদেশ এবং আপন জামাতা তিনি বলেন, মাওলানা ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) ছিলেন একজন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম বুজুর্গ, সমাজ সংস্কারক ও ইসলামের প্রচারক। তিনি এদেশে ইসলামের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন বিদ'আত ও কুসংস্কার দূরীকরণে ব্যাপক অবদান রাখেন। পবিত্র কুরআনের সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের অন্ধকার কীভাবে দূর করা যায় সে লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করেন মাদ্‌রাসা। সেখানে তিনি বিশেষভাবে বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতের জন্য ক্বিরাত বিভাগ আলাদাভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। ক্বিরাত বিভাগের প্রায় সবগুলো কিতাব একমাত্র তার প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয়। তিনি বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে তাফসির মাহফিলের মাধ্যমে সমাজে প্রচলিত মিলাদ, কেয়াম, কবর পূজা, মাযার পূজা বিভিন্ন কুসংস্কার ও বেহায়াপনার বিরুদ্ধে কুরআন হাদীসের দলিলের মাধ্যমে সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপন করতেন। তার ওয়াজ মাহফিলের আলোচনা শুনে বহু মানুষ সঠিক ইসলামের পথে ফিরে আসেন। তিনি কুরআন হাদীসের সঠিক জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়ে কুরআন হাদীসের চেতনায় মানুষের নিকট সঠিক ইসলামের পরিচয় তুলে ধরে হেদায়েতের পথে পরিচালিত করতে সফল ভূমিকা পালন করেছেন।[৫৭১]

---

[৫৬৯] ৩০ মার্চ, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে।

[৫৭০] ২২ এপ্রিল, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে।

[৫৭১] ১৫ মার্চ, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-৩.২ : মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান (রহ.) (১৯৩৫-২০০৬ খ্রি.)

চাঁদপুর জেলায় ফরিদগঞ্জ উপজেলার কেরোয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে মাওলানা এম. এ. মান্নান ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৯ মার্চ তাঁর নানার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা শাহ মোহাম্মদ ইয়াছিন (রহ.) ছিলেন ফুরফুরা শরীফের মাওলানা আবু বক্কর সিদ্দিকী (রহ.)-এর সুযোগ্য খলিফা। তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী শৈশবে পিতৃহারা এম. এ. মান্নান নানার বাড়িতে কৃতিত্বের সাথে মাদ্‌রাসার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করে কুমিল্লায় প্রখ্যাত মাওলানা আইয়ুব আলীর সান্নিধ্য লাভে সক্ষম হন। তিনি ইবতেদায়ী হতে কামিল পর্যন্ত ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন করেন। অত্র মাদ্‌রাসায় আরবী সাহিত্য, আরবী কাওয়ায়েদ, উসুলে ফিকহ, বাগালাত, মানতেক, ফারায়েজ, তাফসীর, হাদীস, দর্শন, সকল বিষয়ের তিনি পারদর্শী হয়ে উঠেন। পরবর্তীতে ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসায় বিশ্ব বরেণ্য ওস্তাদগণের কাছে ইলমে হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান অর্জন করেন। মাদ্‌রাসা শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি প্রথমে কিছু দিন ইসলামপুর মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করেন। পরবর্তীতে তিনি মজিদিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দেস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অল্প কিছুদিন পর তিনি উক্ত মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী হওয়ায় আরবী, ফার্সী উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন। তিনি বুখারী-মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসের কিতাবসমূহ অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় পাঠদান করাতেন। সেহাসিত্তার ওপর গভীর জ্ঞান থাকায় দেশের বড় বড় আলেম ওলামাদের সাথে বিভিন্ন ইলমি বিষয়ে আলোচনা করতেন। তিনি ঐতিহাসিক হাজিগঞ্জ বড় মসজিদের ইমামেরও দায়িত্ব পালন করেন এবং মাদ্‌রাসাতুস সালেকীনে হাদীসের শিক্ষা দান করেন।[৫৭২]

উম্মাহর কল্যাণ ও দুর্দশার অবদানের জন্য নিজেদের মধ্যকার এই অহেতুক বৈরিতা, আত্মঘাতী সংঘাত নিরসনের কোনো বিকল্প নেই। চাই সবার অবদানের স্বীকৃতি, চাই পরস্পর শ্রদ্ধা-সম্মান-মর্যাদার অভিব্যক্তির সংস্কৃতির আবাদ। এ ক্ষেত্রে মাওলানা এম. এ. মান্নান সরেজমিনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে গেছেন, আমরণ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি ফুরফুরা সিলিসিলার লোক ছিলেন, তার পিতা ও নানা ফুরফুরায় মুজাদ্দিদে জমান মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (রহ.)-এর খলিফা ছিলেন, তিনি নিজে ছারছীনার পীর মরহুম মাওলানা শাহ আবু জাফর মোহাম্মদ ছালেহ (রহ.)-এর বিশিষ্ট মুরিদ ছিলেন, এক বিশেষ আধ্যাত্মিক ঘরানার লোক হওয়া সত্ত্বেও তিনি সব ঘরানার আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখের সাথে নিবিড় সম্পর্ক রাখতেন, সব দরবারে ও খানকায় যেতেন, তাঁদেরকে দাওয়াত দিয়ে আনতেন, বিশেষভাবে মেহমানদারি করতেন। সবাইকে নিয়ে দ্বীনী সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায় অন্বেষণ করতেন। নিজ মতাদর্শে অটল-অবিচল থেকে অন্যের মতকে গুরুত্ব দিতেন, সকলের অবদানের স্বীকৃতি দিতেন। তিনি ছিলেন ঐক্যের প্রতীক। তাঁরাও তাঁকে মনে করতেন একান্ত আপনজন। তাঁদের কেউ কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে তাঁর শরণাপন্ন হতেন। তিনিও অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সে সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতেন। তিনি মুসলিম জাহানের ঐক্যের প্রচেষ্টা চালাতেন। ভাতৃঘাতী যুদ্ধের অবসানের লক্ষ্যে দূতের ভূমিকা পালন করতেন। আরব জাহানের রাজা-বাদশাহ, শীর্ষস্থানীয় নেতারা তাঁকে অত্যন্ত কাছের মানুষ, নিজের মানুষ, ঘনিষ্ঠ বন্ধু মনে করতেন। অনেকে তাঁকে বাংলাদেশ ও আরব জাহানের মধ্যকার সেতু বলেও আখ্যায়িত করতেন[৫৭৩]।

---

৫৭২ আবদুল আউয়াল ঠাকুর, ইতিহাস সৃষ্টিকারী এক মাওলানা, (দৈনিক ইনকিলাব : ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৮।
৫৭৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

Dhaka University Institutional Repository

চরিত্র বিশ্লেষণে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, তিনি বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বোধ-বিশ্বাস ও চেতনাকে শাণিতকরণে মুজাদ্দেদীয় ভূমিকা পালন করেছেন। তার সুগভীর ও সুদূরপ্রসারী চিন্তার কারণেই জাতীয় ইতিহাস ঐতিহ্য লালিত হতে পারার মতো বাস্তবতা এখনও বিরাজ করছে। প্রতিটি বিশ্লেষণেরই নানা দিক এবং যুক্তি রয়েছে এবং থাকতে পারে। মাওলানা এম এ মান্নানের আলোচনায় একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, ক্ষুদ্র স্বার্থের সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে সামগ্রিক কল্যাণের এক মহাবৃত্তে তিনি নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। সে কারণেই তিনি বিশ্বাসীদের চেতনায় অমরত্ব লাভ করেছেন[৫৭৪]।

মাওলানা এম. এ. মান্নান (রহ.) ছিলেন একজন দীর্ঘ হস্ত বিশিষ্ট উদারপ্রাণ ব্যক্তি। মাদ্রাসা এবং বিপদগ্রস্তদের জন্য তিনি একজন অকুণ্ঠ দাতা। শুধু দেশে নয়, বিদেশেও তার দানশীলতা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। দিল্লীর লাল কেল্লার নিকটে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবীর মাযার জিয়ারতে গিয়েছিলেন মাওলানা এম. এ. মান্নান (রহ.)। শাহ ওয়ালীউল্লাহর মাযার সংলগ্ন রয়েছে বহু সংখ্যক ওলী, কামেল ও বুজর্গের মাযার। ঐ মাযার জিয়ারতকালে মাযার সংলগ্ন মাদ্রাসা পরিদর্শনের সময় মাওলানা এম. এ. মান্নান (রহ.) কয়েকশ ডলার দান করেন, যদিও কুরআন-হাদীসে সফরের সময় দানশীলতার প্রতি তেমন উৎসাহ দেয়া হয় না[৫৭৫]।

মাওলানা এম.এ . মান্নান (রহ.) ছিলেন একজন খাটি রাসূল প্রেমিক। বহুবার হজ্জ পালন করেছেন। তার প্রচেষ্টায় পীর-মাশায়েখ আলেম-ওলামা, সরকারি কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন পেশার ৫ হাজার লোক বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও জেয়ারতে মদিনার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

দৈনিক ইনকিলাবের প্রতিষ্ঠাতা বর্ণাঢ্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী প্রবীণ রাজনীতিক আলহাজ এম. এ. মান্নান ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তাঁর অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী গাউছুল আযম কমপ্লেক্সের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে তাকে দাফন করা হয়।

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান (রহ.)-এর অবদান-

মাওলানা এম.এ . মান্নান (রহ.)-এর কর্মজীবন শুরু হয় শিক্ষকতার মাধ্যমে। শিক্ষকতা জীবনে তিনি মুহাদ্দিসরূপে টাইটেল ক্লাসে কখনো কখনো একাই সিহাহ সিত্তার পাঠদান করেছেন। ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া কামিল মাদ্রাসায় তিনি যখন হাদীস দারস দিতেন ছাত্ররা চাতক পাখির মতো পিন-পতন নিস্তব্ধতায় মনের গহীনে তার কথাগুলো গেঁথে নিতেন। তিনি তার দারসে ইমামদের বিভিন্ন মত ও তাঁদের দলিল সবিস্তার বর্ণনা করতেন, বিভিন্ন মতের মধ্যে যৌক্তিক সামঞ্জস্য তুলে ধরতেন। তিনি দেশ-বিদেশে লাখো মানুষের সাথে মেলামেশা করেছেন। কোনো নোট বই বা ডায়েরিতে তাদের নাম বা পরিচয় তাকে লিখে রাখতে হয়নি কখনো। কিন্তু তাদের নাম অনায়াসে বলে দিতে পারতেন। টেলিফোন নম্বর লিখে রাখতে হয়নি তাঁকে, কিন্তু কী দেশে, কী বিদেশে দিন-রাত টেলিফোন করতে থাকতেন তিনি। কত হাজার নাম্বার স্মৃতিতে তাঁর আল্লাহই তা ভালো জানেন।[৫৭৬]

কর্মজীবনে মুহাদ্দিস ও প্রিন্সিপাল হিসেবে তিনি বিপুল সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে রাজনীতিতে যোগ দেন এবং ফরিদগঞ্জ-হাজীগঞ্জ এলাকা থেকে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ঐ সালে তিনি প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা ও স্থানীয় সরকার বিষয়ক পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি নিযুক্ত হন এবং ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন।

---

৫৭৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

৫৭৫ এ.জেড.এম. শামসুল আলম, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান (রহ.), (দৈনিক ইনকিলাব : ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৭।

৫৭৬ রুহুল আমীন খান, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান (রহ.), (দৈনিক ইনকিলাব : ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ খ্রি.) পৃ. ৭।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি পাকিস্তান ইসলামী এডভাইজারি কাউন্সিলর সদস্য মনোনীত হন এবং ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন। ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিম লীগের পূর্ব পাকিস্তানের সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ তিনি শিক্ষা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ধর্মমন্ত্রী এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব সফলতার সাথে সম্পন্ন করেন। তিনি একজন দক্ষ সংগঠক ও সমাজসেবক ছিলেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে জমিয়তুল মোদাররেসীনের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে এই সনংগঠনটিকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়েছেন। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে বেসরকারি মাদারাসা শিক্ষা সমিতি (জমিয়তুল মোদাররেসীন) বেসরকারি স্কুল শিক্ষক সমিতি, বেসরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতি এবং সরকারি মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতি এবং সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতির সমন্বয়ে শিক্ষক সমিতির ফেডারেশন গঠন করেছিলেন। তার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষক সমাজের প্লাটফর্ম থেকে শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দাবি-দাওয়া তথা তাদের আর্থিক নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য পরিচালিত হয়েছিল নিয়মতান্ত্রিক দুর্বার আন্দোলন। এর ফলশ্রুতিতে ক্রমান্বয়ে প্রবর্তিত হয় বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য বেতন স্কেল, বাড়ি ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা, অবসর ভাতা, উৎসব বোনাস প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধা। পর্যায়ক্রমে বেসরকারি শিক্ষকরা এখন যে শতভাগ বেতন পাচ্ছেন এটা মূলত মাওলানা এম এ মান্নানের অবদানের সুস্পষ্ট উদাহরণ।[৫৭৭]

মাওলানা এম. এ. মান্নান ছাত্রজীবনে ভালো ছাত্র ছিলেন। তাঁর জ্ঞানের ভিত্তি ছিল খুব মজবুত। শিক্ষকতা জীবনে তিনি ইসলামি বিষয়সমূহের বড় বড় কিতাব পড়িয়েছেন। গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্টে দক্ষতার সাথে পাঠদান করেছেন। শিক্ষকতা জীবনে মুহাদ্দিস ও প্রিন্সিপাল হিসেবে তিনি তিনি বিপুল সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। যখন শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়েছেন তখনও কিতাবের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। বই-কিতাব পড়েছেন। শিক্ষকরূপে মসজিদে বয়ান করেছেন। ইল্‌ম তাজা রেখেছেন। মসজিদে গাউসুল আজমে জুমার পূর্বে অথবা অন্যান্য ধর্মীয় বিশেষ দিবস বা রজনীতে বয়ান করেছেন। সেগুলো লিপিবদ্ধ করে পত্রিকায় নিবন্ধ আকারে প্রকাশ পেয়েছে। গ্রন্থাকারে পাঠকের হাতে গেছে। বিষয়বস্তুর চমৎকারিত্ব ও বর্ণনা শৈলী থেকে ধারণাই হতো না যে এটি কোনো রাজনৈতিক সংগঠক ও ব্যস্ততম সমাজনেতার বক্তব্য। মনে হতো এ যেন ষোলআনা পেশাদার একজন শিক্ষক-আলেমের তাজা পড়াশোনার ফসল। একাডেমিক বিষয়বস্তু দিয়েও তিনি আলেম ও তালিবে ইলমের সান্নিধ্যে এমন সব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেন যা থেকে মনে হতো যে তিনি শিক্ষাঙ্গনেই কর্মরত একজন প্রবীণ শিক্ষাবিদ। তাঁর জীবনের শেষ বয়ানেও শ্রোতারা তাফসীর শাস্ত্রের একটি জটিল বিষয়ের আলোচনা প্রাণবন্ত উপস্থাপনা থেকে উপকৃত হয়েছিলেন। তিনি সেদিন পবিত্র কুরআনের ষোল পারার তিনটি রুকুর তাফসীর বর্ণনা করেন। সাংবাদিকতা, সংবাদসূত্র বা তথ্য অনুসন্ধানের দর্শনের ওপর তিনি নবী করীম (সা.)-এর মৌলিক কর্মনীতিও পবিত্র কুরআনের আলোকে বর্ণনা করেছিলেন। সম্ভবত এটি তার জীবনের শেষ সমাবেশ ও শেষ বক্তৃতা ছিল।[৫৭৮]

মাওলানা এম. এ. মান্নান (রহ.) আরবী ভাষায় অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সাবলীল ভঙ্গিতে আরব দেশীয়দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে পারতেন। শুধু সাধারণ আরব নয়, আরব দেশীয় রাজা-বাদশাহ, মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্কের একটি প্রধান কারণ হলো -

---

৫৭৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

৫৭৮ উবায়দুর রহমান খান নদভী, মাওলানা এম.এ. মান্নান : জাগরণের অনন্ত প্রেরণা, (দৈনিক ইনকিলাব : ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৮।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা এম. এ. মান্নান (রহ.)-এর উন্নত আরবী ভাষাজ্ঞান। আরবীতে পারদর্শিতার জন্য তার পক্ষে তাফসির এবং হাদীস শাস্ত্রে গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী হওয়া সহজ হয়েছে। তিনি সিহাহ-সিত্তার উপরে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে দেশের সেরা হাদীস বিশেষজ্ঞের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন।[৫৭৯]

আরবী একটি কঠিন ভাষা। এর ব্যাকরণও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। মাদ্রাসায় তা ভালোভাবে পড়তে হয় ও পড়াতে হয়। একজন মুহাক্কিক আলেমেদ্বীন হয়ে এ ভাষা তিনি জানবেন, বুঝবেন তা স্বাভাবিক। অনেক আলেমই এ ভাষা জানলেও এ ভাষায় বক্তৃতা করতে পারেন না। আটলান্টিকের বেলাভূমি থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত যে আরবজাহান বিস্তৃত তার স্থানীয় ভাষার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে, পার্থক্য আছে ক্লাসিক্যাল আরবী ও আধুনিক আরবীর মধ্যে। আর বিভিন্ন আরব দেশের দেহাতী আরবীয়ের মধ্যে পার্থক্য তো নদীয়া শান্তিপুরের, বাংলার চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা বাংলার চেয়েও বেশি। মাওলানা এম. এ. মান্নান ব্যাপকভাবে আরবজাহান সফর করেছেন, রাজা-বাদশাহ থেকে যাযাবর বেদুঈনদের সাথেও মিশেছেন, কথাবার্তা বলেছেন, মতবিনিময় করেছেন, আলাপচারিতায় অংশ নিয়েছেন, কিন্তু দোভাষীর সহায়তায় নিতে হয়নি কখনো। তিনি কী করে যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাদের কলবিকল ল্যাঙ্গুয়েজ আয়ত্ত করে ফেলতেন আর অবলীলাক্রমে তা ব্যবহার করতেন। ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত, ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন, মিশরের প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারক, লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফী, আরব আমিরাতের শেখ জায়েদ, জর্দানের বাদশাহ হোসেন, সাউদি আরবের বাদশাহ খালেদ, পাকিস্তানের নওয়াজ শরিফের সাথে মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করতেন। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সেতুবন্ধনে তার ভূমিকা সত্যিই প্রশংসনীয়।

শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষা কারিকুলাম ও সিলেবাস উন্নয়ন, ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পাশাপাশি তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হাজার হাজার দ্বীনী প্রতিষ্ঠান।[৫৮০]

মাওলানা এম. এ. মান্নান (রহ.)-এর পৈতৃক গ্রাম ইসলামপুরের পূর্ব নাম ছিল দেবীপুর। তাঁরই প্রচেষ্টায় দেবীপুর নাম পরিবর্তিত হয়ে নতুন নামকরণ হয় ইসলামপুর। ইসলামপুর আলিয়া মাদ্রাসার পুনঃসংস্কার করেন তিনি। ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ইসলামপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত আলিয়া মাদ্রাসাটি উন্নয়নে মাওলানা মান্নান (রহ.)-এর ব্যক্তিগত আগ্রহ ও উদ্যোগ স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মাদ্রাসার জন্য তাঁর পৈতৃক জমি এবং পৈতৃক ভবনও দান করেন। ভবনটি মাদ্রাসার অতিথি ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আঙ্গিনায় রয়েছে তাঁর পিতা মাওলানা ইয়াসিনের কবর। মাওলানা আব্দুল মান্নান (রহ.)-এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুস সালাম। মাদাসার সংলগ্ন মসজিদ উন্নয়নেও মাওলানা আব্দুল মান্নান (রহ.) গভীর উৎসাহ নেন। মাওলানা আব্দুল মান্নান (রহ.)-এর পিতা শাহ ইয়াসিন (রহ.) ছিলেন একজন আলেম ও বুজর্গ। মাওলানা আব্দুল মান্নাহ (রহ.)-এর মাতুলালয় ছিল ইসলামপুর উপজেলার কেরওয়া পল্লীতে। তাঁর মাতামহ ছিলেন শাহ সুফী আব্দুল মজিদ (রহ.)। ইসলামপুর আলিয়া মাদ্রাসার নামকরণ করা হয়েছে মাওলানা আব্দুল মান্নান (রহ.)-এর মাতামহ শাহ সুফী আব্দুল মজিদের নামে।

---

৫৭৯ এ.জেড,এম. শামসুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

৫৮০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

Dhaka University Institutional Repository

ফরিদগঞ্জের ইসলামপুর মাজিদিয়া আলিয়া মাদ্রাসাকে কামিল স্তরে উন্নীতকরণ এবং ব্যাপক উন্নয়নে মাওলানা আব্দুল মান্নান (রহ.)-এর বিরাট অবদান ভূমিকা রয়েছে।[৫৮১]

অধিকাংশ আলিয়া মাদ্রাসার ছোট বড় পুকুর থাকে। ইসলামপুর মাদ্রাসার সম্মুখে তিনি খনন করান বিরাট পুকুর। নির্মাণ করেন দীর্ঘস্থায়ী ঘাট। পুকুরে মৎস্য্য চাষ করে আয় বৃদ্ধিতে তিনি উৎসাহ দান করতেন। ফরিদগঞ্জ ও ইসলামপুর মাদ্রাসায় বহু নারিকেল গাছ লাগিয়ে মাদ্রাসার অর্থায়নের ব্যবস্থা করেন। ইসলামপুর আলিয়া মাদ্রাসার বহুমুখী উন্নয়নে মাওলানা আব্দুল মান্নান (রহ.)-এর অবদান ছিল ব্যাপক। তিনি মাদ্রাসার জন্য সরকার থেকে অনুমোদনের ব্যবস্থা করেন। মাদ্রাসা ভবনের কয়েকটি কক্ষ সোনালী ব্যাংকের ব্রাঞ্চ খোলার জন্য ভাড়া দিয়ে মাদ্রাসার স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করেন।[৫৮২]

মাওলানা এম এ মান্নানের আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় ইসলাপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় বিরাট ইসলামী মিশন। এর পরিচালনায় রয়েছে ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। এর জন্য ভূমি ও অর্থ সংগ্রহে বিশেষ অবদান রেখেছেন মাওলান আব্দুল মান্নান (রহ.)।[৫৮৩]

মুসলমানদের অধিকার আদায়ে মাওলানা এম. এ. মান্নান : ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভারতবর্ষে মুসলিম শক্তি নিধনে তারা মুসলমানদের শিক্ষা বঞ্চিত করাকে প্রথম হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছিল। সে কারণে ব্রিটিশ দখলকৃত ভারতের হিন্দুদের ক্রমাগত দাবি ও কোম্পানি সরকারের শোষণনীতি বাস্তবায়নে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে ফার্সীর বদলে অফিস-আদালতে ইংরেজি ভাষার প্রচলন করা হয়। এরপর উচ্চ পর্যায়ে ওকালতি ও মুনসেফগিরি পরীক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজিকে চালু করা হয়। অন্যদিকে শাসকশ্রেণি ও তাদের লালিত চাটুকার শ্রেণির নেতৃত্বে যে ইংরেজি শিক্ষা করা হয়েছিল সেখানে মুসলমান ছাত্রদের প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। যার ফলে রাষ্ট্র সমাজ ও প্রশাসনের গুরুত্ব স্তর থেকে ভারতবর্ষের মুসলমানরা ছিটকে পড়েছিল। ফলত উনবীংশ শতাব্দীর বাংলায় জনবিচ্ছিন্ন হয়ে সমাজদেহে নতুন যে শ্রেণির জন্ম হয়েছিল, সংস্কৃতির বিচারে কেউ তাদের পাশ্চাত্যের শিক্ষিত শ্রেণি ও বাবু শ্রেণি বললেও প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল শোষক শ্রেণির তাঁবেদার গোষ্ঠী। বলার অপেক্ষা রাখে না, মেকলে প্রবর্তিত চুইয়ে পড়া শিক্ষানীতির প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এ নতুন শ্রেণি উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল। মাওলানা এম.এ. মান্নান (রহ.) এ সকল শ্রেণির বিরুদ্ধে এবং মুসলমানদের প্রকৃত অধিকার আদায়ে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন।[৫৮৪]

ঐতিহ্যবাহী গাউছুল আজম মসজিদ নির্মাণ : বাংলাদেশে সর্বত্র মসজিদ নির্মাণে উৎসাহ প্রদান, অর্থ সংগ্রহে বৃদ্ধি, পরামর্শ ও অন্যান্য বিষয়ে সদা সক্রিয় সহায়তা দান মাওলানা আব্দুল মান্নান (রহ.)-এর একটি সহজাত প্রবণতা। মসজিদ স্থাপনে বা সম্প্রসারণে সহায়তা করা মাওলানা আব্দুল মান্নান ব্যক্তিগত কাজের মতোই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। ইসলামপুর মসজিদ স্থাপনে মাওলানা আব্দুল মান্নান ছিলেন অতি উৎসাহী। তার হাত অবারিত। হৃদয় ছিল উদার। ঢাকা শহরে গাউছুল আজম মসজিদ মাওলানা আব্দুল মান্নান (রহ.)-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই মনোরম সুরম্য গাউসুল আজম মসজিদটি স্থাপত্যকলা এর অপরূপ নিদর্শন। এর জন্য অর্থ সংগ্রহ করা, জমি বরাদ্দ ও নকশা প্রণয়ন

---

[৫৮১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।
[৫৮২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।
[৫৮৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।
[৫৮৪] আব্দুল আউয়াল ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

Dhaka University Institutional Repository

এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে মাওলানা মান্নান (রহ.)-এর মেধা ও প্রজ্ঞা নিয়োজিত হয়েছিল। গাউসুল আজম মসজিদটি শুধু মসজিদই নয়, স্থাপত্য কর্ম হিসেবে বহু শতাব্দী পর্যন্ত স্মরণীয় হয়ে থাকবে।[৫৮৫]

আধ্যাত্মিকতা : মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান (রহ.)-এর আর একটি দিক আধ্যাত্মিকতা সে সম্পর্কে তাঁকে নিয়ে লেখা একটি কবিতার কয়েকটি চরণের উদ্ধৃতির মাধ্যমে তাঁর আধ্যাত্মিকতার উচ্চতা পরিমাপ করা যায়-

কখনো কাবার পাশে, রাসূলের রওজা মোবারকে
বাগদাদে, কারবালায়, কখনো আজমীরে দেখি তাঁকে
দেখি পীর-মুর্শিদের দরবারে খানকায়
মাদ্রাসায়, মসজিদে, কভু দেখি ধ্যানমগ্ন, আত্মলীন মহাতপস্যায়
বেখুদীতে গরক, কভু পানে মত্ত ইশকের জাম
মাওলানা আবদুল মান্নান এক অতি উচ্চ অধ্যাত্মিক সাধকের নাম।[৫৮৬]

রাজনৈতিক সাফল্য : ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে রাজনীতিতে যোগ দেন এবং ফরিদগঞ্জ-হাজীগঞ্জ এলাকা থেকে সাবেক পূর্বপাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ঐ সালে তিনি প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা ও স্থানীয় সরকার বিষয়ক পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি নিযুক্ত হন এবং ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি পাকিস্তান ইসলামী এডভাইজারি কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন এবং '৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন। '৬৫ থেকে '৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিম লীগের পূর্ব পাকিস্তানের সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশে '৭৯ খ্রিস্টাব্দে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। '৮১ খ্রিস্টাব্দে তিনি শিক্ষা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ধর্মমন্ত্রী এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব সফলতার সাথে সম্পন্ন করেন। তিনি একজন দক্ষ সংগঠক ও সমাজসেবক ছিলেন। '৭৬ খ্রিস্টাব্দে জমিয়তুল মোদাররেসীনের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে এই সনংগঠনটিকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়েছেন। '৭৮ খ্রিস্টাব্দে বেসরকারি মাদারাসা শিক্ষা সমিতি (জমিয়তুল মোদাররেসীন) বেসরকারি স্কুল শিক্ষক সমিতি, বেসরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতি এবং সরকারি মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতি এবং সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতির সমন্বয়ে শিক্ষক সমিতির ফেডারেশন গঠন করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষক সমাজের প্লাটফর্ম থেকে শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দাবি-দাওয়া তথা তাদের আর্থিক নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য পরিচালিত হয়েছিল নিয়মতান্ত্রিক দুর্বার আন্দোলন। এর ফলশ্রুতিতে ক্রমান্বয়ে প্রবর্তিত হয় বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য বেতন স্কেল, বাড়ি ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা, অবসর ভাতা, উৎসব বোনাস প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধা। পর্যায়ক্রমে বেসরকারি শিক্ষকরা এখন যে শতভাগ বেতন পাচ্ছেন এটা মূলত মাওলানা এম এ মান্নানের অবদানের সুস্পষ্ট উদাহরণ।

জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা : জাতীয় ঐক্য-সংহতি ও ইসলামী উম্মাহর চেতনা সুরক্ষায় মাওলানা এম.এ. মান্নান (রহ.) নানা মত ও পথের নেতাদের মাঝে অপূর্ব সমন্বয় সাধনের চৌম্বকীয় ক্ষমতা রাখতেন। বাংলাদেশের আলেম সমাজ নানা বিষয়ে বৃহৎ ঐক্যমতে যতবারই পৌঁছেছেন এর পিছনে মাওলানা এম.এ. মান্নানের ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়। শত বিরোধ ও বিভক্তি নিয়েও বিভিন্ন চিন্তার নেতারা তার ডাকে এক টেবিলে বসতেন। তার যুক্তি ও বুদ্ধিদীপ্ত কথা শুনে সহনশীলতা এবং

---

[৫৮৫] এ.জেড.এম. শামসুল আলম, প্রাগুক্ত, ৭।
[৫৮৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

Dhaka University Institutional Repository

উদারতায় বৃত্তে এক হতেন। তারই তাকে সর্বস্তরে পীর-মাশায়েখ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিপুলভাবে সাড়া দেন।

ইনকিলাব প্রতিষ্ঠা : মুসলিম সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সাংবাদিকতার ময়দানে ইনকিলাব বা বিপ্লব সৃষ্টি করার জন্য ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা এম.এ. মান্নান প্রতিষ্ঠা করেন জনগণনন্দিত পত্রিকা দৈনিক ইনকিলাব। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে ইসলামী তাহযীব তামাদ্দুন শিক্ষা সংস্কৃতি ও মাদ্রাসা শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতায় অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এই ইনকিলাব ইসলামের ওপর যখনই আঘাত এসেছে তখনই ইনকিলাব তার ইনকিলাবি ভূমিকা রেখেছে।

সমাজ সেবক : মাওলানা এম.এ. মান্নান (রহ.) সমাজে ইসলামী চিন্তা চেতনার বিকাশ মুসলিম সমাজের ঐক্য প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি জনগনের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে চাঁদপুর থেকে লক্ষ্মীপুর মহাসড়ক, ফরিদগঞ্জে বেইলী ব্রিজ, ডাকাতিয়া নদীর পাড়ে দীর্ঘ বাঁধ দিয়ে চাষাবাদের ব্যবস্থাসহ বহুমূখী অবদান তিনি রেখেছেন।[৫৮৭]

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মন্তব্য-

১. **মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী** তিনি বলেন, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান (রহ.) ইন্তেকালের পর থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে শূন্যতা বিরাজ করছে তা সহসা পূরণ হওয়ার নয়। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও লক্ষ্যভেদী রাজনীতির ফলে অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবন-মানের সন্ধান পাওয়া মাদ্রাসা শিক্ষক সমাজে দৈনন্দিন জীবনে যেমন- মাওলানা আবদুল মান্নান (রহ.)-এর অবদানের কথা স্মরণে এনে দেয়, ঠিক তেমনি তাঁর এ ধারার অসংখ্য কাজে সুফল ছড়াতে থাকে সুকর্মের অপার সুরভিতে। মসজিদ নগরী ঢাকার মহাখালীতে জমিয়তুল মোদাররেসীন ও মসজিদে গাউসুল আজম কমপ্লেক্সের অপূর্ব নির্মাণশৈলী আর নয়নাভিরাম স্থাপত্য যুগযুগ ধরে ঘোষণা করবে মাওলানা এম. এ. মান্নান (রহ.)-এর জীবন সাধনার শ্রেষ্ঠত্ব। মাওলানা আবদুল মান্নান (রহ.) দৈনিক ইনকিলাব প্রকাশনার তিন দশকের আজকের বহু দৈনিক তাদের কাগজের প্রচারণার অন্যতম উপাদান হিসেবে সমর্থন করছি। মাওলানা আবদুল মান্নান (রহ.)-এর অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য বলেই তিনি অমর হয়ে আছেন।[৫৮৮]

২. **মাওলানা রুহুল আমিন খান** তিনি বলেন, সত্যিই মাওলানা এম. এ. মান্নান এক কালজয়ী পুরুষের নাম। দৈনিক ইনকিলাবের প্রতিষ্ঠাতা, বাংলাদেশ জমিয়তুল মোদাররেসীনের নব রূপকার, মসজিদে গাউসুল আজম ও জমিয়তুল মোদাররেসীন কমপ্লেক্সের স্থাপত্য-স্থপতি, অসংখ্য দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক, সাবেক ধর্ম ও ত্রাণমন্ত্রী, এমপি আলহাজ্ব মাওলানা এম. এ. মান্নান এক মহান কর্মবীর, এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁকে কখনো ভোলা যায় না। তাঁর জীবন পর্যালোচনা করতে গিয়ে যেমন মনে পড়ে, তেমনি মনে পড়ে দেশ জাতির নানা সংকট সম্ভাবনার সময়ে। হরিষ-বিষাদে, আনন্দ-বেদনায়, বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বারবার উচ্চারিত হয় তাঁর নাম। মনের পর্দায় ভেসে উঠে তাঁর উজ্জ্বল কান্তি ও প্রশান্ত মুখচ্ছবি। এক সাধারণ পরিবেশ থেকে উঠে এসে তিনি রেখে গেছেন অসাধারণ কীর্তি। মেধা, প্রতিভা, সৃজনশীলতা,

---

[৫৮৭] আবদুল আউয়াল ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।
[৫৮৮] সাক্ষাতকার : তারিখ : ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকুশলতা, দুর্দমনীয় মনোবল, কর্মনিষ্ঠা ও অধ্যবসার দ্বারা তিনি অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে। কালের পাতায় রেখে গেছেন চিরস্মরণীয় কীর্তি ও স্মৃতি। ঈমানদার, সৎকর্মশীল সাহসী বান্দার মৃত্যু নেই। দৈহিক মৃত্যু হলেও আখেরাতে বিশ্বাসী কর্মবীরদের জীবনের শেষ নেই।[৫৮৯]

৩. **মাওলানা শাব্বীর আহমদ মমতাজী** মহাসচিব, জমিয়তুল মুদাররেসীন বাংলাদেশ, তিনি বলেন, আমি বিভিন্ন সভা-সমাবেশে বলে থাকি মাওলানা এম. এ. মান্নান (রহ.)-এর জন্ম না হলে মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাস অন্যরকম হতো। সত্যিই তাই। তাঁর সুদূর প্রসারী চিন্তার ফসল আজকের পুনর্গঠিত জমিয়তুল মোদাররেসীন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে নব উদ্যোগকে দেশের বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের অরাজনৈতিক বৃহত্তর প্ল্যাটফর্ম তিলে তিলে আজকের অবস্থানে এসেছে। এর একমাত্র কৃতিত্বের দাবিদার হলেন তিনি। তিনি অনুভব করেছিলেন অবহেলিত ও বঞ্চিত এ সমাজকে বঞ্চনা ও অবহেলা থেকে মুক্ত করে সমাজ ও দেশ উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে এবং আগত আলেম সমাজকে কুরআন, হাদীস, ফিকহ, তাসাউফ শিক্ষার সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী করে গড়ে তুলতে হবে। সে লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে তিনি দেশের সেরা আলেম-উলামা, পীর মাশায়েখদের নিয়ে বড় বড় সম্মেলন সভা-সেমিনার করেছেন এবং মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যক্রমে আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন। তাঁরই ধারাবাহিকতায় আজকে মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীগণ কুরআন, হাদীস, আরবী, ফিকহ, আকায়েদ, ইসলামের ইতিহাস, তাসাউফসহ ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথে তথ্যপ্রযুক্তি, বিজ্ঞান, পৌরনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনা শিক্ষাসহ সকল বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীগণ নীতি নৈতিকতার সাথে দেশ ও সমাজ উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছেন। যে কাজ সম্পাদন করা ও সাফল্য অর্জন করা লক্ষ লক্ষ পাশ্চাত্য শিক্ষিত ইসলামী চেতনা সম্পন্নদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, সে কাজ মাওলানা এম.এ মান্নান কৃতিত্বে সাথে স্বাক্ষর রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান দান করুন।[৫৯০]

---

[৫৮৯] সাক্ষাতকার : তারিখ : ১৫ মার্চ ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ।

[৫৯০] সাক্ষাতকার : তারিখ : ১১ এপ্রিল ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-৩.৩ : মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ্ (রহ.) (১৯০৮-১৯৯৬ খ্রি.)

যে সকল আলেমে দ্বীন ইলমে হাদীসের বিশাল ভাণ্ডারের ধারক-বাহক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং আরবী ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার-প্রচারে অবদান রাখেন তাঁদের স্বীয় দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেন, সে সকল মাকবুল বান্দাগণের মধ্যে মাওলানা হেদায়াত উল্লাহ্ (রহ.) ওরফে মুহাদ্দিস সাহেব হুযূর ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ। তিনি সকল আলেমগণের নিকট মুহাদ্দিস হুযুর নামেই পরিচিতি লাভ করেন। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি ইলমে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করেন। মানব জীবনে ইল্‌মে দ্বীনের প্রচার-প্রসারে ও তার যথার্থ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক বিশাল ব্যক্তিত্ব।

মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহ.) ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে চাঁদপুর জেলার মু'মিনপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ঐতিহ্যবাহী আলেম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জনাব মুবারক উল্লাহ ও মাতার নাম হাসনা বানু। তাঁরা ছিলেন চার ভাই, তিন বোন। ভাইয়েরা হলেন- মাওলানা মুহাম্মদ হাবীব উল্লাহ, মাওলানা মুহাম্মদ সফীউল্লাহ্, মাওলানা ছিদ্দীকুল্লাহ্ ও মাওলানা সা'দউল্লাহ।[৫৯১]

ইল্‌মী আমলী ঐতিহ্যের অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় তিনি ইলমের অনাবিল পরিবেশে বড় হন। ফলে তাঁর শুভ্র কচি হৃদয়ে ইলমের প্রতি নিবিড় মহব্বত জন্মেছিল। শৈশবে পিতা মুন্সি মুবারকুল্লাহ (রহ.) ও তাঁর ভাইদের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। কুরআনের বিশুদ্ধ তেলাওয়াতসহ বিভিন্ন বিষয়ের প্রাথমিক ইল্‌ম তাঁদের থেকেই শিক্ষা লাভ করেন। অবশ্য পার্শ্ববর্তী গ্রাম চান্দ্রার মাওলানা আসলাম সাহেবের নিকট আরবী, উর্দূ-ফার্সীসহ বেশ কিছু বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করেন।

তদানীন্তন বাংলার হাতেগোনা যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ইলমে দ্বীন তথা আরবী ও ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র রূপে বিবেচিত হত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার প্রাণ-কেন্দ্রে অবস্থিত জামিয়া ইউনুসিয়া ছিল সেগুলোর অন্যতম। মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহ.)-এর ভাই মাওলানা সফিউল্লাহ (রহ.) ছিলেন অত্র মাদ্‌রাসারই একজন খ্যাতিমান ওস্তাদ। দশ বছর বয়সে তখন ইল্‌ম অর্জনের লক্ষ্যে তাঁর ভাই তাকে অত্র মাদ্‌রাসায় ভর্তি করেন। তখন মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.) এবং হাফেজ্জী হুযুর(রহ.) অত্র জামিয়া ইউনুসিয়ার শিক্ষক ছিলেন। বালক হেদায়েতুল্লাহ অসাধারণ মেধা ,অনুপম আদব আখলাক ও লেখাপড়ার প্রতি অপারিসীম মনোযোগ ও পরম একাগ্রতার মাধ্যমে অতি অল্প সময়েই সকল উস্তাদের পরম স্নেহভাজন হয়ে উঠেন। তাই সকল ওস্তাদগণ তাকে পূর্ণ শ্রম ও ভালোবাসা দিয়ে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন। মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহ.)-এর বড় ভাই ছিলেন নাহু-সরফের অনেক বড় আলেম, মাওলানা সফিউল্লাহ ও মাওলানা শামসুল হক (রহ.) প্রমুখের একান্ত তত্ত্বাবধানে সুদীর্ঘ আট বছর জামিয়া ইউনুসিয়ায় পড়ালেখা করেন। এ সময় অত্যন্ত সফলতার সাথে তিনি উর্দু ফার্সি, আরবী সাহিত্য, নাহু-সরফ, ফিকহ, তাফসীর, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, বালাগাত প্রভৃতি ইলমের বুৎপত্তি অর্জন করেন। জামিয়া ইউনুসিয়ায় সমকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের নিকট কঠোর অধ্যাবসায় নিরবচ্ছিন্নভাবে ইলমে দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জনে নিমগ্ন থাকেন। জামায়াতে জালালাইন পর্যন্ত তিনি উক্ত মাদ্‌রাসায় লেখাপড়া করেন। ১৩৫০ হিজরি সনে তিনি জামায়াতে জালালাইনে ভর্তি হন। উক্ত বছরের মাঝের দিকে মাওলানা শামসুল হক (রহ.) হাফেজ্জী হুযূর (রহ.) ও পীরজী হুযুর (রহ.) ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্‌রাসা থেকে চলে আসেন এবং খুলনা গজালিয়ায় গিয়ে দাওয়ারে হাদীস

---

[৫৯১] হিফজুর রহমান, মাশায়েখে কুমিল্লা, প্রাগুক্ত, পৃ.১

Dhaka University Institutional Repository

পর্যন্ত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাওলানা হেদায়তুল্লাহ (রহ.) গজালিয়া ভর্তি হয়ে উক্ত শিক্ষাবর্ষের শেষ পর্যন্ত লেখাপড়া করেন।[৫৯২]

উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি ১৩৫১ হিজরিতে ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং ১৩৫৭ হিজরি পর্যন্ত সুদীর্ঘ ছয় বছর দারুল উলূম দেওবন্দে অধ্যয়ন করেন। এ সময় তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের উলামায়ে কেরামের একান্ত তত্ত্বাবধানে সুদীর্ঘ ছয় বছর উলূমুল হাদীসসহ ,ইলমে দ্বীনের প্রতিটি বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন ।

মাওলানা হেদায়েতুল্লা (রহ.) দাওরায়ে হাদীসের ক্লাসে পৌছার পূর্বেই কুতুবে সিত্তার ৬টি কিতাব অধ্যয়ন করেন। এরপর নিয়মতান্ত্রিকভাবে দাওরায়ে হাদীসের ক্লাস দুবার পড়েন। এভাবে তিনি ইলমে হাদীসের মযবুত জ্ঞানের গভীরতা লাভ করেন।[৫৯৩]

মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহ.) ওস্তাদগণের তাকরীর (ক্লাসের প্রদত্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ) হুবহু লিখে ফেলাতেন। মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.)-এর কাছে তিনি মাকামাতে হারীরী অধ্যয়ন করেন। মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) যে তাকরীর করতেন তিনি তা সাথে সাথে লিখে নিতেন। দেওয়ানে মুতানাব্বি পড়েন শায়খুল আদব এযায আলী (রহ.)-এর কাছে। হাদীসের ক্লাস শেষ হলে তিনি একা বসে পুরো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ধারাবাহিকভাবে হুবহু লিখে নিতেন। সামান্যতম ব্যতিক্রম হত না।[৫৯৪]

দারুল উলূম দেওবন্দে ওস্তাদদের তত্ত্বাবধানে মাঝে মাঝে সকল ছাত্রদেরকে নিয়ে আরবী বক্তৃতার অনুষ্ঠান হত। এক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে ওস্তাদগণ বাংলাদেশীদের মধ্য থেকে কাউকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আহ্বান করলেন। বাংলাদেশী কেউ সাহস করেনি। সকলেই নিরব। এর মাঝে হঠাৎ মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহ.) দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় আরবী বক্তৃতা দিলেন। এতে সবাই বিস্মিত হলো।

দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁর ওস্তাদ শায়খুল আদব মাওলানা ইযায আলী (রহ.) তাকে লক্ষ্য করে বলেন ,"স্বভাবত মনে ব্যথা লাগে যে আপনি দেওবন্দ থেকে দীর্ঘ সময়ের জন্য বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন । কিন্তু বিবেকের দিক দিয়ে এ ভেবে আনন্দ লাগছে যে ,আপনি ইসলামী বিশ্বে ইসলাম প্রচার করার ও দ্বীনী ইল্‌ম বিস্তার করার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। আপনি নিজ কর্ম পদ্ধতির মাধ্যমে লোকদেরকে সহীহ পথ দেখাতে পারবেন। সহীহ নিয়তের সাথে ইলমে দ্বীনের প্রচার করতে থাকুন। আল্লাহ তা'আলা আপনার সকল প্রয়োজন পূর্ণ করবেন।

দীর্ঘ ছয় বছর দেওবন্দের শিক্ষাজীবন শেষে মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহ.) জাহেরী ও বাতেনী উভয় ইলমের নূরে উদ্ভাসিত হয়ে এবং একজন কামিল মুমিনের গুণাবলী অর্জন করে স্বদেশের উদ্দেশ্যে বিদায়কালে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর নিকট সীরাতে মুস্তাকীমের ওপর অটল থাকার দু'আ নিয়ে ১৩৫৮ হিজরিতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

তিনি দেওবন্দে উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করে দেশে এসে লক্ষীপুর জেলার রায়পুর উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত আলেম পরিবারে বিবাহ করেন। মাওলানা মুহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর ছিলেন তাঁর স্ত্রীর বৈমাত্রেয় ভাই। ইন্তেকালের সময় তিনি তিন পুত্র ও দুই কন্যা রেখে যান। ছেলেরা হলেন - হাফিয মাওলানা ফযলুর রহমান, হাফিয মাওলানা হিফযুর রহমান ও হাফিয ফরজুর রহমান। পুত্রগণ প্রত্যেকেই

---

[৫৯২] মাওলানা আহমাদুল্লাহ, হায়াতে মুহাদ্দিস ছাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি, (ঢাকা: মাকাতাবুল আশরাফ, ২০১৪খ্রি.), পৃ.৫৩।
[৫৯৩] প্রাগুপ্ত, পৃ. ৫৬।
[৫৯৪] প্রাগুপ্ত, পৃ. ১০।

Dhaka University Institutional Repository

হাফিয ও আলিম। জামাতাদ্বয়ও প্রখ্যাত আলেম ও মুহাদ্দিস।[৫৯৫] তাঁর উল্লেখযোগ্য ওস্তাদগণ হলেন, মুজাহিদে আজম আল্লামা শামছুল হক ফরিদ পুরী (রহ.), মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর (রহ.), মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব পীরজী হুযুর (রহ.) প্রমুখ। শায়খুল ইসলাম মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) শায়খুল আদব মাওলানা এযায আলী (রহ.), মাওলানা ইবরাহীম বলয়াভী (রহ.), মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ), মাওলানা মিয়া আসগর হোসাইন (রহ.), মাওলানা ইদ্রীস কান্ধলবী (রহ.), মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী (রহ.) প্রমূখ। শায়খুল ইসলাম মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর নিকট তিনি হাদীসের সকল কিতাবের পাঠদানের অনুমতি লাভ করেন।

মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহ.) সব সময় নিজেকে লুকিয়ে রাখা ছিল তাঁর স্বভাবগত অভ্যাস। একবার রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বড় বড় আলেমদেরকে দাওয়াত করলেন। সে তালিকায় তাঁর নামও ছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও রাষ্ট্রপতির প্রোগ্রামে নিতে পারেনি। এতো বড় আলেম হয়েও তাঁর মধ্যে কোনরূপ গর্ব বা অহংকার ছিল না।[৫৯৬] সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষের তিনি আপনজনের মতো কথাবার্তা বলতেন। বাংলার আনাচে-কানাচে পরোক্ষভাবে দ্বীনের আলো প্রজ্বলিত করেন।

ইলমে তাসাওউফের দুই মহান দিকপাল, মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.) ও হাফেজ্জী হুযুর (রহ.)-এর মাধ্যমে তিনি ইলমে মারেফাতের উঁচু মর্যাদা লাভ করেন।[৫৯৭] তাঁর প্রথম শায়েখ ছিল হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)। দ্বিতীয় শায়েখ মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী (রহ.) থেকে খেলাফত লাভ করেন। এরপর হাকীম মুহাম্মদ আখতার সাহেবের সাথে প্রত্যক্ষ ইসলাহী সম্পর্ক কায়েম করেন এবং হাকীম আখতার (রহ.) আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে খেলাফত প্রদান করেন।

মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহ.) ২২ মার্চ ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ শুক্রবার ইন্তেকাল করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়ে ছিল ৮৮ বছর। তাঁর জানাযার নামাজের ইমামতী করেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র হাফিয মাওলানা হিফযুর রহমান। অতঃপর তাঁকে তাঁর শেষ কর্মস্থল জামিয়া মাদানীয়া যাত্রাবাড়িতে দাফন করা হয়।[৫৯৮]

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ্ (রহ.)-এর অবদান-

দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে স্বদেশে ফিরে এসে কিছুদিন বাড়িতে অবস্থান করেন। ১৩৫৮ হিজরির ৮ই শাওয়াল হুসাইনিয়া আশরাফুল উলূম বড়কাটারা মাদ্রাসায় শিক্ষকতার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হলে তিনি অত্র মাদ্রাসার শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহ.)-কে অত্র মাদ্রাসায় পড়ানোর জন্য যে সকল কিতাব দেওয়া হয় তার বিবরণ তিনি মাওলানা জাফর আহমাদ উসমানী (রহ.) মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.), মাওলানা ইযায আলী (রহ.) ও অন্যান্য উস্তাদের নিকট পত্রের মাধ্যমে জানিয়ে ছিলেন এবং দু'আ প্রার্থনা করেন। পত্রের উত্তরে সকলেই খুশি

[৫৯৫] প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৪৩।
[৫৯৬] আল্লামা শাহ্ মহিব্বুর রহমান (রহ.) স্মারক গ্রন্থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩০।
[৫৯৭] মাওলানা আহমাদুল্লাহ, হায়াতে মুহাদ্দিস ছাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি, প্রাগুপ্ত, পৃ.১৩৫।
[৫৯৮] হিফজুর রহমান, মাশায়েখে কুমিল্লা, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশ করেন এবং দু'আ করেন। দীর্ঘ ১২ বছর পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সাথে আশরাফুল উলূম মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনায় দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে লালবাগ মাদ্‌রাসায় যোগদান করেন।[৫৯৯]

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহ্যবাহী জামেয়া কুরআনীয়া লালবাগ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অত্র মাদ্‌রাসার বিস্ময়কর সাফল্য ও বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জনের মূলে যে সব আলেমগণের, মেধা শ্রম ও দু'আ রয়েছে তাঁদের মধ্যে মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহ.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লালবাগ মাদ্‌রাসার স্বর্ণালী ইতিহাস রচনায় মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.), হাফেজ্জী হুযুর (রহ.), মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁন (রহ.), মাওলানা জাফর আহমাদ উসমানী (রহ.)-এর ভূমিকা যেমন ছিল তেমনি ভূমিকা ছিল মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহ.)-এর। যে সকল মনীষী বড়কাটারা আশরাফুল উলূম মাদ্‌রাসা থেকে এসে জামিয়া কুর'আনিয়া লালবাগ প্রতিষ্ঠা করেন, তাদের মধ্যে মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহ.) ছিলেন অন্যতম সদস্য। যিনি ছিলেন আরবী ও ইসলামী শিক্ষার সুপ্রসিদ্ধ প্রচারক ও প্রসারক। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অত্র মাদ্‌রাসায় হাদীসের দারস প্রদান করেন। তার ক্লাসে হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুনার জন্য বিভিন্ন মাদ্‌রাসা থেকে অসংখ্য তালেবে ইল্‌ম উপস্থিত হতো। মনোমুগ্ধকর পরিবেশে অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় তিনি হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতেন। ছাত্ররা অতি সহজে তাঁর হাদীসের ব্যাখ্যা বুঝে ফেলতেন। তিনি হাদীসের অনেক কঠিন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও অতি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করতে পারতেন। এভাবেই তিনি আরবী ও ইসলামের প্রচার-প্রসারে লালবাগ জামিয়া প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দীর্ঘ ৩৪ বছর পর্যন্ত আপন পরিবার পরিজন থেকেও অধিক আপন করে নেন অত্র মাদ্‌রাসাকে। গভীর মমতা, ভালোবাসা, ইখলাস, প্রখর মেধা, সঠিক সিদ্ধান্ত, অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে লালবাগ মাদ্‌রাসা তিনি তিলে তিলে গড়ে তোলেন। যা ইল্‌মী আমলী ও আখলাকী দিক দিয়ে বিশ্বের অন্যতম সেরা বিদ্যাপীঠ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[৬০০]

মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.) লালবাগ মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে প্রিন্সিপাল এবং জাতীয় পর্যায়ের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও অত্যন্ত কর্মব্যস্ত মানুষ ছিলেন। এজন্য মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহ.)-এর মাধ্যমেই তিনি জামিয়ার যাবতীয় কাজ পরিচালনা করেন এবং তাঁকে জামিয়ার ভবিষ্যৎ যোগ্য মুহতামিম হিসেবে গড়ে তোলেন।[৬০১]

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ২১ জানুয়ারি মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.) ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের পর মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহ.) প্রিন্সিপালের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপালের দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজ ব্যাপকভাবে চালিয়ে যান। বিশেষ করে ইলমে হাদীসের গভীর জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসারক তৈরিতে মনোনিবেশ করেন যাতে করে ইসলামের প্রচারক ও প্রসারক লালবাগ মাদ্‌রাসায় তৈরির জন্য পুরো বাংলাদেশে অবদান রাখার ব্যাপারে সহায়ক হয়।

মাওলানা হেদায়তুল্লাহ (রহ.) ইলমে হাদীসের খেদমতের লক্ষে যখন জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া যাত্রাবাড়িতে যখন আগমন করেন তখন যাত্রাবাড়ি মাদ্‌রাসাটি ছিল বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। কিন্তু তাঁর আগমনের ফলে ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে ধাবিত হয় এবং পড়াশোনার ক্ষেত্রে ঢাকার বিশিষ্ট মাদ্‌রাসা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমানে যাত্রাবাড়ি মাদ্‌রাসাটি শত সহস্র উলামা মাশায়েখ ও আশেকে নববীর কেন্দ্রীয় মারকায হিসেবে পরিচিত। যাত্রাবাড়ি মাদ্‌রাসার মুহতামিম

[৫৯৯] মাওলানা আহমাদুল্লাহ, হায়াতে মুহাদ্দিস ছাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি, প্রাগুপ্ত, পৃ.৭৫।

[৬০০] সাক্ষাৎকার, মাওলানা ক্বারী মুজাফফর সাহেব, ওস্তাদ, বড় কাটরা মাদ্‌রাসা,-২০ই মার্চ,-২০১৫ খ্রিস্টাব্দ।

[৬০১] মাওলানা মহিউদ্দীন খাঁন সম্পাদিত, মাসিক মদীনা, (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স,২০১৫ খ্রি.), পৃ.১৮।

Dhaka University Institutional Repository

শায়খুল হাদীস মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব বহুবার বলেছেন, যাত্রাবাড়ি মাদ্রাসাটি ইলমে জাহেরী ও ইলমে বাতেনীর উন্নতি শুরু হয়, মাওলানা হেদায়তুল্লাহ (রহ.)-এর আগমনের মাধ্যমে। তিনি যদিও মাদ্রাসায় প্রশাসনিক কোনো দায়িত্বে ছিলেন না কিন্তু অভ্যন্তরীণ যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হলে ওস্তাদগণ আলোচনা করে মূল বিষয়গুলো তাঁর সামনে পেশ করতেন। তিনি কোনো ফয়সালা দিতেন না, শুধু বলতেন, মনে হয় এটা ভালো হবে। তখন সেটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত হত। পরবর্তীতে অত্র সিদ্ধান্তটি সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত হিসেবে প্রমাণিত হত। তিনি ছাত্রদের দৈনন্দিন জীবনে নামায ও কুরআন তেলাওয়াতসহ সুন্নাতের প্রতি খুব লক্ষ্য রাখতেন। সুন্নাতের পরিপন্থি কোন কাজ হতে দেখলে সাথে সাথে তা সংশোধন করে দিতেন।[৬০২]

মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহ.) ছিলেন, একজন আদর্শ শিক্ষাবিদ ইলমে দ্বীন শিক্ষাদান-ই ছিল তাঁর প্রকৃত চিন্ত-চেতনা। তবে মাদ্রাসা পরিচালনা ও ইলমে হাদীসের শিক্ষাদানের ব্যস্ততার পাশাপাশি আরও বেশ কিছু প্রশংসনীয় কাজ করেছেন।

ইমাম ও খতীবে দায়িত্ব পালন : মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহ.) ঢাকা বড় কাটারা আশরাফুল উলূম মাদ্রাসায় শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন কালে ছোট কাটারা ছোট মসজিদে ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর লালবাগ জামিয়ার প্রাথমিক যুগে দৌলতি বাজার মসজিদে ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। উক্ত দায়িত্ব পালনকালে তিনি কুরআনের তাফসীর ও হাদীসের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যাসহ ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের শিক্ষাদানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মাঝে বিভিন্ন সংস্কারমূলক অবদান রাখেন।[৬০৩]

ঐতিহ্যবাহী ফরিদাবাদ মাদ্রাসার মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব পালন : মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহ.) ছিলেন ঢাকার ঐতিহ্যবাহী ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ মাদ্রাসার দীর্ঘ দিনের মুতাওয়াল্লী। ফরিদাবাদ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম মুতাওয়াল্লী ছিলেন মুজাহিদে আযম মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.)। তাঁর ইন্তেকালের পর মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহ.) উক্ত মাদ্রাসার মুতাওয়াল্লীর পদ অলংকৃত করেন এবং ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ তাঁর ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতা ও সাফলতার সাথে এই গুরুদায়িত্ব পালন করেন। কীভাবে অত্র মাদ্রাসায় ইলমে দ্বীনের প্রচার-প্রসারে উন্নতি করা যায় সে ব্যাপারে তিনি নিয়মিত পরামর্শ করতেন। ফলে পরবর্তীতে তা প্রশংসার দাবিদার হিসেবে স্বাক্ষর বহন করে।[৬০৪]

গ্রন্থ রচনায় অবদানঃ মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহ.) স্বভাবগতভাবে লিখনীর প্রতি তেমন কোনো মনোযোগ ছিলো না। বরং তিনি ছিলেন শিক্ষা সম্রাট। তাঁর পাঠদান পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও সৃজনশীল। তাঁর অনবদ্য ও সুবিন্যস্ত শিক্ষা পদ্ধতি ছাত্ররা যখন 'কলমবন্দ' করতো তখন তা গ্রন্থাবলি সহজবোধ্য ও তথ্যনির্ভর হতো। তবে মাওলানা শামসুল হক (রহ.)-এর অনুরোধে তিনি তারাবীহ নামায আট রাকাত না বিশ রাকাত এ গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়ে القول الصحيح في ركعات التراويح 'আলকাওলুস সহীহ ফী রাকাআতীত তারাবীহ' নামক একটি চমৎকার কিতাব ও রচনা করেছেন। যার ভূমিকা লিখেছেন স্বয়ং মাওলানা শামসুল হক (রহ.)। উর্দু ভাষায় রচিত তাঁর এই কিতাবটি প্রমাণ সম্বলিত এ বিষয়ে কিতাব পাঠে সহজেই মানুষ প্রকৃত সত্য গ্রহণে অনুপ্রাণিত হয়। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে মুজাহিদে আযম শামসুল-হক ফরিদপুরী (রহ.) লেখেন, মাশা-

---

[৬০২] মাওলানা আহমাদুল্লাহ, হায়াতে মুহাদ্দিস ছাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি, প্রাগুপ্ত, পৃ.১০৪।
[৬০৩] পয়গামে সুন্নাত, (ঢাকাঃ জামি'আ, রাহমানিয়া আরাবিয়া, ২০২৪হি.), পৃ.২২।
[৬০৪] স্মরণিকা, (ঢাকাঃ জামিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ, ১৯৯৪খ্রি.), পৃ.৪২।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ সাহেব ইলমের সাগরে ডুব দিয়ে মুল্যবান মণি মুক্তা আহরণ করে এই কিতাবটিকে মালায় গেঁথে দিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত ভারসাম্য এবং ইনসাফের সাথে কারো প্রতি সামান্যতম অবিচার না করে প্রকৃত বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর মর্যাদাকে উঁচু করুন এবং তাঁর নেক নিয়তের বরকতে মুসলমানদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ ও সম্প্রীতিকে বৃদ্ধি করে দেন।

অনুরূপ উপমহাদেশের হাদীস শাস্ত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্র মাওলানা জাফর আহমাদ উসমানী (রহ.) ও উক্ত কিতাব প্রসঙ্গে লেখেন, আমি কিতাবটি এক এক অক্ষর করে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে সম্পূর্ণ পড়েছি। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ভারসাম্যের সাথে কিতাবের বিষয়বস্তু সুন্নাত, সাহাবাদের আমল এবং ইজমার মাধ্যমে প্রমাণিত করে মুসলিম উম্মাহকে মতানৈক্য ও ফেতনা থেকে রক্ষা করেছেন। আমি খুব আনন্দিত যে, আমি এ'লাউস সুনানের মধ্যে যা কিছু লিখেছি তার সারসংক্ষেপ এই কিতাবে চলে এসেছে ,আলহামদু লিল্লাহ ।[৬০৫]

উক্ত কিতাবটি ছাড়াও মাওলানা হিদায়াতুল্লাহ (রহ.) বাংলার ইসলামী সাহিত্যাকাশের পুরোধা সদর সাহেবের লেখালেখির ক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহায়তা করেন। সদর সাহেব (রহ.) নিজেই ফুরুউল ঈমানের অনুবাদের শেষে লিখেন, "এই কিতাবের হাদীসের আরবী এবারতসমূহ আমার পরম বন্ধু মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ সাহেব থেকে আমি তাঁর নিকট এই বিষয়ে কৃতজ্ঞ।[৬০৬] তেমনিভাবে ইমদাদিয়া লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত বাংলা কুরআন তরজমা যা একটি নির্ভরযোগ্য অনুবাদ, সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহ.) ছিলেন উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও অনেক লেখক, গবেষক, গবেষণার কাজে তাঁর নিকট শরণাপন্ন হতো।[৬০৭]

গবেষকদের নিয়ে সিরাজী কিতাবের বিশেষ গবেষণা : মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহ.)-এর নিকট নোয়াখালী এক আলেম দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে পড়ালেখা শেষ করে এসে তাঁকে বিশেষ অনুরোধের সাথে বলেন যে, "সিরাজী কিতাব আমাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন। তিনি উত্তরে বলেন, কিতাব তো পড়েছি কিন্তু হিসেবের ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা হতে পারে কিন্তু পর্যালোচনা দ্বারা তা সমাধান হয়ে যাবে। লোকটি বলল আপনি অনুমতি দিলে প্রতিদিন আধা ঘন্টা পরস্পর পর্যালোচনা করলেই যথেষ্ট হবে। তখন তিনি জাফর আহমদ উসমানী (রহ.)-এর নির্দেশক্রমে তাঁর খানকায় কয়েকজন আলেমসহ খুব সুন্দরভাবে সফলতার সাথে সম্পূর্ণ সিরাজী কিতাব পরস্পর পর্যালোচনার মাধ্যমে সমাধান করেন। পরবর্তীতে ফরায়েজের যে কোনো মাসয়ালা খুব সুন্দরভাবে অতিদ্রুত সমাধা করতে পারতেন।

মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহ.) তাঁর কর্মজীবনের সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অধ্যায় ছিল হাদীস ও অন্যান্য কিতাবের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিক্ষাদান পদ্ধতি। মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.) বলতেন, এদেশে যদি হাদীস পড়তে হয় তাহলে মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ সাহেবের কাছে পড়া দরকার। তিনি আরও বলতেন, মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ সাহেব তিরমিযী শরীফ যত সুন্দর করে পড়িয়ে থাকেন দুই তিনজন উল্লেখযোগ্য আলেম ছাড়া বর্তমানে এতো সুন্দর করে পড়ানোর মতো গোটা ভারতবর্ষে আর কেউ নেই। তাঁর এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দারসের বিভিন্ন দিক এখানে তুলে ধরা হল।[৬০৮]

---

[৬০৫] মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী , ফরুউল ঈমান, (ঢাকাঃ মোহাম্মদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৬খ্রি.), পৃ.০৩-০৪।
[৬০৬] মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী , ফরুউল ঈমান, প্রাগুপ্ত , পৃ. ২০৬।
[৬০৭] মাওলানা আহমাদুল্লাহ, হায়াতে মুহাদ্দিস ছাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১০৮।
[৬০৮] হাফেজ্জী হুযুর (র.) স্মারক গ্রন্থ, (ঢাকাঃ মডার্ন ইঞ্জিনিয়ার এন্ড আর্কিটেক্টস লিমিটেড, ২০০৫খ্রি.), পৃ. ১৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

দারসে হাদীসের আদব : মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহ.) হাদীসের ক্লাসে পাঠদান প্রদ্ধতি ছিল অনুপম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ক্লাসে যাওয়ার আগে উযূ করে দু'রাকাত নামায পড়তেন। সকল ছাত্র প্রস্তুত হয়েছে এটা বুঝানোর জন্য তাঁর রুম থেকে যখন নির্দিষ্ট কিতাব ক্লাসে নিয়ে যাওয়া হত তখন তিনি ক্লাসে উপস্থিত হতেন। সালাম দিয়ে ক্লাসে রুমে প্রবেশ করেতন। ক্লাস রুমে প্রবেশের পর দরজা জানালা বন্ধ করে দেওয়া হত। যাতে বাইরের আওয়াজ ভিতরে না আসে এবং নতুন করে কেউ বের হওয়ার বা প্রবেশ করার সুযোগ না থাকে। তিনি অত্যন্ত বিনয় ও সম্মানের সাথে উভয় পা ভাঁজ করে পায়ের পাতাদ্বয় ডান দিকে বের করে দিয়ে বসতেন। গোটা ক্লাস রুম তখন পিন-পতন নীরবতা বিরাজ করত। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-মিশ্রিত-ভীতি ছাত্রদের এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রাখতো যে, কেউ একটু নড়াচড়া করাকে বেয়াদবি মনে করতেন। তিনি নিজেও হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সামনে রেখে নড়াচড়া করতেন না। এভাবেই শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সাথে তিনি ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য ইসলামের প্রচারক ও প্রসারক তৈরি করেছেন।

তাঁর দারসে হাদীসে কতিপয় আদবে প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হত। তিনি ক্লাসে সবসময় উযুসহ নামায পড়ার মতো বসতেন। পা উঠিয়ে বা আসন পেতে কখনো বসতেন না, পান মুখে নিয়ে কখনো ক্লাসে পড়াতেন না, মুখে পান থাকলে কুলি করে নিতেন, ক্লাস শুরুর আগে মনে মনে দুরূদ শরীফ পড়তেন, ক্লাস চলাকালীন কোনো ছাত্রের কোনো অনর্থক কাজ, নড়াচড়া এদিক সেদিক তাকানো, কথা বলা, হাসা, ঘুমানো বাম হাত দ্বারা কিতাব ধরা তাঁর খুবই অপছন্দনীয় ছিল, আলোচনা শেষ করার আগে কোনো প্রশ্ন করা অপছন্দনীয় ছিল। সাধারণত আলোচনা শেষ করার পর কোনো প্রয়োজনীয় প্রশ্নের প্রয়োজন থাকত না, তিনি খুব নিচু আওয়াযে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতেন। কিন্তু নীরবতার কারণে কারো শুনতে সমস্যা হত না, সাহাবীর নামের সাথে সকল রাবীকে শামিল করে নিতেন।[৬০৯]

তাকরীরের বৈশিষ্ট্য : মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহ.) উর্দু ভাষায় হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতেন। বছরের শুরুতে ইলমে হাদীসের সংজ্ঞা, হাদীস সংকলনের ইতিহাস এবং ইলমে হাদীসের ফযিলত ও আদব বর্ণনা করতেন। তখন শাইখ ইবনে আব্দুল বার (রহ.)-এর আদব সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশগুলো বর্ণনা করতেন।

হাদীসের পাঠদান পদ্ধতি : মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহ.)-এর হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা হাদীসে অনুবাদ পরিষ্কারভাবে বুঝা যেত। যে কারণে আলাদাভাবে কোনো হাদীসের ধারাবাহিক অনুবাদ করার প্রয়োজন হত না, প্রতিটি বাক্য তিন তিন বার বলতেন, নতুন শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে। যার কারণে শ্রোতাদের বুঝা সহজ হত, হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার পর সকলে সাথে সাথে তা লিখে নিতে পারত। নির্ধারিত সময়েই নির্ধারিত পাঠ্যতালিকা সমাপ্ত করতেন, আলোচ্য হাদীসের অধীনে যত বিষয় আছে, এ সমস্ত বিষয়ে যত প্রশ্ন থাকতে পারে সকল প্রশ্নের মীমাংসা তাঁর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ধারাবাহিকভাবে এসে যেত। যার ফলে তাঁর কাছে আনুষঙ্গিক হাদীস বুঝতে কোনো প্রশ্ন করার দরকার পড়ত না, তাঁর তাকরীরের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মধ্যে হাদীস, ফিকহ্ ও তাফসীর ছাড়াও অন্যান্য ইল্‌ম যেমন লুগাত, সরফ, বালাগাত, আদব, উসূলে ফিক্‌হ, তাছাউফ, মানতিক, ফালসাফা তারিখ ইত্যাদির আলোচনা থাকত। অনেক মাসয়ালার সমাধান হয়ে যেত, হাদীসের সনদের মধ্যে যেসব রাবীদের নাম আসত তাদের সম্পর্কেও পর্যালোচনা করতেন, তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হাদীসের অন্যান্য কিতাবের জন্যও নোট বই হিসেবে কাজে লাগত। সকল ছাত্র চোখ-কান খোলা

[৬০৯] আলোর কাফেলা, (ঢাকা: চৌধুরী এন্ড সন্স, ২০০৫খ্রি.), পৃ. ১১।

Dhaka University Institutional Repository

রেখে অতি বিনয়ের সাথে মনোযোগ দিয়ে তাঁর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুনত এবং সাথে সাথে সে মূল্যবান ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ লিখে রাখতেন। তাঁর হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রতি সকলের এমন আকর্ষণ ছিল যে, কীভাবে তাঁর ক্লাসের দু'ঘণ্টা পার হয়ে যেত কেউই অনুভব করতে পারতো না। তিনি হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার পর ভিন্নভাবে কোনো নসীহত করার প্রয়োজন হত না। তাঁর হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছিল পরিপূর্ণ নসীহত। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট হাদীসের ওপর আমল করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন এবং সকলের এ ধারণা হত যে, এ হাদীসের ওপর সবচেয়ে বেশি আমলকারী হলেন স্বয়ং তিনি নিজেই, কোনো মাসয়ালা বুঝানোর জন্য তাঁকে হাতের ইশারা বা অঙ্গভঙ্গি করার প্রয়োজন হত না। মুখের বর্ণনাই যথেষ্ট হত।[৬১০]

যে সকল কিতাবের শিক্ষা প্রদান করেন : মাওলানা হেদায়েতুল্লা (রহ.) পড়ানোর জীবনে বেশি সময় মিশকাত শরীফ এবং তিরমিযী শরীফ পড়িয়েছেন। এ দু'কিতাবের সাথে তাঁর আত্মার সম্পর্ক ছিল। তাঁর কাছে কেউ মিশকাত পড়লে তাঁর জন্য সিহাহ সিত্তা সহজ হয়ে যায় একথা সকলের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। তবে এ কিতাব ২টি কত বছর পড়িয়েছেন তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। ১৩৭৫ হিজরি সনে যারা লালবাগ জামিয়ায় দাওরায়ে হাদীসে পড়েছেন তাঁরা তাঁর কাছে তিরমিযী পড়েছেন এটা নিশ্চিতভাবে জানা গেছে। সে হিসেবে তিরমিযী পড়ানোর সময়কাল ৪০ বছর হয়। কিন্তু এর আগেও পড়িয়েছেন কিনা তা জানা যায়নি।

বুখারী শরীফ : মুহাদ্দিস সাহেব (রহ.) বুখারী শরীফও বেশ কয়েক বছর পড়িয়েছেন। মাওলানা মুফতী আমীনী, মাওলানা আব্দুর রহীম ১৯৮৩ হিজরিতে মাওলানা সিদ্দীকুর রহমান ১৩৮৪ হিজরিতে মাওলানা রহমত উল্লাহ ১৩৮৬ হিজরিতে মুফতী উবাইদুল্লাহ ১৩৯৪ হিজরিতে তাঁর কাছে বুখারী শরীফ পড়েছেন। মাওলানা রহমত উল্লাহ সাহেব বলেন, "আমাদের সময় শায়খুল হাদীস বলতে আমরা মুহাদ্দিস সাহেবকেই বুঝতাম।" যাত্রাবাড়ি মাদ্রাসায় যাওয়ার পরও মুহাদ্দিস সাহেব বুখারী শরীফের কিতাবুল ঈমান পড়িয়েছেন। সাধারণত তিনি বুখারী শরীফ পড়াতেন না। মুসলিম শরীফও পড়িয়েছেন। শায়খুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক (রহ.), মাওলানা সালাহ উদ্দীন সাহেব (রহ.) প্রমূখ তাঁর কাছে মুসলিম শরীফ পড়েছেন।[৬১১]

তিনি দেওয়ানে মুতানাব্বী, মাক্বামাতে হারীরী (আরবী আদব শাস্ত্র) পড়িয়েছেন। তিনি শব্দের তাহকীক লেখাতে গিয়ে তাঁর সমর্থনে কুরআনের আয়াত, হাদীস ও জাহিলি যুগের কবিদের উদাহরণ কালাম পেশ করতেন এবং এক একটি শব্দের আসল অর্থ ব্যক্ত করতেন এবং কীভাবে বর্তমানে ব্যবহারিক অর্থটি এলো তাও বলতেন। শরহে জামীঃ ইলমে নাহুর সর্বোচ্চ কিতাব সেটিও পড়িয়েছেন। সদর সাহেব (রহ.)-সহ আরও অন্যান্য শিক্ষক তাঁর শরহে জামী পাঠদান পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করার জন্য ক্লাস রুমের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। অতঃপর ফিরে এসে এক বাক্যে তাঁরা মন্তব্য করলেন, আজ যদি মোল্লা জামী বেঁচে থাকতো। তবে তিনি এভাবেই পড়াতেন। হেদায়া কিতাবও তিনি পড়িয়েছেন। মুফতী নূরুল হক বলেছেন, একবার হেদায়ার ছাত্ররা মন্তব্য করেছিল যে, তিনি হেদায়ায় যে তাকরীর করেন তা যদি পুরোপুরি লেখা হয় তাহলে হেদায়া কিতাবটি ৮০ খণ্ড হবে। তিনি আরও যে সকল কিতাব পড়িয়েছেন সেগুলো হলো নাসাঈ শরীফ, মু'আত্তা মুহাম্মাদ, শরহে আকায়েদ, শরহে বেকায়া, নূরুল আনওয়ার, কানযুদ্দাকায়েক, কুদুরী, কাফিয়া, মুখতাসারুল মা'আনী, মুনাযারায়ে রশীদিয়া, কুতবী, হিদায়াতুল হিকমাত, মাইবূযী , উরুযুল মিফতাহ, বাইযাবী শরীফ।[৬১২]

[৬১০] প্রাগুপ্ত, পৃ. ১১৫।
[৬১১] আলোর কাফেলা, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৮৮।
[৬১২] প্রাগুপ্ত, পৃ. ১২।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখযোগ্য ছাত্রবৃন্দ : মাওলানা আব্দুল মাজীদ ঢাকুবী হুযুর (রহ.) (১৯১৮-১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ), মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব (রহ.) (১৮৯৫-২০০৩ খ্রিস্টাব্দ), হাফেয মাওলানা মুহসিন (রহ.) (১৯২৪-১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ), শায়খুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক সাহেব (রহ.) (১৯১৯-২০১২ খ্রিস্টাব্দ), মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেব শায়েখজী হুজুর (রহ.) (১৯২৪-১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ), মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করীম পীর সাহেব চরমোনাই (রহ.) (১৯৩৫-২০০৬ খ্রিস্টাব্দ), মাওলানা মাজহারুল হক সাহেব (রহ.) (মৃত্যু ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ)।[৬১৩]

যাঁরা তাঁর নিকট বাই'আত হয়েছেন : (১) মাওলানা আব্দুর রহীম মুহাদ্দিস জামিয়া কুর'আনিয়া লালবাগ ঢাকা। (২) ক্বারী মাওলানা জাকারিয়া সাবেক শিক্ষক মুমিনপুর মাদ্রাসা চাঁদপুর। (৩) মাওলানা মুফতী উমর ফারুক জামিয়া দারুল উলূম মতিঝিল ঢাকা। (৪) মাওলানা হাবীবুল্লাহ মুহাদ্দিস চৌধুরী পাড়া মাদ্রাসা ঢাকা। (৫) মাওলানা মিজানুর রহমান সাহেব জামিয়া দারুল উলূম মতিঝিল ঢাকা। (৬) মাওলানা আহমাদুল্লাহ জামিয়া দারুল উলূম মতিঝিল ঢাকা এবং (৭) মাওলানা হাসান আহমাদ শিক্ষক জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া সাত মসজিদ ঢাকা।[৬১৪]

ফতোয়া ও ফারায়েযের মাধ্যমে বিশেষ অবদান : ইসলামী শরীয়তের বিভিন্ন নীতিমালা বা ফতোয়ার জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহ.) অত্যধিক মেধাবুদ্ধি, পরিপূর্ণ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। লালবাগ মাদ্রাসার প্রধান মুফতী আব্দুল মুঈয (রহ.)-এর অভ্যাস ছিল যে, কোনো জটিল ফতোয়া হলে তা লিখে মুহাদ্দিস সাহেবকে দেখাতেন। তিনি যদি বলতেন ঠিক আছে, তাহলে সেটা প্রচার করতেন। কোনো ফতোয়ার ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করলে তা প্রচার করা হতে বিরত থাকতেন। যে কোনো ফতোয়া বা ফারায়েযের ব্যাপারে অধিক গবেষণার পর মুহাদ্দিস সাহেব যা বলতেন ঠিক তাই প্রমাণিত হত। মুফতী মাওলানা মনসূরুল হক বলেন, আমি লালবাগ মাদ্রাসার ফতোয়া বিভাগের দায়িত্বে থাকাকালীন অনেক মাসায়েলের সমাধান না পেলে মুহাদ্দিস সাহেবের খেদমত হাজির হয়ে সমস্যা পেশ করতাম। তিনি কিতাবের নাম পৃষ্ঠা নম্বরসহ বলে দিতেন।

তাঁকে কোনো মাসয়ালা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি প্রথমে বলতেন, মুফতী সাহেবের কথা বলতেন। পরে অবশ্য মাসয়ালা বলে দিতেন এবং হাওয়ালাসহ বলতেন যে 'ফতোয়ায়ে কাজীখানে' তো এমন লিখেছে। ফতোয়ায়ে শামীতে এমন লিখেছে। তিনি সূত্রগুলো এমনভাবে বলতেন যে, মনে হত তিনি কিতাব দেখে বলছেন।[৬১৫]

কয়েকটি শব্দের তাহকীক : خضر খিযির শব্দের তাহকীক। মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহ.) তাকরীরে বলেছেন যে, খিযির (আ.)-এর নাম আমাদের মাঝে খিযির হিসেবেই প্রসিদ্ধ। কিন্তু শব্দটি খিযির নয় বরং খাযির। আর এটা তার নাম নয় বরং তাঁর উপাধি। যার অর্থ হচ্ছে সবুজ-শ্যামল। তিনি যে মৃত গাছ বা ঘাসের ওপর দিয়ে যেতেন তা জীবিত হয়ে যেত বিধায় তিনি এই উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তাঁর মূল নাম হলো بليا بن ملكان বালাইয়া বিন মালকান তিনি এও বলেছেন, যে তাঁর মূল নাম মনে রাখতে পারবে মৃত্যুর সময় তাঁর কালিমা নসীব হবে।

---

৬১৩ প্রাগুক্ত,পৃ. ১৭।

৬১৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

৬১৫ মাওলানা আহমাদুল্লাহ, হায়াতে মুহাদ্দিস ছাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০।

Dhaka University Institutional Repository

* عبدود শব্দের তাহকীক: লালবাগ মাদ্‌রাসার এক ওস্তাদ মুহাদ্দিস সাহেব (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হাদীসের কিতাবে একটা শব্দ আছে عبدود 'আব্দুদ' এটা কেমন শব্দ হলো। মুহাদ্দিস সাহেব (রহ.) বললেন, শব্দটা عبدود আব্দুদ নয়। বরং عبدواد আব্দে ওয়াদ (সংযুক্ত শব্দ)।

* بشارت (সুসংবাদ) শব্দের তাহকীক: মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক সাহেব বলেন, লালবাগে একবার মুহাদ্দিস (রহ.)-এর সামনে بشارت শব্দ নিয়ে আলোচনা হলো যে, শব্দটি বিশারত নাকি বাশারত? মুহাদ্দিস সাহেব বললেন, বিশারত এর তাহকীকের জন্য অভিধান দেখতে বললেন। তখন মিসবাহুল লুগাত দেখে তাঁকে জানানো হলো বাশারত লিখা আছে। তিনি বললেন মিসবাহুল লুগাতের হাওয়ালা যথেষ্ট নয়। বরং মিসবাহুল লুগাতের মূল উৎস المنجد আল-মুনজিদ দেখতে হবে। তখন আলমুনজিদ দেখা হলো এবং সেখানে শব্দটি বিশারত পাওয়া গেল।[৬১৬]

বিভিন্ন মনীষীদের দৃষ্টিতে মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ্ (রহ.)-এর ইল্‌মী মর্যাদা-

মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহ.) তাঁর সমকালীন শ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরামেগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর ছিল হাজার হাজার শাগরিদ, এছাড়াও যারা অন্তত তাঁর একটি ক্লাসে বসেছে কিংবা তাঁর ক্লাসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সামান্য নমূনা দেখেছে অথবা কোনো ইল্‌মী আলোচনা শুনেছে এমন প্রত্যেক আলেম তাঁর ইল্‌মী শ্রেষ্ঠত্বের কথা অকপটে ঘোষণা করেছে। তাঁর ইল্‌মী মাকামের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে দেশ-বিদেশের অগণিত মনীষী অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁর মধ্যে কয়েকজন মনীষীর মন্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১। **আল্লামা ইউসুফ বানূরী (রহ.)-এর মন্তব্য :** যাত্রাবাড়ি মাদ্‌রাসায় প্রিন্সিপাল মাওলানা মাহমূদুল হাসান সাহেব বহুবারই আল্লামা ইউসুফ বানূরী (রহ.)-এর একটি মন্তব্য উল্লেখ করে বলেন, বর্তমানে কারো হাদীসের পড়ানো পদ্ধতির প্রতি আমার পরিপূর্ণ আস্থা হয় না। তবে মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ সাহেবের হাদীসের পড়ানোর পদ্ধতির প্রতি আমার অধিক আস্থা হয়।

২। **আল্লামা তাকী উসমানীর মন্তব্য :** শায়খুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী সাহেব বলেন, এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে বড় আলেম হলেন মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহ.)।

৩। **আরেফ বিল্লাহ শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার (রহ.)** তিনি তাঁর ইসলামী জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে বলেছেন। হেদায়েতুল্লাহ সাহেব (রহ.) ছিলেন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম।

৪। **শায়খুল হাদীস আল্লামা আযীযুল হক (রহ.)** বলেন, মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহ.)-এর ইসলামী জ্ঞানের গভীরতা শুধু উচ্চ নয় বরং সর্বোচ্চ ছিল। তাঁর পড়ানোর পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত নিখুঁত। ছাত্ররা সবাই তাঁর কাছে কিতাব পড়তে অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করে। শায়খুল হাদীস সাহেব মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহ.) জীবদ্দশায় জামিয়া রাহমানিয়ার এক মজলিসে বলেছিলেন, আমিসহ রাহমানিয়ার সকল ওস্তাদদের ইল্‌ম একত্র করলেও মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহ.)-এর ইলমের সমান হবে না। আরবী ও ইসলামী জ্ঞানের গভীরতা মাওলানা হিদায়াতুল্লাহ সাহেবকে যে মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দান করেছেন তা আমাদের উপলব্ধির অনেক ঊর্ধ্বে।

৫। **মাওলানা আব্দুল মজীদ ঢাকুবী (রহ.)** মাঝে মাঝেই বলতেন মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ সাহেব যেভাবে হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতেন তা বর্তমানে দারুল উলূল দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় ও

---

[৬১৬] প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

নেই। তিনি আরও বলতেন, লালবাগ কুতুবখানায় এমন কোনো কিতাব নেই, যা মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ সাহেব গবেষণা করেননি।

৬। **মুফতী মাওলানা ফজলুল হক আমীনী (রহ.)** বলেন, মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহ.)-এর ইল্মী মাকাম এতো উঁচু ছিল যে, মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁন সাহেবের মতো ব্যক্তি বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খণ্ড পড়ানোর সময় অনেক বিষয় তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করতেন।[৬১৭]

৭। **মাওলানা মুহিউদ্দীন খাঁন সাহেব** সম্পাদিত মাসিক মদীনার কোন এক সংখ্যায় প্রশ্ন করা হল যে, মুহাদ্দিস কাকে বলে? বর্তমান যুগে মুহাদ্দিস কেউ আছে কিনা, থাকলে তিনি কে, মুহিউদ্দীন খাঁন সাহেব উত্তর দিয়েছেন, মুহাদ্দিস যাঁদেরকে বলা হয় এবং মুহাদ্দিস হওয়ার জন্য যে সকল শর্তাবলির প্রয়োজন, আমার জানামতে যে সকল শর্তাবলী অনুযায়ী বেশ কয়েক জন মুহাদ্দিস এদেশে আছেন, তাঁদের অন্যতম হলেন মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ সাহেব (রহ.)। তাঁর মধ্যে মুহাদ্দিসের সকল শর্ত পূর্ণরূপে বিদ্যমান। যদিও তাঁকে অনেকেই চিনেন না।[৬১৮]

৮। **মাওলানা হারুন ইসলামাবাদী** একবার আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন, মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ সাহেবকে আমার ওস্তাদ মনে করো। আমি পড়ানোর সময় সবচেয়ে বেশি ইস্তেফাদা করেছি তাঁর কাছ থেকে।

৯। **মাওলানা আতাউর রহমান খান (রহ.)** তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন। ওস্তাদুল হাদীস মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ (রহ.) ইলমে হাদীসের জগতে এক অনন্য স্থান দখল করেছিলেন। যারা সরাসরি তাঁর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেছেন তাঁরা তো বটেই, আমরা যারা তাঁর সরাসরি ছাত্র নই আমরাও অনুভব করি তিনি ইলমে হাদীসের কাননে প্রস্ফুটিত গোলাপ চামেলীর অন্যতম। জুনায়েদ বাগদাদী, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) জগতের এ তিন প্রতিভার সুন্দর সমাহার ঘটেছিল তাঁর ব্যক্তিত্বে।[৬১৯]

---

[৬১৭] প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৬৪।

[৬১৮] মাসিক মদীনা, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৮।

[৬১৯] মাওলানা আহমাদুল্লাহ, হায়াতে মুহাদ্দিস ছাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-৩.৪ : মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ (রহ.) (১৯৩৭-২০০৫ খ্রি.)

মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ (রহ.) ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ থানার সাদ্রা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মোহাম্মদ আরিফ উল্লাহ। তিনি তাঁর পিতার নিকট আক্ষরিক জ্ঞানসহ পবিত্র কুরআনের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি পালিশারা মাদ্রাসায় প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে অত্র মাদ্রাসায় ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। পরবর্তীতে তাঁর পিতা তাঁকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে বেলচোঁ কারিমাবাদ দাখিল মাদ্রাসায় ভর্তি করেন। তিনি অত্র মাদ্রাসায় তৃতীয় শ্রেণি থেকে আলিম পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সাথে পড়ালেখা করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে তিনি আলিম পাশ করেন। এরপর ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহ্যবাহী লাকসাম গাজীরমুড়া কামিল মাদ্রাসা ফাযেল শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে অত্র মাদ্রাসা হতে ফাযেল পাশ করেন। তার মেধা ও তীক্ষ্ম বুদ্ধির কারণে শিক্ষকগণ তাঁকে খুবই মহব্বত করতেন।

পরবর্তীতে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ছারছীনা আলিয়া মাদ্রাসায় কামিল হাদীস বিভাগে ভর্তি হন। সেখান থেকে হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ বিজ্ঞ আলেমদের নিকট অধ্যয়ন করে অত্যন্ত সুনামের সাথে ছারছীনা মাদ্রাসা হতে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে কামিল পাশ করেন। ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, শিক্ষকগণ তাঁর মেধার খুব প্রশংসা করতেন। তিনি বাংলা, আরবী, উর্দূ, ফার্সী ও ইংরেজি ভাষার খুবই দক্ষ ছিলেন এবং এ সকল ভাষায় খুব সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারতেন।[৬২০] তিনি ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে অনার্স পাশ করেন এবং পরবর্তীতে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। সর্বশেষ ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি হতে ইসলামীক স্টাডিজে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর ওস্তাদগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, মাওলানা নিয়াজ মাখদুম তুর্কেস্তানী খাতাওয়ানী, মাওলানা আবদুস সাত্তার বিহারী, মাওলানা আবদুল লতিফ, মাওলানা আবদুল করীম প্রমুখ।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন ছয় পুত্র ও তিন কন্যা সন্তানের জনক। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত "সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ" সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে মাওলানা সিফাতুল্লাহ (রহ.) প্রায় বেলা ১১টার সময় বক্তৃতা শুরু করেন। তিনি ১০ মিনিট বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তব্যে বিশেষ দাবি ছিলো অবিলম্বে কামিল শ্রেণিকে মাস্টার্স ও ফাযেল শ্রেণিকে ডিগ্রির মান দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি জোরালো আবেদন। ১০ মিনিট বক্তব্যের পর তিনি হঠাৎ ঢলে পড়ে যান এবং এ অবস্থায় ২২ ডিসেম্বর ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে ইন্তেকাল করেন। অতঃপর বাইতুল মুকাররাম জাতীয় মসজিদে তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং হাজীগঞ্জের গ্রামের বাড়িতে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।[৬২১]

---

[৬২০] স্মৃতি অম্লান, মাওলানা সিফাতুল্লাহ স্মরক গ্রন্থ ২য় প্রকাশ সৌদি আরব, জেদ্দা-২০০৭খ্রি., পৃ. ৯১।

[৬২১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ (রহ.)-এর অবদান-

মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ (রহ.) ফাযিল পাশ করার পর ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি মাগুরা জেলা সদরে অবস্থিত ছিদ্দিকীয়া সিনিয়ার মাদ্‌রাসার সুপারিন্টেনডেন্ট হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি অত্যন্ত যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে মাদ্‌রাসার শিক্ষকতা ও পরিচালনার কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদন করেন এবং মাদ্‌রাসার শিক্ষার উন্নতির ক্ষেত্রে ও অন্যান্য অবদান রাখেন।

অতঃপর ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার মাসুমপুর সিনিয়ার মাদ্‌রাসার হেড মাওলানা পদে যোগদান করে অত্যন্ত সুনামের সাথে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলার সোনাইমুড়ি সিনিয়র মাদ্‌রাসার সুপারিনটেন্ডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। অত্র মাদ্‌রাসায় যাবতীয় কার্যক্রম সুন্দরভাবে পরিচালনার কারণে সকলেই তাঁকে আন্তরিকভাবে মুহাব্বত করেন।

পরবর্তীতে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি সাতক্ষীরা জেলার কালারোয়া উপজেলার হামিদপুর আলিয়া মাদ্‌রাসায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর হাদীস পড়ানো পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত চমৎকার। তিনি হাদীস পড়ানোর সময় হাদীসের অধ্যায়ভিত্তিক রাবীর নাম বর্ণনা, সনদের ধারাবাহিকতা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, কঠিন কঠিন শব্দের তাহকীক, উসুলে হাদীসের বর্ণনাসহ অত্যন্ত সুন্দর ও সহজ ভাষায় উপস্থাপন করতেন। যার ফলে ক্লাসের সকল ছাত্র সহজেই হাদীসের বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে সক্ষম হতো। সকলেই তাঁর ক্লাস অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে শ্রবণ করত।

এরপর তিনি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে খুলনা নেছারিয়া কামিল মাদ্‌রাসার উপাধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উক্ত দায়িত্ব অত্যন্ত সুনামের সাথে পালন করেন। অত্র মাদ্‌রাসায় তিনি বুখারী শরীফসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পাঠদান করেন এবং মাদ্‌রাসার শিক্ষা কার্যক্রম সংস্কার করে সম্পূর্ণরূপে নতুন উদ্যমে শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসায় উপাধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে অবসরে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি অত্র মাদ্‌রাসায় হাদীসের কিতাবসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ অত্যন্ত সুনামের সাথে পাঠদান করেন যার কারণে তাঁর সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

মাওলানা আবুল কাশেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ (রহ.) অবসরে যাওয়ার পর ২০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা মিসবাহুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় খণ্ডকালীন মুহাদ্দিস হিসেবে হাদীসের পাঠদান করেন। তিনি দীর্ঘ ৩২ বছর যাবৎ সিহাহ সিত্তা হাদীসের কিতাবসমূহের পাঠদান অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করেন। তিনি ছিলেন একজন যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষক। তাঁর পাঠদান পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত চমৎকার। তাঁর মধুর বচনে সকলেই মুগ্ধ ছিল।[৬২২]

তাঁর উল্লেখযোগ্য অনেক ছাত্র রয়েছে, যারা বিভিন্ন মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস হিসেবে হাদীসের পাঠদানসহ ইসলামী শিক্ষার খেদমতে বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলো মাওলানা খলিলুর রহমান মাদানী, মুহাদ্দিস তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা ঢাকা, ড. মাওলানা আবদুর রহমান, মাওলানা মহিবুল্লাহ আযাদ, উপাধ্যক্ষ সীতাকুণ্ড কামিল মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম, মাওলানা বশির আহমদ, উপাধ্যক্ষ চাটখিল কামিল মাদ্‌রাসা, নোয়াখালী, মাওলানা মোয়াজ্জেম হোসাইন,

---

[৬২২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২-৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাদ্দিস তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা ও মাওলানা সাইফুল ইসলাম অধ্যক্ষ মোহাম্মদাবাদ ইসলামীয়া আলিম মাদ্‌রাসা ঢাকা।[৬২৩]

মাওলানা আবুল কাশেস মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ (রহ.) বহু প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা এবং বহু প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনসহ সমাজের বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক অবদান রাখেন। তিনি পত্র-পত্রিকায় বহু লেখালেখি করেন। তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা তিন হাজারেরও অধিক। তিনি বহু গ্রন্থের অনুবাদ করেন। তাঁর অনেকগুলো লিখিত মৌলিক গ্রন্থ রয়েছে যার সংখ্যা প্রায় ২৫টির অধিক। তিনি সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা বিষয়ক সংস্কারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ইসলামিক কনফারেন্স ও শিক্ষা বিষয়ক সম্মেলনে যোগদান করেন এবং এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তিনি সৌদিআরব, ইরাক, ও পাকিস্তান ভ্রমণ করেন। তাঁর অনেক খ্যাতিমান ছাত্র রয়েছে, যারা দেশের বিভিন্ন মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস, প্রিন্সিপাল, অধ্যাপকসহ জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বিশেষ অবদান রাখছেন। আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচারক ও প্রসারক মাওলানা সিফাতুল্লাহ (রহ.) ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ হতে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে ওয়াজ-মাহফিল, সেমিনার, প্রবন্ধ-রচনা, লেখালেখির মাধ্যমে কুরআন-হাদীসের সঠিক দিকনির্দেশনা উপস্থাপনের মাধ্যমে সামাজিক অবক্ষয়, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবকাঠামো অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় যুক্তি সহকারে সাধারণ ও শিক্ষিত সমাজে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। আর কীভাবে তার সঠিক সমাধান করা যায় তাও উপস্থাপন করে সমাজের মানুষের মাঝে সঠিক ইসলামী আদর্শ তুলে ধরে জীবনের সমস্ত শক্তি ও কৌশল অবলম্বন করে ইসলামের দুশমনদেরকে প্রতিরোধের জন্য আজীবন চেষ্টা চালিয়ে যান। তিনি বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে সময়ের উপযোগী করে কুরআন হাদীসের আলোকে সমাজের অবকাঠামোগুলোকে মানুষের সামনে তুলে ধরে তার বাস্তব ক্ষতির দিকগুলো বর্ণনা করেন এবং তার সুন্দর সমাধানও পেশ করেন। সমাজে প্রচলিত বিদ'আত, কুসংস্কার, শিরক এবং অনৈসলামীক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম চালিয়ে যান। তাঁর বক্তব্য শুনে সাধারণ মানুষ খুব সহজেই তাঁর প্রতি আসক্তি ও আন্তরিক ভালোবাসা প্রকাশ পেত।[৬২৪]

মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ (রহ.) সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত-

১। মাওলানা সাইফুল ইসলাম, অধ্যক্ষ মোহাম্মদাবাদ আলিম মাদ্‌রাসা ঢাকা। তিনি বলেন, মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ (রহ.) তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, লেখক ও সুবক্তা। দীর্ঘ ৩২ বছর পর্যন্ত তিনি হাদীসের দারস দান করেন এবং প্রতিষ্ঠা করেন অনেক মাদ্‌রাসা ও প্রতিষ্ঠান। তিনি বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিল ও সেমিনারের বক্তব্যে কুরআন ও হাদীসের কথাগুলো অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও যুক্তিপূর্ণ ভাষায় উপস্থাপন করতেন। তিনি বিভিন্ন মাদ্‌রাসার দায়িত্ব পালন অবস্থায় ইসলামী শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেন। লেখনির মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ সহজ ভাষায় সুন্দরভাবে সাধারণ ও শিক্ষিত মানুষের মাঝে তুলে ধরতে সক্ষম হন।[৬২৫]

---

[৬২৩] স্মারণিকী, মাও. আবু কাসেম মু. ছিফাতুল্লাহ (রহ.) ২০০৭ খ্রি., পৃ. ৩-১২।
[৬২৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২৩।
[৬২৫] গবেষক ১২.০৩.২০১৬ তারিখে সাক্ষাৎকার অনুযায়ী লিখিত।

Dhaka University Institutional Repository

২। মাওলানা খলিলুর রহমান মাদানী, মুহাদ্দিস তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা ঢাকা। তিনি বলেন, মাওলানা সিফাতুল্লাহ (রহ.) ছিলেন একজন উঁচুমাপের আলেম, কুরআন-হাদীসের জ্ঞান ছিল ব্যাপক। লেখনির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল বিশাল, তিনি ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ের ওপর গ্রন্থ রচনা করেন এবং বহু গ্রন্থের অনুবাদ করেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ হাদীস ও তাফসীর গ্রন্থসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ পাঠ করাতেন। হাদীস পড়ানোর সময় তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় হাদীসের সনদ, রাবী ও কঠিন কঠিন শব্দের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহজ ভাষায় উপস্থাপন করতেন। তিনি বিভিন্ন দেশে ইসলামিক কনফারেন্স ও শিক্ষা বিষয়ক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে শিক্ষার মান উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[৬২৬]

৩। মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ আযাদ, উপাধ্যক্ষ সীতাকুণ্ড কামিল মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম। তিনি বলেন, মাওলানা সিফাতুল্লাহ (রহ.) ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ একজন আলেম, মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সির। তিনি দীর্ঘদিন বিভিন্ন মাদ্‌রাসা পরিচালনা দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বের ও সুনামের সাথে পালন করেন। তিনি বিভিন্ন জায়গায় তাফসীর মাহফিল মাধ্যমে সঠিক কুরআন-হাদীস ভিত্তিক আলোচনা করে সমাজের মানুষকে ইসলামের প্রতি আসক্ত করতে সক্ষম হন। তাঁর মধুময় ব্যবহারে সকলেই তাঁকে মুহাব্বত করে। তিনি যখন হাদীসের দারস দিতেন তখন সকল ছাত্র অধিক মনোযোগ সহকারে শুনতো। তিনি হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এমনভাবে করতেন যার ফলে সকল ছাত্র সহজে তা বুঝতে সক্ষম হতো। তিনি বহু প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং বহু প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, সহ সভাপতি ও সেক্রেটারি পদ অলংকৃত করেন। তিনি সমাজের বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে বহু অবদান রাখেন।[৬২৭]

---

[৬২৬] গবেষক ২৮.০৪.২০১৬ তারিখে সাক্ষাৎকার অনুযায়ী লিখিত।
[৬২৭] গবেষক ১২.০৭.২০১৫ তারিখে সাক্ষাৎকার অনুযায়ী লিখিত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-৩.৫ : মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল হক (রহ.) (১৯২৩-২০০৯খ্রি.)

মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল হক (রহ.) ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে চাঁদপুর জেলার সদর উপজেলার সকদী পাঁচগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ আলী মিয়াজী ও মাতার নাম মোসাম্মাৎ হাজেরা বেগম। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় সদকী পাঁচগাঁও গ্রামে অবস্থিত মাদ্রাসায়। এরপর কয়েক বছর যাবৎ শাহতলী মাদ্রাসায় পড়ালেখা করেন। পরবর্তীতে হাজীগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসায় কয়েক বছর পড়ালেখা করেন এবং অত্র মাদ্রাসা থেকে অত্যন্ত সুনামের সাথে আলিম পাশ করেন। অতঃপর তিনি নোয়াখালী চৌমুহনী ইসলামীয়া মাদ্রাসা থেকে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ফাযেল পাশ করেন। ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান সৃষ্টির পর কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। তিনি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় কামিল শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব-পাকিস্তান মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে কামিল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। সে সময় ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় তাঁর উল্লেখযোগ্য ওস্তাদ ছিলেন, মাওলানা জাফর আহমাদ উসমানী (রহ.), মাওলানা আবদুর রহমান কাশগাড়ি (রহ.), মুফতী আমীমুল ইহসান (রহ.), মাওলানা আবদুস সাত্তার বিহারী (রহ.), মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁন (রহ.) ও মাওলানা সুলতান মাহমুদ (রহ.) প্রমূখ।

মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল হক (রহ.) ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র হজ্জ সম্পাদন করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন চার সন্তানের জনক। তাঁরা হলেন, মাওলানা মুহাম্মদ এমদাদুল্লাহ, মাওলানা মুহাম্মাদ জাফর আহমাদ, ড. মুহাম্মদ আবদুল হক, ক্বারী মুহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল। মাওলানা আমিনুল হক (রহ.) ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে ইলমে দ্বীনের খেদমত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অসবর গ্রহণ করার পর ২০১০ খ্রিস্টাব্দে ২ মার্চ ইন্তেকাল করেন এবং পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[৬২৮]

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল হক (রহ.)-এর অবদান-

মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল হক ছিলেন একজন প্রখ্যাত আলেম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, তিনি ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ হতে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। বিশেষ করে তিনি হাদীসের খেদমতে তাঁর পুরো জীবনকে অতিবাহিত করেন।

তিনি ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে শাহতলী আলিয়া মাদ্রাসায় হেড মাওলানা হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন এবং কয়েক বছর যাবৎ অত্র মাদ্রাসায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহের অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে হাজীগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসায় কিছুদিন অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে মাদারীপুরের বাহাদুরপুর আলিয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। আলেম হিসেবে তিনি ছিলেন উঁচু-মাপের আলেম এবং তার শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিলো খুবই অনুকরণীয়। এরপর তিনি ঢাকা দারুস সালাম ফুরফুরা মাদ্রাসা ও চাঁদপুর মহামায়া কওমী মাদ্রাসায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ বিশেষ করে ইলমে-হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ কিতাবাদি অধ্যাপনা করেন। তিনি কুরআন-হাদীসের শিক্ষাদান পদ্ধতিতে প্রাচীন মুহাদ্দিস ও ফকীহদের নিয়ম অনুসরণ করতেন। তিনি প্রতিটি হাদীস ও মাসয়ালা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ উপস্থাপন করতেন। প্রতিটি মাসয়ালা চার মাযহাবের আলোকে বর্ণনা করতেন। তাঁর প্রতিটি দারস এমনভাবে উপস্থাপন করতেন যাতে করে ক্লাসের সকল ছাত্র সহজে বুঝতে পারে, সে দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে দারস প্রদান করেন। মাওলানা আমিনুল হক ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে হাজীগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসার

---

[৬২৮] ড. মুহাম্মদ আবদুল হক কর্তৃক লিখিত তাঁর জীবনী থেকে সংগৃহীত। পৃ. ১-৭ (অপ্রকাশিত)।

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃপক্ষ তাঁকে অত্র মাদ্‌রাসায় পুনরায় যোগদানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তাই তিনি তাঁদের অনুরোধের কারণে পুনরায় হাজীগঞ্জ আলিয়া মাদ্‌রাসায় যোগদান করেন এবং ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অত্র মাদ্‌রাসায় অত্যন্ত সুনামের সাথে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক খেদমত করেন এবং শিক্ষা উন্নয়নে বিভিন্ন সংস্কারমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে শহরতলী আলিয়া মাদ্‌রাসায় উপাধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে উক্ত কর্ম-সম্পাদন করেন এবং মাদ্‌রাসা শিক্ষার ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেন। পরবর্তীতে উক্ত মাদ্‌রাসায় শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুরোধে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে উক্ত পদে কর্মরত থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি উক্ত মাদ্‌রাসা পরিচালনাসহ অত্র এলাকায় বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে বিশেষ সংস্কারমূলক ভূমিকা পালন করেন। তিনি ফতোয়া ও ইল্‌মুল ফারায়েজ বিষয়ের ওপর বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। যে কোনো ফারায়েজ বিষয়ক মাসয়ালা তাৎক্ষণিক সমাধান দিতে পারতেন। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে হজ্জ পালনের পর দেশে প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় হাদীসের খেদমত শুরু করেন। কিছুদিন হাজীগঞ্জ আলিয়া মাদ্‌রাসায় ইলমে হাদীস ও তাফসীরের অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে শাহতলী আলিয়া মাদ্‌রাসায় ইলমে হাদীসের অধ্যাপনাসহ ইসলামী শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ অধ্যাপনা করেন। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকা দারুস সালাম মিরপুর মাদ্‌রাসায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে ইলমে দ্বীনের খেদমত করেন এবং ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উক্ত দ্বীনী খেদমত খুব সুচারুরূপে পরিচালনা করেন।[৬২৯] চাঁদপুর মহামায়া মাদ্‌রাসাটি তাঁর গ্রামের নিকটে অবস্থিত, উক্ত মাদ্‌রাসার কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুরোধে তিনি অত্র মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে গ্রামে চলে যান এবং উক্ত মহামায়া মাদ্‌রাসায় ইলমে হাদীসের খেদমতে নিজেকে নিযুক্ত রাখেন। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি নিয়মিত হাদীসের দারস খুব সুন্দরভাবে চালিয়ে যান। তাঁর হাদীসের পাঠদান পদ্ধতি ছিল খুবই চমৎকার। তিনি যখন হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতেন তখন হাদীসের আলোকে প্রতিটি মাযহাবের উদ্ধৃতি বর্ণনা করতেন। হাদীসের অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় তিনি মুহাদ্দিসগণের রীতি অনুসরণ করতেন। তিনি বর্ণিত হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত কুরআনের আয়াত বা অন্য কোনো হাদীস খুঁজে বের করতেন। প্রতিদিন ক্লাস শুরু করার পূর্বে হাদীসের নিয়মিত অধ্যয়ন না করে ক্লাসে পাঠদান করতেন না। তিনি প্রতিটি ক্লাসের পূর্বে নতুনভাবে অজু ও পবিত্র হয়ে পাঠদান করাতেন। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক অধ্যয়ন না করে নিজের মেধা ও স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করে বা পুরাতন প্রস্তুতির ওপর নির্ভর করে পাঠদান করানো অতি দূষণীয় মনে করতেন। তিনি বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও উচ্চকণ্ঠে দ্বিধাহীনভাবে বলিষ্ঠতার সাথে হাদীস পাঠ করতেন। যার কারণে ছাত্ররা তাঁর ক্লাসে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে নীরবে হাদীস শ্রবণ করত। তিনি ছাত্রদেরকে প্রতিটি সহীহ হাদীসের ওপর আমল করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। দলীল হিসেবে তিনি প্রাচীন ইমামগণের উদাহরণ পেশ করেন। কেননা প্রত্যেক ইমামগণ তাঁদের জ্ঞাতসারে সকল সহীহ হাদীসের ওপর আমল করার চেষ্টা করেছেন।[৬৩০] তিনি বলতেন জীবনে একবার হলেও প্রতিটি হাদীসের ওপর আমল কর। আর হাদীসের ওপর আমল করতে গিয়ে সমাজে যেন ভুল বুঝাবুঝি না হয়, সে দিকে সতর্ক থাকার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি উপমহাদেশের বড় বড় আলেমগণের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও পরামর্শ করতেন এবং আলেমদেরকে সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে দ্বীনী শিক্ষাসহ ইসলামের তাহযীব-তামাদ্দুন সম্পর্কে সচেতন করতেন এবং শরীয়তের সঠিক দিকনির্দেশনা বর্ণনা করতেন।

---

৬২৯ প্রাগুক্ত পৃ. ৯-১২।

৬৩০ গবেষকের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উক্ত তথ্য সংগৃহ, ড. মুহাম্মদ আবদুল হক বিন আমিনুর হক (ধ্রু.) হতে প্রাপ্ত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে বিভিন্ন কুসংস্কার দূরীকরণে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। যৌতুক ও সামাজিক অপরাধের বিষয়ে তিনি ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, বিচার ফায়সালাসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি কয়েকটি মাদ্‌রাসা, মসজিদ, মক্তব ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘদিন যাবৎ জুমা'আ ও ঈদের নামাযের ইমামতি করেন। সামাজিক বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জোরালো ভূমিকা পালন করেন। তিনি ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে অসামান্য অবদান রাখেন। দীর্ঘ ৬০ বছরের দ্বীনী শিক্ষাদানে মাধ্যমে শত শত ছাত্র তাঁর কাছ থেকে কুরআন হাদীসের শিক্ষা লাভ করে ইসলামের প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন।[৬৩১]

মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল হক (রহ.) সম্পর্কে শিক্ষাবিদ ও গুণীজনের অভিমত-

১। ড. মুহাম্মদ আবদুল হক বিন মুহাম্মদ আমিনুল হক (রহ.) তিনি বলেন, আমার পিতা ছিলেন একজন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, দীর্ঘদিন পর্যন্ত বুখারী শরীফের দারস প্রদান করেন। তিনি ছিলেন অতি উঁচুমানের মানুষ। যেমন ছিলেন ভালো ছাত্র, আদর্শ আবেদ, সফল দায়ী ইলাল্লাহ, তেমনিভাবে তিনি ছিলেন আদর্শ পরিবার পরিচালক। তিনি শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে মানুষের মেধাবিকাশ ঘটাতে এবং মানুষের কাছে আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবনবিধান ইসলামের সঠিক পরিচয় তুলে ধরতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান। কুরআন-হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা মানুষের মাঝে তুলে ধরে মানুষকে মুক্তি ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে ব্যাপক সফলতা লাভ করেন।[৬৩২]

২। মাওলানা ছগীর হোসাইন, অধ্যক্ষ সালেহা বাদ ফাযেল মাদ্‌রাসা চাঁদপুর, তিনি বলেন, মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল হক (রহ.) ছিলেন একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির, ফকীহ ও সমাজ সংস্কারক। ইলমে দ্বীনের খেদমতে তিনি সর্বোচ্চ পর্যায়ে ইনসানে কামিল হিসেবে অবদান রাখেন। তাঁর মিশন ও ভিশন ছিলো আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের আদর্শকে নিজ জীবন পরিবার, সমাজ ও সমগ্র মানবতার মধ্যে বাস্তবায়িত করা। যার কারণে তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ইলমে-দ্বীনের খেদমতে নিজের জীবনকে অতিবাহিত করেন। তিনি সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে সমাজ উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন।[৬৩৩]

৩। মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ শাহজালাল, প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ সৈয়দপুর কামিল মাদ্‌রাসা কুমিল্লা, তিনি বলেন, মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল হক (রহ.) তিনি দীর্ঘকাল পর্যন্ত মুহাদ্দিস হিসেবে ইলমে হাদীসের খেদমত করেন, তিনি নিয়মিত সুন্নাতের অনুসরণ করতেন। তিনি ছিলেন নীরব প্রকৃতির মানুষ ও জাতির পথ-প্রদর্শন। বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন খুবই কঠোর। হাদীস পড়ানো পদ্ধতি ছিল খুবই চমৎকার। হাদীসের ইখতিলাফী মাসয়ালা অত্যন্ত গোছালোভাবে সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করতেন। যার ফলে ছাত্ররা সহজে হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অতি সহজে আয়ত্ত করতে পারতো। পরিশেষে বলা যায় তিনি ছিলেন একজন ইলমে-দ্বীনের সফল প্রচার-প্রসারক।[৬৩৪]

---

[৬৩১] মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল হক (রহ.)-এর ছাত্র মাওলানা আনিছুর রহমান, অধ্যক্ষ, রাজার গাঁও ফাযেল মাদ্‌রাসা চাঁদপুর ১৫.০৩.১৫ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত সাক্ষাৎকার।

[৬৩২] গবেষকের সাথে পূর্ব পরিচিত সূত্রে ১১.০৭.২০১৫ তারিখে সাক্ষাৎকার অনুযায়ী লিখিত।

[৬৩৩] গবেষকের সাথে ২৫.০৬.২০১৫ তারিখে সাক্ষাৎকার অনুযায়ী লিখিত।

[৬৩৪] গবেষকের সাথে ১৪.০৮.২০১৫ তারিখে সাক্ষাৎকার অনুযায়ী লিখিত।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
বৃহত্তর কুমিল্লার সমাজ ও সংস্কৃতিতে আলেমগণের অবদান

পরিচ্ছেদ-১ : আলেমগণের চেতনা	২৭৭
পরিচ্ছেদ-২ : আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তার	২৭৮
পরিচ্ছেদ-৩ : আত্মশুদ্ধিকরণ	২৭৯-২৮০
পরিচ্ছেদ-৪ : সামাজিক উন্নয়ন	২৮০
পরিচ্ছেদ-৫ : অর্থনৈতিক উন্নয়ন	২৮১-২৮২
পরিচ্ছেদ-৬ : দ্বীনী শিক্ষা কার্যক্রম	২৮২-২৮৫
পরিচ্ছেদ-৭ : অনৈসলামীক এনজিওদের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে ভূমিকা	২৮৫-২৮৬
পরিচ্ছেদ-৮ : ইসলামী লেবাসে অইসলামী কার্যক্রম	২৮৬-২৮৮
পরিচ্ছেদ-৯ : বিভিন্ন কুসংস্কার দূরীকরণ	২৮৯
পরিচ্ছেদ-১০ : রাজনৈতিক ভূমিকা	২৯০-২৯২

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বৃহত্তর কুমিল্লার সমাজ ও সংস্কৃতিতে আলেমগণের অবদান

বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার আলেমগণ আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারসহ দেশ, জাতি ও ধর্মের জন্য ব্যাপক অবদান রেখে আসছে। শিক্ষা সংস্কৃতি বিকাশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারে, বাতিল ও কুসংস্কার প্রতিরোধে, খ্রিস্টান মিশনারি, এনজিওদের অপতৎপরতা প্রতিরোধে, কাদিয়ানী ও বিদ'আতি ফিতনা প্রতিরোধে এবং সমাজ সংস্কারে অর্থাৎ ইসলাম প্রতিষ্ঠায় সকল প্রকার বাতিল প্রতিরোধে বৃহত্তর কুমিল্লা আলেমগণের ব্যাপক অবদান রাখেন।

পরিচ্ছেদ-১ : আলেমগণের চেতনা

মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা। দৈনন্দিন জীবনে মহান আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং নবী রাসূলগণের দেখানো পথ অনুযায়ী জীবন-যাপন করাই ইবাদত। মূলত ইবাদতের মাধ্যমেই মহান আল্লাহর অনুগত্য ও দাসত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এর মধ্যেই মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ "আমি জ্বীন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র ইবাদতের জন্য"।[৬৩৫]

ইবাদত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তা'আলার জন্য না হলে আল্লাহ তা'আলার তা কবুল করবেন না। তাই কীভাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করলে ও জীবন-যাপন করলে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তা শেখানোর জন্য নবী-রাসূলগণের (সা.) আগমন হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের অনুসরণে বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ "তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য কর এবং উলুল আমরদের আনুগত্য কর"[৬৩৬] আর আলিমগণ সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের উত্তসূরি হিসেবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য ও একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করে থাকেন। আল্লাহর দেওয়া বিধিবিধান মোতবেক নিজেদেরকে ও সমাজের মানুষদেরকে পরিচলানা করার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। আর এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল মানবজাতিকে উন্নত চরিত্রের অধিকারী বানানো এবং একটি আদর্শ সমাজ গঠন করা। তাই এজন্য প্রয়োজন কতিপয় মৌলিক নীতিমালা অনুসরণ করা। আলেমগণ সেই সব নীতিমালা অনুসরণ করে তা সমাজে বাস্তবায়ন করেন।

---

৬৩৫ আল-কুরআন; সূরা আয্-যারিয়া : ৫৬।
৬৩৬ আল-কুরআন; সূরা আন-নিসা : ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-২ : আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তার

ইংরেজদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির আগ্রাসনের মুখে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখা এবং তা বিকাশে বৃহত্তর কুমিল্লার আলেমগণের অবদান উল্লেখযোগ্য। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা ধর্মীয় শিক্ষা ধারার অতি প্রাচীন ধারায় সংস্কার করে তদস্থলে আধুনিক সার্বজনীন সংস্কারমূলক শিক্ষা ধারা প্রবর্তন করে এবং শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। কেননা শিক্ষা মৌলিক উদ্দেশ্য হলঃ

- শিক্ষার্থীর নৈতিকতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটানো।
- আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.)-এর পথ ও মতাদর্শ সম্পর্কে অবগতি লাভ করা।
- শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হওয়ার মাধ্যমে হক ও বাতিলের পার্থক্য নিরূপণ করা।
- আহরিত জ্ঞানের আলোকে নিজেকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আখেরাতের সফলতা লাভ করা এবং সমাজ সংস্কারসহ সকল মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রণীত এ শিক্ষা ধারার মাধ্যমে নৈতিকভাবে আদর্শ মানুষ তৈরি করা। আর এ মহৎ কাজটি সকল আলেম সমাজের মাধ্যমেই সম্ভব। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

  فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

  "আর তাঁদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ বের হয় না কেন, যাতে তাঁহারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং তাঁদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে। যখন তাঁরা তাদের নিকট ফিরে আসে।"[৬৩৭]

আজ পর্যন্ত আরবীও ইসলামী শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং বিস্তারকে নিজেদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বহু নির্যাতন, নিদারুণ অভাব ও অনটন ভোগ করেছেন। তবু তাঁরা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় এবং ইলমে-দ্বীনের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে জীবন বাজি রেখে ইসলামী শিক্ষার বিকাশে ব্যাপক অবদান রেখে গেছেন। নতুন নতুন মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা, ফ্রি ও অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন, বিনাবেতনে কিংবা নামমাত্র বেতনে শিক্ষাদান, ওয়াজ নসিহত, দ্বীনের দাওয়াত ও গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করেন। তাঁদের ইখলাস, আন্তরিকতা ও বহু ত্যাগের বদৌলতে বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ পুরো বাংলাদেশে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসার ছড়িয়ে পড়ে। তাঁদের প্রচেষ্টার ফলে দেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামে অন্তত একটি করে ধর্মীয় প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছে।

---

[৬৩৭] আল-কুরআন; সূরা আত-তাওবা : ১২২

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-৩ : আত্মশুদ্ধিকরণ

প্রত্যেক মানুষের জন্য আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। স্বীয় আত্মাকে সব ধরনের পাপ-পংকিলতা ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত রাখাই আত্মশুদ্ধি। বস্তুত দেহ ও অন্তরের সমন্বয়ে মানুষ গঠিত। মানুষের অন্তর যেরূপ নির্দেশনা প্রদান করে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তদ্রূপ কাজ করে থাকে সুতরাং অন্তরের সংশোধনই হলো আত্মশুদ্ধি। আত্মশুদ্ধির করণীয় সম্পর্কে বুজুর্গ আলিমগণ বলেন, তিনটি বস্তু রিপুকে দুর্বল ও সবল করতে পারে। (১) ইচ্ছার মুখে লাগাম দেয়া এবং কামনা-বাসনা চরিতার্থ না করা। (২) ইবাদতের জন্য পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে তাকে দুর্বল রাখা। (৩) আল্লাহর কাছে বেশি বেশি সাহায্য কামনা করা এবং কান্নাকাটি করে বিশেষভাবে মুনাজাত করা। কেননা এ থেকে মুক্তি দেয়ার আর কেউ নেই। হযরত ইউসুফ (আ.) মহান আল্লাহর কাছে বলেছিলেন: لامارة بالسوء الا ما رحم ربي "আমার আল্লাহ আমাকে না বাঁচালে প্রবৃত্তির তো কাজই হল বারংবার অন্যায় কাজে উদ্বুদ্ধ করা।"[৬৩৮] অতঃপর সম্পূর্ণভাবে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নিবে। কারণ যারা পরিশুদ্ধ তারা একান্ত মুত্তাকী ও পরহেজগার।

ইসলামী সমাজের সদস্যগণ যদি উৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী না হন, তাহলে সে সমাজকে ইসলামী সমাজ বলা যায় কি করে? এক্ষেত্রে আলিমগণ আত্মশুদ্ধির পথ প্রদর্শক। আর তা বাস্তবেও সত্য যে, ভিত্তি, শক্তি, উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন আলেমগণের সংস্পর্শ। যার কোনো বিকল্প নেই। তাঁদের মাধ্যমেই ধর্মীয় অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব।[৬৩৯]

মহান আল্লাহ মানবজাতির হিদায়াতের জন্য এবং বিভিন্ন বিষয়ে সতর্ক করার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। কেননা নবুওতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। কিয়ামত পর্যন্ত কোনো নবী-রাসূল দুনিয়ায় আসবে না। মহানবী (সা.) মাধ্যমে আরও জানতে পেরেছি যে, নবী-রাসূলগণের রেখে যাওয়া দ্বীন আলিম-সমাজই জীবন্ত করে রাখবেন। তাছাড়া পবিত্র কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা ভীতি প্রদর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন। নবী-রাসূল আগমনের দরজা বন্ধ। তবে কেউ না কেউ এ দায়িত্ব পালন করবেন। তা না হলে জাতি গোমরাহ হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ তা'আলা এজন্য একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে নবী-রাসূলদের রেখে যাওয়া দায়িত্ব পালন করাবেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদেরকে মানব-জাতির কল্যাণের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা মানবজাতিকে সৎকাজের আদেশ প্রদান করবে, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখবে।"[৬৪০]

তাই আলেমগণ নবী রসুলগণের রেখে যাওয়া দায়িত্ব তথা ইসলামের প্রচার-প্রসারে বিশ্বব্যাপী অসামান্য অবদান রেখে আসছেন। এমনিভাবে আলেমগণ সমাজের মানুষকে গোমরাহির পথ থেকে বের করে হেদায়েতের পথ দেখিয়েছেন। ওয়াজ নছিহত তাফসীর মাহফিল, জনসভা, জুমার খোৎবাহ, তা'লিম, দাওয়াতে তাবলীগ, সিম্পোজিয়াম, সেমিনার ও লেখনীর মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত

---

[৬৩৮] আল-কুরআন; সূরা ইউসুফ : ৫৩।

[৬৩৯] ড. তাহের আল-কাদেরী, ভাষান্তরঃ মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ, তাসাউফের আসল রূপ, (চট্টগ্রাম: সানজরী পাবলিকেশন, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৪১।

[৬৪০] আল-কুরআন; সূরা আলে-ইমরান : ১০।

Dhaka University Institutional Repository

দেখাবেন। এছাড়া একজন মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার জীবনধারার মান কেমন হবে সে সম্পর্কেও আলেম সমাজ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। আর আলেমগণ সমাজের সকল জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন পূরণ করার লক্ষ্যে একমাত্র ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন। তাঁদের নির্দেশ ও উপদেশ ব্যতীত সুন্দর ও সুশৃঙ্খল সমাজ গঠন করা কল্পনা করা অসম্ভব। আর হেদায়েতের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا "নিশ্চয়ই আমি হিদায়াতের পথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, ইচ্ছা করলে কেউ তা গ্রহণ করতে পারে আবার কেউ গ্রহণ করতে নাও পারে।"[৬৪১] আর এ হেদায়েতের প্রতি বিশ্বমানবতাকে আহ্বান করে একমাত্র আলেমগণই। মানুষের মনমগজ থেকে বাস্তববাদী চিন্তা ধারার অবসান ঘটিয়ে যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে সঠিক চিন্তা-চেতনার উদ্ভব ঘটিয়ে চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে সুন্দর ও সুশৃংখল সমাজ গড়তে ব্যাপকভাবে সহায়তা করে। সমাজকে সঠিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করতে হলে আলিম সমাজের কোনো বিকল্প নেই। কেননা সুন্দর ও সুশৃংখল সমাজ গঠনে আলিমগণের অবদান ব্যাপকভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরিচ্ছেদ-৪ : সামাজিক উন্নয়ন

একটি সুস্থ ও সমৃদ্ধ সমাজের জন্য প্রয়োজন সুস্থ-চিন্তার অধিকারী আদর্শবান নাগরিক। আর এজন্য শর্ত হলো আদর্শ শিক্ষা এবং সৎ ও পরিমার্জিত জীবনের প্রশিক্ষণ। আলেম সমাজ এ প্রয়োজনের তাগিদে শিক্ষানীতির মাধ্যমে উন্নত সমাজ গঠনে ব্যাপক অবদান রাখেন। তাঁরা শিক্ষা ধারায় কুরআন-সুন্নাহকে শিক্ষার মৌলিক ও কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করেছে। কুরআন-হাদীসের আলোকে যে সমাজ গঠনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে আলেম সমাজ সে শিক্ষার নির্দেশ প্রদান করেন। তাঁরা দ্বীনী শিক্ষাদানের পাশাপশি পরিবার ও সমাজ-জীবনে বাস্তব প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ নজর প্রদান করেন। সমাজের পরিবেশকে এভাবেই সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। কোনো আলেম নৈতিকতা-বিরোধী কোনো কার্যলাপে লিপ্ত হওয়া তো দূরের কথা এমনকি প্রকৃত আমলের ক্ষেত্রে সামান্য দুর্বলতা প্রদর্শন করলে সে নিজেই নিজেকে অপরাধী ভাবতে শুরু করে। ফলে শরীয়তের চাহিদা মোতাবেক নিজেকে গড়ে তোলা তাঁর জন্য সহজ হয়। এমনিভাবে একজন আলেমকে ব্যক্তি জীবনে চরিত্রবান, ন্যায়-পরায়নসহ সৎ পরিমার্জিত জীবনবোধ তথা কুরআন-সুন্নাহর পূর্ণ অনুসারী হিসেবে গড়ে তোলা হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত সে ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবেচেয়ে তাকওয়াবান।"[৬৪২] এরা যে শুধু ব্যক্তি জীবনে আদর্শ নাগরিক হিসেবে জীবন-যাপন করে তাই নয়, বরং পুরো সমাজ-জীবন যেখানেই অবস্থান করে, তাঁদেরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে একটি আদর্শিক ও নৈতিক পরিমণ্ডল। তাঁরা সমাজের মানুষকে সৎ পরিমার্জিত জীবনের প্রতি অনুপ্রাণিত করে আদর্শবান নাগরিকরূপে গড়ে তুলতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে যা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

---

[৬৪১] আল-কুরআন; সূরা আদ-দাহর (আল-ইনসান) : ৩।
[৬৪২] আল-কুরআন; সূরা আল-হুজুরাত : ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-৫ : অর্থনৈতিক উন্নয়ন

অর্থ মানুষের জীবনে যেমন স্বাচ্ছন্দ্য ডেকে আনে তেমনিভাবে অনেক সময় বিপদও নিয়ে আসে। জীবন চলার জন্য অর্থের প্রয়োজনকে ইসলাম যেমনি তাগিদ দিয়েছে, তেমনিভাবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের আসক্তিকেও ইসলাম অনুমোদন করে না। আলেম সমাজ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখেই অগ্রসর হয়েছে এবং অল্পতেতুষ্টি, কষ্ট, সহিষ্ণুতা ও লৌকিকতা বিবর্জিত পরিশ্রমী জীবনকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাই নিজেরা অর্থনৈতিকভাবে নিগ্রহের স্বীকার হয়েও বিরাট অর্থনৈতিক খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন এবং অর্থনৈতিক সুষ্ঠু বিকাশ ও সমৃদ্ধ অর্থ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আলেম সমাজ অনন্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আর অর্থনৈতিক সুষ্ঠু বিকাশের জন্য আবশ্যকীয় হলো সম্পদের নিরাপত্তা। নিরাপত্তাহীন সম্পদ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বাধাগ্রস্ত করে। তাই অন্যায় আত্মসাতের পথ রুদ্ধ করতে ইসলাম হুক্কুল ইবাদের যে গুরুত্ব দিয়েছে, উলামায়েকেরামগণ তা সমাজের মানুষের নিকট ব্যাপক গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছে এবং আখেরাতের জবাবদিহিতার চেতনায় সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। ফলে অন্যের হক আত্মসাৎ করাকে মানুষ পাপ-জ্ঞান মনে করে নিজেরা তা থেকে বিরত থাকে। যার ফলে সমাজের ন্যায়পরায়ণতার পথও সুগম হয়।

অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাশের জন্য অন্যতম জরুরি বিষয় হলো চাহিদার নিয়ন্ত্রণ। কারণ লাগামহীন চাহিদা বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি, আত্মসাৎ, ঘুষ, সুদ ইত্যাদি অর্থনৈতিক দুরাচারের জন্ম দেয়। আলেম সমাজ মানুষের এ চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে, ওয়াজ নসীহত, কুরআনের তাফসির ও ধর্মীয় বই পুস্তকসহ বিভিন্ন ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্নীতি, আত্মসাৎ, ঘুষের দুনিয়াবী এবং পরকালীন ক্ষতির কথা মানুষের সামনে তুলে ধরার মাধ্যমে ব্যাপক সংস্কার করেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ "আল্লাহ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বাড়িয়ে দেন।"[৬৪৩] অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে হলে অপচয় রোধ করা ও মিতব্যয়ী হওয়া অপরিহার্য। ইসলাম অপচয় রোধ করা ও মিতব্যয়ী হওয়ার যে বিধান দিয়েছে আলেম সমাজ তা সমাজের সামনে সুষ্ঠুভাবে যুক্তিসহ তুলে ধরছে।

অর্থ যদি ব্যক্তির হাতে পুঞ্জীভূত হয়ে পড়ে তাহলে অর্থ সম্পদের আবর্তন বাধাগ্রস্ত হয় এবং অর্থনৈতিকভাবে ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। এতে সমাজের এক শ্রেণির মানুষ অর্থনৈতিকভাবে বিশাল সম্পদের অধিকারী হয়ে উঠে। আর সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী চরমভাবে দারিদ্র্যের শিকার হয় এবং গুটিকয়েক মানুষের নিকট সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণ জিম্মি হয়ে পড়ে। ইসলাম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখার জন্য এবং সম্পদ কারো হাতে ব্যক্তিগত না হয়ে পড়ার জন্য যেসব বিধি, ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। আলেম সমাজ সমাজের সামনে তা বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। কৃপণতার পরিনাম দানের ফযিলত এবং যাকাত ফিতরার বিধান সম্পর্কে সমাজকে সচেতন করে তুলে একমাত্র আলেম সমাজ। ফলে অর্থনীতিতে একটি স্বাভাবিক আবর্তন অব্যাহত রয়েছে। ওয়াজ ও তাফসির মাহফিলের এবং ইসলামী পুস্তক প্রকাশনার মাধ্যমে আলেমগণ সমাজ পরিচলনার ক্ষেত্রে বিশেষ খিদমতের আঞ্জাম দিয়ে চলছে।

প্রতারণা, শোষণ ও মধ্য-স্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য সুষ্ঠু অর্থনৈতিক বিকাশের পথে বড় অন্তরায়। ইসলাম এসকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সর্বপ্রকার সুদি লেনদেনকে হারাম করেছে। আলেম সমাজ

---

৬৪৩ আল-কুরআন; সূরা আল-বাকারা : ২৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের এই শাশ্বত বিধান সমাজের সামনে তুলে ধরে তাদেরকে সতর্ক করে আসছে এবং যাবতীয় সুদি লেনদেন থেকে বেঁচে থাকার জন্য সমাজের মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। এভাবে আলেম সমাজ সকল অন্তরায়কে দূরীভূত করে একটি সুষ্ঠু অর্থনৈতিক বিকাশের পথকে সমাজে মানুষের সামনে সুন্দরভাবে প্রশস্ত করে তুলে ধরেছে। তাছাড়া আলেম সমাজ কোনোরূপ সরকারি সাহায্য ছাড়াই সমাজের মানুষ থেকে যত সামান্য অনুদান নিয়ে এতিমখানা খুলে অগণিত এতিম অসহায়ও দুঃস্থ মানুষকে থাকা খাওয়াসহ সম্পূর্ণ অবৈতনিকভাবে শিক্ষাদান করে আদর্শ মানুষ হিসেবে সমাজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা মিতব্যয়ী দৃষ্টিভঙ্গি ও আমানতদারীর কারণেই তাঁদের পক্ষে এ সকল বৃহৎ খিদমত সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে। আলেম সমাজের বদৌলতে আজো এক শ্রেণির মানুষ পরিমার্জিত ও সততার জীবন রক্ষা করে চলছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا "হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো।" যদি সমাজের প্রতিটি মানুষ ইসলামের নির্দেশিত পথে চলতো তাহলে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ সুখ সমৃদ্ধি অর্জনে আরও ত্বরান্বিত হতো।

সকল শ্রেণির মানুষের কাছে দ্বীন পৌঁছে দেওয়ার জন্য দ্বীনী দাওয়াতের বিকল্প নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর থেকে সব যুগের উলামায়ে কেরাম দ্বীনী দাওয়াতের মহান খেদমত আঞ্জাম দিয়ে এসেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় ইসলামের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে আলেম সমাজ বাস্তবমুখী বহু কর্মসূচি নিজের দায়িত্ব মনে করে তা পালন করে চলছে।

পরিচ্ছেদ-৬ : দ্বীনী শিক্ষা কার্যক্রম

দ্বীনী শিক্ষা সম্প্রসারণে পদক্ষেপ : ইসলামের প্রচার প্রসারের জন্য আলেমগণের সর্ববৃহৎ অবদান হলো দ্বীনী শিক্ষা সম্প্রসারণের আন্দোলন। এ শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আলেমগণ কতিপয় নীতিমালা তৈরি করে তা সমাজ উন্নয়নে বাস্তবায়ন করেন। তাঁদের পদক্ষেপগুলো নিম্নে উল্লেখিত পদ্ধতির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে সমাজ সংস্কারে ব্যাপক অবদান রাখেন।

- পবিত্র কুরআনের প্রাথমিক শিক্ষা নাজেরা ও হিফজের জন্য বৃহত্তর কুমিল্লাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মক্তব ও হিফজখানা প্রতিষ্ঠা করেছে।
- যোগ্য আলেমে দ্বীন তৈরি করার লক্ষ্যে এবং দ্বীনের প্রচার-প্রসার সূচারুভাবে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সারাদেশে বহু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেছে।
- শিক্ষার মান অক্ষুন্ন রাখা ও তার উন্নতি সাধনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে বিভিন্ন পরীক্ষা অংশগ্রহণ করছে।
- দ্বীনী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মেধাবী ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছে।
- বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠান ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছে।
- শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গড়ে ওঠেছে মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য পৃথক শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। যার ফলে শিক্ষার মান ব্যাপকভাবে উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

  فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Dhaka University Institutional Repository

"আর তাঁদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ বের হয় না কেন, যাতে তাঁহারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং তাঁদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে। যখন তাঁরা তাদের নিকট ফিরে আসে।"[৬৪৪]

তাফসির ও ওয়াজ মাহফিলের ব্যবস্থাপনা : তাফসির মাহফিল, ওয়াজ নসিহত ও ধর্মীয় সভাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আলেমগণ বাৎসরিক তাফসির মাহফিল ও ইসলামী আলোচনা সভার ব্যবস্থা করেন। এর দ্বারা বহু মানুষ হেদায়েত ও দ্বীনের প্রেরণা লাভ করে থাকে। এছাড়া দেশের প্রতিটি মসজিদে এবং প্রতিটি মহল্লায় ও বিভিন্ন বাসায় সাপ্তাহিক ও মাসিক দ্বীনি আলোচনা ও মাহফিল করে মানুষের মাঝে দ্বীনের আলো বিতরণ করেন।

ধর্মীয় বই পুস্তক রচনা ও প্রকাশনা : ইসলামের প্রচারের উদ্দেশ্যে আলেম সমাজ বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থাবলি রচনা ও প্রকাশনার মাধ্যমে ব্যাপক অবদান রাখেন। আরবী, উর্দু ও মাতৃভাষা অনেক ধর্মীয় মৌলিক বিষয়ের গ্রন্থাবলি রচনা ও প্রকাশ করেন। এসব গ্রন্থাবলি দ্বারা অগণিত মানুষ ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করে হেদায়েত গ্রহণ করে চলছে।

দ্বীনের প্রচার-প্রসার : আলেম সমাজের অবদানে বিশ্বব্যাপী দ্বীনের প্রচার-প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে চলেছে। তাঁদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আলেমগণ দ্বীনের দাওয়াতকে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিরাট অবদান রেখেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ। "আপনার পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন, হিকমতের সাথে ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে"।[৬৪৫] বাংলাদেশের তাবলীগ জামাতের অন্যতম মুরুব্বী আলহাজ্ব মাওলানা আলী আকবার (রহ.) যার মাধ্যমে অনেক অমুসলিম দেশে তাবলীগের কাজ চালু হয়েছে। তিনি বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার অন্যতম ফসল। তাছাড়া আলেম সমাজ তাবলীগের সাথে জড়িত থেকে দ্বীন প্রচারের এ মিশনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। তাবলীগ জামাত ছাড়াও বহু উলামায়ে কেরাম যারা বিভিন্নভাবে ইসলামের প্রচার-প্রসারে ব্যাপক অবদান রাখেন তাঁদের দাওয়াতী তৎপরতাকে কয়েকটি স্তরে বিন্যস্ত করা যায়। যেমন:-

- নিজ ঘরে দাওয়াতী কার্যক্রম।
- বন্ধু, প্রিয়জন ও প্রতিবেশীকে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া।
- মহল্লাবাসীর কাছে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া।
- দেশবাসীর কাছে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া ।
- বিশ্ববাসীর কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানো এবং ইসলামের শিক্ষা তুলে ধরা।

উলামায় কেরামগণের এই সংস্কারমূলক প্রক্রিয়া সাধারণ মানুষের জন্য দ্বীন ও শরীয়ত বুঝার বিষয়টিকে সহজ করে তুলেছে।

পীর-মাশায়েখদের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসার : উপমহাদেশে পীর মাশায়েখগণের মাধ্যমেই ইসলাম আগমন ও বিস্তার লাভ করেছে। তাঁদের বহু ভক্ত-মুরিদের ঈমান ও ইল্মী-আমলী উন্নয়নের ক্ষেত্রে হক্কানী পীর মাশায়েখগণের অবদান অপরিসীম। ইসলামের প্রচার-প্রসারে পীর মুরিদ ও খানকা

[৬৪৪] আল-কুরআন; সূরা আত-তাওবা : ১২২।
[৬৪৫] আল-কুরআন; সূরা আন-নাহল : ১২৫।

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপনের ক্ষেত্রেও রয়েছে তাঁদের অবদান ব্যাপক। বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় বহু পীর-মাশায়েখ জন্মগ্রহণ করে। তাঁদের বিভিন্ন সংস্কারমূলক অবদানে বৃহত্তর কুমিল্লাসহ সারা বাংলাদেশের সমাজ সংস্কৃতি ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। তাঁদের চেষ্টার ফলে মানুষ অপ-সংস্কৃতি থেকে নিজেকে রক্ষা করে এবং দৈনিক জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে সঠিক পথের সন্ধ্যান লাভ করে। তাঁদের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। তাঁরা বিভিন্ন জামে মসজিদ ও তাঁদের প্রতিষ্ঠিত খানকাসমূহে মাসিক ইসলাহী জলসায় ও ইজতেমার মাধ্যমে তাঁদের হাতে বহু মানুষ বাই'আত গ্রহণ করে নিজ নিজ আত্মশুদ্ধি করতেন। তাঁরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে উলামায়ে কেরাম ও সাধারণ মুরিদদেরকে ইসলাহী তা'লীম প্রদান করে থাকতেন।

উল্লেখ্য যে, এখানে হক্কানী পীরের পরিচয় তুলে ধরা প্রয়োজন। যারা আধ্যাত্মিক ব্যাধিসমূহ নিরাময় করে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য নিজেকে সমাজের সাধারণ মানুষে খেদমতে উৎসর্গ করেন তাঁদের পরিচয়ে নিম্নোক্ত শর্তগুলো পাওয়া আবশ্যক।

১) ধর্মীয় গুণসম্পন্ন ও সুন্নাতের পাবন্দী হওয়া।
২) আক্বীদাসমূহ আহলে সুন্নাতওয়ালা জামাতের মতানুসারে হওয়া ।
৩) কোন শায়েখ কর্তৃক তুরীকতের পক্ষ থেকে মুরিদ করানোর ইজাযতপ্রাপ্ত হওয়া।
৪) মুত্তাকী ও পরেজগার হওয়া।
৫) তার সম্পর্কে সমকালীন বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামগণের সুধারণা থাকা।
৬) মুরিদ কর্তৃক পীরকে সেজদা না করা।
৭) মুরীদের অধিকাংশ শরীয়তের অনুসারী হওয়া।
৮) পীরের দরবারে নাচ গান বা নির্দিষ্ট দিনে ওরছ না হওয়া।
৯) নিজে সর্বদা সুন্নাতের অনুকরণ করা এবং ইবাদতে মশগুল থাকা।
১০) মুরিদগণের সংশোধনের প্রতি সচেষ্ট হওয়া।

এমনিভাবে ভণ্ডপীরের ও কতিপয় লক্ষণ রয়েছে কেউ হক্কানী পীরের অনুসরণ করতে হলে তাকে অবশ্যই ভণ্ডপীরকে চিনতে হবে। এজন্য উলামায়ে কেরামগণ ভণ্ডপীরের কয়েটি লক্ষণ বর্ণনা করেন। যথা-

(১) ধর্ম সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকা(২) আক্বীদা সহীহ না হওয়া (৩) নেশা জাতীয় দ্রব্য পান করা (৪) বেগানা মহিলাদের সাথে পর্দা না করা (৫) তার মুরিদানের মাঝে ধর্মীয় চেতনা না থাকা (৬) মুরীদ কর্তৃক পীর কে সেজদা করা (৭) তার সম্পর্কে সমকালীন উলামায়ে কেরামগণের সুধারণা না থাকা (৮) তার দরবারে নাচ, গান, ঢোল ও নির্দিষ্ট দিনে ওরছ হওয়া।

বিদ'আত প্রতিরোধ : ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন যেভাবে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে তেমনিভাবে শরীয়তের জ্ঞান যথাযথ সম্প্রসারণ না হওয়ায় মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলেও ইসলামের প্রকৃত রূপ অবগতি লাভ করতে পারেনি। যার ফলে মুসলিম সমাজ পূর্বের বহু অনৈসলামীক রুসুম ও রেয়াজ থেকেও সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি। মানুষের অজ্ঞতার এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এক শ্রেণির অর্থলিপ্সু মানুষ পীর বুযুর্গদের মাযার নিয়ে ব্যবসায় মেতে উঠে। এ সকল মাযার ব্যবসায়ীরা অর্থের লোভে বিভিন্ন ধরনের বিদ'আত ও কুসংস্কারের জন্ম দেয়। বৃহত্তর কুমিল্লাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদেরকে বিদ'আত ও বিভিন্ন কুসংস্কারে গ্রাস করে ফেলে। বৃহত্তর কুমিল্লার আলেমগণ দেশের বিভিন্ন স্থানে সভা সমাবেশ ওয়াজ নসিহত ও বাহাস, মুনাজিরাসহ বিভিন্ন কিতাব রচনার

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে সমাজ থেকে বিদ'আত মুক্ত করতে এবং সুন্নাত প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। যার ফলশ্রুতিতে বৃহত্তর কুমিল্লাসহ সারাদেশ অনেকটা বিদ'আত মুক্ত হয়।

পরিচ্ছেদ-৭ : অনৈসলামীক এনজিওদের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে ভূমিকা

খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্মীয় অপতৎপরতা : বাংলা বিহার ও উড়িষ্যায় ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা ক্ষমতা দখল করার পর তারা বিভিন্ন পন্থায় এদেশে ব্যাপকভাবে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার শুরু করে। মুসলিম জাতি যখন সততা বিচ্ছিন্ন, দরিদ্র, পীড়িত, সামাজিক কুসংস্কার ও বিভিন্নভাবে আক্রান্ত এই সুযোগে খ্রিস্টান মিশনারি ও এন.জি.ও দুঃস্থ মানবতার সেবার নামে ধোকা দিয়ে আমেরিকায় ইউরোপে রয়েল সিটিজেন বানানোর লোভ দেখিয়ে মানুষকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা চালায়। এক্ষেত্রে তারা নিম্নোক্ত কতিপয় কর্মসূচি গ্রহণ করে।

(১) জনগণকে আর্থিকভাবে পঙ্গু করার পর তাদেরকে আর্থিক প্রলোভনের মাধ্যমে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

(২) খ্রিস্টানবাদী ধ্যান-ধারণার ওপর মিশনারি ব্র্যাক স্কুল ইত্যাদি নামে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে।

(৩) তাদের অধীনে চাকরিরত কর্মচারীদেরকে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করে। বৃহত্তর কুমিল্লার আলেমগণ খ্রিস্টান মিশনারি ও এন.জি.ও.-দের মিথ্যা ভণ্ডামী ও ষড়যন্ত্রের মুখোশ ওয়াজ ও তাফসির মাহফিল এবং লিখনীর মাধ্যমে সমাজের সামনে তুলে ধরে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। যাতে করে সমাজ তাদের ষড়যন্ত্র বুঝতে সক্ষম হয় এবং নিজেদেরকে তাদের ধোঁকায় শিকার হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়।

এন.জি.ও.-দের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ : এনজিও সংস্থা সরাসরি বিদেশী নাগরিক দ্বারা পরিচালিত। আবার কিছু এনজিও তাদের অর্থ ও পরিকল্পনায় এদেশীয়দের দ্বারা পরিচালিত। আবার কিছু এনজিও ধর্মান্তরিত করার কাজে সরাসরি জড়িত। আর কিছু এনজিও মুসলিম সমাজে তাদের অপসংস্কৃতির আগ্রাসন চালিয়ে খ্রিস্টানিজম প্রচারের পথ সুগম করে চলেছে। উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যই এনজিওগুলো পাশ্চাত্যের মতো মুসলমানদের পারিবারিক বন্ধন ও কাঠামো ধ্বংস করার লক্ষ্যে নারী সমাজকে প্রধান টার্গেট করে। তাদের স্বাবলম্বী করা, চাকরি ও ঋণ দেওয়ার বাহানায় প্রথমত ঘর থেকে বের করেছে। বাই সাইকেল ও হোন্ডার ড্রাইভিং শিখাচ্ছে। অভিশপ্ত সুদি লেনদেন থেকেই ঘৃণা বিদ্বেষ উঠিয়ে দিচ্ছে। নারীদের তাদের পিতা, ভাইদের কন্ট্রোল থেকে খুব সূক্ষ্মভাবে সরিয়ে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ইসলাম থেকে সরিয়ে নিচ্ছে। বিভিন্ন কলা-কৌশলে তাদেরকে ইসলাম ও আলেম সমাজের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলছে। তারা অত্যন্ত চতুরতা ও গোপনীয়তার সাথে চূড়ান্ত লক্ষ অর্জনে মিশন চালিয়ে যাচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর হাসানুজ্জামান চৌধুরী তাঁর এক বক্তৃতায় বলেন, আমি মনে করি দুর্নীতি দুষ্ট এনজিওর কার্যক্রম এদেশে নিষিদ্ধ করা উচিত। এরা দেশের শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত হানছে। তারা দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। জনগণের নামে তারা বিদেশ থেকে টাকা আনছে। এরা আমাদের মহিলাদের রাস্তায় নামিয়েছে। ইসলামী জীবন-বিধানের পরিপন্থি কাজ করছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষে সেবা হল এনজিওদের মুখোশ আর তাদের মূল লক্ষ্য হল সুদূর প্রসারী যা আমাদের জাতিসত্তার জন্য বড় হুমকি স্বরূপ। তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশসহ মুসলিম রাষ্ট্রে খ্রিস্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং সেই সাথে তাদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন একটি বিরাট জনগোষ্ঠী তৈরি করা। অভিযুক্ত এনজিওগুলোর অসংখ্য অপতৎপরতার মাঝে সবচেয়ে বড় ও মারাত্মক তৎপরতা হলো কূটকৌশলের মাধ্যমে ধর্মান্তকরণের প্রক্রিয়া। ধর্ম বিশ্বাসসহ পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর আইনের প্রতি ঘৃণা উপহাস সৃষ্টি করা এবং ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা। আমাদের সমাজে প্রচলিত পারিবারিক পদ্ধতির কাঠামো ভেঙ্গে দিয়ে পাশ্চাত্যের সমাজ ব্যবস্থার প্রতি উৎসাহিত করা। বিবাহ বহির্ভূত অবৈধ যৌনকর্মের ব্যাপক পৃষ্ঠাপোষকতা করা। অর্থনৈতিক শোষণ নির্যাতন এবং দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা। এমনকি এনজিওরা তাদের পরিকল্পনা বাধাগ্রস্ত না হওয়ার লক্ষ্যে দেশের অন্যতম চালিকা শক্তি তথা রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, কবি, সাহিত্যিকদের অধিকাংশকে বহু টাকার বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছে ও নিচ্ছে। আর যাদেরকে ক্রয় করা অসম্ভব তাদের ও হক্কানি আলেম সমাজ এবং ধর্মীয় গোষ্ঠী, তাদের বিরুদ্ধে স্বয়ং এনজিওরা এবং তাদের কাছে বিক্রিত গোলামরা একজোট হয়ে "এরা মৌলবাদী, ফতোয়াবাজ" নারী উন্নয়ন বিরোধী ও প্রগতি বিরোধী ইত্যাদি কাল্পনিক শব্দসমূহ আবিষ্কার করে জোরদার অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।" যাতে করে দেশের সকল নাগরিকরা এনজিও বিরোধী ধর্মীয় গোষ্ঠীকে নির্ভরযোগ্য আস্থাভাজন ও তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী মনে না করে।

পরিচ্ছেদ-৮ : ইসলামী লেবাসে অনৈসলামীক কার্যক্রম

কাদিয়ানি ফিতনা প্রতিরোধ : ইংরেজদের সাহায্যে ভারত উপমহাদেশ যেসব ফিতনার জন্ম হয়েছিল কাদিয়ানী ফিতনা তন্মধ্যে অন্যতম। এ ফিতনার পুরুধা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গোলাম আহমদ পর্যায়ক্রমে নিজেকে সংস্কারক ইমাম মাহদী, প্রতিশ্রুত মাসীহ, ঝিল্লিনবী, ছায়ানবী বলে দাবি করে। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে সে নিজেকে পরিপূর্ণ নবী বলে দাবি করেন এবং পবিত্র কুরআনের কতিপয় আয়াতের অর্থ বিকৃত করে তার আগমনের কথা পবিত্র কুরআনের উল্লেখ রয়েছে বলে দাবি করে। এ বাতিল পন্থী কাদিয়ানী ফিতনার প্রতিরোধে বৃহত্তর কুমিল্লার আলেমগণ কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের সাথে অনেক বাহাস মুনাজারা করেছেন তাদেরকে পরাস্ত করেছেন। এমনকি তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের কিতাব পড়ে আলোচনা করে তাদেরকে কুরআন হাদীস বুঝিয়ে পুনরায় তাদেরকে মুসলমান বানিয়েছে। তাদের পুরো পরিবারসহ অনেক কাদিয়ানী বৃহত্তম কুমিল্লার আলেম সমাজের হাতে তওবা করে মুসলমান হয়েছে। আলেমগণের ব্যাপক সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে কাদিয়ানীদের বেশ কয়েকটি মসজিদ পুনরায় মুসলমানদের হাতে ফিরে আসে। তৎকালীন সময়ে বৃহত্তম কুমিল্লার ওলামায়ে কেরাম তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না নিলে হয়তো বা বৃহত্তম কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কাদিয়ানী প্রধান এলাকা হিসেবে পরিগণিত হত। আল্লাহ্ তা'আলা ওলামায়ে কেরামের উছিলায় অত্র অঞ্চলে মুসলমানদের ঈমানকে হেফাজত করেছেন। মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীরা মুরতাদ কাফের।[৬৪৬] আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.)-এর দুশমন, সকল মুসলমানদের দুশমন তাদের অসংখ্য কুফরী আকীদা হতে নিম্নে কয়েকটি কুফুরী আক্বীদা তুলে ধরা হলোঃ

---

৬৪৬ শামছুদ্দীন কাসেমী, (খতমে নবুওয়াত আন্দোলন পরিষদ বাংলাদেশ, ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ২৬৩-২৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

- মির্জা গোলাম আহমদ বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি স্বয়ং আল্লাহ্, আমি বিশ্বাস করে ফেলেছি যে, আমি তাই।
- আমার কাছে আমার আল্লাহ্ই মুরিদ হয়েছেন।
- তিনি সত্যিকার আল্লাহ্ যিনি কাদিয়ানে আপন রাসূল প্রেরণ করেছেন।
- আমার দাবি এই যে, আমি হলাম রাসূল এবং নবী ।
- রাসূল (সা.) এর তিন হাজার মুজিযা আর আমার মুজীজার সংখ্যা হলো দশ হাজার
- মসীহ মাউওদ মির্যা গোলাম স্বয়ং, নতুন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ যিনি ইসলাম প্রচারের জন্য দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে আগমন করেছে। অতএব আমাদের কোন নতুন কালিমার প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ মুহাম্মদ (সা.) ব্যতীত যদি অন্য কেউ আসতেন, তাহলে নতুন তাওহীদের বাণীর প্রয়োজন হতো। প্রকৃতপক্ষে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর অর্থ তাদের নিকট লা ইলাহ ইল্লাল্লাহু মির্জা গোলাম রাসূলুল্লাহ। যিনি দ্বিতীয়বার কাদিয়ান এলাকায় আগমন করেন।
- যদি আমার গর্দানের দুদিকে তলোয়ারও রেখে দেওয়া হয় এবং আমাকে একথা বলা হয় যে, তুমি বল যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কোনো নবী আসবে না, তাহলে আমি অবশ্যই একথা বলব যে তুমি মিথ্যাবদী। রাসূল (সা.) এর পর অবশ্যই নবী আসতে পারে।
- ইবনে মরিয়ম অর্থাৎ ইসা (আ.) এর আলোচনা ছেড়ে দাও গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তার চেয়েও উত্তম।
- আমি ইমাম হোসাইন থেকে অনেক উর্ধ্বে।
- আমার বিরুদ্ধবাদীরা জংলী শূকর হয়ে গেছে। আর তাদের স্ত্রী লোকের স্বভাব চরিত্রের দিক দিয়ে কুকরীদেরও অগ্রে চলে গেছে।
- কুরআন শরীফে খারাপ গালিতে ভরা এবং কুরআন শরীফে কঠোর পন্থা অবলম্বন করেছে।
- মির্জার সত্তার মাঝে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীর শান ছিল উদ্ভাসিত।
- আমরা যখন ব্রিটিশদের তাঁবেদারী করি তখন আল্লাহ্রই ইবাদত করি।

অতএব, কাদিয়ানীরা ধর্মীয় পৃথক বৈশিষ্ট্যাবলি নিয়ে অর্থাৎ পৃথক, কালিমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, তীর্থস্থান নিয়ে ইসলাম ধর্মের বাহিরে চলে গিয়েছে। মুসলমানদের সব ফেরকার মানুষ বিয়ে শাদী আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু কাদিয়ানিরা বলে মুসলমানদের সাথে আত্মীয়তা করো না। মুসলমানরা কোনো দলের মতো নয়। তারা কাফের, তারা অন্যান্য কাফেরদের মতোই। তাই কাদিয়ানীদেরকে বিশ্ব মুসলিম ফিকাহ একাডেমী, বিশ্ব উলামা পরিষদ, রাবিতা ফিহাক একাডেমীসহ বহু মুসলিম রাষ্ট্র এবং ইসলামী চিন্তাবিদগণ জ্ঞানী সমাজ ও মুসলিম সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে কাফের বলে ঘোষণা দিয়েছে। সুতরাং তাদেরকে কাফের মনে করতে হবে নতুবা ঈমান থাকবে না।

কাদিয়ানী সম্পর্কে ইসলামের আকীদা : কুরআন ও হাদীসের আলোকে কাদিয়ানীদের উপরোল্লিখিত সকল আকীদাই ভ্রান্ত ও ইসলাম বিরোধী। হযরত মুহাম্মদ (সা.) হচ্ছেন সর্বশেষ নবী ও সর্বশেষ রাসূল। তাঁর পর আর কোনো নবী নেই। সমস্ত জ্বীন ও মানুষ এবং সারা জাহানের জন্য হল তার নবুয়্যাত। এই বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীতে এবং এই ধরনের আরও কতিপয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যে তিনি নবীদের মধ্যে আফযল এবং শ্রেষ্ঠ। তাঁর রিসালাত এবং নবুয়্যতের ওপর ঈমান ব্যতীত কারো ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। নবুয়্যতী সিলসিলার পরিসমাপ্তি তাঁর দ্বারাই হয়েছে। তাঁর পর থেকে নবুয়্যতের

Dhaka University Institutional Repository

দাবিদার প্রতিটি ব্যক্তিই হল কাফির এবং ইসলামের গণ্ডি থেকে বহির্ভূত। তাই মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং কাদিয়ানী সম্প্রদায় হল মুরতাদ, যিন্দিক, মুলহিদ এবং কাফির।

- রাসূল (সা.) এরপর থেকে ওহীর পথ চিরতরে বন্ধ। অন্য কারো নিকট ওহী আসার আর বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। সুতরাং রাসূল (সা.)-এর পর নবুয়্যতের দাবিদার প্রতিটি ব্যক্তিই হল কাফির এবং মুরতাদ। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন; مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ "মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।"[৬৪৭]
- মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নয় বরণ আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।
- আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেন,

  أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لَا نَبِيَّ بَعْدِي

  "আমিই শেষ নবী আমার পরে আর কোনো নবী নেই।"[৬৪৮]

  এ সম্পর্কে সাওবান (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেন,

  عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي،

  "অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে। তারা প্রত্যেকে নবী হওয়ার দাবি করবে। আর আমিই হলাম শেষ নবী। আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না।"[৬৪৯]

- কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মানুষের নাজাত এবং সফলতা রাসূল (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ ওহীর ওপরই নির্ভরশীল।
- এ উম্মতের কোন ব্যক্তি হযরত ঈসা (আ.) এবং অন্যান্য নবীদের থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারেন না। এক নবীর শ্রেষ্ঠত্ব নবীর ওপর হতে পারে।
- কুরআনে বর্ণিত জিহাদের হুকুম পবিত্র ও প্রয়োজনীয়।[৬৫০]

---

[৬৪৭] আল-কুরআন; সূরা আল-আহযাব : ৪০।

[৬৪৮] আল-মু'জামুল আওসাত, নং-৩২৭৪, আল-আল-মাকতাবাতুশ শামেলা।

[৬৪৯] সুনানে আবি দাউদ, নং-৪২৫২, আল-আল-মাকতাবাতুশ শামেলা।

[৬৫০] মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, বাতিল যুগেযুগে, (কুমিল্লা: আল-আমিন একাডেমী, ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ৪০,৪২।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-৯ : বিভিন্ন কুসংস্কার দূরীকরণ

ইসলাম ধর্মের মূল শিক্ষা হল কুরআন-হাদীস। এই শিক্ষার সাথে যখন মনগড়া নিয়ম, রুসুম-রেওয়াজ, বিদাআত-শিরক প্রভৃতি কুসংস্কারের আর্বজনা সংমিশ্রন হয়, তখন সে ধর্মেও আধ্যাত্মিক প্রাণসত্তা বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। ধর্মের মূল শিক্ষার বদলে সেখানে ধর্মের নামে অনেক অধর্ম প্রধান্য পেয়ে যায়। বস্তুত এ ধরনের শির্ক-বিদ'আত, বিভিন্ন কুসংস্কার ও মানুষের মনগড়া কার্যলাপেই এক সময় ধর্মের মূল শিক্ষার ওপর প্রভাব বিস্তার করে বসে। স্বার্থপর অজ্ঞ লোকেরা তখন মূল ধর্মকে বাদ দিয়ে আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন মূল ধর্মে দেখা দেয় বিকৃতি। এর ফলে শিক্ষা আদর্শ অজ্ঞতার অন্ধকারে তলিয়ে যায়। যুগে যুগে আল্লাহ তার বিভিন্ন পয়গাম্বরের ওপর যেসব কিতাব ও সহীফা নাযিল করেছেন, সেগুলোও একই অবস্থার শিকার হয়ে আপন কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। পরবর্তীতে মানুষ এর অনুপস্থিতিতে আরও বিভ্রান্তির পথে অনেক দূর এগিয়ে যায়। তখন আল্লাহ তা'আলা নতুন কোনো নবী পাঠান। কিন্তু শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর তিনি যে কিতাব নাযিল করেন, কেয়ামত পর্যন্ত সেটিকে তিনি বিভিন্ন উছিলায় অবিকৃত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাই দেখা যায় নানা প্রকার কুসংস্কার, অপব্যাখ্যা, বিদ'আত ও শিরকের আর্বজনা এসে যখন ইসলামের মূল শিক্ষা ও প্রাণসত্তাকে বিনষ্ট করার উপক্রম হয়, তখনই আল্লাহ কোনো না কোনো বিজ্ঞ আলেম পাঠিয়ে কুরআনের মূল শিক্ষাকে নিমজ্জিত অবস্থা থেকে ভাসিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। বৃহত্তর কুমিল্লার আলেমগণ ও সে ধারার ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা অনৈসলামিক বিভিন্ন কুসংস্কার, বিদা'আত শিরক ও বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যার হাত থেকে রক্ষায়, দ্বীনী শিক্ষা বিস্তারে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তাঁরা নিজের জীবনকে ইসলামের সেবায় করেছেন উৎসর্গ। খোলাফায়ে রাশেদার খেলাফত কালে সুন্নাহর পরিপন্থী কাজ তাঁরা কোনো অবস্থায় নিরব থাকতে পারতেন না। আলেমগণ সমাজের পরিবেশ পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল থাকুক না কেন তাঁরা ন্যায় এবং সত্য কথা সমাজের সামনে তুলে ধরাকেই তাঁদের প্রধান দ্বীনী কর্তব্য মনে করতেন। সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের প্রবণতা এবং অন্যায়ের সাথে মিতালির মনোভাব তাঁরা কোনোদিনই গ্রহণ করেননি। আর বৃহত্তম কুমিল্লার আলেমগণের মধ্যে অনেকেই উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক ও পণ্ডিত আলেম ছিলেন যারা বহু আরবী, ফার্সী ও উর্দু কিতাবের প্রণেতা এবং আরবী ও ফার্সী কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। তাঁরা ছিলেন অকুতোভয়, স্পষ্টভাষী, ত্যাগী, খোদাভীরু আলেম হিসেবে খ্যাত। তাঁরা ছিলেন সংগ্রামী। তবে তাদের সংগ্রাম ছিল বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। যেসব লোক ভণ্ডপীরের মুরিদ হয়ে নামাজ রোজা তথা শরীয়তকে উপেক্ষা করে মারেফাত হাসিলের নামে ভাওতাবাজিতে লিপ্ত তাদেরকে তাঁরা বিভিন্নভাবে সংস্কার করে ইসলামের সঠিক পথে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের মূল কুরআন-হাদীসের বক্তব্য তাদের সামনে তুলে ধরার মাধ্যমে তাঁদের মূল্যবান জীবন অতিবাহিত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-১০ : রাজনৈতিক ভূমিকা

ইসলাম একটি সার্বজনীন জীবনব্যবস্থা। শুধু জীবন ব্যবস্থাই নয়; বরং এটি একটি জীবনদর্শন। মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে এর দিকনির্দেশনা। এই দিকনির্দেশনা এটি সরাসরি আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত। পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সর্বত্রই ইসলামের সুশীতল ছায়া বিস্তৃত। বৃহত্তর কুমিল্লায় আলেমগণ তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন দেশের সচেতন নাগরিক। কিন্তু তাঁদের মাঝে কেউ কেউ দেশে প্রচলিত রাজনীতিতে সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হওয়া তখন পছন্দ করেননি, বরং জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার আলো প্রজ্বলিত করে ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে প্রথমে জনগণকে সংশোধন করা উত্তম মনে করেন।

তাই তারা প্রথমে ইসলাহে নাফস ও ইসলাহে কাওমের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এদেশ হতে ব্রিটিশদের উৎখাত করে ইসলামী তাহজীব তামাদ্দুন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামী আন্দোলনের সাথে অনেকেই সরাসরি জড়িয়ে পড়েন।

বিশেষ করে ব্রিটিশ আমলের শেষদিক থেকে শুরু করে রাজনীতিতে তাঁদের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। তারা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে বহু কার্যকরি ভূমিকা পালন করেন। যার কারণে গোটা সমাজ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড থেকে প্রতিরোধ করতে সক্ষমতা লাভ করে। তাদের প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রীয়ভাবে শরীয়ত বিরোধী বহু আইনি এবং দেশের সংবিধানে ধর্ম নিরপেক্ষার বিরুদ্ধে আপোষহীন বিপ্লবী মুজাহীদের ভূমিকা পালন করে। তাদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলেন - ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.) বৃহত্তর পরিসরে সমাজসেবা, ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হন। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের তিনি একজন নিঃস্বার্থ কর্মী ও নেতা ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্মলগ্নে তিনি শায়েখুল ইসলাম আল্লামা শাব্বির আহমদ ওসমানি (রহ.)-এর পরামর্শে জমিয়তের উলামায়ে ইসলামে যোগদান করে পাকিস্তান আন্দোলনে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। তৎকালীন স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে তিনি উলামায়ে কেরামকে নিয়ে তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁদের এ আন্দোলনের ফলে পাক গণপরিষদে (Constituent Assembly of Pakistan) ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ১২ মার্চ সর্বসম্মতিক্রমে আদর্শ প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরবর্তীতে তিনি নিখিল পাকিস্তান নিযামে ইসলাম দলের সহ-সভাপতি ছিলেন।[৬৫১]

মাওলানা মুহাম্মদ জাফর (রহ.) তিনি ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক, তাছাড়া বিভিন্ন সামজিক কর্মকাণ্ডের পাশাপশি রাজনৈতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। তিনি প্রথম জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ যোগদান করে রাজনৈতিকভাবে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে লাহোর প্রস্তাব পাশের পর পাকিস্তান আন্দোলন জোরদার করেন। পরবর্তীতে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামে যোগদান করে বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত উক্ত দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠা ও যোগ্যতার সাথে পালন করে।[৬৫২]

মাওলানা এম. এ. মান্নান (রহ.) রাজনৈতিক দিক থেকে ব্যাপক আবদান রয়েছে। তিনি ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইস্ট পাকিস্থান মুসলিম লীগের সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

[৬৫১] হাফিয মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

[৬৫২] হিফজুর রহমান, মাশায়েখে কুমিল্লা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ সৃষ্টির পর আলেম সমাজের মধ্যে থেকে যারা মন্ত্রী হিসেবে সফল দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।[৬৫৩]

মাওলানা রুহুল আমীন চৌধুরী (রহ.) তিনি ছাত্র জীবন থেকে রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং তৎকালীন নেজামে ইসলাম পার্টির সক্রিয় সদস্য পদ লাভ করেন । ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা ১০ বর্তমান (লাকসাম+মনোহরগঞ্জ) সংসদীয় আসন হতে ইসলামী ঐক্যজোটের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেন। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির মহাসচিব নির্বাচিত হন।[৬৫৪]

মাওলানা গোলাম হাক্কানী (রহ.) তিনি আজীবন ইসলামী রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। রাজনৈতিক ময়দানে তার ব্যাপক প্রসারতা ও সুনাম রয়েছে। তাছাড়া ইত্তেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশ মজলিস সাদারাতের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী হিসেবে কসবা-আখাউড়া, বুড়িচং বি-পাড়া নির্বাচনী এলাকায় সংসদ সদস্য হিসেবে প্রার্থী ছিলেন।[৬৫৫]

মাওলানা মাজহারুল ইসলাম (রহ.) ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তি। তিনি নেজামে ইসলামী পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং নেজামে ইসলাম পার্টির পক্ষকে নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করেন । ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ ইত্তেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি উক্ত সংগঠনের সেক্রেটারি ও ছিলেন।[৬৫৬]

মাওলানা ফজলুল হক আমিনী (রহ.) ছিলেন প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তিনি ছিলেন সমাজ সংস্কারক ও যুগশ্রেষ্ঠ সচেতন রাজনীতিবিদ। তিনি ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে খেলাফত আন্দোলনের সেক্রেটারি জেনারেল নিযুক্ত হন। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চার দলিয় ঐক্য জোটের প্রার্থী হিসেবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-০২ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। সর্বশেষে তিনি মৃত্যুর পূর্বে ইসলামী ঐক্য জোটের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব রত ছিলেন।[৬৫৭]

মাওলানা কাজী আবু লাইচ মো. সফিকুল আলম সাবেক প্রিন্সিপাল লালচাঁদ আজহারিয়া সিনিয়ার কামেল মাদ্রাসা, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা। তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ আলেম, রাজনীতিবিদ এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয়। দীর্ঘদিন তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। প্রেসিডেন্ট শহিদ জিয়াউর রহমানের শাসন আমল থেকে শুরু করে ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বৃহত্তম কুমিল্লার বহু রাজনীতিবিদ ও মন্ত্রিবর্গ তার থেকে বিভিন্ন পরামর্শ গ্রহণ করেন। তাছাড়া বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ডে ব্যাপকভাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

মাওলানা সৈয়দ মুছলেহ উদ্দিন (রহ.) ছিলেন বৃহত্তর উত্তর কুমিল্লার ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি পুরুষ। তিনি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি প্রথমত জমিয়াতে উলামায়ে হিন্দের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। পরবর্তীতে জমিয়তে উলামায়ে

---

[৬৫৩] দৈনিক ইনকিলাব, এ.জেড.এম. শামসুল হক, ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ খ্রিস্টাব্দে।
[৬৫৪] হিফজুর রহমান, মাশায়েখে কুমিল্লা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৩।
[৬৫৫] সাঈদীয়া স্মরণিকা, আড়াইবাড়ি সাঈদিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পৃ. ২৮-২৯।
[৬৫৬] হিফজুর রহমান, মাশায়েখে কুমিল্লা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৪-২১৫।
[৬৫৭] দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১৩ ডিসেম্বর ২০১২ খ্রিস্টাব্দে।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের সেক্রেটারি নিযুক্ত হন এবং পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পূর্ব পাকিস্তানের সহ-সভাপতিও ছিলেন।[৬৫৮]

মাওলানা ফয়েজউল্লাহ (রহ.) তিনি ছিলেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের অন্যতম সদস্য। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বাধীনতার পক্ষে পাকিস্থান হানাদার বাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত হিন্দু-মুসলমানদের বিভিন্ন সহযোগিতা করেন। তাছাড়া এলাকার বিভিন্ন উন্নয়ন করেন ও সমাজ সংস্করণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[৬৫৯]

মাওলানা আব্দুল খালেক হুতুরাভী (রহ.) তিনিও রাজনীতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের নিবার্চতে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে নিজ এলাকা হতে সদস্য নিবার্চিত হন। কিন্তু এসেম্বলির বৈঠক বসার পূর্বেই ইন্তেকাল করেন।[৬৬০]

মাওলানা সিদ্দুকুর রহমান ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেন। মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) তাঁকে সাতশত কর্মীর ভলান্টিয়ারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করেন। বিভিন্ন পর্যায়ে রাজনৈতীক ময়দানে তাঁর ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।

এছাড়াও বৃহত্তর কুমিল্লার বহু আলেম যারা বিভিন্ন পরিস্থিতর চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন অনৈসলামীক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ইসলামী আন্দোলনের সাথে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত থেকে দেশ ও জাতির ক্রান্তিলগ্নে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।[৬৬১]

---

[৬৫৮] দৈনিক সংগ্রাম, ২৬ আগস্ট ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে।

[৬৫৯] মুফতী ইহতিশামুল হক নোমান, মাখায়েখে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।

[৬৬০] ড. মো: আবু ছালেহ পাটোয়ারী, হাফেজ মাওলানা আব্দুর রহমান হানাফী (র.): ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সংস্কারে তাঁর অবদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯।

[৬৬১] হিফজুর রহমান, মাশায়েখে কুমিল্লা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সমাজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে আলেমগণের প্রত্যাশা এবং বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা

পরিচ্ছেদ-১ : সমাজ উন্নয়নে নীতিমালা	২৯৪-২৯৬
পরিচ্ছেদ-২ : মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ	২৯৬-২৯৮
পরিচ্ছেদ-৩ : মদ-জুয়ার নিষিদ্ধকরণ	২৯৮
পরিচ্ছেদ-৪ : যাকাতের বিধান প্রতিষ্ঠা করা	২৯৯
পরিচ্ছেদ-৫ : জবাবদিহিতার ভয় নিশ্চিত করা	৩০০

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সমাজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে আলেমগণের প্রত্যাশা এবং বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা

পরিচ্ছেদ-১ : সমাজ উন্নয়নে নীতিমালা

ইসলাম আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত ও মনোনীত একটি জীবন ব্যবস্থার নাম। ইসলাম হলো শান্তি, মৈত্রী, সাম্য, সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি, ইনসাফ, ন্যায়-নীতি ও সামাজিক সকল পর্যায়ে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার নাম। কাজেই অশান্তি, শত্রুতা, শ্রেণিভেদ, হিংসা ও অন্যায়-অবিচার যখন পৃথিবীর মানব সমাজকে গ্রাস করেছিল, তখন শান্তির শাশ্বত বাণী পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষকে আশ্বস্ত করেছিল। সালামের বার্তাবাহক প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সা.) ৩১০ খ্রিস্টাব্দে ৪০ বছর বয়সে নবুয়্যাত প্রাপ্ত হন। তিনি আল্লাহর একত্ববাদসহ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিকভাবে পারস্পারিক সম্পর্ক উন্নয়নে শান্তি ও সৌহার্দ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর প্রেরিত বাণী কুরআনের নির্দেশাবলী মানুষের মাঝে প্রচার করেন।

ইসলামের তাৎপর্য হল আল্লাহ ও বান্দার মাঝে বন্দেগির সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সে অনুযায়ী জীবনকে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন একটি সুশৃঙ্খল জীবন-ব্যবস্থার ওপর আমল করা। সে সমাজের লক্ষ্য ও ভিত্তি হতে হবে সমগ্র মানবজাতির মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং সমাজের সকল সদস্যকে আত্মশুদ্ধি অর্জন করা। আলেমগণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল একটি কল্যাণকর আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। যার বিস্তার হবে বিশ্বব্যাপী। আর ব্যক্তি সমাজ সব ধরনের ভয়-ভীতি ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হতে হবে এটাই হলো তাদের একমাত্র লক্ষ্য।[৬৬২]

আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল পৃথিবীর বুকে একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ "তিনি সেই মহান সত্তা যিনি আপন রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অন্য সকল দ্বীন থেকে বিজয়ী করতে পারেন। যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।[৬৬৩]

ইসলাম মানবতার ঐক্য-সম্প্রীতিতে ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ গঠনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। কেননা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ইতিহাস পঠন-পর্যালোচনার মাধ্যমে এ বাস্তবতা স্পষ্ট হয় যে, পৃথিবীতে যে কোনো সমাজ তিনটি মৌলিক ধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

(১) ভৌগোলিক (২) বংশীয় ও ভাষাগত (৩) অর্থনৈতিক।

এ তিনটি মৌলিক ধারা খুবই সীমাবদ্ধ। আর সীমাবদ্ধ মৌলিক ধারাগুলোকে বিশ্বস্ততার ওপর প্রতিষ্ঠিত করা অত্যাবশ্যক যা সমাজের কর্মনীতি অন্যদের তুলনায় হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার দিকে ধাবিত হয়। তাই ইসলামী সমাজকে হিংসা-বিদ্বেষ থেকে চিরমুক্ত করার লক্ষ্যে মানবতার ঐক্য ও সম্প্রীতি স্থাপনের কথা পেশ করেছে এবং সমগ্র মানবজাতিকে সেদিকে আহ্বান করেছে। পবিত্র কুরআনে তার বাস্তবতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[৬৬২] ড. তাহের আল-কাদেরী, ভাষান্তর: মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ, তাসাউফের আসল রূপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩-৪৪।

[৬৬৩] আল-কুরআন; সূরা আত-তাওবা : ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ "হে মানব সমাজ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন।"[৬৬৪] মহান আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً "সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল।"[৬৬৫]

যে সমাজের সকল মানুষের মূল লক্ষ্য হবে ব্যক্তি ও সমাজ সমভাবে সকল ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ লাভ করা। আর এটিই হলো প্রকৃত অর্থে ঐশী নির্দেশনার প্রধান বিষয়। কেননা যতক্ষণ কোনো মানুষ ভয়-ভীতি থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের যথাযথ উন্নয়ন ও অগ্রগতি কখনো সম্ভব হবে না। আর যে সমাজ জনগণের নিরাপত্তা, সংশয় ও ভীতি থেকে মুক্ত রাখতে এবং তাদের মাঝে শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা প্রদান করতে সক্ষম হবে না। সে সমাজকে কোনোভাবেই ইসলামী সমাজের আওতাভুক্ত করা যায় না। কুরআন মজীদে ইসলামী সমাজের সকল সদস্যদেরকে ভয় ও শঙ্কামুক্ত হয়ে জীবন পরিচালনা করার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান করেছে। কেননা কাফেররা আজ তোমাদের দ্বীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ "আর তোমরা" নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখও প্রকাশ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তাহলে তোমরাই সফল হবে।"[৬৬৬]

সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে আলেমগণ ইসলামের নৈতিক শিক্ষাগুলো জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তাঁরা চিন্তা করেন কিভাবে একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায়। কিভাবে সমাজ স্থায়ী হতে পারে এবং কিভাবে উন্নতি লাভ করতে পারে? তাই এ ব্যাপারে সঠিক ধারণা থাকা খুবই প্রয়োজন। আলেমগণ মনে করেন যে, সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে ও ইসলামী সমাজের অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব এবং অগ্রগতি লাভের ক্ষেত্রে কয়েকটি শর্ত অপরিহার্য। তা হলো, ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু প্রতিপালন, সামাজিক অবকাঠামো দূরীকরণ ও সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করা। আর এর মাধ্যমেই ইসলামের মূল উদ্দেশ্য অর্জনসহ অপরাপর পরিপূর্ণ ইসলামের দ্বীনের ওপর ইসলামের বিজয় সম্ভব হবে।

কেননা ইসলামী সমাজ এমন এক ধরনের সমাজ ব্যবস্থা যেখানে কোনো অন্যায়, অবিচার, জুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন, নিস্পেষণও মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন হবে না। কারো উন্নতি অগ্রগতি প্রতিভা দমিয়ে রাখা হবে না। যে সমাজে নারীরা তাদের অধিকার ও মর্যাদা পরিপূর্ণভাবে লাভ করবে। সকলে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশ, জাতি ও সমাজকে গড়ে তোলার ব্যাপারে আল্লাহ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করা ঈমানের দাবি বলে মনে করবে। যে সমাজের লোকজন দুর্নীতি করার কোন সাহস পাবে না। কারণ তাদের সকলের মনে পরকালীন জবাবদিহিতার ভীতি কাজ করবে। সুতরাং দুর্নীতি করার সাথে সাথে তাদের বিবেকে বাধা আসবে। ফলে তারা দুর্নীতি থেকে নিজেকে বহুদূরে রাখবে। এর ফলে সুন্দর ও সুশৃংখল পরিবেশ গঠন করা সম্ভব হবে এবং সকলে সুখ-শান্তিতে বসবাস করবে। তাদের প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হবে, প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সমাজ ব্যবস্থার ন্যায়। আইয়্যামে জাহেলিয়াতের যুগে নারী জাতিকে ভোগ বিলাসের পাত্রই মনে করত।[৬৬৭]

---

[৬৬৪] আল-কুরআন; সূরা আন-নিসা : ১।

[৬৬৫] আল-কুরআন; সূরা বাকারা : ২১৩।

[৬৬৬] আল-কুরআন; সূরা আলে-ইমরান : ১৩৯।

[৬৬৭] আল-গাজালি, কিমিয়ায়ে সা'দাত, হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী (রহ), অনুবাদক: মাওলানা নুরুর রহমান, (ঢাকা:এমদাদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ২৫-২৭।

Dhaka University Institutional Repository

সে সমাজে নারী জাতিকে জোরপূর্বক ব্যবহার করত। কিন্তু মহানবী (সা.) যখন ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করলেন তখন গোটা মানব সমাজ এমনভাবে পরিবর্তন সাধিত হলো যে, একদা একজন ষোড়শী সুন্দরী মহিলা অলংকারে সজ্জিত হয়ে রাতের অন্ধকার পথ চলছিল, তখন কোনো পুরুষ তার সাথে খারাপ আচরণ করা তো দূরের কথা কেউ তার প্রতি তাকানো সাহস করেনি। কারণ সকলেই ইসলামী বিধান সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ "নিশ্চয়ই যারা ভীতি স্থাপন করে তাদের ওপর যখনই কোন ধরনের শয়তানের আক্রমণ আসে তখন তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং সাথে সাথে তাদের বিবেচনাবোধ জাগ্রত হয়"[৬৬৮] কারণ সমাজ যদি ইসলামী সমাজ হয়, তাহলে অবশ্যই সমাজে ইসলামী বিধি বিধান চালু থাকবে এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দল, মত নির্বিশেষে একই আইনে আওতাভুক্ত হবে। যেমন চোরের হাত কাটার ব্যাপারে আল্লাহর বিধান হবে রাষ্ট্রীয় বিধান। কেননা এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا "চোর হোক অথবা চুন্নি হোক যখন তারা চুরি করবে তখন তোমরা তাদের হাত কর্তন করে দাও।"[৬৬৯] অতএব এ ধরনের সমাজ ব্যবস্থা চালু থাকলে সমাজে চুরি-ডাকাতি স্বপ্নের মতো মনে হবে। মানুষ নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবে। আর সে সমাজ হবে শান্তিপ্রিয়। এমন সমাজই আলেমগণের প্রত্যাশা। সমাজে আল্লাহর আইনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং রসুলুল্লাহ (সা.) মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। সকল মানুষের প্রতি সুবিচারের বিধান নিশ্চিত থাকবে। মুসলমানদের মধ্যে সাম্যের বিধান নিশ্চিত থাকবে, শাসকের দায়িত্ব ও জবাবদিহিতার নিশ্চয়তা থাকবে, ভালো কাজে আনুগত্য ও মন্দ কাজ বর্জনে নিশ্চয়তার বিধান থাকবে এবং মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠায় নিশ্চয়তা থাকবে। সমাজে বসবাসকারী মুসলিম-অমুসলিম সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত হবে। তবেই একটি সুন্দর রাষ্ট্র গঠন ও সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব হবে।

পরিচ্ছেদ-২ : মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ

সমাজকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কতিপয় মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা আবশ্যক। যার আলোকে মানুষ সমাজকে পরিচালনা করতে সক্ষম:

(ক) জীবন সংরক্ষণ করা। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ "প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য, যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না।"[৬৭০]

(খ) মালিকানা অধিকার সংরক্ষণ করা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা কেউ কারো সম্পদ অবৈধ পন্থায় ভক্ষণ করো না"[৬৭১]

---

[৬৬৮] আল-কুরআন; সূরা আল-আ'রাফ : ২০১।
[৬৬৯] আল-কুরআন; সূরা আল-মায়েদা : ৩৮।
[৬৭০] আল-কুরআন; সূরা আল-ইসরা : ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) সম্মান-সম্ভ্রম সংরক্ষণ করা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"মু'মিনগণ কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা কেউ একে অপরকে দোষারোপ করো না, তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গোনাহ। যারা এরূপ কাজ থেকে তওবা না করে তারাই যালিম।"[৬৭২]

(ঘ) অনুমতি ব্যতীত অন্যের ঘরে প্রবেশ না করা।এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুমতি গ্রহণ না করে নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না।"[৬৭৩]

(ঙ) অশ্লীল কথা থেকে নিজেকে সংরক্ষণ করা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন; لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ "প্রকাশ্যভাবে কারো নিন্দা করা আল্লাহ পছন্দ করেন না, কিন্তু যদি যুলুম হয়ে থাকে তবে সেক্ষেত্রে।"[৬৭৪]

(চ) ন্যায়সঙ্গত কথা বলার অধিকার নিশ্চিত করা। এ সম্পর্কে হযরত উমর (রা.) বলেন; "তোমরা হক বা সত্য কথা বলো, যদিও তা তিক্ত হয়।"

(ছ) প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। কারণ, প্রত্যেকেই কেবল তার নিজের জন্য দায়ী, এজন্য অন্যকে পাকড়াও করা যাবে না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন; وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ আর প্রত্যেক ব্যক্তি যে মন্দ কাজ করে, তার ফল তাকেই ভোগ করতে হবে, কেউ অন্য কারোর বোঝা বহন করবে না।"[৬৭৫] কারও মাধ্যমে কোন সংবাদ জানতে পারলে তা অবশ্যই যাচাই-বাছাই করবে। কারণ এটা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

---

[৬৭১] আল-কুরআন; সূরা আন-নিসা : ২৯।
[৬৭২] আল-কুরআন; সূরা আল হুজুরাত : ১১।
[৬৭৩] আল-কুরআন; সূরা আন-নূর : ২৭।
[৬৭৪] আল-কুরআন; সূরা আন-নিসা : ১৪৮।
[৬৭৫] আল-কুরআন; সূরা আল-আন'আম : ১৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

"কোন ফাসেক (পাপাচারী) ব্যক্তি যদি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তোমরা তা অনুসন্ধান করো। এমন যেন না হয় যে, তোমরা না বুঝে কোন পক্ষের ক্ষতি করার পর নিজের পদক্ষেপের কারণে অনুতপ্ত হইও না।"[৬৭৬] এক্ষেত্রে অবশ্যই প্রমাণাদি সংগ্রহ করবে। আর এটাই তোমদের উচিত।

(জ) প্রত্যেকের অধিকার নিশ্চিত করা। কেননা, অভাবী-বঞ্চিত ব্যক্তিদেরকে তাদের জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য দ্রব্যসামগ্রী প্রদান করতে হবে।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ "আর তাদের সম্পদে সাহায্যপ্রার্থী বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।"[৬৭৭] সুতরাং তোমরা তাদের থেকে সাদকা (যাকাত) নিয়ে তাদের সম্পদকে পবিত্র করো। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

"তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করো না এর পর পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে যখন তারা উভয় অথবা একজন বার্ধক্যে পৌছে যায় তখন তোমরা তাদেরকে এমন কথা বলো না যাতে তারা সামান্য পরিমাণ কষ্ট পায়।আর তাদেরকে ধমকও দিও না বরং সর্বদা তাদের সাথে কোমল নমনীয়তার সাথে সম্মানজনক কথা বলো।[৬৭৮]

পরিচ্ছেদ-৩ : মদ-জুয়া নিষিদ্ধকরণ

সমাজে যদি মদ-জুয়ার বিধান নিষেধ থাকে তাহলে সকলেই মদ-জুয়া থেকে দূরে থাকতে বাধ্য থাকবে। কেননা মদ হলো মস্তিষ্ক বিকৃতিকারী বস্তু। মদজুয়ায় লিপ্ত হলে স্বাভাবিকভাবেই শয়তানি কাজে নিমজ্জিত হওয়ার জন্য শয়তান বারবার প্রতারিত করতে থাকে। ফলে একসময় সে প্ররোচিত হয়ে শয়তানি কাজের বাস্তবতা ঘটিয়ে দেয়। ইসলামী সমাজ এগুলোকে কখনও সমর্থন করে না। ফলে এগুলো সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ থাকবে এবং সমাজে অপকর্মও হবে না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা ও ভাগ্য নির্ধারণকারী তীর এগুলো শয়তানের কাজ। তোমরা এগুলো থেকে দূরে থাক। তবেই তোমরা সফলকাম হবে।"[৬৭৯] কুরআনের বিধান চালু থাকলে তখন কেউ এগুলো করতে সাহস পাবে না এবং করবেও না। আর পিতামাতা তাদের সন্তানের ব্যাপারে স্ত্রী তার স্বামীর ব্যাপারে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকবে। তবেই সমাজে সফলতা আসবে।

---

৬৭৬ আল-কুরআন; সূরা আল-হুজুরাত : ৬।
৬৭৭ আল-কুরআন; সূরা আজ-জারিয়াত : ১৯।
৬৭৮ আল-কুরআন; সূরা আল-ইসরা : ২২।
৬৭৯ আল-কুরআন; সূরা আল-মায়েদা : ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-৪ : যাকাতের বিধান প্রতিষ্ঠা করা

ইসলামী সমাজে যাকাতের বিধান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে যাকাতের বিধান চালু থাকলে তখন সম্পদশালীদের কাছ থেকে শরীয়ত কর্তৃক সম্পদ নিয়ে রাষ্ট্রীয় খাতে জমা করে সেগুলোকে হিসেব করে অসহায়-দরিদ্রের মাঝে বন্টনের ব্যবস্থা থাকবে। তাহলে সমাজে দরিদ্রতা, অসহায়ত্ব ও বেকারত্ব খুব অল্প সময়ের মাঝে দূর করা সম্ভব। ফলে সমাজে শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করবে। রাস্তার মাঝে কাউকে ভিক্ষা করতে দেখা যাবে না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا "তোমরা তাদের মাল গ্রহণ কর ছদকা হিসেবে ও পবিত্র করার উদ্দেশ্যে"[৬৮০] কেননা, এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন; وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ "তাদের সম্পদে বঞ্চিত ও প্রার্থীদের অধিকার রয়েছে।"[৬৮১]

---

[৬৮০] আল-কুরআন; সূরা আত-তাওবা : ১০৩।

[৬৮১] আল-কুরআন; সূরা আজ-জারিয়াত : ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-৫ : জবাবদিহিতার ভয় নিশ্চিত করা

প্রত্যেকেরই জবাবদিহিতার ভয় নিশ্চিত করতে হবে। এ ভয় থাকলে কখনো কোনো মানুষ শরীয়ত বিরোধী ও রাষ্ট্রবিরোধী অপকর্মে লিপ্ত হতে পারবে না। আর সবচেয়ে বড় অপকর্ম হচ্ছে নিজ নিজ দায়িত্বে ফাঁকি দেয়া। যদি তার ভয় থাকে যে মহান আল্লাহর দরবারে তাকে জবাবদিহিতা করতে হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন; يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا "হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।"[৬৮২]

অতএব, সমাজে ইসলামী ব্যবস্থা চালু থাকলে প্রতিটি মানুষ সৎসঙ্গ পাবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর অনুসারী হবে। কারণ গোলামীর শৃঙ্খলায় আবদ্ধ থেকে অনৈসলামীক শক্তির মাঝে কিছু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করা কখনো সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহর বিধিবিধান পালনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতা ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য। সুতরাং ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর আদর্শে আদর্শবান লোক তৈরি করতে হলে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা অপরিহার্য।

---

[৬৮২] আল-কুরআন; সূরা আল-আহযাব : ৭০।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ভারত উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব থেকে আরব ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে এদেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বহু আলেম উলামা, পীর-মাশায়েখ ও ধর্ম প্রচারকদের একটি বিশাল জনগোষ্ঠী ইসলামী দাওয়াত নিয়ে আগমন করেন। খলিফা ওয়ালিদ ৭২২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সেনাপতিত্বে সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে এ অঞ্চলটি ইসলামী সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। যার ফলে বহু আলেম-উলামা ও ধর্ম প্রচারকগণ আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারে নিজেদের নিয়োজিত করেন। পরবর্তীতে ৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ গজনভী লাহোর দখল করেন। এরপর ক্রমান্বয়ে সমগ্র বাংলা ও ভারত দখল করেন। প্রকৃতপক্ষে বিজিত মুসলমানরা উপনিবেশ না বানিয়ে এদেশকে নিজেদের আবাসভূমি বানিয়েছেন। তাই তাঁরা এদেশে বহু ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সেখানে তাঁরা ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারে নিজেদের নিয়োজিত রাখেন। আর এদেশের বিভিন্ন ধর্মের মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ফলে ক্রমান্বয়ে মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে যায়। তাই মুসলিম সাম্রাজ্যের উন্নতি ও ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশের জন্য তাঁরা বহু মাদ্‌রাসা, মসজিদ, খানকাসহ অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। যার কারণে বৃহত্তর কুমিল্লা অঞ্চলে মুসলিম সমাজের উন্নতি, আরবী ও ইসলামী শিক্ষার ব্যাপকতা এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর এ ধারাবাহিকতায় আলেম সমাজ ইসলামের দাওয়াতী অভিযানের মাধ্যমে বাংলাদেশের সোনার গাঁয়ে শায়েখ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা কর্তৃক ১২৭৬ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। যা আরবী মাদ্‌রাসা হিসেবে ভারত উপমহাদেশে ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে। এটি ছিল বাংলার প্রথম শ্রেষ্ঠ আরবী শিক্ষা কেন্দ্র। অত্র মাদ্‌রাসায় ইলমে দ্বীন শিক্ষা অর্জনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হতে বহু ইল্‌ম পিপাসু আগমন করেন। পরবর্তীতে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলার মুসলমানদের আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারতায় ব্যাপক উন্নতি লাভ করে। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহ.) ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা ক্ষেত্রে আরও ব্যাপক প্রসারতা লাভ করে। কিন্তু উনিশ শতকের মধ্য ভাগ থেকে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বৃহত্তর কুমিল্লায় ও ইউরোপীয় পদ্ধতির নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভাব পড়ে। মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষার প্রতি প্রাথমিকভাবে অনাগ্রহী থাকার ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। কিন্তু পরবর্তীতে কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা ও দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসার আদলে বৃহত্তর কুমিল্লাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃহত্তর কুমিল্লার আলেম সমাজ বহু দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। আর সে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই আরবী ও ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারতা লাভ করে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে দ্বীনী দাওয়াতী কাজের মারকায (কেন্দ্র) হিসেবে ব্যবহার করেন। যার ফলে সেখানে তৈরি হয় হাজার হাজার আলেম-উলামা ও পীর মাশায়েখ। যারা তাঁদের উত্তরসূরি হিসেবে বৃহত্তর কুমিল্লাসহ সমগ্র বাংলাদেশে কুরআন-হাদীস ও ইসলামের মৌলিক বিষয়ের খেদমত অত্যন্ত সুনামের সাথে ব্যাপকভাবে চালিয়ে যান। কেননা ইলমে নববীর ধারক-বাহক ছিলেন বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম। আর তাঁদের উত্তরসূরী হিসেবে বৃহত্তর কুমিল্লার উলামায়ে কেরামগণ ইসলামী তাহজীব ও তামাদ্দুন প্রতিষ্ঠায় সামাজিক, আর্থিক ও নৈতিক সকল বিধি-বিধানে সুন্নাতে নববী (সা.)-এর শিক্ষার আলোকে ইসলামী পুনর্জাগরণ ও সংস্কারে এক সার্বিক ও কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। আর তাঁরা ইসলামের প্রচার-প্রসারে, সমাজ সংস্কারে, আপোসহীন সংগ্রামী নেতৃত্বে তাঁদের নানা উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডে এবং আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নে যে উন্নতি সাধিত হয়েছে সে বিষয়ে এ অভিসন্দর্ভে আলোচনা করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। কেননা উলামায়ে কেরামের সবচেয়ে বড় অবদান হল অসংখ্য দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন। যার মাধ্যমে বহু মানুষ কুরআন-হাদীসের সঠিক ইল্‌ম অর্জন করে নিজেকে একজন যোগ্য ইসলামের ধারক-বাহক হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছে সে বিষয়টিও এ অভিসন্দর্ভে তুলে ধরা হয়েছে। তাঁদের অবদানের ফলে এ যাবৎ বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় আলিয়া নেছাবে সর্বোচ্চ ডিগ্রি পর্যায়ে কামিল মাদ্‌রাসা রয়েছে ১৯টি। আর কাওমি নেসাবে সর্বোচ্চ ডিগ্রি দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত মাদ্‌রাসা রয়েছে ১২টি। তাছাড়া আলিয়া নেসাবে ইবতেদায়ী হতে কামিল পর্যন্ত এবং কওমী নেসাবে মক্তব হতে মেশকাত পর্যন্ত আরও অসংখ্য মাদ্‌রাসা রয়েছে। যার মাধ্যমে আলেম সমাজ আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। পাশাপাশি তাঁরা আলিয়া ও কওমী নেসাবে নারীদের জন্যও আলাদাভাবে বহু দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বৃহত্তর কুমিল্লার আলেমগণের অবদান উল্লেখযোগ্য। তাঁরা এদেশের বহু মাদ্‌রাসা, মসজিদ, মক্তব, খানকা ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে শিক্ষা ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদান রাখেন। এদেশের শিক্ষা ও ঐতিহ্য রক্ষায় তাঁদের ভূমিকা রয়েছে ব্যাপক। যার ফলে বাংলাদেশের শিক্ষা কার্যক্রম এগিয়ে যাওয়ায় ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এ গবেষণা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তাঁদের অবদান উপস্থাপন করা হয়েছে। বৃহত্তর কুমিল্লার এ ধরনের অসংখ্য আলেম বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের প্রচার-প্রসারে নিরলস ভূমিকা পালন করেন। আর তাঁদের এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে বৃহত্তর কুমিল্লাসহ বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার প্রসারতা ও উন্নয়নে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হবে। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতায় এক নতুন রূপ ধারণ করেছে। যা সমাজের চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট সম্ভাবনা বিরাজমান। আর এ শিক্ষার মাধ্যমেই সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক সংস্কারে ব্যাপক পরিবর্তন আনা সম্ভব। একমাত্র এ শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম এবং এটাই বাস্তব। এজন্য প্রয়োজনে সমাজের সচেতন নাগরিকদের সজাগ দৃষ্টি ও কার্যকরী পদক্ষেপের মাধ্যমে বৃহত্তম কুমিল্লা অঞ্চলে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১ আল-কুরআনুল কারীম : সূরা বাকারা
: সূরা আলে-ইমরান
: সূরা আন-নিসা
: সূরা আল-মায়েদা
: সূরা আল-আন'আম
: সূরা আল-আ'রাফ
: সূরা আত-তাওবা
: সূরা আল-ইসরা
: সূরা আন-নূর
: সূরা আল-আহযাব
: সূরা ফাতির
: সূরা আল-হুজুরাত
: সূরা আজ-জারিয়াত
: সূরা আল-আলাক্ব

২ হাদীস গ্রন্থাবলি :
ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ (রহ.) : সহীহ মুসলিম, মাকতাবাতুশ শামেলা।
ইমাম সুলায়মান ইবন আস'আছ (রহ.) : সুনান আবু দাউদ, মাকতাবাতুশ শামেলা।
ইমাম মুহাম্মদ ইবন ঈসা (রহ.) : সুনান তিরমিযি, মাকতাবাতুশ শামেলা।
ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ (রহ.) : সুনান ইবন মাযাহ, মাকতাবাতুশ শামেলা।
ইমাম জয়নুদ্দিন ইবনে ইবরাহীম (রহ.) : আল বাহরুর রাইক, মাকতাবাতুশ শামেলা।

৩ মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.) (অনুবাদক), ফুরুউল ঈমান, (ঢাকা:এমদাদিয়া পুস্তকালয় প্রা. লি., ২০০৮খ্রি.)।

৪ অধ্যক্ষ মো. আলমগীর, ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি, (ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৯৮৭খ্রি.)।

৫ অধ্যাপক মো. সগির উদ্দিন মিঞা, গৌড়ে মুসলিম শাসন ও নূর কুতুবউল আলম, (ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৯১খ্রি.)।

৬ আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া এর তত্ত্বাবধানে; কুমিল্লা জেলা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত, কুমিল্লা জেলার ইতিহাস (কু.জে.ই., ১৯৮৪খ্রি.)।

৭ আব্দুর রহমান হানাফী (র.), আনিসুত তালেবীন, ৫ম খণ্ড, (ঢাকা: রূপালী প্রিন্টিং লি., ১৩৪৫ বা.)।

৮ আব্দুর রহমান হানাফী (র.), আরবের সফরনামা, (ঢাকা: রূপালী প্রিন্টিং লি., ১৩৫২ বা.)।

৯ আব্দুর রহমান হানাফী (র.), চার তরিকার অজিফা ও শাজরাহ, (ঢাকা: রূপালী প্রিন্টিং লি., ১৩৯৫ বা.)।

১০ আব্দুর রহমান হানাফী (র.), যাদুল হুজ্জাজ, (ঢাকা: রূপালী প্রিন্টিং লি., ১৩৯৫ বা.)।

১১ আব্দুর রহমান হানাফী (র.), দু'আয়ে হিযবুল বাহার, (ঢাকা: আরেফিন প্রেস, ১৩৪৫ বা.)।

১২ আব্দুর রহমান হানাফী (র.), অযীফায়ে নাফেয়া, (ঢাকা: রূপালী প্রিন্টিং লি., ১৩৯২ বা.)।

Dhaka University Institutional Repository

১৩ আব্দুর রহমান হানাফী (র.), অসিয়তনামা, (ঢাকা: রূপালী প্রিন্টিং লি., ১৩৪৬ বা.)।

১৪ আব্দুর রহমান হানাফী (র.), আকছামুল মুসলেমীন, (ঢাকা: রূপালী প্রিন্টিং লি., ১৩৯৫ বা.)।

১৫ আলহাজ্জ মাওলানা এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুন্সী, সীরাতে আজীম (র.), (কুমিল্লা : খানকাহ-ই-সিদ্দিকীয়া, ধামতী, ১৯৮৫খ্রি.)।

১৬ আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহ্ ছুফী আজীমুদ্দিন আহমদ, মারেফাতের মূলতত্ত্ব, (কুমিল্লা : খানকাহ-ই-সিদ্দিকীয়া, ধামতী, ১৯৮৫খ্রি.)।

১৭ আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০খ্রি.)।

১৮ আবুল আসাদ, একশ বছরের রাজনীতি, (ঢাকা : বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৪খ্রি.)।

১৯ আব্দুর রহমান হানাফী (র.), আনিসুত তালেবীন, ৪র্থ খণ্ড, (ঢাকা : রূপালী প্রিন্টিং লি., ১৯৯০খ্রি.)।

২০ আব্দুল্লাহ মামুন আরিফ আল-মান্নান, ফুরফুরার ইতিহাস, (ঢাকা : ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ২০০৫খ্রি.)।

২১ আল্লামা শাহ মুহিব্বুর রহমান (রহ.), স্মারক গ্রন্থ, (আঞ্জুমানে মাদানীয়া মুহিব্বিয়া, বাংলাদেশ, ২০১১খ্রি.)।

২২ আল-গাজালি, কিমিয়ায়ে সা'দাত, হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী (রহ), অনুবাদক: মাওলানা নুরুর রহমান, (ঢাকা: এমদাদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৪খ্রি.)।

২৩ উইলিয়াম হান্টার; দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস, বাঙ্গানুবাদ, এম. আনিসুজ্জামান, (ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৭৫খ্রি.)।

২৪ এম.এ.সাঈদ. তারীখুল ইসলাম, (ঢাকা: ফাতাহ পাবলিকেশন, ২০০৮খ্রি.)।

২৫ এইচএম জাবেদ হোসাইন, এক মনীষীর গল্প শোন, (ঢাকা: নাসির বুক ডিপো, বাংলাবাজার, ২০১৩খ্রি.)।

২৬ এম. এ. রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৭৬খ্রি.)।

২৭ এ.কে.এম. ইয়াকুব আলি, রাজশাহীতে ইসলাম, (ঢাকা : ই.ফা.বা., ১৯৯২খ্রি.)।

২৮ এইচ.এম. জাভেদ হোসাইন, ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার উলামা-মাশায়েখের কর্মময় জীবন, (ব্রাহ্মণবাড়িয়া : আকাবির প্রকাশনী, ২০১৩খ্রি.)।

২৯ জুলফিকার আলী কিসমতি, বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর-মাশায়েখ, (ঢাকা: প্রগতি প্রকাশনী, ১৯৮৮খ্রি.)।

৩০ জুলফিক্কার আহমদ কিসমতী, বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ, (ঢাকা: ই.ফা. বা., ২০০৫খ্রি.)।

৩১ জুলফিক্কার আহমদ কিসমতি, আজাদি আন্দোলনে সংগ্রামী ওলামাদের ভূমিকা, (ঢাকা : আল-ফালাহ.পা.২০০০খ্রি.)।

৩২ জামিয়া, ইউনুসিয়ায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ইতিহাস ঐতিহ্য ও অবদান, (ব্রাহ্মণবাড়িয়া: জামিয়া ইসলামীয়া ইউনুসিয়া, ২০০৯খ্রি.)।

৩৩ ড. মো. মোহর আলি, হিস্ট্রি অব দ্যা মুসলিমস অব বেঙ্গল, (মদীনা: মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৫খ্রি.।

৩৪ ড. কাজি দীন মুহাম্মদ, বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, (ঢাকা : ই.ফা.বা. ১৯৯৪খ্রি.)।

৩৫ ড. মুহম্মদ ইসহাক, ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান। (ঢাকা : ই.ফা.বা., ১৯৯৩খ্রি.)

৩৬ ড. এম.এ. কাদের, নোয়াখালীতে ইসলাম (ঢাকা: ই. ফা. বা. ১৯৯১খ্রি.)।

৩৭ ড. মুহাম্মদ সেকান্দর আলী, জুহুদুল মুহাদ্দেসীন ফি বাংলাদেশ, (ঢাকা: কারনী প্রেস, ১৯৮৩খ্রি.)।

৩৮ ড. মোহাম্মদ গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সুফীসাধক, ৩য় সংস্করণ, (ঢাকা : ই.ফা.বা., ১৯৯৩খ্রি.)।

৩৯ ড. ইবনে গোলাম সামাদ, বাংলাদেশে ইসলাম (ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৯৮৫খ্রি.)।

Dhaka University Institutional Repository

৪০ ড. আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন, ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, (ঢাকা : ই.ফা.বা., ২০০৫খ্রি.)।

৪১ ড. আব্দুস সালাম হারুন, সিরাতে ইবনে হিশাম কুয়েতঃ দা.ব.ই., ১৯৮৪ খ্রি.)।

৪২ ড. তাহের আল-কাদেরী, ভাষান্তরঃ মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ, তাসাউফের আসল রূপ, (চট্টগ্রামঃ সানজরী পাবলিকেশন, ২০০৯ খ্রি.)।

৪৩ ড. মোঃ আবু ছালেহ পাটোয়ারী, হাফেজ মাওলানা আব্দুর রহমান হানাফী (র.): ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সংস্কারে তাঁর অবদান, (ঢাকাঃ ই.ফা.বা., ২০১৩খ্রি.)।

৪৪ ড.আ.ফ.ম.আলী হায়দার, শিক্ষা বিস্তার ও সংস্কারে ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিক (রহ.), (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০১০খ্রি.)।

৪৫ ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, (ঢাকাঃ ই.ফা.বা., ২০০৯খ্রি.)।

৪৬ ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, (ঢাকাঃ ই.ফা.বা., ২০০৯খ্রি.)।

৪৭ ড. মুহাম্মদ আফাজ উদ্দিন; ইসলামী দাওয়াহ বিস্তারে ও ধর্মীয় সামাজিক সংস্কারে আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (র.), (১৮৬৭-১৯২০ খ্রি.)-এর অবদান, পি. এইচ.ডি. থিসিস, (কুষ্টিয়া : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮খ্রি.), অপ্রকাশিত।

৪৮ ড. মো. হেফজুর রহমান, বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় হাদীসচর্চাঃ সমাজ ও সংস্কৃতিতে এর প্রভাব, ২০১৪খ্রি., পিএইচ.ডি (ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪), থিসিস, (অপ্রকাশিত)।

৪৯ দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, হযরত শাহজালাল (রহ.), (ঢাকাঃই.ফা.বা.১৯৮৩খ্রি.)

৫০ তিনটি ফুলের গল্প, এইচ. এম. জাবেদ হোসাইন, (নাদিয়া প্রকাশনী, ঢাকাঃ ২০১০খ্রি.)।

৫১ নাসীম আরাফাত, বাংলার হিরে-মতি-পান্না-২, (ঢাকাঃ আল-হুদা ইসলামীক ফাউন্ডেশন, ২০১০খ্রি.)।

৫২ পয়গামে সুন্নত, (ঢাকাঃ জামি'আ, রাহমানিয়া আরাবিয়া ১৪২৪হি.)।

৫৩ বাংলাদেশে পীর-আউলিয়া, এস.এম আজিজুল হক আনসারী, (ঢাকাঃ সোনালী বুক হাউস, ২০১২খ্রি.)।

৫৪ মুহাম্মদ নুসরাতুল্লাহ নূর, আলোর আধার, (ঢাকাঃ মডার্ন ইঞ্জিনিয়ার এন্ড আর্কিটেক্টস লিমিটেড, ২০১৩খ্রি.)।

৫৫ মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, ফরিদপুর জেলায় ইসলাম, (ঢাকা : ই.ফা.বা. ১৯৯৭খ্রি.)।

৫৬ মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, বাতিল যুগেযুগে, (কুমিল্লাঃ আল-আমিন একাডেমী, ১৯৯০খ্রি.)।

৫৭ মুফতী ইহতেশামুল হক নো'মান, মাশায়েখে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার জীবন ও কর্ম, (ঢাকা : মাদরাসা মারকাযুল উলূম আল ইসলামীয়া, ২০১২খ্রি.)।

৫৮ মাওলানা মুশতাক আহমদ, তাহরীকে দেওবন্দ, (ঢাকাঃ শান্তিধারা প্রকাশনী, ১৯৯২খ্রি.)।

৫৯ মাওলানা ফজলে ইলাহী, উজানীর হযরত ক্বারী ইব্রাহীম ছাহেব (রহ.)-এর জীবনচরিত (ঢাকাঃ আল-ইব্রাহীম প্রকাশনী, ১৯৯৯খ্রি.)।

৬০ মাওলানা আশরাফ উদ্দিন আহমদ, স্মারক গ্রন্থ, (ঢাকাঃ জাভেদ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২০০৩খ্রি.)।

৬১ মাওলানা আহমাদুল্লাহ, হায়াতে মুহাদ্দিস ছাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি, (ঢাকাঃ মাকাতাবুল আশরাফ, ২০১৪খ্রি.)।

৬২ মাওলানা মহিউদ্দীন খাঁন সম্পাদিত, মাসিক মদীনা, (ঢাকা; মদীনা পাবলিকেশন্স,২০১৫খ্রি.)।

৬৩ মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী , যুরুউল ঈমান, (ঢাকাঃ মোহাম্মদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৬খ্রি.)।

৬৪ মাওলানা মাহবুবে ইলাহী, মাশায়েখে চিশ্‌ত ও ক্বারী ইবরাহীম সাহেব (রহ.), (চাঁদপুর : ইব্রাহীম প্রকাশনী., ২০০৮খ্রি.)।

৬৫ মাওলানা আবূ মূসা, মুরশীদে কামেল হযরত মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন (র.), জীবন ও আদর্শ, (ঢাকা : ইছামতি অফসেট প্রেস, ১৯৯৬খ্রি.)।

৬৬ মাওলানা ওবায়দুল হক, বাংলার পীর-আউলিয়াগণ, (ফেনী : হামিদিয়া লাইব্রেরি, ১৯৬৯খ্রি.)।

Dhaka University Institutional Repository

৬৭ মাও. রুহুল আমিন, বঙ্গ ও আসামের পীর আউলিয়া কাহিনী, (মারকাযে এশায়াতে ইসলাম, দারুস সালাম, মীরপুর, ১৯৮২খ্রি.)।

৬৮ মাওলানা আবদুল বাতিন, সীরাত-ই মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী, (ঢাকা:আল-কারনী প্রেস, ১৯৭৮খ্রি.)।

৬৯ মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী, বাগদাদের জ্যোতিষ্ক, (কুমিল্লাঃ দারুল আমান, ২০০৮খ্রি.)

৭০ মাওলানা ফজলে ইলাহী, উজানীর হযরত ক্বারী ইব্রাহীম ছাহেব (রহ.)-এর জীবনচরিত (ঢাকাঃ আল-ইব্রাহীম প্রকাশী, ১৯৯৯খ্রি.)।

৭১ মাও. আনোয়ার বিন মুসলিম, হায়াতে সিরাজ, (বি-বাড়িয়া : আস সিরাজ প্রকাশনী, ২০০৭খ্রি.)।

৭২ মো. আবদুল কাদের, শিক্ষা বিস্তারে কুমিল্লা জেলার মুসলিম মনীষীদের অবদান, এম ফিল থিসিস, (কুষ্টিয়াঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২ খ্রি.), অপ্রকাশিত।

৭৩ মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম : জীবন ও সাধনা, (ঢাকাঃ আল-নূর পাবলিকেশন, ২০০৩খ্রি.)।

৭৪ মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, খাজা আবদুল মজিদ শাহ : জীবন ও কর্ম, (ঢাকা:ই.ফা.বা.২০০১খ্রি.)।

৭৫ মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস, কুমিল্লা জেলার ইসলাম প্রচার, (ঢাকা:ই.ফা.বা.,১৯৮৭খ্রি.)।

৭৬ মুহাম্মদ উল্লাহ মজুমদার, "বাংলাদেশের শিক্ষা বিস্তারে কুমিল্লা জেলার বিদ্যোৎসাহী সমাজ:১৯০৫-১৯৪৭" শীর্ষক পিএইচডি থিসিস (কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫খ্রি.), অপ্রকাশিত।

৭৭ রশিদ আহমদ, বাংলাদেশের সুফীসাধক, (ঢাকাঃ মডার্ন লাইব্রেরি, ১৯৭৪খ্রি.)।

৭৮ শিক্ষা বিস্তারে ও সংস্কারে ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দীক (র.), (ঢাকাঃ ই.ফা. বা. ২০০৪ খ্রি.)।

৭৯ শায়েখুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, ড. এ. এইচ এম মুজতবা হোছাইন (সম্পাদিত) হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, (ঢাকাঃ ইসলামীক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট বাংলাদেশ, ১৯৯৮খ্রি.)।

৮০ শ.ম. শওকত আলী, কুষ্টিয়া জেলার ইসলাম, (ঢাকা : ই.ফা.বা. ১৯৯৩খ্রি.)।

৮১ শামছুদ্দীন কাসেমী (খতমে নবুওয়াত আন্দোলন পরিষদ বাংলাদেশ, ১৯৯০খ্রি.)।

৮২ সাইয়েদ মাহবুব রাদভীরী, তারিখে দারুল উলূম দেওবন্দ, ১ম খণ্ড (উর্দু), (ভারত : দারুল উলূম দেওবন্দ, ১৯৯২খ্রি.)।

৮৩ সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ : (ঢাকা : ই.ফা.বা., ১৯৯৬খ্রি.)।

৮৪ স্মারক গ্রন্থ, বেদনার অন্তরালে, অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম. (শাহ্ হোসাইন রিসার্চ একাডেমী, দারুস সুন্নাহ ওয়ালীয়া কমপ্লেক্স মৌকরা, ২০০৭খ্রি.)।

৮৫ হাফিয মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, ফখরে বাঙ্গাল আল্লামা তাজুল ইসলাম ও সাথীবর্গ (ঢাকাঃ ই.ফা.বা., ২০০৪খ্রি.)।

৮৬ হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, আমরা যাদের উত্তরসূরি, (ঢাকাঃ আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০০৬খ্রি.)।

৮৭ হিফজুর রহমান, মাশায়েখে কুমিল্লা, (কুমিল্লা : আল-জামেয়াতুল ইসলামীয়া, দারুল উলূম, বরুড়া, ২০০০খ্রি.)।

৮৮ হাফেজ্জী হুযুর (র.) স্মারক গ্রন্থ, (ঢাকাঃ মডার্ন ইঞ্জিনিয়ার এন্ড আর্কিটেক্টস লিমিটেড, ২০০৫খ্রি.)।

৮৯ Sirajul Islam (ed), Banglapedia, Vol.3, (Dhaka:Asiatic Society of Bangladesh, 2003).

৯০ A.K.M. Yaqub Ali. Aspects of society and culture of the Bengal, 1200-1576 A.D. (Un-published Ph.D. Thesis, Rajshahi University, 1981).

৯১ Dr. Enamul Hoque, History of Sufism in Bengal, Dhaka, 1980.

৯২ Islam in Bangladesh, through ages o.p.cit., (Dhaka:I.F.B., 1995 A.D.).

৯৩ Journal of Asiatic Society of Bengla, 1922.

Dhaka University Institutional Repository

৯৪ Dr. A.K.M. Ayub Ali, History of Traditional Education in Bangladesh, (I.F.B. 1983).

৯৫ Madhury R. Shah, Instruction in Education and Teaching Technology (New Delhi: Sumaiya Publications Pvt. Ltd, Bombay).

পত্র-পত্রিকা ও স্মরণিকা

৯৬ সাঈদীয়া স্মরণিকা, আড়াইবাড়ি সাঈদিয়া আলিয়া মাদরাসা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৯৯৩খ্রি.।

৯৭ স্মরণিকা, (ঢাকা: জামিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ, ১৯৯৪খ্রি.)।

৯৮ স্মারক গ্রন্থ, পীরে কামেল মাও. আবুল কাসেম (রহ.) জীবন ও কর্ম, ২০১৪খ্রি.।

৯৯ স্মারক গ্রন্থ, জামেয়া আরাবিয়া লালবাগ, ঢাকা, ২০১৩খ্রি.।

১০০ স্মারক গ্রন্থ, ধামতী মাদরাসা, (কুমিল্লা: ধামতী মাদরাসা, ১৯৮৬খ্রি.)

১০১ ডায়েরি, (ঢাকা: ফরিদাবাদ মাদরাসা, ২০০৬খ্রি.)।

১০২ স্মৃতি অম্লান, মাওলানা সিফাতুল্লাহ স্মরক গ্রন্থ ২য় প্রকাশ সৌদি আরব, জেদ্দা-২০০৭খ্রি.।

১০৩ একটি নাম একটি স্মৃতি, শেখ মো. কামাল উদ্দিন, সাঈদিয়া দরবার শরীফ, ১৯৯২ খ্রি.।

১০৪ মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, মুহাম্মদ আমীমুল এহসান, মো. হেলালুজ্জামান, (অধ্যাপক মাওলানা আবু নাঈম মো. ইব্রাহীম (রহ.)-এর জীবন ও কর্ম, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ১-১০ (অপ্রকাশিত)।

১০৫ মুহাম্মদ আমীমুল এহসান, মো. হেলালুজ্জামান, (প্রিন্সিপাল মাওলানা আবুলাইচ মো. সফিকুল আলম জীবন ও কর্ম, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ১-১০ (অপ্রকাশিত)।

১০৬ আলোর কাফেলা, (ঢাকা: চৌধুরী এন্ড সন্স, ২০০৫খ্রি.)

১০৭ দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১৩ ডিসেম্বর ২০১২খ্রি.।

১০৮ দৈনিক সংগ্রাম, ২৬ আগস্ট ১৯৯৪খ্রি.।

১০৯ দৈনিক আমার দেশ, ১৩ই ডিসেম্বর ২০১২খ্রি.।

১১০ দৈনিক ইনকিলাব, ১৩ই ডিসেম্বর ২০১২।

১১১ চৌদ্দগ্রাম: বাংলা পিডিয়া, ৩য় খণ্ড।

ওয়েবসাইট :

১১২ কুমিল্লা জেলা তথ্য বাতায়ন। জেলা প্রশাসকের ওয়েবসাইট।

১১৩ ব্যানবেইস ফরম, ড. আহসান সাইয়েদ।

১১৪ ব্যানবেইস ফরম, মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী।

১১৫ জেলা প্রশাসকের ওয়েবসাইট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

১১৬ চাঁদপুর জেলা প্রশাসক ও জেলা পরিষদের ওয়েবসাইট।

Dhaka University Institutional Repository

ইনস্টিটিউট ফর লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট (ইলিম)
Institute for Library and Information Management (ILIM)

(সরকার অনুমোদিত ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত)

ওয়েস্ট ধানমন্ডি ইউসুফ হাইস্কুল ক্যাম্পাস, শংকর, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৭।

পাসপোর্ট সাইজ ছবি

আবেদন পত্র

পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন সায়েন্স কোর্স

শিক্ষাবর্ষ : ২০২০-২০২১

আবেদন ফরম ইংরেজিতে পূরণ করতে হবে।

আবেদনের ক্রমিক:

জমার ক্রমিক:

১। প্রার্থীর নাম :-----------------------------------

২। পিতার নাম :-----------------------------------

৩। মাতার নাম :-----------------------------------

৪। স্থায়ী ঠিকানা :-----------------------------------

৫। বর্তমান ঠিকানা :-----------------------------------

৬। জন্ম তারিখ : ------------------ ৭। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর : ------------------

৮। সেক্স : পুরুষ মহিলা

৯। জাতীয়তা : বাংলাদেশী

১০। বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত অবিবাহিত

১১। ধর্ম :-----------------------------------

১২। শিক্ষাগত যোগ্যতা :

পরীক্ষার নাম	প্রাপ্ত বিভাগ/শ্রেণি/গ্রেড	পাসের সন	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়	মোট নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	যোজঃ নম্বর	যোগ নম্বর
এস,এস,সি/সমমান							
এইচ,এস,সি/সমমান							
স্নাতক/সমমান							
মাস্টার্স/সমমান							

১৩। অভিজ্ঞতা :

কর্মরত প্রতিষ্ঠানের নাম	পদবী	কর্মকাল

১৪। অভিভাবকের নাম :-----------------------------------

১৫। পিতা/মাতা/ভ্রাতা/অভিভাবকের বার্ষিক আয় :-----------------------------------

১৬। অভিভাবকের মোবাইল নম্বর :-----------------------------------

তারিখ: ----------------------

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

মোবাইল নম্বর----------------------

NU Roll:

PIN No:

Dhaka University Institutional Repository

ইনস্টিটিউট ফর লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট (ইলিম)
Institute for Library and Information Management (ILIM)
(সরকার অনুমোদিত ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত)
ওয়েস্ট ধানমন্ডি ইউসুফ হাইস্কুল ক্যাম্পাস, শংকর, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৭।

পাসপোর্ট সাইজ ছবি

ভর্তি ফরম

পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন সায়েন্স কোর্স

শিক্ষাবর্ষ : ২০২০-২০২১

জমার ক্রমিক নম্বর:

শ্রেণী রোল :

১। শিক্ষার্থীর নাম (বাংলায়) :..

(ইংরেজি ব্লক লেটারে) :..

২। পিতার নাম (বাংলায়) :..

(ইংরেজি ব্লক লেটারে):..

৩। মাতার নাম (বাংলায়) :..

(ইংরেজি ব্লক লেটারে) :..

৪। স্থায়ী ঠিকানা :..

....

৫। বর্তমান ঠিকানা :..

....

৬। জন্ম তারিখ :...................... ৭। জাতীয়তা : .... ৮। ধর্ম ....

৯। শিক্ষাগত যোগ্যতা :

পরীক্ষার নাম	প্রাপ্ত বিভাগ/শ্রেণি/গ্রেড	পাসের সন	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়	মোট নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	রেজি: নম্বর	রোল নম্বর
এস,এস,সি/সমমান							
এইচ,এস,সি/সমমান							
স্নাতক/ ডিগ্রী পাস/ সমমান							
মাস্টার্স/সমমান							

১০। চাকুরির অভিজ্ঞতা :

প্রতিষ্ঠানের নাম	পদবী	কার্যকাল

তারিখ :

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর
মোবাইল নম্বর:......................

আবেদনকারীকে ভর্তির অনুমতি প্রদান করা হইল।

অধ্যক্ষ
ইলিম, শংকর, ঢাকা।